বৈষ্ণব-দর্পণ

অমরেন্দ্রনাথ সাহা

পরিবেশক
পুস্তক বিপণি
২৭ বেনিয়াটোলা লেন,
কলকাতা ৭০০ ০০৯

॥ উৎসর্গ ॥

পরমারাধ্য স্বর্গত পিতৃদেব
হরিশচন্দ্র সাহা
ও পরমারাধ্যা স্বর্গতা মাতৃদেবী
সুশীলা সুন্দরীর
পুণ্য স্মৃতির উদ্দেশ্যে উৎসর্গিত।

বৈষ্ণব-দর্পণ

"দুকূলং বিভ্রাণো দলিত হরিতাল দ্যুতিভরং
জবাপুষ্পশ্রেণীরুচিরুচির পাদাম্বুজতলঃ।
তমাল শ্যামাঙ্গো দর-হসিত-লীলাঙ্কিত-মুখঃ
পরানন্দা ভোগঃ স্ফুরতু হৃদি মে কোঽপি পুরুষঃ"।।

যাঁর পরিধানে আছে সমুজ্জ্বল পীতাম্বর, যাঁর চরণতল জবাকুসুম বর্ণসদৃশ লালিমাময় সুন্দর, যাঁর মুখ কমল মৃদমন্দ হাস্যরেখা দ্বারা সুশোভিত—এমন এক পরিপূর্ণ পরমানন্দ-ঘন মূর্তি তমাল-শ্যামল পুরুষ আমার হৃদয়ের মধ্যে স্ফূর্তি প্রাপ্ত হোন।

॥ সূচীপত্র ॥

প্রথম পর্ব

প্রথম অধ্যায় ॥ ১ - ২

দ্বিতীয় অধ্যায় ॥ ৩ - ৩৬

তৃতীয় অধ্যায় ॥ ৩৭ - ৪৪

চতুর্থ অধ্যায় ॥ ৪৫ - ৭৭

অর্পণ, চন্দন ঘর্ষণ ও অর্পণ। পূজাবিধি—আচমন, আসনশুদ্ধি, করশুদ্ধি, পুষ্পশুদ্ধি, ঘণ্টাপূজা, সামান্যার্ঘ্য স্থাপন, শঙ্খস্থাপন, জলশুদ্ধি, পাত্রশুদ্ধি, আত্মশুদ্ধি, ভূতশুদ্ধি।

(৩) পূর্বাহ্নকৃত্য—গুরুপূজা, নবদ্বীপ ও বৃন্দাবনের ধ্যান। শ্রীকৃষ্ণের ধ্যান ও প্রণাম। শ্রীরাধার ধ্যান ও প্রণাম, গোপাল গায়ত্রী ধ্যান ও পূজা। পঞ্চতত্ত্বের ধ্যান ও প্রণাম, গৌরাঙ্গ, নিত্যানন্দ, অদ্বৈত, গদাধর ও শ্রীবাসের ধ্যান ও প্রণাম। পূজান্তে প্রার্থনা মন্ত্র।

(৪) মধ্যাহ্নকৃত্য — বিগ্রহ পূজা, নিত্যপাঠ, প্রণাম, পঞ্চাঙ্গ ও সাষ্টাঙ্গ।
(৫) অপরাহ্নকৃত্য — সংখ্যাপূর্বক নামজপ শাস্ত্রপাঠ, মালার ধ্যান।
(৬) সায়াহ্নকৃত্য — ভোগ, আরতি ও লীলা স্মরণ
(৭) প্রদোষকৃত্য — বিগ্রহ শয়ন ইত্যাদি
(৮) রাত্রিকৃত্য — সংখ্যাজপ, কীর্তনাদি, শয্যাগ্রহণ।

চতুর্থ পর্ব

দশম অধ্যায় ॥ ১৩৫-১৪৯

চৌরাশি ক্রোশ ব্রজমণ্ডলের দ্বাদশবন, গৌড়ীয় বৈষ্ণবগণের লুপ্ত বৃন্দাবন উদ্ধার ও অন্যান্য দ্রষ্টব্য স্থান।

ব্রজমণ্ডলের দ্বাদশবন, ২৪ উপবন, পঞ্চপর্বত, সপ্তসরোবর, সপ্তস্থানে কৃষ্ণচরণচিহ্ন, ছয়টি ঝুলন স্থান, ছয়টি দানলীলার স্থান, তিনটি বট, দুইটি পুলিন, নয়টি ক্ষেত্রপাল, বৈষ্ণবদের সমাধিস্থল।

বৃন্দাবনের বিগ্রহাদি—গোবিন্দ, মদনমোহন—মূর্তিরহস্য, গোপীনাথ, রাধারমণ, রাধাদামোদর, রাধাবিনোদ, গোকুলানন্দ, গিরিধারী, শ্রীগোপাল, শ্রীবৃন্দাজী, শ্রীগোবর্ধনশিলা, বংকবিহারী, শেঠের মন্দির, লালাবাবুর মন্দির, শাহজীর মন্দির, জামাই বিনোদ মন্দির, জয়পুর রাজার মন্দির।

অন্যান্য—নিকুঞ্জবন, নিধুবন, কালীয়দমন, সূর্যঘাট, পুষ্পন্দনঘাট, যুগলঘাট, বিহারঘাট, তেঁতুলঘাট, শৃঙ্গারঘাট, গোপালঘাট, বস্ত্রহরণঘাট, ভ্রমরঘাট, কেশীঘাট ও রাজঘাট। ইমলিতলা।

দ্বাদশবন— বৃন্দাবন মধুবন, তালবন, কুমুদার বহুলাবন, কাগুন, খুদির বন, ভদ্রবন, ভাণ্ডীর বন, বিল্ব বন, লৌহবান, মহাবন বা গোকুল।

মথুরা—শ্রীকেশবদেব মন্দির, বিশ্রামঘাট, ধ্রুবঘাট, কংসটিলা, পোতরাকুণ্ড, বলীটিলা।

অন্যান্য—ব্রহ্মাণ্ডঘাট, রাভেল, গোবর্ধন, ভোজনস্থলী, চরণপাহাড়ী, নন্দগ্রাম, সংকেতকুঞ্জ, বর্ষাণা, যাবট, রাধাকুণ্ড—শ্যামকুণ্ড। চৌরাশি ক্রোশ ভ্রমণসূচী।

একাদশ অধ্যায় ॥ ১৫০-১৫৮

বৈষ্ণবগণের জ্ঞাতব্য কয়েকটি আখ্যান—সাক্ষীগোপাল, ক্ষীরচোরা গোপীনাথ, করমেতিবাঈ, ভক্ত গোবিন্দদাস, বিষ্ণুপুরের গ্রন্থচুরি।

পঞ্চম পর্ব

দ্বাদশ অধ্যায় ॥ ১৫৯-১৬২

বৈষ্ণব তীর্থ পরিক্রমা। শ্রীপাট ও মহাপাট। দ্বাদশ গোপালের পাট পরিচিতি।

ত্রয়োদশ অধ্যায় ॥ ১৬৩-১৮৮

পশ্চিমবঙ্গ জেলাভিত্তিক বৈষ্ণব-তীর্থ :

পশ্চিমবঙ্গ — ২৪ পরগনা, নদীয়া, হুগলী, বর্ধমান, মুর্শিদাবাদ, মেদিনীপুর, বীরভূম, বাঁকুড়া, মালদহ ও হাওড়া।

ওড়িশা — পুরী, গম্ভীরা, সার্বভৌম আলয়, টোটা গোপীনাথ, হরিদাস ঠাকুরের স্থান গুণ্ডিচা বাড়ী। আলাল নাথ, ভুবনেশ্বর, যাজপুর, কটক।

বিহার—কানাই-এর নাটশালা, গয়া।

উত্তরপ্রদেশ—কাশী, প্রয়াগ

চতুর্দশ অধ্যায় ॥ ১৮৯

ভারতের অন্যান্য প্রদেশ বৈষ্ণবতীর্থ

বাংলাদেশে জেলা ভিত্তিক বৈষ্ণবতীর্থ—রাজশাহী জেলায়, আবোরা, প্রেমতুলি, খেতুরী, পাছপাড়া।

যশোরে— তালখড়ি, হালদা মহেশপুর, বোধখানা, ফতেয়াবাদ।

চট্টগ্রাম— চক্রশাল, বেলেটি।

ঢাকা— স্বর্ণগ্রাম, বেতুল্যা, কাষ্ঠকাটা।

শ্রীহট্ট— নবগ্রাম, পনাতীর্থ, বড়গঙ্গা, ভিটাদিয়া, শ্রীহট্ট।

খুলনা— ব্যূঢ়ন।

বগুড়া— গোপীনাথপুর

ফরিদপর—ফরিদপুর।

পঞ্চদশ অধ্যায় ১৮৯-১৯২

॥ বিশ্বে কৃষ্ণনাম প্রচার ॥

প্রথম পর্ব

প্রথম অধ্যায়

বৈষ্ণব ধর্মের উৎস সন্ধানে

সাধারণভাবে বিষ্ণুদেবতার ভক্ত বা উপাসকদের বৈষ্ণব বলা হয়। কিন্তু এখন বৈষ্ণব শব্দের অর্থ ব্যাপকতর রূপ লাভ করেছে। এখন কৃষ্ণবাসুদেবরূপী বিষ্ণুর উপাসকেরাও বৈষ্ণব।

এই বৈষ্ণবধর্ম যে কত প্রাচীন তা এখন পর্যন্ত সঠিকভাবে নির্ণীত হয়নি। তবে এটা বলা যায় ভারতবর্ষে সুপ্রাচীন কাল থেকে ভগবান বিষ্ণু ও বসুদেব-তনয় শ্রীকৃষ্ণ ভাগবতজনের অন্তরের অন্তরতম দেবতারূপে পূজিত হয়ে আসছেন। হিন্দুদের আদি ধর্মগ্রন্থ বেদ। ঋগ্বেদে বিষ্ণু নামক দেবতার উল্লেখ আছে। যজুর্বেদের বহুস্থানে বিষ্ণুর উল্লেখ পাওয়া যায়। কঠোপনিষদ বা ছান্দোগ্য উপনিষদে বিষ্ণু ভক্তহৃদয়ে সর্বোচ্চ স্থান অধিকার করে আছেন। উপনিষদোত্তর যুগে ভারতবর্ষে বিষ্ণু ও বাসুদেবকে কেন্দ্র করে ভক্ত সম্প্রদায় গড়ে উঠে। আবও পরবর্তীকালে ভাগবত, বিষ্ণুপুরাণ, পদ্মপুরাণ, ব্রহ্মবৈবর্তপুরাণ এবং মহাভারতীয় কৃষ্ণলীলায় বৃন্দাবনলীলা যুক্ত হয়ে ভাগবত ধর্ম বৈষ্ণবধর্মের আকারে বিশেষভাবে ব্যপ্তিলাভ করে।

ভাগবতধর্ম ব্যাপকতরভাবে বৈষ্ণবধর্ম বোঝালেও সংকীর্ণভাবে বৈষ্ণব সম্প্রদায়ের একটি শাখাকে বুঝিয়ে থাকে। বিষ্ণুর উপাসক বৈষ্ণব বটে, তবে কৃষ্ণ-বাসুদেবের উপাসকেরা ভাগবত নামে অভিহিত হতেন। পাঞ্চরাত্র নামে এক বৈষ্ণব সম্প্রদায়ের পরিচয় খ্রিস্টীয় দ্বিতীয় শতক থেকে পাওয়া যায়। পাঞ্চরাত্র মতে বাসুদেবই পরমদেবতা।

খ্রিস্টীয় প্রথম শতাব্দী হতে নবম শতাব্দী পর্যন্ত দক্ষিণ ভারতে এক বৈষ্ণব সম্প্রদায় ছিলেন—এই সম্প্রদায় আলোয়ার সম্প্রদায় নামে পরিচিত। আলোয়ারের অর্থ—ঈশ্বর প্রেমে পাগল। আলোয়ারেরা প্রেমের মধ্য দিয়ে কৃষ্ণের আরাধনা করতেন। বারোজন আলোয়ার সাধকের পরিচয় পাওয়া যায়। তাঁদের মধ্যে অণ্ডাল বা গোদা ছিলেন মহিলা। তাঁর রচিত 'তিরুপ্ পাবৈ' গান গেয়ে ব্রজভূমির ব্রজকন্যারা কৃষ্ণের ঘুম ভাঙাতেন। আলোয়ারেরা স্বকীয়া ও পরকীয়া দু'প্রকার নায়িকার ভাবেই কৃষ্ণভজন করতেন। বাংলার বৈষ্ণবধর্মের সঙ্গে দক্ষিণ ভারতের এই আলোয়ার ভক্তিসাধনার যথেষ্ট মিল আছে। কথিত আছে, মহাপ্রভু শ্রীচৈতন্য দক্ষিণ ভারত হতে 'ব্রহ্মসংহিতা' ও কৃষ্ণ-কর্ণামৃত গ্রন্থদুটি সঙ্গে নিয়ে এসেছিলেন। মনে হয়, এই গ্রন্থদুটি থেকে তিনি ভক্তিভাবের অনেক উপাদান গ্রহণ করে থাকতে পারেন। তবে নিঃসন্দেহে কিছু বলা যায় না। ভক্তি পথানুসারী দার্শনিকগণ ভক্তিতত্ত্বকে দার্শনিক তত্ত্বরূপে প্রতিষ্ঠিত করেন। এঁদের মধ্যে শঙ্কর অদ্বৈতবাদী। তিনি ব্রহ্মভিন্ন অন্য সকল পদার্থকে মিথ্যাও ইন্দ্রজালবৎ বলে প্রমাণ করেন, আর দ্বৈতবাদী ভক্ত দার্শনিকগণ অচলা ভক্তি দ্বারা ভগবানকে লাভ করতে চেয়েছেন। এই দ্বৈতবাদী বৈষ্ণবগণ চারি শাখায় বিভক্ত :—

(১) রামানুজ প্রভাবান্বিত শ্রীসম্প্রদায় (বিশিষ্টাদ্বৈতবাদ)

(২) মধ্ব প্রভাবান্বিত ব্রহ্ম সম্রদায় (দ্বৈতবাদ)

(৩) বল্লভাচার্য প্রভাবান্বিত রুদ্র সম্প্রদায় (শুদ্ধাদ্বৈতবাদ)

(৪) নিম্বার্ক প্রভাবান্বিত সনক সম্প্রদায় (দ্বৈতাদ্বৈতবাদ)।

পুরাণগুলির মধ্যে পদ্মপুরাণে উল্লেখ আছে :—

"শ্রী-ব্রহ্ম-রুদ্র-সনকা-বৈষ্ণবাঃ ক্ষিতিপাবনাঃ।' পুরাণাদিতে কৃষ্ণলীলা-বিষয়ক যে ভক্তিধর্মের উল্লেখ আছে তাকে দার্শনিক ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত করেন দ্বৈতবাদী দার্শনিকেরা। দশম শতাব্দী হতে একাদশ শতাব্দীর দ্বিতীয়ার্ধ পর্যন্ত এঁরা বর্তমান ছিলেন।

(১) **রামানুজ প্রভাবান্বিত শ্রীসম্প্রদায়** :—ইহা আলোয়ার সম্প্রদায়েরই সংশোধিত রূপ। আলোয়ারেরা কেবল বিষ্ণুর উপাসক ছিলেন, কিন্তু শ্রীসম্প্রদায়ের গোষ্ঠীভক্তগণ "শ্রী" বা লক্ষ্মী এবং নারায়ণের উপাসক ছিলেন। শ্রী সম্প্রদায় বিশিষ্টাদ্বৈতবাদকে সম্পূর্ণভাবে প্রতিষ্ঠিত করেন। এই সম্প্রদায়ের প্রথম আচার্য নাথমুনি (খ্রিস্টীয় ৮২৪-৯২৪)। আরও অনেক আচার্যদের মধ্যে রামানুজই (জন্ম—আনুমানিক একাদশ শতাব্দী) এই মতবাদকে দার্শনিক ভিত্তির উপর সুপ্রতিষ্ঠিত করেন। মাদ্রাজ প্রেসিডেন্সিতে চেঙ্গলাট পরগণায় পেয়ামভুদরা গ্রামে তিনি জন্মগ্রহণ করেন, তাঁর পিতার নাম কেশব, মাতার নাম কান্তিমতী দেবী। ইনি শ্রীসম্প্রদায়ের সর্বপ্রধান ব্যক্তি। শঙ্করাচার্য শুধু ব্রহ্মকেই স্বীকার করেছেন। তাঁর মতে ব্রহ্মছাড়া সংবস্তু আর নেই। জগৎ বোধ রজ্জুতে সর্পভ্রমের মত, আর রামানুজের মতে ব্রহ্ম একমাত্র সৎ বস্তুহলেও তিনি নির্গুণ নন। গুণদ্বারা তাঁকে বিশিষ্ট করা যায়। জীব ও জগত ব্রহ্ম থেকে বিচ্ছিন্ন নয়। আবার জীব ও জগৎই ব্রহ্ম নয়। অগ্নি আর অগ্নির উত্তাপ, সূর্য ও সূর্যকিরণে যে সম্পর্ক ব্রহ্ম ও জীবে সেই সম্পর্ক।

সূর্যের কিরণ বস্তুটি সূর্য নয়, আবার সূর্য থেকে পৃথক নয়। সূর্যের কিরণ হচ্ছে সূর্যের শক্তি বা গুণ ; সেইরূপ জীব ব্রহ্ম নয়, আবার ব্রহ্ম থেকে পৃথক নয়। জীবজগতকে ব্রহ্মের গুণ বলা যেতে পারে। রামানুজ গোলাপফুলের দৃষ্টান্ত দিয়ে তাঁর ভক্তিধর্ম বা দর্শন সুপ্রতিষ্ঠিত করেছেন। গোলাপের সৌন্দর্য, গোলাপের গন্ধ, গোলাপের পাপড়ি, কোনটাই বিচ্ছিন্নভাবে গোলাপ ফুল নয়, সব মিলেই গোলাপফুল। তেমনি জীব ও জগৎ ব্রহ্মের গুণের সঙ্গেই একান্তযুক্ত। রামানুজ ব্রহ্মকে করুণাময় ভক্তিবৎসল বিষ্ণুরূপে গ্রহণ করেছেন। তিনি ১২০ বৎসর বয়সে দেহত্যাগ করেন, তাঁর মৃত্যুর পর শ্রী সম্প্রদায় দ্বিধাবিভক্ত হয়ে যায়।

(২) **নিম্বার্ক প্রভাবান্বিত সনকসম্প্রদায়** :—নিম্বার্ক দক্ষিণ ভারতে তেলুগু ব্রাহ্মণবংশে একাদশ-দ্বাদশ শতাব্দীতে জন্মগ্রহণ করেন। এঁর মতবাদকে দ্বৈতাদ্বৈতবাদ বলা হয়। তিনি ভক্তিধর্মে বিশ্বাসী ছিলেন। তাঁর মতে রাধা বিষ্ণুর নিত্য-সহচরী। তিনি বিষ্ণু বা শ্রীকৃষ্ণকে পরম ব্রহ্ম বিবেচনা করতেন। তাঁর মতে জীবজগৎ ও ব্রহ্মের মধ্যে অংশ অংশীর সম্বন্ধ। রামানুজের সূর্য ও কিরণ সম্পর্ক নয়। নিম্বার্কের মতে ব্রহ্ম ও জীবজগতের সম্বন্ধ সুবর্ণপিণ্ড ও তা' হতে নির্মিত অলংকারের ন্যায়। অলংকার সুবর্ণ হতে পৃথক বটে আবার একও বটে। ভেদের মধ্যেও অভেদ রয়েছে। জীব জগতেও ব্রহ্মের অতিরিক্ত পৃথক সত্তা আছে ; আবার জীবজগতের মুল কারণ ব্রহ্ম ছাড়া আর কিছুই নয়, সুতরাং জীব ও ব্রহ্মের স্বরূপ দ্বৈত এবং অদ্বৈত দুই-ই। তাই তাঁর মতবাদ দ্বৈতাদ্বৈতবাদ বা ভেদাভেদতত্ত্ব নামে পরিচিত।

(৩) **মধ্বাচার্য প্রভাবিত ব্রহ্ম সম্প্রদায়** :—মধ্বাচার্য দক্ষিণভারতে দ্বাদশ শতাব্দীতে জন্মগ্রহণ করেন। তিনি ভক্তিদর্শনের তৃতীয় মত প্রচার করেন যার নাম দ্বৈতবাদ বা ভেদাভেদ বাদ। এই মতে জীবজগৎ ও ব্রহ্ম উভয়ই সত্য এবং উভয়ই স্বতন্ত্র। এই মতে ব্রহ্মসত্তা ও জীবসত্তা উভয়ই স্বীকৃত। তাই এটি দ্বৈতবাদ নামে বা ব্রহ্মে ভেদ আছে বলে ভেদাভেদ নামে পরিচিত। মধ্বাচার্য মতে ব্রহ্ম জ্ঞানী ও করুণাময়। হরি, বিষ্ণু, ব্রহ্ম অভিন্ন। বিষ্ণুই সর্বোত্তম সত্য। তিনি সকল শাস্ত্রের একমাত্র প্রতিপাদ্য। জীবগণ তাঁর করুণা পেলেই দুঃখ থেকে মুক্তি লাভ করে। তাঁর মতে দেহজীবনেই জীবের সেই মুক্তি সম্ভব। তিনি শ্রীসম্প্রদায়ের

মত লক্ষ্মীনারায়ণের সেবা করতেন। সংস্কৃত ভাষায় দ্বাদশ স্তোত্র ও কৃষ্ণামৃত মহার্ণব নামক দুটি উৎকৃষ্ট ভক্তিগীতিমূলক গ্রন্থ তাঁরই রচনা।

(৩) **বল্লভাচার্য প্রভাবিত রুদ্র সম্প্রদায়** :—পূর্বোক্ত তিন সম্প্রদায়ের অনেক পরে ১৪-১৫শ শতাব্দীতে বল্লভাচার্যের আবির্ভাব। তাঁর প্রচারিত ভক্তিকেন্দ্রিক দর্শনশাখার নাম বিশুদ্ধাদ্বৈত বাদ। রুদ্র হতে উৎপত্তি বলে একে রুদ্র সম্প্রদায়ও বলে। এই মতের প্রথম আচার্য বিষ্ণুস্বামী, তবে বল্লভাচার্যই সমধিক প্রসিদ্ধ। তাঁর মতে জীব ও জগৎ উভয়ই সত্য, কোনটাই মায়া নয়। জীবজগৎ ব্রহ্মময়। ভগবান হলেন গোকুলের শ্রীকৃষ্ণ এবং শ্রীকৃষ্ণের সাক্ষাৎলাভই ভক্তিসাধনার চূড়ান্ত পরিণতি। গোপীজনবল্লভ শ্রীকৃষ্ণই ব্রহ্ম।

ষোড়শ শতাব্দীতে রূপ, সনাতন, জীবগোস্বামী ও বলদেব বিদ্যাভূষণ চৈতন্যতত্ত্বের পটভূমিকায় বেদান্তসূত্রের ভক্তিরসাশ্রিত ব্যাখ্যা দেন। এইমত আচার্যগণের কোন কোন দিকে অনুরূপ, আবার কোথাও কোথাও কিছু ভিন্ন। ইহাই অচিন্ত্যভেদাভেদ নামে পরিচিত।

ভক্তিমাল গ্রন্থে আছে—

"চারি সম্প্রদায় চারি মহান্ত স্বতন্ত্র।
শিষ্য অনুশিষ্যক্রমে দাতা কৃষ্ণমন্ত্র ॥
শ্রী ব্রহ্মা, রুদ্র আর সনক চতুর্থ।
এই চারি সম্প্রদায় বৈষ্ণব মহত্ত্ব ॥

দ্বিতীয় অধ্যায়

ভগবানের লীলাতত্ত্ব ও চৈতন্যাবির্ভাবের পূর্বাভাস

শ্রীকৃষ্ণ যুগে যুগে নরদেহ ধারণ করে পৃথিবীতে অবতীর্ণ হন। তাই আমরা দেখতে পাই তিনি দ্বিভুজ। কিন্তু শ্রীকৃষ্ণই পূর্ণব্রহ্ম চতুর্ভুজ নারায়ণ। শ্রীচৈতন্য চরিতামৃতে আছে—

"স্বরূপ বিগ্রহ কৃষ্ণের কেবল দ্বিভুজ।
নারায়ণ রূপে সেই তনু চতুর্ভুজ ॥
শঙ্খচক্র গদাপদ্ম মহৈশ্বর্য্যময়।
শ্রীপ্রভুর লীলা শক্তি যাঁর চরণ সেবায় ॥"

ভগবান শ্রীকৃষ্ণ পরমপুরুষ। যখন জীবের একমাত্র ভগবদ্‌জ্ঞান লাভ হয়, তখন জীব সংসারের আর কিছুই দেখতে পায় না। এক শক্তিমান ভগবানই সত্য ; আর সবই অলীক ও মিথ্যা। তাঁর শক্তিই এই বিশ্বের কল্পনাময় আকার। তাই শ্রুতি বলেছেন—

'একস্য সত্যঃ, প্রপঞ্চ কার্য্যমিদং ন বস্তু সৎ।।' একমাত্র ভগবানই এ প্রপঞ্চময় বিশ্বের সত্তাব্যঞ্জক। তাঁরই মায়াশক্তি দ্বারা এই জগৎ সৃষ্টি হয়েছে। তাই জীব মায়ার অধীন। ভগবান দ্বাপর লীলায় শ্রীব্যাসদেবকে বলেছিলেন—

"অহমের ক্বচিদ্ ব্রহ্মণ! সন্ন্যাসাশ্রমাশ্রিত।
হরিভক্তি গ্রাহয়ামি কলৌপাপহতান্নরাণ।" অর্থাৎ

হে ব্রহ্মণ, আমি কলিযুগে অবতার গ্রহণ করে সন্ন্যাসধর্ম আচরণ দ্বারা ধরার পাপাসক্ত লোকদিগকে হরিভক্তি গ্রহণ করাব।

'সেই কৃষ্ণ অবতীর্ণ শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য।'
সেই পরিকরগণ সঙ্গে সব ধন্য" (চৈ চ)

বৃহন্নারদীয় পুরাণে আছে "হরের্নাম হরের্নাম হরের্নামৈব কেবলম্!
কলৌ নাস্ত্যেব নাস্ত্যেব নাস্ত্যেব গতিরন্যথা ॥

মহাপ্রভু প্রবর্তিত সাধন পথ অতি সরল ও সহজসাধ্য। শুধুমাত্র নামজপ ও সংকীর্তন যজ্ঞদ্বারা ভগবানে আসক্তি স্থাপন করাই হলো এই পথের প্রধান উদ্দেশ্যে। ইহা আচার-বিচার, শুচি-অশুচি কিছুরই অপেক্ষা করেনা। পবিত্র-অপবিত্র সর্ব অবস্থাতেই সাধন করা যায়। তিনি বলেছেন—হরিনাম পবিত্র বস্তু ; সেই অতি পবিত্র নাম জপ করার জন্য আবার দেহের পবিত্রতার কি দরকার? ভক্তের নিকট শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য যে ভগবানের অবতাব তা বিভিন্ন পুরাণ থেকেও জানা যায়। যথা—

পদ্মপুরাণে 'কলেঃ প্রথম সন্ধ্যায়াং গৌরাঙ্গোহং মহীতলে।
ভাগীরথী তটে রম্যে ভবিষ্যামি শচীসুতঃ ॥'

"কলির প্রথম ভাগে শ্রীগৌরাঙ্গ নামে।
শচীসুত হব আমি নবদ্বীপ ধামে ॥"

নাবদীয় পুরাণে— "অহমেব কলৌ বিপ্র নিত্যং প্রচ্ছন্ন বিগ্রহঃ।
ভগবদ্ভক্তরূপেণ লোকান রক্ষামি সর্বথা ॥"

"জ্ঞাত হও ওহে বিপ্র আমার বচন।
কলিতে বিগ্রহ রূপে থাকিয়া প্রচ্ছন্ন ॥
ভক্তরূপে লোক সবে করিয়া আচ্ছন্ন।
রক্ষিবো সকল লোকে করিয়া যতন ॥"

এ ছাড়া শ্রীমদ্ভাগবতের দশম স্কন্ধে, মহাভারতে, বায়ু পুরাণে শ্রীকৃষ্ণের ভাবী অবতারের কথা বর্ণিত আছে।

গড়ুর পুরাণে--পূর্ণ ভগবদ্‌রূপী আমি কলিযুগের সন্ধিক্ষণে নবদ্বীপের মায়াপুরে শচীনন্দন রূপে অবতীর্ণ হব।

গৌর পুরাণে—আমি কলিযুগে ভাগীরথীতীরে শুদ্ধ ও গৌরবিগ্রহে অবতীর্ণ হয়ে জীবগণকে কৃষ্ণকীর্তন উপদেশ করব।

স্কন্দ পুরাণে—অভ্যন্তরে কৃষ্ণ ও বহির্দেশে গৌর বিগ্রহ, অঙ্গ-উপাঙ্গ অস্ত্র ও পার্ষদ সমন্বিত আমি মায়ামনুষ্যের কর্ম আচরণ সহকারে শচীগর্ভে জন্মগ্রহণ করব।

"অন্তঃ কৃষ্ণো বহির্গৌরঃ সাঙ্গোপাঙ্গাস্ত্রপার্ষদঃ।
শচীগর্ভে সমাপ্নুয়াৎ মায়ামানুষ কর্মকৃৎ ॥"

ভগবান শ্রীকৃষ্ণ তিনটি বিষয় আস্বাদনের নিমিত্ত শ্রীরাধার ভাবকান্তি নিয়ে শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যরূপে শচীগর্ভে অবতীর্ণ হন। বিষয় তিনটি হল—

(১) শ্রীরাধার প্রণয়মহিমার স্বরূপ আস্বাদন।

(২) কৃষ্ণের অনির্বচনীয় মধুরিমা যা শ্রীমতী রাধা আস্বাদন করেন তা কিরূপ তা জ্ঞাত হওয়া,

(৩) শ্রীকৃষ্ণের মাধুর্যের অনুভূতিতে শ্রীরাধার মনে কিরকম সুখের উদয় হয় তা' জানা।

"শ্রীরাধায়াঃ প্রণয়মহিমা কীদৃশো বা নয়ৈবাস্বাদ্যোযেনাদ্ভুত মধুরিমা কীদৃশো বা মদীয়ঃ। সৌখ্যঞ্চাস্যা মদনুভবতঃ কীদৃশং বেতি লোভাৎ তদ্ভাবাঢ্য সমজনি শচীগর্ভ সিন্ধৌ হরীন্দুঃ। (চৈ.চ.১/৪)।

"শ্রীগৌরাঙ্গ"
জীবনালেখ্য

বৈদেশিক বাণিজ্যের পত্তন হওয়ার পর হতেই গঙ্গাতীরে নবদ্বীপ অঞ্চলে বসতির ভিড় বেড়ে যায়। পাল ও সেনরাজাদের সময়ে গঙ্গা ও গঙ্গার শাখানদী দেশের শাসনরক্ষণ ও বাণিজ্য ব্যাপারে বিশিষ্ট ভূমিকা গ্রহণ করেছিল। পূর্ববঙ্গে মুসলমান অধিকার প্রসারের সঙ্গে সঙ্গে পশ্চিমবঙ্গে গঙ্গাতীরে পূর্ববঙ্গের লোকের আগমন ও বসতি বাড়তে থাকে। নদীপথে নবদ্বীপের সঙ্গে একদিকে পূর্ববঙ্গের অপরদিকে রাজধানী গৌড়ের সংযোগ ছিল। ভাগীরথীতীরে বাণিজ্যকেন্দ্র সপ্তগ্রাম ও শাসনকেন্দ্র আম্বুয়া দুইই নবদ্বীপের কাছাকাছি। ধাঁই গ্রাম অর্থাৎ ধাত্রীগ্রামে লক্ষ্মণসেনের উপরাজধানী ছিল। বিদ্বৎজন লক্ষ্মণ সেনের অতিশয় প্রিয় ছিলেন। তাঁর এই বিদ্যানুরাগে আকৃষ্ট হয়ে পূর্ববঙ্গ থেকে অনেক শাস্ত্রজ্ঞ ব্রাহ্মণ নবদ্বীপ ও তার সন্নিহিত অঞ্চলে এসে উপনিবেশ গড়ে তুলেছিলেন। ফলে কালনা-নবদ্বীপ-শান্তিপুর অঞ্চল বিদ্বজ্জনাকীর্ণ ও ঘন বসতিপূর্ণ জনপদে পরিণত হয়েছিল। এইরূপ বিদ্যাচর্চার অনুকূল পরিবেশে ন্যায়শাস্ত্র পাঠের উদ্দেশ্যে আসেন উপেন্দ্র-নন্দন জগন্নাথ মিশ্র। অধ্যয়নান্তে বিবাহ করেন সেখানকার নীলাম্বর চক্রবর্তীর কন্যা শচীদেবীকে এবং নবদ্বীপে বসতি স্থাপন করেন।

নবদ্বীপেই জন্ম হয় শ্রীগৌরাঙ্গের ১৪৮৬ খৃষ্টাব্দের ১৮ই ফেব্রুয়ারী (২৩শে ফাল্গুন. ৮৯২ সাল) দোল পূর্ণিমার সন্ধ্যায়। হরিধ্বনিতে মুখরিত নবদ্বীপ। সেই শুভলগ্নে আবির্ভূত হলেন শ্রীগৌরাঙ্গ। পূর্ণচন্দ্র হতেও তিনি প্রিয়দর্শন। চাঁদে কলঙ্ক আছে কিন্তু গোরাচাঁদ নিষ্কলঙ্ক। তাই নবদ্বীপবাসী বলতেন

"চাঁদে যে কলঙ্ক আছে।
ছি ছি চাঁদ কি গৌরাচাঁদের কাছে ॥

গৌরাঙ্গের বংশপঞ্জী

চৈতন্যদেবের পূর্বপুরুষ মধুকর মিশ্র ওড়িশার রাজা কপিলেন্দ্র দেবের অত্যাচারে যাজপুর থেকে শ্রীহট্টে পালিয়ে আসেন। মধুকর মিশ্রের পিতার নাম ছিল বিশুদ্ধ মিশ্র। ইঁহারা বৈদিক শ্রেণীর ব্রাহ্মণ, বাৎসায়ন গোত্রীয়,
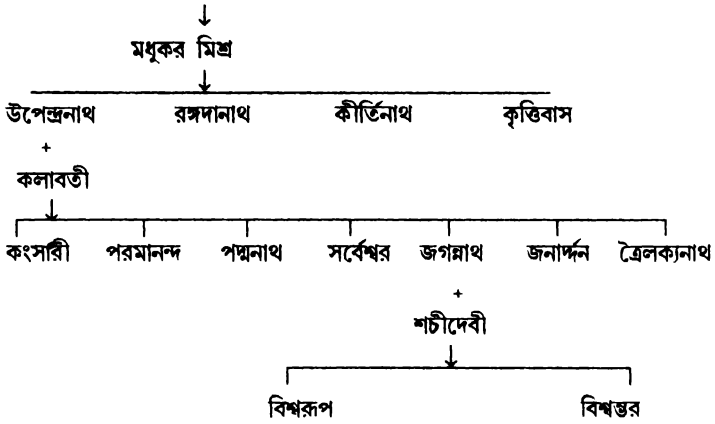
সনাতন মিশ্র বৈদিক শ্রেণীর ব্রাহ্মণ, রাজপণ্ডিত, ধনবান লোক। জগন্নাথ মিশ্রের আটটি মেয়ে হয়েছিল। তারা আঁতুরে অথবা আ; শৈশবাবস্থায় মারা যায়। তারপর বিশ্বরূপ নামে এক পুত্র জন্মে এবং বিশ্বরূপ জন্মাবার প্রায় এগার বছর পরে গৌরাঙ্গের জন্ম হয়।

জগন্নাথ মিশ্রের শ্বশুর নীলাম্বর খুব প্রভাবশালী ব্যক্তি ছিলেন। স্থানীয় মুসলমান শাসক (কাজী) তাঁকে মান্য করতেন। তিনি ভাল জ্যোতিষীও ছিলেন। গৌরাঙ্গের জন্ম হলে ইনি জন্মপত্রিকা বিচার করে বলেছিলেন,

"সিংহ রাশি সিংহলগ্ন উচ্চ গ্রহগণ।
ষড়বর্গ অষ্টবর্গ সর্ব শুভক্ষণ ॥"

আর লঘু পদচিহ্ন আছে "শোভে ধ্বজ বজ্র শঙ্খ পদ্ম মীন।" ফলে জাতক মহাপুরুষ রূপে খ্যাত হবে।

বিশ্বরূপের যখন ষোল বৎসর বয়স, তখন তার বিয়ের নহবৎ বাজছে, পুরনারীরা শুভ বিবাহের উদ্যোগ করছেন এমন এক রাত্রে জ্বালাময় সংসার হতে ত্রাণ পাওয়ার জন্য বিশ্বরূপ সাঁতার দিয়ে গঙ্গা পার হয়ে চলে গেলেন। কোথায় গেলেন কে জানে? সম্ভবতঃ দক্ষিণভারতে। শচীদেবীর অভিযোগ অদ্বৈত আচার্যই তাকে সন্ন্যাস বুদ্ধি দিয়েছিলেন। তাই তিনি বলতেন, কে বলে এই বুড়ার নাম অদ্বৈত, ইনি একটি দৈত্য, আমার চাঁদের মত ছেলেটিকে ঘরের বার করে দিয়ে এই শিশুটির কানে কি মন্ত্রণা দিচ্ছেন কে জানে?

শোনা যায় বিশ্বরূপ কোন এক সিদ্ধপুরুষের নিকট দীক্ষা নিয়ে শঙ্করারণ্য পুরী নাম নিয়ে সন্ন্যাসী হয়েছিলেন, বিশ্বরূপের সন্ন্যাসের পর জগন্নাথ মিশ্র পাঁচ বছরের গৌরাঙ্গের পড়াশুনা বন্ধ করে দিয়েছিলেন কারণ—

"এই যদি সর্বশাস্ত্রে লভিবেক জ্ঞান।
ছাড়িয়া সংসার সুখ করিবে প্রয়াণ"॥ অতএব এর পড়ে কাজ নাই। 'মূর্খ হয়ে ঘরে থাকুক নিমাই।"

জন্মের দশম দিন বিশ্বম্ভরের নামকরণ, ছয়মাস পরে সিতপঞ্চমী হস্তানক্ষত্রযুক্ত শুক্রবারে অন্নপ্রাশন, পঞ্চম বৎসর বয়সে বৈশাখ মাসের পঞ্চম দিবসে শুক্লা ত্রয়োদশী তিথি সোমবারে চূড়াকরণ, এবং বৈশাখ মাসের অক্ষয় তৃতীয়া দিবসে তার উপবীত ধারণ অনুষ্ঠান অনুষ্ঠিত হয়।

বাল্যে দুরন্তপনা :— বাল্যকালে নিমাই অসম্ভব রকমের দুষ্টু ছিলেন। সন্ধ্যাকালে কোন দেবমন্দিরে ঢুকে বিগ্রহের নিকটবর্তী আরতির পঞ্চপ্রদীপ নিবিয়ে দিতেন। কখনও ব্রাহ্মণ চোখ বুজে গীতাখানি সম্মুখে রেখে ধ্যান করছেন, নিমাই গীতাটি নিয়ে ছুটে পালাতেন। কোন ব্রাহ্মণ শিবলিঙ্গ ও উত্তরীয় তীরে রেখে স্নান করতে নামলে তার উত্তরীয় ও শিবলিঙ্গ চুরি করতেন। কখনও কোন বালকের কানে জল ঢুকিয়ে দিয়ে তার বিপদে আনন্দ অনুভব করতেন। গঙ্গাস্নানের সময় সমবয়সী মেয়েদের গায়ে জল ছিটাতেন, স্নান সেরে তারা দেবতার পূজায় বসলে

"কন্যাগণ মধ্যে প্রভু আসিয়া বসিলা।
নৈবেদ্য কাড়িয়া খান সন্দেশ চালু কলা ॥

আর বর দেন— "প্রভু কহে তোমা সভাকে দিলা এই বর।
তোমা সভাকার ভর্ত্তা হবে পরমসুন্দর।

আর না দিলে—

যদি মোরে নৈবেদ্য না দেহ হইয়া কৃপণী।
বুড়ো ভর্ত্তা হবে আর চার চার সতিনী

(চ. ভাঃ)

আবার কখনও কোন বালিকার চুলে ওকড়ার বীচি ফেলে দিয়ে বিয়ে করবার ভয় দেখাতেন; আবার কখনও-বা গায়ে কম্বল জড়িয়ে ষাঁড় সেজে কারো কলাবনে ঢুকে কলা চুরি করে নিয়ে পলায়ন করতেন। এই সকল উৎপাতে নবদ্বীপের লোকদিগকে অতিষ্ঠ করে তোলাতে গ্রামবাসী ব্রাহ্মণ সজ্জনেরা জগন্নাথ মিশ্রকে অনুযোগ করতে লাগলেন। বাধ্য হয়ে জগন্নাথ মিশ্র পুত্রকে গঙ্গাদাস পণ্ডিতের টোলে ভর্তি করে দিলেন।

নিমাইয়ের প্রতিভা ছিল অতীব তীক্ষ্ণ। ব্যাকরণ পাঠে তিনি দ্রুত এগিয়ে গেলেন। তাঁর ব্যাকরণ ও সংস্কৃত ভাষাজ্ঞানে অল্প দিনের মধ্যে অসাধারণ বুৎপত্তি দেখে গঙ্গাদাস পণ্ডিত আশ্চর্য হয়ে গিয়েছিলেন।

এই সময় গৌরাঙ্গের পিতা পরলোক গমন করেন। সে সময় গৌরাঙ্গের বয়স এগার বৎসর আর শচী দেবীর বয়স পঞ্চান্ন। গৌরাঙ্গ মাতাকে সান্ত্বনা দিলেন, পিতৃকৃত্য সমাপন করলেন এবং অধিকতর প্রচেষ্টায় অধ্যয়ন করতে লাগলেন। গৌরাঙ্গ ধনীর দুলাল ছিলেন না। জগন্নাথ মিশ্রের অবস্থা মোটমুটি সচ্ছল ছিল। তাঁর বাড়ির সদর দরজা ছিল দক্ষিণমুখী। সদর দরজা পেরোলে সুন্দর আঙ্গিনা। সেই আঙ্গিনার পশ্চিম ধারে পূর্বমুখী দরজা পেরোলে অন্দর মহল। মিশ্রগৃহে তুলসী গাছ ছিল। ঘরে ছিল বালগোপাল স্বরূপ শালগ্রাম শিলা।

"দক্ষিণ ও পূর্বদ্বারী সুন্দর শ্রীঘরে।
পূর্বদ্বার অভ্যন্তরে সুরম্য চত্বরে"
দক্ষিণ কপাট দিয়া অভ্যন্তরে আসি
ময়ূরের সাথ ডাকে বালক বিলাসী ॥"—চূড়ামণি রচিত (গৌরাঙ্গ বিজয়)

নিমাই ব্যাকরণের সাথে সাথে সাহিত্য, অলংকার, পালি প্রভৃতি শাস্ত্রেও অগাধ পাণ্ডিত্য অর্জন করেছিলেন। ব্যাকরণ শাস্ত্র শেষ হতে হতেই বিশ্বম্ভর নবদ্বীপের ছাত্রসমাজে নবীনতম পণ্ডিত বলে অভ্যর্থিত হয়েছিলেন। মা সংসারে একা। মায়ের কথা চিন্তা করে তিনি মনস্থ করলেন যে এবার টোল খুলে বিয়ে করে রীতিমতো সংসারী সাজবেন। খুললেনও তাই। তখন নিমাই-এর বয়স মাত্র ষোলবছর। প্রতিবেশী শুভানুধ্যায়ী মুকুন্দ সঞ্জয়ের চণ্ডীমণ্ডপে। মুকুন্দের পুত্র সঞ্জয়-পুরুষোত্তম তাঁর প্রথম ছাত্র।

বিশ্বম্ভরের টোল অল্প দিনেই জমে উঠল। পূর্ববঙ্গ থেকেও ছাত্র এসে ভিড় করতে লাগল। ছাত্রদের তিনি ব্যাকরণ পড়ার সঙ্গে সঙ্গে বৈষ্ণব সদাচারও শিক্ষা দিতেন। টোল খোলার কিছুদিন পর বল্লভাচার্যের পরমাসুন্দরী কন্যা লক্ষ্মীপ্রিয়ার সঙ্গে তাঁর বিয়ে হয়। তখন তাঁর বয়স আঠার বৎসর। কিছুদিন অতিবাহিত হলে তিনি কতিপয় ছাত্র নিয়ে পূর্বদেশে অর্থাৎ পদ্মাপারে বহুস্থানে যান এবং প্রভূত যশ ও বহুতর দ্রব্য নিয়ে নবদ্বীপে ফিরে আসেন। বাড়ি এসে প্রথমা স্ত্রী লক্ষ্মীপ্রিয়ার সর্পাঘাতে মৃত্যু সংবাদ শুনে মর্মাহত হন। তারপর মায়ের একান্ত অনুরোধে বিয়ে করেন সম্ভ্রান্তশালী সনাতন মিশ্রের অশেষগুণবতী কন্যা বিষ্ণুপ্রিয়াকে। সনাতন মিশ্রের একমাত্র পুত্র যাদব ও একমাত্র কন্যা বিষ্ণুপ্রিয়া।

১৫০৮ খ্রীষ্টাব্দে নিমাই-এর বয়স যখন ২৩ বৎসর তখন তিনি স্বীয় মেশোমশাই চন্দ্রশেখর আচার্যের সঙ্গে পিতৃপিণ্ড দানের জন্য গয়া যাত্রা করেন। পিতৃপিণ্ডদান অন্তে তথায় ঈশ্বরপুরী সমীপে দীক্ষাগ্রহণ পূর্বক পৌষমাসের শেষভাগে গৃহে প্রত্যাবর্তন করেন।

দীক্ষাগ্রহণের পর গৌরাঙ্গের চরিত্রে অদ্ভুত পরিবর্তন ঘটল। তাঁর উদ্ধত স্বভাব, পাণ্ডিত্যের গর্ব একেবারে দূর হয়ে গেল। যে নিমাই ছিলেন অতিশয় উদ্ধত 'তেমন উদ্ধত আর নাহি নবদ্বীপে' (চৈ. ভা. ১/৮), পণ্ডিতদের গায়ে পড়ে তর্ক বাধান ছিল যার স্বভাব, যার ঝগড়াঝাঁটির ভয়ে মাতাও থাকতেন উদ্বিগ্ন,

'মায়ে বলে বাপ আজ কি পুঁথি পড়িলা।
কাহার সহিত কিবা কোন্দল করিলা ॥—সেই নিমাই দীক্ষা গ্রহণের পর সম্পূর্ণ বদলে গেলেন। গয়া হতে প্রত্যাবর্তনের পর মাত্র চার মাস টোল চালিয়েছিলেন। কিন্তু অধ্যাপনার দিকে তাঁর মন বসছিল না। অবশেষে ছাত্রদের ডেকে নিমাই পণ্ডিত বললেন,

"তোমা সব স্থানে মোর এই পরিহার।

আজি হইতে আর পাঠ নাহিক আমার ॥ এই বলে হাতে তাল দিয়ে দিশা দেখিয়ে তাদেরকে কীর্তন শেখালেন—

হরয়ে নমঃ কৃষ্ণ যাদবায় নমঃ

গোপাল গোবিন্দ রাম শ্রীমধুসূদন॥" এবং নিজেও গাইতে লাগলেন। উপরোক্ত পংক্তিদ্বয় চৈতন্য প্রবর্তিত কীর্তন গানের আদি বাণী। নিমাই হয়ে উঠলেন পরম বৈষ্ণব। সন্ধ্যা হলে ভক্তরা একে একে নিমাই পণ্ডিতের বাড়িতে এসে জড় হতেন। সুকণ্ঠ গায়ক মুকুন্দ দত্তের ভক্তি শ্লোক পাঠ সমাপ্ত হলে কীর্তন শুরু হত, চলত সারারাত। তখন নবদ্বীপের বৈষ্ণবগোষ্ঠী ছিল ছোট। নিমাই-এর অভাবনীয় ব্যক্তিত্বে মুগ্ধ হয়ে বিভিন্ন স্থান হতে ভক্তিবাদের অনুগামীরা নবদ্বীপে এসে চৈতন্যগোষ্ঠীতে যোগ দিলেন-- এলেন যবন হরিদাস, নিত্যানন্দ, কাঁচরাপাড়ার জগদানন্দ পণ্ডিত, কুলীন গ্রামের সত্যরাজ খাঁন, শ্রীখণ্ডের নরহরি সরকার, চট্টোগ্রামের পুণ্ডরীক বিদ্যানিধি প্রভৃতি।

'যত যত স্থানে সব পার্ষদ জন্মিলা।

অল্পে অল্পে সভে নবদ্বীপে আইলা ॥'— (চৈ. ভা. ২/৮)

মহাপ্রভু অন্তরঙ্গদের নিয়ে বন্ধদ্বারে কীর্তন করেন শ্রীবাসের গৃহে কখনও বা মেশোচন্দ্রশেখরের বাড়িতে কখনও বা নিজের গৃহেই।

নবদ্বীপে মহাপ্রভুর কীর্তন শুরু হওয়ার পর চারিদিকে রটে গেল যে স্বয়ং ঈশ্বর নবদ্বীপে অবতীর্ণ হয়ে ভক্তি বিতরণ করছেন। সর্বকালে, সর্বদেশে বিরুদ্ধবাদীদের অভাব হয় না। নবদ্বীপেও তাই ঘটল। শ্রীবাস অঙ্গনে ভক্তসঙ্গে দুয়ার বন্ধ করে মহাপ্রভু কীর্তন করতেন। এতে নিন্দুকেরা—

"কেহো বলে আরে ভাই সব হেতু পাইলা।

দ্বার দিয়া কীর্ত্তণের সন্দর্ভ জানিলা ॥

রাত্রি করি মন্ত্র পড়ি পঞ্চ কন্যা আনে।

নানাবিধ দ্রব্য আনে তা সভার সনে ॥

ভিন্নলোক দেখিলে না হয় তার সঙ্গ।

এতেক দুয়ার দিয়া করে নানারঙ্গ। (চৈ. ভা. ২/৮)

কিন্তু সত্য কখনো মেঘাবৃত থাকে না। অন্তরঙ্গ গোষ্ঠীর সঙ্গে কিছুদিন কীর্তন চালাবার পর, চৈতন্যদেব কীর্তনমাধ্যমে প্রকাশ্যে সর্বসাধারণের জন্য ভক্তি প্রচার করতে উদ্যোগী হলেন। একাজে তাঁর প্রধান সহায় হলেন নিত্যানন্দ ও হরিদাস ঠাকুর।

"আজ্ঞা পাই দুইজনে বুলে ঘরে ঘরে।"

বোল কৃষ্ণ গাও কৃষ্ণ ভজহ কৃষ্ণেরে ॥'

মহাপ্রভুর অন্তরঙ্গ পার্ষদদের বেশীর ভাগই ছিলেন ব্রাহ্মণ, বৈদ্য, ও কায়স্থ। কিন্তু মহাপ্রভুর প্রেমভক্তির দুর্বার স্রোতে ব্রাহ্মণ, বৈদ্য, শূদ্র, চণ্ডাল, নারী-পুরুষ সকলের সম অধিকারের পথ প্রশস্ত হল। মহাপ্রভু ঘোষণা করলেন তথাকথিত নীচজাতি জন্মের জন্য কেউ পড়ে থাকবে না। উচ্চজাতি বিদ্বানের সঙ্গে নিম্নস্তর জাতির সাধারণ মানুষ একত্রে মিলেমিশে সম্মেলক কীর্তনে যোগ দিয়ে মহানন্দ লাভ করবে। আর জাতির সম্বন্ধে বললেন—

"চণ্ডালেহো মোহোর শরণ যদি লয়।

সেহো মোর মুঞি তার জানিহ নিশ্চয় ॥ তাছাড়া,

কিবা বিপ্র কিবা ন্যাসী শূদ্র কেনে নয়।

যেই কৃষ্ণতত্ত্ব বেত্তা সেই গুরু হয় ॥

হরিদাস ও নিত্যানন্দকে তিনি আদেশ করলেন দিনেরবেলায় নবদ্বীপের পথেঘাটে নাম সংকীর্তন করে বেড়াতে। তাঁরাও রাজী হলেন মহানন্দে। নবদ্বীপে সাধারণ লোকের মধ্যেও কৃষ্ণভক্তির প্রবাহ বইতে লাগল।

জগাই-মাধাই উদ্ধার

যে সময়ের কথা বলছি, তখন নবদ্বীপে জনজীবনের মহাত্রাস ছিলেন কাজী নিযুক্ত দুইজন কোটাল নাম, শ্রীজগন্নাথ রায় ও শ্রীমাধব রায়। উভয়েই শুদ্ধ শ্রোত্রীয় ব্রাহ্মণ। কিন্তু ব্রাহ্মণ হলে কি হয়। এঁরা কাজীকে অর্থ দিয়ে বশ করে নবদ্বীপে যথেচ্ছাচার করতেন। তাঁদের মত দুর্বৃত্ত, দুরাচার ও মদ্যপের জুটি মেলা ভার। একদিন নগরকীর্তনের সময় মদের নেশায় উন্মত্ত জগাই মাধাই সংকীর্তনের দলকে আক্রমণ করেন, এবং মাধাই নিত্যানন্দের মাথায় কলসীর কানা ছুঁড়ে এমন আঘাত করেন যে দরদর করে রক্ত ঝরতে থাকে। নিত্যানন্দের ভ্রূক্ষেপ নাই। তিনি বললেন — "মারিলি কলসীর কানা সহিবারে পারি।

তোদের দুর্গতি আমি সহিবারে নারি ॥
মেরেছিস মেরেছিস তোরা তাতে ক্ষতি নাই।
সুমধুর হরিনাম মুখে বল ভাই ॥"

অবশেষে শ্রীচৈতন্যের অসীম কৃপায় তাঁরা দুজন উদ্ধার হলেন।

কাজী দলন :

তৎকালে বাংলার সুলতান ছিলেন সৈয়দ আলাউদ্দিন হুশেন শাহ। (১৪৯২-১৫১৯)। তাঁর অধীনস্থ কাজী ছিলেন চাঁদ রায়। বৈষ্ণব বিরোধীদের অভিযোগ ক্রমে—

"কাজী বলে হিন্দুয়ানী হইল নদীয়া
করিমু ইহার শাস্তি নাগালি পাইয়া ॥"

কাজী একদিন সন্ধ্যাবেলা কীর্তনের কোলাহল শুনতে পেয়ে সংকীর্তনরত নগরিয়াদের উপর অত্যাচার করলেন, তাঁদের খোল ভেঙ্গে দিলেন। কাজীর এই অত্যাচারের কথা শুনে চৈতন্যদেব তেলেবেগুনে জ্বলে উঠলেন। তিনি আদেশ করলেন, কাজীর এই হুকুম কিছুতেই মানা হবে না— "সর্বনবদ্বীপে আজি করিমু কীর্তন।

দেখো মোরে কোন্ কৰ্ম্ম করে কোন্‌জন।"

আর নগরীয়াদের আহ্বান করে বললেন, 'তিলার্দ্ধেকো-ভয় কেহো না করিও মনে ॥'

তিনি বলে দিলেন সকলে যেন সন্ধ্যায় তাঁর বাড়ির সামনে যার বাড়িতে যা বাজনা আছে—শাঁখ, ঘন্টা, করতাল, মন্দিরা, শিঙা, বাঁশি, মৃদঙ্গ প্রভৃতি এবং বড় বড় মশাল তৈরী করে, বড় বড় তেলের দীপ সাজিয়ে নিয়ে আসে। যথাসময়ে লোক বাদ্যযন্ত্র মশালাদি নিয়ে সমবেত হল। চৈতন্যদেব সমবেত জনতাকে লক্ষ্য করে বললেন,—

'ভাঙ্গিয়া কাজীর ঘর কাজীর দুয়ারে।
কীৰ্ত্তন করিমু দেখোঁ কোন্ কৰ্ম্ম করে ॥"

চৈতন্যদেব সংকীর্তনে নাচের ব্যবস্থা করলেন-প্রথম দলে নাচবেন অদ্বৈত, দ্বিতীয় দলে নাচবেন হরিদাস, তৃতীয় দলে শ্রীবাস এবং চতুর্থ বা শেষদলে নাচবেন তিনি স্বয়ং। গায়কদের এইভাবে ভাগ করে দেওয়া হল। তখন,

ঈষৎ আজ্ঞায় মাত্র সর্বনবদ্বীপ, তো জড় হলই স্ত্রীলোকেরাও এই কীর্তন অভিযান থেকে বাদ পড়লেন না। সকলে মিলে গাইতে লাগলেন—

'হরয়ে নমঃ কৃষ্ণ যাদবায় নমঃ।
গোপাল গোবিন্দ রাম শ্রীমধুসূদন। 'আর

'হরিবোল মুগধা বোল রে।
যাহে নাহি হয় শমন ভয়রে ॥' নিমাই স্বয়ং গাইতেছিলেন
'তুয়া চরণে মন লাগহুঁ রে।
শারঙ্গধর তুয়া চরণে মন লাগহুঁরে ॥'

কীর্তনের দল কাজীর গৃহাভিমুখে চলতে লাগল। বাড়ির কাছে গঙ্গার ঘাটে অনেকক্ষণ কীর্তন করে বারকোনাঘাট, নাগরিয়া ঘাট প্রভৃতি হয়ে নবদ্বীপের একান্তে নগর সিমুলিয়া এসে কীর্তনদল পৌঁছালে কাজী প্রথমে ভাবলেন এই আওয়াজ নিশ্চয়ই কোন বিবাহযাত্রার। তাঁর কীর্তনবন্ধের আদেশ যে অমান্য করার কারও সাহস আছে এটা তিনি ভাবতেই পারেননি। কিন্তু কীর্তনের শোভাযাত্রা যখন বাড়ির কাছে এসে পড়ল তখন কাজী বেগতিক দেখে সদর দেউড়িতে খিল লাগিয়ে অন্তঃপুরে গিয়ে লুকিয়ে রইলেন। দ্বার বন্ধ দেখে বিশ্বম্ভর বললেন, কাজী এখনই যদি বেরিয়ে না আসো তবে তোমার ঘরদোর ভেঙে উড়িয়ে দিব। বিশ্বম্ভরের মুখের কথা মুখেই থাকলো। সংকীর্তনের দল সদর দরজা ভেঙে কাজীর ফুল ও ফলের বাগান তছনছ করে দিল। নিতান্ত নিরুপায় হয়ে কাজী বেরিয়ে এসে বিশ্বম্ভরকে 'গ্রাম সম্পর্কে ভাগনে' বলে এবং মিষ্ট কথা বলে সন্তুষ্ট করলেন এবং কীর্তনের উপর নিষেধাজ্ঞা তুলে তো নিলেনই উপরন্তু বংশধরদের উপর এই মর্মে আদেশ জারি করলেন যে কেউ কীর্তনে কোন প্রকার বাধা দান না করে। কাজীর কথায় বিশ্বম্ভর প্রসন্ন হয়ে তাঁকে অভয় দান করে আবার সংকীর্তন পরিক্রমা শুরু করলেন। শাসকের আস্ফালন ও দম্ভের বিরুদ্ধে এটা নিরস্ত্র লোকের সক্রিয় প্রতিরোধ। অধ্যাপক পি. কে. সাহার মতে বাংলা তথা ভারতবর্ষে সম্ভবত এটিই রাজশক্তির বিরুদ্ধে প্রথম নিরস্ত্র গণপ্রতিরোধ। যাইহোক সংকীর্তন দল একের পর এক বিভিন্ন বাজার পেরিয়ে খোলাবেচা শ্রীধরের বাড়ি হয়ে নিজের বাড়ির কাছে এসে সংকীর্তন শেষ করলেন। বিশ্বম্ভরের নিরস্ত্র বাঙালী জনমানসে অন্যায় আজ্ঞা অমান্য করবার যে সাহস, তা উদ্দীপ্ত করে শুধু ভারতের ইতিহাসে নয়, বিশ্ব ইতিহাসে নজির সৃষ্টি করে গেলেন।

শ্রীচৈতন্য দেখলেন যে শুধু নবদ্বীপে ভক্তিধর্ম প্রচার করলে চলবেনা, সমগ্র বাংলা দেশে এবং বাংলার বাইরেও ভক্তিধর্ম প্রচার করা আবশ্যক, নতুবা বিভিন্ন আচার ব্যবহারে এবং অনাচার অধর্মে আচ্ছন্ন খণ্ড ছিন্ন বাঙালী জাতিগত ঐক্যলাভ করতে পারবে না, অধিকন্তু সমস্তদেশ ম্লেচ্ছ হয়ে যাবে। লোকে সন্ন্যাসী ব্যতীত অন্যের কাছে সহজে ধর্মের কথা শুনতে চায় না। সুতরাং গৌরাঙ্গ কাটোয়ায় কেশব ভারতীর নিকট সন্ন্যাস গ্রহণ করতে গেলেন। তখন শচীমাতার বয়স ৬৭ বৎসর এবং বিষ্ণুপ্রিয়া মাত্র ১৪ বৎসরের। সন্ন্যাস গ্রহণের পূর্বে মস্তক মুণ্ডন করতে হয়, অবশেষে গৌরাঙ্গের একান্ত অনুরোধে

তখন নাপিত আসি প্রভুর সম্মুখে বসি
ক্ষুর দিল সে চাঁচর কেশে,
করি অতি উচ্চরব কান্দে যত লোকসব
নয়নের জলে দেহ ভাসে ॥

প্রভুর কেশের সমাধি এবং মধুনাপিতের সমাধি আজিও কাটোয়ায় বিদ্যমান। কেশব ভারতীও একান্ত অনিচ্ছা সত্ত্বে গৌরাঙ্গের কর্ণে সন্ন্যাস মন্ত্র দিলেন। এখন তাঁর নাম হল শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য। সন্ন্যাসীর সম্বল হল বাঁশের একখানা যষ্ঠী যাকে বলে দণ্ড, কমণ্ডুল বা কাঠের অথবা নারিকেলের জলপাত্র, একখানা কৌপিন এবং দুইখানি বহির্বাস আর শীত নিবারণের জন্য একখানা ছেঁড়া কাঁথা। সন্ন্যাস গ্রহণের পর শ্রীচৈতন্য কৃষ্ণপ্রেমে পাগল হয়ে উন্মত্তের মত বৃন্দাবনের দিকে ধাবিত হলেন। সঙ্গীভক্তগণ কোন রকমে তাঁকে শান্তিপুরে

নিয়ে গেলেন। কেননা, সন্ন্যাসীর নিজগ্রামে যাওয়া নিষিদ্ধ। শচীদেবী ও নবদ্বীপের লোক ব্যাকুল হয়ে ছুটে এলেন শান্তিপুরে চৈতন্যকে দেখার জন্য। সেখানে ৩/৪ দিন অবস্থান করে শচীমাতা ও অদ্বৈতাদির নিকট বিদায় নিয়ে শ্রীচৈতন্য ১৫১০ খৃষ্টাব্দে নীলাচল অভিমুখে রওনা হন। সঙ্গে ছিলেন নিত্যানন্দ, জগদানন্দ, মুকুন্দ, গোবিন্দ আর দামোদর। সকলেরই পরিধানে বহির্বাস ও কৌপিন আর হাতে করোয়া। এইভাবে তাঁরা বাঁশদহ পথে তমলুক অতিক্রম করে আসেন রেমুনাতে। এখানে বিগ্রহ দ্বিভুজ মুরলীধর গোপীনাথ। সেখানে সেবকগণ মহাপ্রভুকে বারখানা অমৃতকেলী প্রসাদী ক্ষীর দিয়েছিলেন। মহানন্দে ভক্তগণসহ ঐ ক্ষীর সেবা করে আসেন জাজপুরে। জাজপুর থেকে কটক এবং সেখানে মহানদীতে স্নান সেরে আসেন সাক্ষীগোপাল। সাক্ষীগোপাল থেকে ভুবনেশ্বর। এখানে মহাপ্রভু—

'যে চরণ রসে শিব বসন না জানে।
হেন প্রভু নৃত্য করে সবে বিদ্যামানে"

পরদিন প্রাতে বিন্দু সরোবরে স্নান সেরে আসেন কমলপুরে। কমলপুর থেকে তিনক্রোশ দূরে পুরী এসে জগন্নাথ দর্শন করেন।

মহাপ্রভুর দক্ষিণদেশ ভ্রমণ

নীলাচলে কিছুকাল অবস্থান করে মহাপ্রভু ১৪৩২ শকের ৭ই বৈশাখ দক্ষিণদেশ ভ্রমণের জন্য যাত্রা করলেন। দক্ষিণদেশ যাত্রাকালে শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত গ্রন্থানুসারে গৌরাঙ্গের সঙ্গী ছিলেন নিত্যানন্দ পার্ষদ কৃষ্ণদাস, আর গোবিন্দদাসের কড়চা মতে কৃষ্ণদাস এবং গোবিন্দ দাস দুজনেই মহাপ্রভুর সঙ্গে গিয়েছিলেন।

কড়চায় "দক্ষিণ যাত্রায় তুমি যাবে অতি দূর।
সঙ্গে থাক কৃষ্ণদাস ব্রাহ্মণ ঠাকুর ॥
পবিত্র হইয়া বিপ্র তাহাই করিবে।
যখন ইহারে যাহা করিতে বলিবে ॥"

মহাপ্রভু ছিলেন বহুভাষাবিদ্। তিনি তের চৌদ্দটি ভাষা জানতেন। অল্প বয়সে তিনি গঙ্গাদাস পণ্ডিতের টোলে প্রাকৃত ও পালিভাষা পড়েছিলেন (গৌরপদ তরঙ্গিনী)। ভ্রমণ কালে মহাপ্রভুর সঙ্গে অনেক বৌদ্ধপণ্ডিতের তর্ক বিতর্ক হয়েছিল। পালিভাষা শিক্ষার ফলে তিনি বৌদ্ধধর্মের মর্মাভিজ্ঞ হয়েছিলেন। মহাপ্রভু ওড়িশায় ১৮ বৎসর থাকার ফলে তিনি ওড়িয়া ভাষার বৈষ্ণব পদ প্রায়ই আবৃত্তি করতেন 'জগন্নাথ প্রভু পরিমুণ্ডাই'--'প্রভৃতি পদ পাঠ করতে খুব ভালবাসতেন, তেলুগু ও মলয়ালম্ ভাষায় তিনি অনর্গল কথা বলতে পারতেন,

তামিল সম্বন্ধে "কখনও তামিল বুলি বলে গোরা রায়।
কভু বা সংস্কৃত বলি লোকেরে বুঝায় ॥

এ ভাষা জানার কারণ "এই দেশে ভ্রমি দীর্ঘকাল।
সকলের ভাষা বুঝে শচীর দুলাল।"

বৃন্দাবনে থাকার জন্য তিনি অনর্গল হিন্দী বলতে পারতেন। পাঠান বিজলী খাঁয়ের সঙ্গে চৈতন্যের মুসলমান ধর্ম সম্বন্ধে অনেক তর্কবিতর্ক হয়েছিল। বিজলী খাঁ আরবী ও পারসী ভাষায় সুপণ্ডিত ছিলেন। শ্রীচৈতন্য চরিতামৃত গ্রন্থে চৈতন্যের মুসলমান পণ্ডিতদের সঙ্গে যে বিচারের উল্লেখ আছে তাতে মনে হয় তিনি আরবী ও পারসী ভাষা জানতেন। সুতরাং দেখা

যাচ্ছে শ্রীচৈতন্য আরবী, পারসী, বাংলা, সংস্কৃত, পালি, প্রাকৃত, হিন্দি, ওড়িয়া, মৈথিলি, তামিল, তেলুগু মালয়াল্‌ম প্রভৃতি ভাষা জানতেন।

অগ্রজ বিশ্বরূপের অন্বেষণ অছিলায় মহাপ্রভু ১৫১০ খ্রীষ্টাব্দের ৭ই বৈশাখ যাত্রা করেন, যদিও তিনি বিশ্বরূপ অদর্শনের খবর জানতেন। নিত্যানন্দ, বাসুদেব সার্বভৌম প্রভৃতি ভক্তগণসহ আলালনাথ পর্যন্ত এসে মহাপ্রভু ভক্তগণকে বিদায় দিলেন। বাসুদেব সার্বভৌম বলেছিলেন,

'রায় রামানন্দ আছে গোদাবরী তীরে।
অধিকারী হয়েন তিঁহো বিদ্যানগরে ॥
শূদ্র বিষয়ী জ্ঞানে উপেক্ষা না করিবে।
আমার বচনে তারে অবশ্য মিলিবে ॥'

এখানে উল্লেখ করা প্রয়োজন মহাপ্রভুর দক্ষিণদেশ ভ্রমণ সম্পর্কে শ্রীচৈতন্য চরিতামৃত গ্রন্থে ও গোবিন্দদাসের কড়চায় দুই রকমের ভ্রমণ পথ দেখা যায়। তাই, শ্রীচৈতন্য চরিতামৃতধৃত বর্ণনা সংক্ষেপে উল্লেখ করে গোবিন্দদাসের কড়চানুসরণে ভ্রমণ বৃত্তান্ত দেওয়া হল।

শ্রীচৈতন্য চরিতামৃতে :—

শ্রীজগন্নাথ আলাল নাথ কূর্মস্থান-জিয়ড় নৃসিংহ ক্ষেত্র গোদাবরী তীরে ১০ দিন, গোমত্রী গঙ্গা, মল্লিকার্জুন তীর্থ, (মহেশ) দাসরাম মহাদেব, অহোবল-নৃসিংহ সিদ্ধবটের সীতাপতী, স্কন্দ ক্ষেত্র (স্কন্দ মূর্তি), ত্রিমঠস্থ (চতুর্ভুজ মূর্তি) বেঙ্কটার ত্রিপদী (রাম) পানা নৃসিংহ (নৃসিংহদেব), শিবকাঞ্চি, (শিব)-বিষ্ণুকাঞ্চি, লক্ষ্মীনারায়ণ-ত্রিমল্ল-ত্রিকাল হস্তী-পঞ্চতীর্থ (শিব)—বৃদ্ধকোল- শ্বেতবরাহ-পীতাম্বর শিব, শিয়ালী ভৈরবী-কাবেরী তীর-গোসমাজ শিব-বেদাবন-অমৃতলিঙ্গ শিব-দেবস্থান-বিষ্ণু-শ্রীরঙ্গ ক্ষেত্র (চারিমাস ভট্টগৃহে)-ঋষভপর্বত, শ্রীশৈল (তিনদিন) কামকোটি-দক্ষিণ মথুরা-কৃতমালা-দুর্বেসন- মহেন্দ্র শৈল (পরশুরাম)। সেতুবন্ধ (ধনুতীর্থ), রামেশ্বর দর্শন) পুনঃ দক্ষিণ মথুরা, পাণ্ডুদেশে তাম্রপর্ণী-নয়ত্রিপদী-চিয়ড়তলা (শ্রীরামলক্ষ্মণ) তিল কাঞ্চি (শিব) গজেন্দ্র মোক্ষণ-(বিষ্ণু), পানাগড়ি তীর্থ (সীতাপতি)। চামতাপুর (রামলক্ষ্মণ)-শ্রীবৈকুণ্ঠ (বিষ্ণু) মলয় পর্বত (অগস্ত্য) কন্যাকুমারী-আমলিতলা (রাম) মল্লারদেশ-ভট্টসারী-তমালকার্তিক বেতাপনি (রঘুনাথ) পয়স্বিনী তীর (আদিকেশব মন্দির-অনন্ত পদ্মনাভ ২/৩ দিন)—শ্রীজর্নাদন-পয়োষ্ণি (শঙ্কর নারায়ণ)-সিংহারী মঠ (শঙ্করাচার্য্য)-মৎস্যতীর্থ তুঙ্গভদ্রাস্নান— উড়পতীর্থ (মাধবা চার্য্য) ফল্গুতীর্থ- ত্রিতকূপ-বিশালায় পঞ্চাপগরা-গোকর্ণ (শিব) দ্বৈপায়নী-পাবক তীর্থ-কোলাপুর (লক্ষ্মী) ক্ষীর ভারতী লাঙ্গলগণেশ চোরপার্বতী-পাণ্ডুপুর (বিঠ্ঠল দর্শন)-ভীমরথীস্থান-কৃষ্ণবেণ্বতাপীস্থান মাহিষ্মতিপুর-নর্মদাতীর—ধনুতীর্থ-ব্রহ্মাগিরি কুশাবর্ত (গোদাবরীর উৎপত্তিস্থান-সপ্তগোদাবরী-পুনঃ বিদ্যানগর গোদাবরীতীর) পূর্বপথে অলোলনাথ হয়ে পুরী ॥

মহাপ্রভুর দক্ষিণদেশ ভ্রমণ

গোবিন্দ দাসের কড়চানুসারে

মহাপ্রভু কৃষ্ণদাস ও গোবিন্দ দাসকে সঙ্গে নিয়ে নিত্যানন্দ প্রভৃতি পার্ষদ সহ এলেন আলালনাথে। পার্ষদগণকে আলাল নাথ হতে বিদায় দিয়ে কূর্মনগরে উপনীত হলেন। সেখানে কুষ্ঠরোগগ্রস্ত বাসুদেবকে আলিঙ্গনমাত্রেই রোগমুক্ত করলেন এবং কৃষ্ণভক্তি দিয়ে ধন্য করলেন। তারপর ৪০ ক্রোশ অতিক্রম করে তৃতীয় দিবসে এসে পৌছোলেন জিয়ড় নৃসিংহ গ্রামে।

এককালে এখানে ছিল দৈত্যরাজ হিরণ্যকশিপুর রাজধানী। এ স্থানের নাম সীমাচলম্‌-বর্তমান নাম সীমাচলম্‌। এখানকার নৃসিংহদেব প্রহ্লাদ কর্তৃক স্থাপিত জেনে প্রভু আনন্দে প্রেমাপ্লুত হলেন। সেখানে একরাত্রি অবস্থান করে পরদিন রওনা হলেন বিশাখাপত্তনমের দিকে। প্রায় ৫০০ খৃষ্টপূর্বাব্দে বুদ্ধদেবের শিষ্য রাজপুত্র বিশাখা সন্ন্যাস নিয়ে এসে এখানে বাস করতেন। তাই এর নাম বিশাখাপত্তনম্‌। এখান থেকে চলতে চলতে এসে উপনীত হলেন গোদাবরী-তীরে বিদ্যানগরে। ওড়িশারাজ পুরুষোত্তম বিদ্যানগর বা পূর্বগোদাবরী রাজ্য অন্ধ্ররাজাদের নিকট হতে কেড়ে নিয়ে নিজ সাম্রাজ্যভুক্ত করেছিলেন। মহাপ্রভুর সময়ে রাজা প্রতাপ রুদ্রের অধীনস্থ এই অঞ্চলের শাসনকর্তা ছিলেন ওড়িশার অভিজাত বংশীয় ভবানন্দ রায়ের জ্যেষ্ঠপুত্র রায় রামানন্দ। তাঁর রাজপ্রসাদ ছিল এই বিদ্যানগরে যার বর্তমান নাম রাজমহেন্দ্রী। মহাপ্রভু গোদাবরী নদী পার হয়ে স্নান সেরে এক বৃক্ষতলে বসে মালা জপ করছেন, এমন সময় বহুতর ভৃত্য, হস্তী, ঘোড়া নিয়ে রামানন্দ এলেন স্নান করতে। প্রভুকে দেখে তিনি চুম্বকের মত আকৃষ্ট হয়েই ক্ষান্ত হলেন না উভয়ে আলিঙ্গনাবদ্ধ হয়ে মূর্ছিত হয়ে পড়লেন। সকল সহচরবৃন্দও প্রেমে দ্রবীভূত হয়ে পড়ল। বিদ্যানগরে মহাপ্রভু দশদিন ছিলেন। প্রতিদিনই তাঁদের মধ্যে আলোচনা হ'ত কৃষ্ণ প্রাপ্তি বিষয়ে। চৈতন্য আতিথ্য নিলেন এক ব্রাহ্মণের ঘরে। সন্ধ্যার পর রামানন্দ একটি মাত্র ভৃত্য নিয়ে সেখানে হাজির হতেন। সেখানে দীর্ঘরাত্রি পর্যন্ত তাঁদের মধ্যে আলোচনা হত। মহাপ্রভু প্রশ্ন করতেন, রামানন্দ উত্তর দিতেন। প্রশ্ন ছিল মানবের চরম ও পরম সাধ্য উপেয় কি এবং তা পাওয়ার সাধন উপায় কি? পুরুষার্থ অর্থাৎ সাধ্য আমাদের কাম্য। এই পুরুষার্থ বলতে আমরা বুঝি যে পুরুষ বা জীবের অর্থ বা কাম্য বস্তু, কিন্তু রুচির পার্থক্যানুসারে সুখ সম্বন্ধে সকলের ধারণা এক নয়। যাঁরা স্থূল, তাঁরা ইন্দ্রিয়ের উপভোগকেই সুখ বলে মনে করেন তাঁদের পুরুষার্থকে কাম বলা যায়। অন্য একদল ইহকালের সুখভোগেই তৃপ্ত হন না তাঁর পরকাল বা স্বর্গাদি সুখ ভোগেরও কামনা করনে। তাঁরা শাস্ত্রের অনুমোদিত ধর্মকেই পুরুষার্থ মনে করেন। কিন্তু গীতায় বলা হয়েছে—

"ক্ষীণে পুণ্যে মর্ত্যলোকং বিশন্তি"

সুতরাং তাহাও ক্ষণিক সুখ এবং ইন্দ্রিয় উপভোগের পর্যায়ভুক্ত। এই দেহাশ্রয়ী সুখও অনিত্য। কারণ দেহ যখন অনিত্য, তখন দেহাশ্রয়ী সুখও অনিত্য। সেইজন্য অপর একদল মায়ার বন্ধন ঘুচাতে চেষ্টা করেন এবং এই বন্ধনমুক্ত যে অবস্থা তাই-ই মুক্তি। তাঁদের নিকট ইহা সুখ বা পুরুষার্থ। এই মোক্ষলাভ হলে আর সংসারে ফিরে আসতে হয় না এবং ইন্দ্রিয় বাসনার নিবৃত্তি হওয়ায় নিত্য চিন্ময় ব্রহ্মানন্দের অনুভব হয়। ধর্ম, অর্থ, কাম ও মোক্ষ এদের বলা হয় চতুর্বর্গ। এদের মধ্যে ধর্ম, অর্থ, কাম প্রবৃত্তিমূলক এবং মোক্ষ নিবৃত্তিমূলক। গৌড়ীয় বৈষ্ণবগণ মোক্ষকে চরম পুরুষার্থ বলে স্বীকার করেন না। শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে একে কৈতব অর্থাৎ আত্মপ্রবঞ্চনা বলা হয়েছে।

"অজ্ঞান তমের নাম কহি যে কৈতব।
ধর্ম-অর্থ কাম-মোক্ষ বাঞ্ছা আদি সব ॥
তার মধ্যে মোক্ষ বাঞ্ছা কৈতব প্রধান।
যাহা হৈতে কৃষ্ণভক্তি হয় অন্তর্ধান ॥

গৌড়ীয় আচার্যগন বলেন, এই যে ব্রহ্মানন্দ এ লোভনীয় বটে কিন্তু এতে নির্বিশেষ ব্রহ্মের স্বরূপ শক্তির বিলাস নেই বলে সে আনন্দে বৈচিত্র্য নেই। শ্রুতিতে বলা হয়েছে-'রসো বৈ সঃ'। অর্থাৎ ব্রহ্ম রস স্বরূপ। শ্রীকৃষ্ণই রসের শ্রেষ্ঠ বিকাশ। সেই জন্য শ্রীকৃষ্ণ মাধুর্যের যে আস্বাদন তা নির্বিশেষ ব্রহ্মানন্দ অপেক্ষা অনেক শ্রেষ্ঠ।

শ্রীকৃষ্ণের এই অপূর্ব মাধুর্য আস্বাদন করবার একমাত্র উপায় প্রেম। এই প্রেমকেই গৌড়ীয় বৈষ্ণব আচার্যগণ পঞ্চম পুরুষার্থ বা শ্রেষ্ঠ বলে গণ্য করেছেন।

"পঞ্চম পুরুষার্থ সেই প্রেম মহাধন।
কৃষ্ণের মাধুর্য্যরস করায় আস্বাদন ॥

এই আলোচনায় মহাপ্রভু প্রশ্নকর্তা আর উত্তরদাতা রায় রামানন্দ। এই প্রশ্নোত্তরে মানব সাধনার চরম লক্ষ্য, জীবনজিজ্ঞাসার শেষ সদুত্তর পাওয়া গেছে। মানব জীবনের চরমতম উপেয় কি, সাধ্য কি, সাধনা কি আর মানস সাধনার চরম লক্ষ্যই বা কি—এই সমস্ত বিষয় আলোচনার বিষয়বস্তু।

সর্বপ্রথম মহাপ্রভু রামানন্দের কাছে জানতে চাইলেন কৃষ্ণপ্রাপ্তির সাধন সম্পর্কে। রামানন্দ উত্তরে বললেন 'স্বধর্মাচরণে বিষ্ণুভক্তি হয়'। এতে মহাপ্রভু সন্তুষ্ট হতে পারলেন না। কেননা, এ পুরুষার্থ নয়। কারণ দেহাবেগের জন্য পরমধর্ম নয়। তাই মহাপ্রভু বললেন, "এহো বাহ্য, আগে কহ আর।'

এর পর রামানন্দ বললেন, "কৃষ্ণে কর্মার্পণ সাধ্য সার।" এতে পুরুষার্থ নাই, এও দেহাবেশ। এতে কেবলমাত্র কর্ম হতে মুক্তিলাভের ইচ্ছা থাকে। সেইজন্য শ্রীচৈতন্য বললেন, "এহো বাহ্য আগে কহ আর।" রায় রামানন্দ তারপর স্বধর্মত্যাগ সম্বন্ধে বললেন,

"সর্বধর্মান্ পরিত্যজ্য মামেকং শরণং ব্রজ।
অহং ত্বাং সর্ব্বপাপেভ্য মোক্ষয়িস্যামি মা শুচঃ॥"

কিন্তু একে সম্যকরূপ অন্যাভিলাষিতা শূন্য শুদ্ধাপ্রীতি বলা যায় না। স্বধর্মত্যাগে যদি পাপ হয়, ভগবান সেই পাপ হতে মুক্ত করবেন, অবচেতনেও যদি এইরূপ সূক্ষ্ম কোন চিন্তা থাকে, এ আশঙ্কা করে মহাপ্রভু একে বাইরের বিষয় বললেন। তাই তিনি বললেন, "এহো বাহ্য, আগে কহ আর।"

এরপর রামানন্দ জ্ঞানমিশ্রা ভক্তির কথা বললেন, কিন্তু মহাপ্রভু একেও বাহ্য বললেন, কেননা, এরূপ জ্ঞানতত্ত্ব আলোচনার জন্য মনকে ব্যাকুল করে। তত্ত্ব আলোচনা করতে করতে মোহগ্রস্ত হওয়ার সম্ভাবনা থাকে এবং তা সাধনার পক্ষে বিঘ্নজনক। এরূপ তত্ত্ব আলোচনা করলে ভগবানের সঙ্গে জীবের যে সেব্য এবং সেবক সম্বন্ধ সেই অনুভূতি ক্ষীণ হয়ে আসে। রামানন্দ এর পর "জ্ঞানশূন্যা ভক্তির (অর্থাৎ ভগবানের কোন তত্ত্ব না জেনেও তাঁর প্রতি যে ভক্তি) উল্লেখ করলেন। ভগবান কি তত্ত্ব তা না জানলেও এবং তা জানবার চেষ্টা না করে কেবলমাত্র সাধুসজ্জনদের নিকট তাঁর কথা শুনে তাঁর প্রতি যে ভক্তি, তা জ্ঞানশূন্যা ভক্তি। তখন মহাপ্রভু বললেন, "এহো হয়, আগে কহ আর।" রামানন্দ তখন বললেন, "প্রেমভক্তি সর্বসাধ্য সার।" কারণ, ভগবান শুধু প্রেমই চান, প্রেমবিহীন নানা উপচারের পূজা তিনি গ্রহণ করেন না। প্রভু এ হতে শ্রেষ্ঠতর শুনতে চাইলেন। রামানন্দ তখন বললেন, 'দাস্য প্রেম সর্বসাধ্য সার।' তখন মহাপ্রভু বললেন, "এহো হয়, আগে কহ আর।" কারণ, দাস্যভাবে সেবা করলে মাঝে মাঝে এরূপ সঙ্কোচ হতে পারে, এই সেবাতে হয়ত কোন ত্রুটি থেকে যেতে পারে। তাই রামানন্দ পুনরায় বললেন, "সখ্য প্রেম সর্ব্বসাধ্য সাধ্য সার।" সখারা প্রেমের দ্বারা শ্রীকৃষ্ণকে নিজেদের সমান মনে করার জন্য শ্রীচৈতন্য এই সখ্য প্রেমকে উত্তম বলেছেন। "প্রভু কহে এহোত্তম আগে কহ আর।" তখন রায় বললেন, "বাৎসল্য প্রেম সর্বসাধ্য সারা।" প্রভু এও উত্তম বললেন। কেননা, বাৎসল্য প্রেমে শ্রীকৃষ্ণকে আরও আপনার বলে মনে হয়। শ্রীকৃষ্ণের প্রতি নন্দ ও যশোদার যে মমত্ববোধ তা সখাদের নাই। কিন্তু মহাপ্রভু যে প্রেমের কাঙ্গাল, যে মধুর প্রেম জগতে প্রচার করবেন তা বাৎসল্য প্রেমেরও উর্ধ্বে। তাই তাঁর আকাঙ্খার শেষ হল না। তিনি রামানন্দকে বললেন, "এহোত্তম

আগে কহ আর। 'তখন রামানন্দ বললেন, "কান্তাপ্রেম সর্বসাধ্য সার।" কারণ, "পরিপূর্ণ কৃষ্ণপ্রাপ্তি সেই প্রেমা হৈতে। এই প্রেমের বশ কৃষ্ণ কহে ভাগবতে।" তখন মহাপ্রভু বললেন, "প্রভু কহে এই সাধ্যাবধি সুনিশ্চয়। /কৃপা করি কহ আগে কিছু হয়'। তখন রামানন্দ বললেন, "কান্তাপ্রেম সর্বসাধ্যসার" হলেও রাধিকার প্রেম "সাধ্যশিরোমণি।" সম্পূর্ণরূপে সঙ্কোচ ত্যাগ করে রাধার সখীস্থানীয়া গোপীগণের ন্যায় সহজ সরলভাবে তনু-মন-প্রাণ ঢেলে দিয়ে সেবা করাই সখীভাব। এরপর রামানন্দ যখন তাঁর স্বরচিত গীত

"পহলেহি রাগ নয়নে ভঙ্গে ভেল। /অনুদিন বাঢ়ল অবধি না গেল॥
না সো রমণ না হাম রমণী। / দুহু মন মনোভাব পেষল জানি॥/
এ সখি, সো সব প্রেমকাহিনী,/কানুঠাম কহবি বিছুরহ জনি॥"...

গাহিলেন, তখন মহাপ্রভু বিচলিত হয়ে উঠলেন। শ্রীমতী রাধার পরকীয়া প্রেমের কথা শুনে আর কিছু শুনতে পারলেন না। তখন তিনি রামানন্দের মুখ চেপে ধরলেন। এখন প্রশ্ন মহাপ্রভু স্বহস্তে রামানন্দের মুখ চেপে ধরেছিলেন কেন? উক্ত পদটি কলহান্তরিতার। এই পদটি শুনে যদি পূর্বকথা মনে পড়ে যায়, পাছে বামানায়িকা বিমুখ হয়ে বসেন, তাই মহাপ্রভু রামানন্দকে আর কিছু বলতে নিষেধ করেছিলেন। মহাপ্রভুর শ্যামতনুকে আচ্ছাদন করে যে মূর্তি রায় রামানন্দ দেখেছিলেন তিনি রাধা। আপন গৌরকান্তিতে তিনি মহাপ্রভুকে গৌরাঙ্গ সাজিয়েছেন। মহাপ্রভুর ভয় পাছে তিনি মানে বিমুখ হয়ে সম্মুখ হতে সরে দাঁড়ান, তাহলে এই ঋণ পরিশোধের পালা, ঋণ পরিশোধের জন্য সর্বসিদ্ধিপ্রদ নাম সঙ্কীর্তন প্রচারের লীলা, ব্রজের উন্নত উজ্জ্বল রসের মহিমা প্রচারের লীলা এখানেই শেষ হয়ে যাবে। তাই রামানন্দের মুখ চেপে ধরার কারণ।

অন্য হেতু, রামানন্দ তাঁর গীতে যে তত্ত্বের যে ইঙ্গিত দিয়েছেন, তা' যদি উদঘাটিত হয়ে যায়, তাহলের মহাপ্রভুর স্বরূপ তত্ত্বটিই উদঘাটিত হয়ে পড়বে। বস্তুত, প্রেমবিলাস বিবর্তের মূর্ত প্রতীক হলেন তিনি। রামানন্দের নিকট যদি এই তত্ত্বটি উদঘাটিত হয়ে পড়ে তাহলে তখনই তিনি প্রভুর স্বরূপের উপলব্ধি করতে পারবেন। সমস্তই প্রকাশ হয়ে পড়বে। আলোচনাও বন্ধ হয়ে যাবে। কিন্তু তখনও আলোচনা শেষ হয় নাই। অথচ জীবের পক্ষে অপরিহার্য সাধনতত্ত্বের আলোচনা একান্ত প্রয়োজন।

তাই, প্রভুর ইচ্ছা নয় যে, তখন রামানন্দ মহাপ্রভুকে চিনে ফেলুক। কিন্তু আলোচনা এমন স্তরে এসে পৌঁছেছে যে আর একটু অগ্রসর হলেই রামানন্দ স্বীয় গাঢ় প্রেমবশতঃ বুঝতে পারবেন, যাঁর সঙ্গে তিনি আলোচনা করছেন তিনি কে? তাই, মহাপ্রভু রামানন্দের মুখ চেপে ধরেছিলেন।

বিদ্যানগর থেকে গেলেন ত্রিমল্লপুরে (বর্তমান ত্রিমলগড়া)। এখানে ছিল অনেক বৌদ্ধের বাস। রাজাও বৌদ্ধ। বৌদ্ধদের শিরোমণি মহাপণ্ডিত রামগিরি এলেন প্রভুর সঙ্গে 'তর্কযুদ্ধ' করতে। প্রভু কৃষ্ণকথা বলতে বলতে আপনি পুলকিত হলেন। তা দেখে রামগিরির অঙ্গও পুলকিত হল। তখন প্রভু বললেন, হে ভক্তবর, তোমার সঙ্গে কি তর্ক করব। দেখছি, তুমি হরিকথায় পুলকিত হও। "হরি বলি পুলকিত হয় যেইজন।

মাথার ঠাকুর সে তো এই তো কথন॥
তখন, শুনিয়া প্রভুর কথা রামগিরি রায়।
অমনি আছাড় খাঞা পড়িল ধরায়॥

অবশেষে রাজাসহ সকল বৌদ্ধ প্রভুর চরণে আশ্রয় নিলেন। বৌদ্ধগণের উদ্ধার শুনে তুঙ্গভদ্রা নিবাসী তুণ্ডীরাম তীর্থ নামে জনৈক তার্কিক পণ্ডিত শ্রীচৈতন্যের সঙ্গে বিচার করতে আসেন। অবশেষে পরাজিত পণ্ডিতকে হরিভক্তি প্রদান করে তাঁর নাম রাখেন হরিদাস।

এরপর প্রভু এলেন বর্তমান কড়পার নিকট সিদ্ধ বটেশ্বর শিবকে দর্শন করতে। এখানে তীর্থরাম নামে জনৈক ধনী সত্যবাঈ ও লক্ষ্মীবাঈ নামক দুই পতিতাকে নিয়ে প্রভুকে পরীক্ষা করতে এলেন : "বাতরঙ্গ করে লক্ষ্মীবাঈ হাসে।

সত্যবাঈ হাসিমুখে বসে প্রভু পাশে॥"

প্রভু নির্বিকার। কেবল করুণাপূর্ণ দৃষ্টি। প্রভুর প্রেমের বেগে তারা তিনজনই ভেসে গেল।

এখানে সাতদিন থেকে পঞ্চাশ ক্রোশব্যাপী জঙ্গল পার হয়ে এলেন মুন্নানগরে। মুন্নানগর থেকে এলেন বেঙ্কটনগরে। বেঙ্কটনগর মাদ্রাজ প্রদেশের ত্রিপদীর নিকট অবস্থিত। উভয় স্থানে লক্ষ লক্ষ লোককে হরিনামে বিমোহিত করেলেন। এখানে রামানন্দ পণ্ডিত নামে একজন অদ্বৈতবাদী দীক্ষিত হয়েছিলেন। এরপর এলেন বগুলা, সেখানে পন্থভীল নামে জনৈক দস্যুসর্দার বাস করত। প্রভুর হরিকথায় মুগ্ধ হয়ে অস্ত্রশস্ত্র দূরে নিক্ষেপ করে কৌপিন পরে হরিনাম করতে লাগল। সেখান থেকে গিরিশ্বরে শিবলিঙ্গে পুষ্পার্ঘ্য দিয়ে এলেন ত্রিপদীনগরে। সেখানে রামমূর্তি দর্শন করে মথুরা নামক তার্কিক রামাযতকে উদ্ধার করেন। তারপর আসেন পানানরসিংহ দর্শন করতে। পানানরসিংহ দর্শন করে আসেন শিবকাঞ্চী ও বিষ্ণুকাঞ্চি। বিষ্ণুকাঞ্চিতে লক্ষ্মীনারায়ণ বিগ্রহ দর্শন করেন। এখানে প্রত্যহ দুইমণ পায়েসের ভোগ নিবেদন করা হত ঠাকুরকে। সেখান থেকে ছয় ক্রোশ দূরস্থিত ভদ্রানদী তীরে পক্ষগিরি এসে চারিহস্ত পরিমিত গৌরীপদ শিব দেখেন এবং তৎপর দক্ষিণে ভদ্রা ও নন্দী নদীর সঙ্গমস্থলে নন্দিতীর্থে আসেন। সেখানে অদ্বৈতবাদী সদানন্দ পুরীকে কৃষ্ণভক্তি প্রদান করে আসেন চাঁইপল্লীতীর্থে (বর্তমান ত্রিচিনপল্লী)। সেখান থেকে প্রভু নাগর-নাগরে এসে সকলকে হরিনামে মাতোয়ারা করেন। এতে দশক্রোশাধিক দূর হতে লোক সমাগম হতে দেখে একজন ঈর্ষাপরায়ণ ব্রাহ্মণ প্রভুকে বললেন "তুই ভণ্ড সন্ন্যাসী, গ্রামের নির্বোধ লোককে ভুলোচ্ছিস। তোকে প্রহার করব, প্রভুর সেই করুণাপূর্ণ দৃষ্টি—

"আমারে প্রহার কর তাতে দোষ নাই।
প্রাণভরে হরি বল এই ভিক্ষা চাই।"

অবাক ব্যাপার। প্রহার করা দূরে থাকুক, ব্রাহ্মণ "প্রভুর চরণে আসি পড়িল ধরায়॥"
সেখান থেকে সাত ক্রোশ দূরে তাঞ্জোর। সেখানে কৃষ্ণভক্ত ধনেশ্বরের বাটীতে উপস্থিত হন। সেখান থেকে চণ্ডাল নামক গিরিতে ভট্ট নামক ব্রাহ্মণ ও সুরেশ্বর নামক সন্ন্যাসীকে কৃপাদান করেন। সেখান থেকে পদ্মকোট নামক তীর্থে এসে অষ্টভুজা ভগবতীর মন্দিরে বালক-বালিকাসহ হরিকীর্তন করেন। তখন হঠাৎ পুষ্পবৃষ্টি হয়েছিল।

"বালক যুবক সব ক্ষেপিয়া উঠিল।
অষ্টভুজা দেবীযেন দুলিতে লাগিল॥
পদ্মগন্ধ চারিদিকে লাগিল বহিতে।
সেইখানে পুষ্পবৃষ্টি হইল আচম্বিতে॥"

এখানে প্রভু এক অন্ধজনকে চক্ষুদান করেন। কিন্তু এই অন্ধজন প্রভুর চবণ দর্শন করামাত্র প্রাণত্যাগ করলে প্রভু মহাসমারোহে তাঁর সমাধি দেন।

সেখান থেকে আসেন ত্রিপাত্রনগরে। সেখানে প্রভু সাতদিন ছিলেন এবং সেখানকার প্রধান দার্শনিক ভগদেবকে কৃপা করেন। তারপর পনেরো দিন বনপথে চলে এলেন রঙ্গধামা বা শ্রীরঙ্গপট্টমে। শ্রীরঙ্গমে রঙ্গনাথজীর বিশাল মন্দির, আয়তনে প্রায় তিন বর্গমাইল। সাতটি প্রাকার দিয়ে ঘেরা। শ্রীরঙ্গমে বেঙ্কটভট্ট নামে এক ব্রাহ্মণ বাস করতেন—পরমভক্ত হয়েছিলেন

মহাপ্রভুর। মহাপ্রভু সেখানে চার্তুমাস যাপন করেন। তবে একটা শর্তে। তিনি এক একদিন এক এক গৃহস্থের বাড়িতে ভিক্ষাগ্রহণ করবেন। এখানে বেঙ্কটভট্টের গৃহে মহাপ্রভু প্রেমাবেশে নৃত্য করেন। ভট্টের বহির্বাটীর একটি ঘরে মহাপ্রভু উক্ত সময় ছিলেন। এখানে বেঙ্কটভট্টের একমাত্র পুত্র গোপাল ভট্ট প্রাণভরে প্রভুর সেবা করেন। তিনি ষড়গোস্বামীর একজন হয়েছিলেন। মহাপ্রভুর কাছে দীক্ষা গ্রহণ করতে চাইলে মহাপ্রভু তার নিজের 'কাকা প্রবোধানন্দ সরস্বতীর নিকট দীক্ষা নিতে বলেন। মা বাবার মৃত্যুর পর তিনি বৃন্দাবনে রূপ সনাতনের সঙ্গে মিলিত হন। তিনি বৃন্দাবনে 'রাধারমণ' শ্রীবিগ্রহ প্রতিষ্ঠা করেন। এরই শিষ্য শ্রীনিবাস আচার্য। শ্রীরঙ্গম থেকে আসেন রাসভ পর্বতে। এখানে পরমানন্দ পুরীর সঙ্গে সাক্ষাৎ হয়। সেখান থেকে আসেন রামনাথনগরে। সেখানে রামের চরণ দর্শন করে আসেন রামেশ্বরে। রামেশ্বর দর্শন করে তিনদিন সেতুবন্ধে বাস করেন। সেখান থেকে সাতদিন পথ চলে মাধবীবন পার হয়ে তম্বকুণ্ডীতীর্থে স্নান করেন। সেখান থেকে তাম্রপর্ণা গিয়ে মাঘী পুর্ণিমার দিন তাম্রপর্ণা নদীতে স্নান করেন এবং সেখানে একপক্ষকাল অবস্থান করেন। সেখান থেকে সমুদ্র পথ ধরে আসেন কন্যাকুমারী। কন্যাকুমারীতে সমুদ্র স্নান করে সাতন হয়ে আসেন ত্রিঙ্কুরে। ত্রিবাঙ্কুরের তৎকালীন রাজার নাম ছিল রুদ্রপতি। প্রভু তাঁকে কৃপা দান করে প্রবেশ করেন মহারাষ্ট্রে। সেখান থেকে বিজাপুর হয়ে এলেন পাণ্ডুপুরে। এখানে তাঁর অগ্রজ বিশ্বরূপ অলৌকিক ভাবে অদর্শন হন। পাণ্ডুপুর হতে অল্পদূরে ইলোরাতে প্রাচীন রাধাকৃষ্ণ বিগ্রহ দর্শন করেন। সেখান থেকে চণ্ডনগরে এসে ঈশ্বরভারতী নামে এক জ্ঞানী সন্ন্যাসীকে প্রেমদান করেন। তারপর হিংস্রজন্তু অধ্যুষিত বনপথে দু'দিন চলে এলেন নীলগিরি পাহাড়ের নিকটস্থ কাণ্ডারী নামক স্থানে। সেখানে অনেক সন্ন্যাসীকে হরিনামে মাতিয়ে আসেন হায়দ্রাবাদের নিকট গুর্জরীনগরের অগস্ত্যকুণ্ডে। এখানে সহস্র সহস্র লোক হরিনামে মত্ত হয়ে ওঠে। আর—

"সে স্থান তখন যেন বৈকুণ্ঠ হইল।
দলে দলে গ্রাম্য লোক আসিয়া জুটিল ॥
বড় বড় মহারাঠী আসি দলে দলে।
শুনিতে লাগিল নাম মিলিয়া সকলে॥"

গুর্জরীনগর হতে বিজাপুর পর্বত দিয়ে সহ্যাকুলাচল ও মহেন্দ্র মলয় দর্শন করে পুর্ননগর বা পুণায় উপনীত হলেন। পুণা তখন নদীয়ার নবদ্বীপের ন্যায় পণ্ডিতপূর্ণ। এখানেও প্রেমদান করে প্রভু এলেন গোরঘাট নামক স্থানে। সেখান থেকে দেবলেশ্বর হয়ে এলেন জিজুরীগ্রামে। এই স্থানে খাণ্ডবাদের নিকট অনেক দেবদাসী রাখা হত। বাস্তবিক ক্ষেত্রে এদের অনেকেই দেবদাসী না হয়ে ভ্রষ্টাচারিণী হতে বাধ্য হত। এদেরই একটি পাড়ার নাম মুরারীপাড়া। গোবিন্দের নিষেধ সত্ত্বেও প্রভু চললেন তাদের উদ্ধার করতে। সেখানে গিয়ে তাদের বললেন, তোমাদের ভাবনা কি? তোমাদের পতি কৃষ্ণ। তবে শুদ্ধভাবে পতিকে ভজতে হবে। প্রভুর করুণাপূর্ণ দৃষ্টিতে তারা মুগ্ধ হয়ে গেল। সবচেয়ে ঐশ্বর্যশালিনী ইন্দিরা—

"বৃদ্ধ হইয়াছি মুই কুকর্ম করিয়া।
উদ্ধার করহে মোরে পদধূলি দিয়া ॥

প্রভুর কৃপায় সকলেই ভেক নিয়ে প্রকৃত দেবদাসী হল। না এখান থেকে প্রভু এলেন চোরানন্দী নামক বনে। এখানে নারোজী নামে এক দস্যু সর্দার বাস করত। প্রভুর কৃপায় সদলবলে তারা উদ্ধার হল। হাতের অস্ত্র ফেলে হরিনামের ঝোলা হাতে নিল। নারোজীর উক্তি—

"এতদিন চক্ষু অন্ধ ছিল ভ্রান্তি ধূলে।
আজি হতে অস্ত্রশস্ত্র ফেলিলাম ভূমে ॥

এই মুখে কতজনে কটু বলিয়াছি।
এই হস্তে কত নর হত্যা করিয়াছি ॥

কৌপিন পরে নারোজী চললেন প্রভুর সঙ্গে। এখন তাঁরা তিনজন। প্রভু, গোবিন্দ ও নারোজী। সেখান হতে খাণ্ডোয়া গিয়ে সেখানে খুলা নদীতে স্নান সেরে নাসিকে উপনীত হলেন। এখানে লক্ষ্মণ শূর্পনখার নাক কেটেছিলেন। এরপর প্রবেশ করলেন পঞ্চবটী বনে। এখানে রামের কুটির ও পদচিহ্ন আছে। প্রভু সেখানে গিয়ে "কোথা মোর রাম বলি উঠিল কাঁদিয়া।" তারপর পনেরো দিন পথ চলে এলেন সুরাট নগরে। সুরাট হতে নর্মদাতীরে বরোচ। বরোচ হতে এলেন বরোদায়। এখানে গোবিন্দজীর মন্দিরের সামনে নারোজীর মৃত্যু হয়।

বরোদা ত্যাগ করে মহানদী পার হয়ে এলেন আহম্মদাবাদে। এখানে প্রভু মুসলমান রাজ্যের নিদর্শন পেলেন। বাঙ্গলা ত্যাগ করার পর আর দেখেন নাই। সেখান হতে শুভ্রামতী (বর্তমান নাম শবরমতী)। নদীর তীরে পৌঁছে প্রভু কুলীন গ্রামের রামানন্দ বসু ও গোবিন্দ চরণের দেখা পান। তখন তাঁরা সকলে একত্রে বাঙ্গালায় কথাবার্তা বলতে বলতে—দ্বারকার পথে অগ্রসর হন। পথে ঘোঘাতে প্রভু ঐশ্বর্যশালিনী অপরূপ সুন্দরী বারমুখী বেশ্যাকে উদ্ধার করেন। তারপর এলেন সোমনাথে। সোমনাথ মুসলমান কর্তৃক লুণ্ঠিত হয়েছিল। মন্দিরের অবস্থা দেখে প্রভু দুঃখ প্রকাশ করেন। তারপর সেখান হতে যান জুনাগড়। সেখানকার ঠাকুর রণছোড়জী। পার্শ্বেই গির্ণার পাহাড়ে শ্রীকৃষ্ণের পদচিহ্ন। এখান থেকে আসেন অমরাবতী বা প্রভাস তীর্থে। ঘোঘা থেকে প্রভাস আসতে সময় লেগেছিল নয়দিন। এ স্থান দেখে প্রভু একেবারে আত্মহারা হয়ে পড়েন। যেন চিরপরিচিত স্থানে এসে পুর্বেকার সমস্ত চিহ্ন দর্শন করছেন।

"অমরাপুরীর লোক একত্র জুটিয়া।
আনন্দ পাইল সবে প্রভুরে দেখিয়া
পাগলের ন্যায় যেন ইতিউতি চায়।
আবেগে উন্মত্ত প্রভু চারিদিকে ধায় ॥"

১লা আশ্বিন প্রভাস তীর্থ ছেড়ে চললেন দ্বারকায়। সাগরের তীরে তীরে চারদিন চলার পর দড়ির উপর দিয়ে সমুদ্রের খাড়ি পার হয়ে এলেন দ্বারকায়। এখানেও প্রেমের বন্যা বয়ে গেল। একপক্ষকাল দ্বারকায় থেকে নীলাচল অভিমুখে রওনা দিলেন।

আশ্বিন মাসের শেষদিনে প্রভু পুনরায় বরোদায় এলেন। এর ষোল দিন পরে নর্মদায় স্নান সেরে নর্মদার ধারে ধারে এসে দোহদনগর এবং তারপর এলেন কুক্ষীনগরে। সেখানে দুটি ভক্তকে কৃপা করে বিন্ধ্যাচলে উঠে মন্দুরা আসেন, এখান থেকে তিন দিনে দেবঘর এবং দেবঘর হতে সাতদিনে শিবানীনগরে আসেন। সেখান থেকে মহল পর্বত দিয়ে চণ্ডীনগরে এসে চণ্ডীদেবী দর্শন করেন। অবশেষে রায়পুর দিয়ে বিদ্যানগরে এসে রামানন্দের সঙ্গে মিলিত হন।

চৈতন্য চরিতামৃতানুসারে মহাপ্রভু কন্যাকুমারী থেকে প্রায় ৫৪ মাইল দূরে আসেন পয়স্বিনী নদীতে স্নান সেরে আদিকেশরের মন্দিরে। এখানকার বৈষ্ণবগণের সঙ্গে আলোচনায় মহাপ্রভু মুগ্ধ হন। এই মন্দিরেই ছিল ব্রহ্মসংহিতার পঞ্চম অধ্যায়ের একখানি পুঁথি। কথিত আছে ব্রহ্মা কর্তৃক রচিত এই পুঁথিতে শত অধ্যায় ছিল। ব্রহ্মসংহিতার মত শ্রেষ্ঠ গ্রন্থখানি মহাপ্রভু নকল করে নিয়ে আসেন। অপরগ্রন্থ কৃষ্ণ কর্ণামৃতও তিনি মহাবালেশ্বরে প্রাপ্ত হন এবং নকল করে নেন। এইজন্য তিনি কৃষ্ণ বেম্বাতীরে কয়েকদিন ছিলেন। রায় রামানন্দ পুঁথি দু'খানি নকল করে ফেরত দেবেন বলে গ্রহণ করেন। সেখান থেকে মহানদী-তীরস্থ

বত্নপুর। তারপর সম্বলপুর, ভ্রমরানগর প্রভৃতি হয়ে আলালনাথে। সেখানে খবর পাঠান নীলাচলে। তখন, "প্রভুর আগমন শুনি নিত্যানন্দ রায়।

উঠিয়া চলিলা, প্রেমে থেহ নাহি পায় ॥"

অবশেষে ১৫১১ খ্রিস্টাব্দের মাঘমাসের তৃতীয় দিবসে মহাপ্রভু পুরী ফিরে আসেন।

মহাপ্রভুর শিক্ষাদান

(১) সনাতন গোস্বামীকে—মহাপ্রভু স্বয়ং ভগবান। কেননা, তাঁর মধ্যে সমগ্র ঐশ্বর্য, সমগ্র বীর্য, সমগ্র যশ, সমগ্র সৌন্দর্য, সমগ্র জ্ঞান ও সমগ্র বৈরাগ্য— এই ছয়টি অচিন্ত্য শক্তি তাঁর মধ্যে বিরাজমান। ভগবদ্বাক্য অভ্রান্ত, তাই আমাদের পক্ষে তাঁর উপদেশাবলী জীবনপথে একান্ত প্রয়োজনীয়।

সনাতন হেলাভরে রাজমন্ত্রীর পদ ত্যাগ করে ফকিরের বেশে মহাপ্রভুর সাক্ষাতের আশায় বৃন্দাবন যাত্রা করেন। পথে কাশীতে তিনি চৈতন্য মহাপ্রভুর দর্শনলাভ করেন। মহাপ্রভুকে তিনি প্রশ্ন করেন—

"কে আমি, কেনে আমায় জারে ত্রাপত্রয়।
ইহা নাহি জানি—কেমনে হিত হয় ॥
সাধ্য সাধন তত্ত্ব পুছিতে নাজানি।
কৃপা করি সব তত্ত্ব কহত আপনি "

শ্রীচৈতন্য বললেন, সনাতন! শ্রীকৃষ্ণের কৃপা তুমি পূর্ণভাবে পেয়েছ। তুমি সব জান। তোমার তাপত্রয় নাই। তবুও তোমায় জীবতত্ত্ব সম্বন্ধে বলছি—

"জীবের স্বরূপ হয় কৃষ্ণের নিত্যদাস।
কৃষ্ণের তটস্থা শক্তি ভেদাভেদ প্রকাশ ॥"

অর্থাৎ, জীব স্বরূপতর কৃষ্ণের নিত্যদাস। ভগবানের অন্তরঙ্গাচিচ্ছক্তি ও বহিরঙ্গা মায়াশক্তির অন্তবর্তী তটস্থা জীবশক্তি। এই তটস্থা শক্তি তার ইচ্ছা অনুসারে ভগবানের অন্তরঙ্গা অথবা বহিরঙ্গা শক্তিতে অবস্থান করতে পারে। ভগবানের সঙ্গে কোন অংশে তার অভেদ এবং কোন অংশে ভেদ দৃষ্ট হয়। তাই "ভেদাভেদ প্রকাশ।" সূর্যের কিরণকণা যেমন তেজরূপে সূর্য থেকে অভিন্ন, জীবও তেমন গুণগতভেদে ভগবান থেকে অভিন্ন, কিন্তু আয়তনগত ভাবে ভগবান থেকে পৃথক। এই অচিন্ত্য-ভেদাভেদবাদ। কৃষ্ণের অংশ জীব কৃষ্ণবিমুখ হয়ে পড়ার ফলে এই জড়জগতে অধঃপতিত হয় এবং মায়ার প্রভাবে সংসার দুঃখ ভোগ করে। কিন্তু সাধু ও শাস্ত্রের কৃপায় যদি কৃষ্ণ-উন্মুখ হয়, তাহলে সে মায়ার বন্ধন থেকে মুক্ত হয়ে নিস্তার লাভ করে। সাধনভক্তি দ্বারা শ্রীকৃষ্ণকে লাভ করা যায়। প্রয়োজন হচ্ছে 'কৃষ্ণ প্রেম'। ধর্ম-অর্থ-কাম-মোক্ষ এই চর্তুবর্গের অতীত পঞ্চম পুরুষার্থ হচ্ছে এই প্রেম। জীবের পক্ষে কৃষ্ণপ্রাপ্তির একমাত্র উপায় ভক্তি। ভক্তিলাভের ফলে কৃষ্ণপ্রেম লাভ হয়।

কৃষ্ণতত্ত্ব বিশ্লেষণ : মহাপ্রভু সনাতনকে বললেন, "ব্রজেন্দ্রনন্দন শ্রীকৃষ্ণই অদ্বৈতজ্ঞানতত্ত্ব। তিনি স্বয়ং ষড়ৈশ্বর্যপূর্ণ ভগবান। তিনি সমস্ত অবতারের অবতারী, সমস্ত রসের আধার, সর্বচিত্ত আকর্ষক ; পীতাম্বরধারী। বনমালী, অপ্রাকৃত নবীন মদন, তিনি সকলের ঈশ্বর, সকলের আশ্রয় এবং সর্ব্বকারণের পরম কারণ। এই অদ্বয় জ্ঞানতত্ত্বকে তত্ত্বজ্ঞ মহাজনেরা কেউ ব্রহ্ম, কেউ পরামাত্মা, আবার কেউ ভগবান বলে উল্লেখ করেন। জ্ঞান, যোগ এবং ভক্তিসাধন অনুসারে শ্রীকৃষ্ণ সাধকদের কাছে ব্রহ্ম পরমাত্মা

ও ভগবানরূপে প্রকাশিত হন। ভগবানের অনন্ত রূপ। তার মধ্যে তিনটি রূপ শ্রেষ্ঠ। (১) স্বয়ং রূপ (২) তদেকাত্মরূপ (৩) আবেশরূপ। শ্রীকৃষ্ণ হচ্ছেন স্বয়ং রূপ। এ আবার দুইভাগে বিভক্ত। প্রাভব এবং বৈভব। প্রাভব বিলাসে এক কৃষ্ণরাসে অসংখ্য গোপীর সঙ্গে নৃত্য করেছিলেন আর বৈভব বিলাসে একই বিগ্রহ ভিন্নরূপে প্রকাশ হয়। শ্রীবলরাম হচ্ছেন শ্রীকৃষ্ণের বৈভব প্রকাশ। তাঁর বর্ণমাত্র ভেদ কিন্তু আর সবই শ্রীকৃষ্ণের সমান। শ্রীকৃষ্ণের স্বয়ং রূপ থেকে পৃথক রূপের নাম তদেকাত্মরূপ। এটি দুই প্রকার। বিলাস ও স্বাংষ। বিলাসরূপ নানাভাগে বিভক্ত। তার মধ্যে বাসুদেব, সংকীর্ণ, প্রদ্যুম্ন এবং অনিরুদ্ধ প্রধান।

তাদেরকে শ্রীকৃষ্ণের কাযব্যূহ বলা হয়। যে সমস্ত জীবে ভগবান জ্ঞান, শক্তি আদি দ্বারা আবিষ্ট হন সেই সমস্ত মহত্তম জীবকে আবেশ বলা হয়। ব্রহ্মা, বিষ্ণু, শিব—এই তিনজন ভগবান শ্রীকৃষ্ণের গুণাবতার। তাঁরা সত্ব, রজঃ ও তমোগুণে চৈতন্য দান করে সৃষ্টি, স্থিতি ও প্রলযকার্য সম্পাদন করেন। সত্য, ত্রেতা, দ্বাপর ও কলিতে ভগবান যথাক্রমে শুক্ল, রজ, কৃষ্ণ ও পীতবর্ণ ধারণ করেন।

কলিযুগ মাহাত্ম্য :— "আর তিন যুগে ধ্যানাদিতে যেই ফল হয়।
কলিযুগে কৃষ্ণ নামে সেই ফল পায় ॥"

শাস্ত্রের বর্ণনানুসারে কলিযুগে যুগাবতারের বর্ণপীত এবং যিনি সংকীর্তন যজ্ঞের প্রচারক। এই বর্ণনা থেকে সনাতন চৈতন্য মহাপ্রভুকে চিনতে পেরে পরম চতুরতার সঙ্গে জিজ্ঞাসা করলেন—

"অতি ক্ষুদ্র জীব মুই নীচ নীচাচার।
কেমনে জানিব কলিতে কোন অবতার ॥"

তার উত্তরে মহাপ্রভু হেসে বললেন,

"সর্বজ্ঞ মুনির বাক্য-শাস্ত্র পরমান।
আমা সবার জীবের হয় শাস্ত্র দ্বারা জ্ঞান
অবতার নাহি কহে আমি অবতার
মুনি সব জানি করে লক্ষণ বিচার।" (চৈ. চ.)

সনাতন তখন করজোড়ে বললেন,

"যাতে ঈশ্বর লক্ষণ,
পীতবর্ণ, কায়া, প্রেমদান সংকীর্তন।
কলিকালে সেই "কৃষ্ণাবতার নিশ্চয়।
সুদৃঢ় করিয়া কহ যাউক সংশয়।

মহাপ্রভুর ভক্তগণ তাঁকে প্রকাশ করতে সদাই যত্নবান। আর তিনি প্রকাশ হতে একেবারেই নারাজ। তাই গম্ভীরভাবে বললেন,

"প্রভু কহে চাতুরালি ছাড় সনাতন।
শক্ত্যাবেশাবতারের শুন বিবরণ।" (চৈ. চ.)

যখন যাতে ভগবানের কোন বিশেষ শক্তির প্রকাশ পায়, তখন তাকে শক্ত্যাবেশ অবতার বলে, যেমন মনুতে জ্ঞান, নারদে ভক্তি, পৃথুতে পালন, পরশুরামে দুষ্ট দমন ইত্যাদি।

শ্রীকৃষ্ণের বয়োধর্ম ও লীলারহস্য : —শ্রীকৃষ্ণের লীলা নিত্য প্রকট । অনন্ত ব্রহ্মাণ্ডে কালে কালে নিত্যলীলা প্রকট হয়। তবে বৃন্দাবনে শ্রীকৃষ্ণ তাঁর সর্ব ঐশ্বর্য প্রকাশ করে পূর্ণতম, মথুরায় ও দ্বারকায় তিনি পূর্ণতর এবং বৈকুণ্ঠে তিনি পূর্ণ।

শ্রীকৃষ্ণের ধাম তিনটি—মথুরা, দ্বারকা ও বৃন্দাবন। শ্রীবৃন্দাবনেই তাঁর নিত্য স্থিতি। পিতামাতা ও বন্ধুদের নিয়ে তিনি এখানে মাধুর্য লীলা সম্পাদন করেন। তার নীচে পরব্যোম-বিষ্ণুলোক। তা তার বিলাসমূর্তি নারায়ণের ধাম। এই ধামে শ্রীকৃষ্ণ অনন্তশয্যায় নারায়ণমূর্তিতে লক্ষ্মীসহ বিরাজ করেন। তার নীচে মহেশ ধাম ও বিরজার পাড়ে দেবীধাম। ভগবানের ঐশ্বর্য বর্ণনা করতে করতে মহাপ্রভুর কৃষ্ণস্ফূর্তি হল। তখন তিনি সনাতন গোস্বামীকে বললেন যে, শ্রীকৃষ্ণের যত লীলা রয়েছে তার মধ্যে সর্বোত্তম হল নরলীলা। সেই লীলায় তাঁর গোপবেশ, হাতে বাঁশী, নবকিশোর নটবর। সেইরূপে এক কণা ত্রিভুবন প্লাবিত করে সমস্ত প্রাণীকে আকর্ষণ করে।

অভিধেয় তত্ত্ব :—তারপর মহাপ্রভু সনাতনকে অভিধেয় তত্ত্ব শিক্ষা দিয়ে বললেন, কৃষ্ণ ভজনের নাম অভিধেয় ভক্তি। এই ভজন ব্যতীত জীবের আর কোন গতি নাই; ভক্তিছাড়া কেবল কর্ম বা জ্ঞানমুক্তি দিতে পারে না। কেউ যদি "হে কৃষ্ণ আমি তোমার হলেম" বলে মনে প্রাণে প্রার্থনা করে তবে শ্রীকৃষ্ণ তাকে চিরদিনের জন্য গ্রহণ করেন।

সাধুসঙ্গের মহিমা :— মহাপ্রভু বললেন, নদীর স্রোতে ভাসমান কাষ্ঠখণ্ড যেমন দৈবযোগে কূলে উপস্থিত হয়, তেমনই সংসার সমুদ্রে ভাসতে ভাসতে ভাগ্যবান জীব যদি ভগবৎ চরণে ভক্তিলাভ করতে পারে তাহলে সে ভবসাগর পার হতে পারবে। ভগবানের কৃপায় তখন তার সংসার বাসনা দূর হয় এবং সাধুসঙ্গ লাভ হয়। ভগবানের চরণে যার অচলা ভক্তি রয়েছে তার মধ্যে সমস্ত সদ্‌গুণই দৃষ্ট হয়। সেগুলি হল—কৃপালু, অকৃষ্ণদ্রোহ, সত্যসার, সম, নির্দোষ ইত্যাদি।

অসৎসঙ্গ :—মহাজনেরা সাধুসেবাকে ভগবদ্ভক্তির দ্বার এবং অসৎসঙ্গকে নরকের দ্বার বলে বর্ণনা করেছেন। জীবের হৃদয়ে কৃষ্ণভক্তি উদয়ের মূল কারণ—সাধুসঙ্গ। ভক্তিমার্গ সাধনের এইটিই প্রধান সঙ্গ।

সাধনভক্তি :—সাধনভক্তি দ্বারা কৃষ্ণপ্রেমরূপ মহাধন লাভ হয়। অনুকূল ভাবের সঙ্গে শ্রবণ কীর্তন ও স্মরণ—সেই ভক্তির স্বরূপ লক্ষণ। কৃষ্ণপ্রেম নিত্য শুদ্ধ বস্তু, তা কখনও শুদ্ধভক্তি ব্যতীত লাভ হয় না। এ দুই প্রকারে লাভ হয়—বৈধ ও রাগানুরাগা। যাদের হৃদয়ে রাগের উদয় হয়নি—শাস্ত্র নির্দেশ অনুসারে যাদের যে ভজন প্রবৃত্তি হয়, তাই বৈধীভক্তি। এই বৈধী ভক্তির চৌষট্টি প্রকার সাধনাঙ্গ রয়েছে। তার মধ্যে সাধুসঙ্গ, নামকীর্তন, ভগবত শ্রবণ, মথুরাবাস ও শ্রদ্ধাপূর্বক শ্রীমতী সেবা—এই পাঁচটি অঙ্গ সর্বশ্রেষ্ঠ। অভীষ্ট বস্তুতে যে স্বাভাবিক স্নেহময়ী তৃষ্ণা তার নাম রাগ বা অনুরাগ। ইষ্টবস্তুতে যে গাঢ় তৃষ্ণা তাই রাগানুগা ভক্তির স্বরূপ লক্ষণ—আর ইষ্টবস্তুতে যে আবিষ্টতা বা তন্ময়তা তাই তার তটস্থ লক্ষণ। বস্তুত রাগানুগা ভক্তিতত্ত্ব ব্রজের নিগূঢ় রসপূর্ণ, তাই বিস্তারিত ব্যাখ্যা করার শক্তি কারোর নাই।

ভগবদ্-প্রেমের উৎপত্তি :—কৃষ্ণে রতি গাঢ় হলে তা প্রেম নামে অভিহিত হয়। ভাগ্যগুণে কোন জীবের হৃদয়ে যদি শ্রদ্ধার উদয় হয়, তবে সেই জীব সাধুসঙ্গ করে।

সাধুসঙ্গের প্রভাবে ভগবানের নাম কীর্তন শ্রবণে তার আসক্তি হয় ; তার ফলে সবরকম অনর্থের নিবৃত্তি হয়। অনর্থ নিবৃত্তি হলে ভগবদ্ভক্তিতে নিষ্ঠা জন্মায়। নিষ্ঠা থেকে ভগবানের নামে রুচি হয়। রুচি থেকে আসক্তি, আসক্তি থেকে ভাব এবং এইভাব গাঢ় হলে সাধকের হৃদয়ে প্রেমের উৎপত্তি হয়। এই প্রেমই সমস্ত আনন্দের

আধার এবং জীবের পরম প্রয়োজন। যার হৃদয়ে এই ভাবের উদয় হয়, তার মধ্যে ক্ষান্তি, মানাভিমান শূন্যতা, ভগবানের নামগানে আসক্তি প্রভৃতি নয়টি গুণ জন্মাবার ফলে আর প্রাকৃত ক্ষেত্রে তার হৃদয় বিচলিত হয় না। এই ধরনের সাধকেরা কৃষ্ণ গুণকীর্তন ব্যতীত অন্য কথায় বৃথা কালক্ষেপ করেন না। নিরন্তর বাক্যের দ্বারা স্তব, মনের দ্বারা শ্রবণ এবং দেহের দ্বারা প্রণতি ও নেত্রজলে অভিসিক্ত হয়ে কেবলমাত্র ভগবানের উদ্দেশ্যেই সমস্ত জীবন অতিবাহিত করেন।

কৃষ্ণপ্রেমের চিহ্ন : "যার চিত্তে কৃষ্ণপ্রেম করয়ে উদয়।
তার বাক্য ক্রিয়া মুদ্রা বিজ্ঞে না বুঝয় ॥
প্রেম ক্রমে বাড়ি হয় স্নেহ মান প্রণয়।
রাগ অনুরাগ ভাব মহাভাব হয় ॥"

ইক্ষুরস অগ্নিতাপে পাক হতে হতে যেমন গুড়, শর্করা, মিছরিরূপে পরিণত হয়ে পরে পরিষ্কৃত ও মিষ্টাধিক্যে মধুর থেকে মধুরতর হয় তেমনি প্রেম ক্রমশঃ বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হয়ে ঘনীভূত অবস্থায় স্নেহ, মান, প্রণয়, রাগ, অনুরাগ, ভাব এবং মহাভাবে পরিণত হয়।

শ্রীকৃষ্ণ চৌষট্টি মহাগুণের আধার এবং এইজন্য তিনি গুণমণি এবং শ্রীরাধা অনন্ত গুণশালিনী। পঁচিশটি গুণ তাতে প্রধানভাবে অধিষ্ঠান করে। এই গুণের দ্বারাই তিনি শ্রীকৃষ্ণকে বশীভূত করেছিলেন।

"ব্রজেন্দ্র নন্দন কৃষ্ণ নায়ক শিরোমণি।
নায়িকার শিরোমণি রাধাঠাকুরাণী।"

তারপর মহাপ্রভু বললেন, "নায়ক-নায়িকা দুই রসের আলম্বন। সেই দুই শ্রেষ্ঠ রাধা ব্রজেন্দ্র নন্দন।" সর্বশেষে মহাপ্রভু বললেন ব্রজের নিগূঢ় রসতত্ত্বের কথা অভক্তদের এবং সাধারণ লোকের আস্বাদ্য নয়। বিশেষ গুণবিশিষ্ট কৃষ্ণ ভক্তেরা ব্রজের এই উজ্জ্বলরস আস্বাদন করে পরম আনন্দ লাভ করেন।

শ্রীরূপকে শিক্ষাদান

শ্রীরূপ ছিলেন তৎকালীন বাংলার সুলতান হুসেন শাহের দবিরখাস অর্থাৎ Private Secretary বা একান্ত সচিব। শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু তাঁকে এবং তাঁর অগ্রজ সনাতনকে শ্রেষ্ঠ ভগবদ্‌ভক্তের আসনে অধিষ্ঠিত করেছিলেন। শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর সান্নিধ্য লাভ করে তাঁরা হেলাভরে উচ্চরাজপদ পরিত্যাগ করেছিলেন। গৌড় ত্যাগ করার আগেই রূপ খবর পেয়েছিলেন যে প্রভু বৃন্দাবন অভিমুখে রওনা হয়েছেন। তাই রূপ ভাইকে নিয়ে গঙ্গাপথে প্রভুর সঙ্গে মিলিত হবার জন্য বৃন্দাবন অভিমুখে চললেন। সাক্ষাৎ হল প্রয়াগে এসে। প্রয়াগে শ্রীচৈতন্য দিন দশেক ছিলেন—মাঘ মাসের শেষ পর্যন্ত। এই সময় তিনি রূপকে ভক্তি ও বৈষ্ণব রসতত্ত্ব সম্বন্ধে তাঁর ভবিষ্যৎ কর্তব্য নির্দেশ করে শিক্ষা ও উপদেশ দিয়েছিলেন। মহাপ্রভু বলেছিলেন, "ভক্তিরস সমুদ্র অতি গভীর এবং অসীম। পরিপূর্ণরূপে বর্ণনা করা সম্ভব নয়। তবু তার একটুখানি আস্বাদন করার চেষ্টা করব :—

ভগবানের অতি ক্ষুদ্র অংশ জীব। কেশাগ্রকে শতভাগে বিভক্ত করে তাকে শত শত ভাগ করলে যে অতি সূক্ষ্ম বস্তু হয়, জীব তার চেয়েও সূক্ষ্ম। জীব স্থাবর ও জঙ্গম ভেদে দুই প্রকার। গাছপালা, তৃণগুল্ম আদি স্থাবর এবং পশুপাখি, কীটপতঙ্গ, মানুষ—এরা জঙ্গম। জঙ্গম-প্রাণীরা আবার তিনভাগে বিভক্ত (১) তির্যক (২) জলচর এবং (৩) স্থলচর। এই

স্থলচব জীবের মধ্যে মানুষের সংখ্যা অতি অল্প। তার মধ্যে আবার অধিকাংশই অসভ্য। মানুষ যখন বেদবিহিত কার্য করে তখনই তাকে সভ্য বলে বিবেচনা করা হয়। এই বৈদিক আচারী মধ্যে আবার অনেকেই কর্মী। সহস্র সহস্র কর্মনিষ্ঠ মধ্যে একটিও জ্ঞানী পাওয়া যায় কিনা সন্দেহ। কোটি কোটি জ্ঞানীর মধ্যে দু-একজন মুক্তপুরুষ দেখা যায়। আবার কোটি কোটি জীবন্মুক্ত মধ্যে একটি কৃষ্ণভক্ত সুদুর্লভ। ভুক্তি, মুক্তি, সিদ্ধকামী পুরুষেরা অশান্ত। কৃষ্ণভক্তই কেবল শান্ত। কেননা তিনি নিষ্কাম।

ব্রহ্মাণ্ডে বিভিন্ন দেহে ভ্রমণ করতে করতে যদি কোন সৌভাগ্যক্রমে জীব শ্রীগুরু ও শ্রীকৃষ্ণের কৃপায় ভক্তিলতাব বীজ প্রাপ্ত হয় এবং মালীর মত যত্ন করে তা হৃদয় ক্ষেত্রে রোপণ করে তার মুখে শ্রবণ কীর্তনরূপ সাধনজল সিঞ্চন করেন তা হলে একদিন সেই বীজ অঙ্কুরিত লতারূপে বর্ধিত হয়ে ব্রহ্মাণ্ড ভেদ করে উঠবে এবং পরব্যোম পার হয়ে গোলোক বৃন্দাবনে প্রবেশ করবে। সেই ভক্তিলতা তখন ভক্তমালীব অবলম্বন করে শ্রীকৃষ্ণচরণরূপ কল্পবৃক্ষের প্রেমধন প্রাপ্ত হন। এই প্রেম ফলের আস্বাদনে তিনি পরম পুরুষার্থ লাভ করেন যাব কাছে ধর্ম-অর্থ-কাম এমনকি মোক্ষও তুচ্ছ।

"অন্য বাঞ্ছা অন্য পূজা ছাড়ি জ্ঞান কর্ম।
আনুকূল্যে সর্বেন্দ্রিয়ে কৃষ্ণানুশীলন।
এই শুদ্ধ ভক্তি ইহা হইতে প্রেমা হয়।
পঞ্চরাত্রে ভাগবতে এই লক্ষণ কয় ॥" (চৈ চ.)

শুদ্ধভক্তি থেকেই প্রেম উৎপন্ন হয়। সাধনভক্তি থেকে রতির উদয় হয়। রতি গাঢ় হলে তার নাম হয প্রেম। প্রেম বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হয়ে ক্রমান্বয়ে স্নেহ, মান, প্রণয়, রাগ-অনুরাগ ভাব ও মহাভাব হয়। এদের মধ্যে মহাভাবই শ্রেষ্ঠ। একমাত্র শ্রীমতী রাধারাণী ও ব্রজগোপীদের যে ভাব তাকে মহাভাব বলা হয়। এরপর মহাপ্রভু স্থায়ীভাব, বিভাব, অনুভাব প্রভৃতি সম্বন্ধে ব্যাখ্যা করলেন। ভক্তি প্রকরণে শ্রীকৃষ্ণ-বিষয়ক রতি স্থায়ীভাব। রতি আদি যাতে বিভাবিত হয় তাকে আলম্বন-বিভাব এবং যার দ্বারা রতি আদি উদ্বুদ্ধ হয় তাকে উদ্দীপন বিভাব বলে। শ্রীকৃষ্ণের গুণ, বেশ, মন্দহাস্য, শ্রীঅঙ্গসৌরভ, বংশী, নূপুর, পদাঙ্ক শ্রীবৃন্দাবনাদি ক্ষেত্র, তুলসী, ভক্ত এবং বাসবাদি উদ্দীপন বিভাব। আর চিত্তগত ভাবের কার্যকে অনুভাব বলে। অনুভাবের লক্ষণ—গড়াগড়ি,. গীত, চিৎকার, হুঙ্কার, শ্বাসবাহুল্য, অট্টহাস্য, হিক্কা প্রভৃতি।

সাক্ষাৎ শ্রীকৃষ্ণ-সম্বন্ধীয় অথবা তা থেকে একটু ব্যবধান বিষয়ক ভাবসমূহ দ্বারা চিত্ত আকৃষ্ট হলে তাকে সত্ত্ব বলা হয়। এই সাত্ত্বিক ভাব ত্রিবিধ (১) স্নিগ্ধ (২) দগ্ধ (৩) রুক্ষ। অষ্টসাত্ত্বিক ভাবসমূহ সহ তিনটি লক্ষণে বিভক্ত। অষ্টসাত্ত্বিক ভাবগুলি হচ্ছে—স্তম্ভ, স্বেদ, রোমাঞ্চ, স্বরভঙ্গ, বেপথু, কম্প, বৈবর্ণ অশ্রু।

ব্যভিচারী ভাব : স্থায়ীভাব সমুদ্রের মত। সঞ্চারীও ব্যভিচারী ভাবগুলি সেই সমুদ্রের তরঙ্গের মত। এরা ক্রমশঃ স্থায়ীভাব সমূহের রূপ প্রাপ্ত হয়। শ্রীকৃষ্ণ-বিষয়ক রতি রূপস্থায়ীভাব শ্রবণ কীর্তনাদি দ্বারা পুষ্ট হয়। বিভাব, অনুভাব, সাত্ত্বিকভাব এবং ব্যভিচারী ভাব দ্বারা ভক্তহৃদয় বিশেষভাবে পুষ্ট হয়ে ভক্তিরসের সৃষ্টি করে।

শান্ত, দাস্য, সখ্য, বাৎসল্য ও মধুর—এই পাঁচটিও প্রেমের স্থায়ী রস ও স্থায়ী ভাব। পরমাত্মারূপ শ্রীকৃষ্ণকে জেনে শ্রীকৃষ্ণের প্রতি তাদের যে রতি তাকে বলা হয় শান্ত রস। যাঁরা ভগবান থেকে হীন মনে করেন, তাঁরা ভগবানেব অনুগ্রহ প্রার্থী। ভগবান তাঁদের আরাধ্য বস্তু। এইরূপ জ্ঞানের নাম দাস্যরতি। যাঁরা ভগবানের সমতুল্য মনে করেন তাঁদের সখা বলে। ভগবানের সঙ্গে পরিহাস, উচ্চহাস্যাদি-এই সখ্যভাবের

কার্য। যাঁরা নিজেদেরকে ভগবানের গুরু বলে মনে মনে অভিমান করেন শ্রীকৃষ্ণ তাঁদেব স্নেহের বড় আদরের ধন। শ্রীকৃষ্ণের প্রতি তাঁদের অনুগ্রহময়ী যে রতি তার নাম বাৎসল্য রতি। শ্রীকৃষ্ণের ও তাঁর প্রেয়সীভাবাপন্ন ভক্তদের যে মধুর সম্বন্ধ এবং এই প্রিয় সম্বন্ধজনিত পরস্পরের মধ্যে যে সম্ভোগ ভাব তার নাম মধুর রতি। সমস্ত রসেব মধ্যে শ্রেষ্ঠ মধুর রস। উপরোক্ত পঞ্চ রস ছাড়াও সাত প্রকাব গৌণ রস আছে। সেগুলি হল হাস্য, অদ্ভুত, বীর, রৌদ্র, করুণ, বীভৎস ও ভয়। এবার কৃষ্ণ ভক্তি রসের কথা। এই রস দুভাগে বিভক্ত। (১) বৈধী ভক্তি (২) রাগাত্মিকা ভক্তি। বৈধীভক্তি ঐশ্বর্য ও জ্ঞানমিশ্রিত আর রাগাত্মিকা ঐশ্বর্য ও জ্ঞানবিহীন। তা শুদ্ধ ও অহৈতুকী। এই ভক্তি কেবল গোকুলের ব্রজবাসীতে বিদ্যমান।

শ্রীপ্রকাশানন্দ সরস্বতীকে মহাপ্রভুর শিক্ষাদান

মহাপ্রভু কাশীতে অবস্থান করছেন। কাশী মায়াবাদী সন্ন্যাসীদের পীঠস্থান। শ্রীচৈতন্যপ্রভুব ভক্তিবাদ তাবা বুঝতে চায়না, তাই নিন্দা কবে। কিন্তু মহাপ্রভুব আশ্চর্য বিভূতিব অদ্ভুত শক্তিতে কৃষ্ণপ্রেমে আবেগ ব্যাকুলতা-ও নৃত্যগীতাদিতে আকৃষ্ট হয়ে কাশীতে লোকে দলে দলে চৈতন্য দর্শনে আসতে লাগল। মায়াবাদী সন্ন্যাসী প্রধান প্রকাশানন্দ তা সহ্য কবতে না পেবে অসূয়া বশে অশালীন মন্তব্য কবতে লাগলেন—

"সন্ন্যাসী নামে মাত্র—মহা ইন্দ্রজালী।
কাশীপুরে না বিকাবে তার ভাবকালী ॥
বেদান্ত শ্রবণ কর না যাইহ তার পাশ।
উচ্ছৃঙ্খল লোক সঙ্গে দুই লোক নাশ।"—

ইহা শ্রবণ করে চৈতন্যদেব বলে পাঠালেন।—

"ভাবকালী বেচিতে আইলাম কাশীপুরে।
গ্রাহক নাহি, না বিকায় লৈয়া যাব ঘরে।
ভারি বোঝা লইয়া আইলাম কেমনে লৈয়া যাব
অল্পস্বল্প মূল্য পাইলে এথাই বেচিব ॥

মহাপ্রভুর ভক্তগণ তাঁর নিন্দা শুনে এতই ব্যথিত যে প্রাণত্যাগ করতে কৃতসংকল্প। হঠাৎ সেই সময় এক বিপ্র এসে

"একবস্তু মাগো দেহ প্রসন্ন হইয়া"

সেই ব্রাহ্মণের প্রার্থনা,

"সকল সন্ন্যাসী মুই কৈনু নিমন্ত্রণ।
তুমি যদি আইস, পূর্ণ হয় মোর মন ॥"

ঈষৎ হেসে মহাপ্রভু নিমন্ত্রণ গ্রহণ করলেন। তারপব সেই ব্রাহ্মণ গৃহে গমন করে দেখলেন সেখানে সমস্ত সন্ন্যাসীরা উপস্থিত। তাঁদের নমস্কাব কবে এবং পদ প্রক্ষালন করে মহাপ্রভু সেখানেই বসলেন এবং বসে ঐশ্বর্য প্রকাশ করলেন। মনে হল যেন তাঁর মহাতেজময় বপু যেন কোটি সূর্যের জ্যোতিতে উদ্ভাসিত। তা দেখে সমস্ত সন্ন্যাসী তাঁর প্রতি আকৃষ্ট হয়ে উঠে দাঁড়ালেন। সন্ন্যাসীদের নেতা প্রকাশানন্দ সরস্বতী মহাপ্রভুর সামনে এসে সসম্ভ্রমে বললেন, "শ্রীপাদ, এই তুচ্ছ অপবিত্র স্থানে আপনি কি দুঃখে উপবেশন করলেন? আসুন, আপনার জন্য সভার মধ্যে বিশেষ স্থান নির্দিষ্ট করে রাখা হয়েছে। মহাপ্রভু তখন অতিশয়

দীনভাবে করজোড়ে তাঁকে বললেন, "আমি অতি হীন সম্প্রদায়ের ভক্ত। আপনাদের এই সভাতে বসবার যোগ্য নই।'

শ্রীশঙ্করাচার্য সম্প্রদায়ের সন্ন্যাসীরা হচ্ছেন বন, অরণ্য, পর্বত, কানন, সরস্বতী, আশ্রম, তীর্থ, গিরি, পুরী এবং ভারতী। এদের মধ্যে ভারতী সম্প্রদায়কে নীচ বলে গণ্য করা হয়। তাই মহাপ্রভুর উক্তি—আমি হই হীন সম্প্রদায়,

তোমার সভাতে মোরে বসিতে নাযুয়ায় ॥

মহাপ্রভুর এই দৈন্যোক্তি এবং ব্যঙ্গোক্তি শুনে প্রকাশানন্দ সরস্বতী লজ্জিত হয়ে সসম্ভ্রমে প্রভুর হস্ত ধরে সভার মধ্যে নিয়েযান এবং বহু সম্মানে যথাযোগ্য স্থানে বসান। প্রকাশানন্দ সরস্বতী তখন মহাপ্রভুকে বলেন, "আপনার নাম আমি শুনেছি। আপনি যে শ্রীপাদ কেশব ভারতীর শিষ্য তা আমি জানি। আপনি আমাদের সম্প্রদায়ী সন্ন্যাসী, কিন্তু আপনি আমাদের সঙ্গ করেন না। তছাড়া আপনি সন্ন্যাসী হয়ে নৃত্য গীত কেন করেন? ভাবুকের সঙ্গে উচ্চ উচ্চ সংকীর্তন করেন। সেটা সন্ন্যাসীর ধর্ম নয়। বেদান্ত পাঠ, জ্ঞান চর্চা, ধ্যানধারণা এগুলি হচ্ছে সন্ন্যাসীর ধর্ম। আপনি আপনার সন্ন্যাস ধর্ম ছাড়লেন কেন? আপনার অপূর্ব প্রভাব দেখে মনে হয় আপনি সাক্ষাৎ নারায়ণ। আপনি এ সমস্ত হীনাচার করেন কেন?'

ভক্তি মহিমা এবং শুদ্ধ মাহাত্ম্য না জেনে ভগবানের নাম কীর্তন এবং তজ্জনিত আনন্দ নৃত্যকে প্রকাশানন্দ সরস্বতী হীনাচার বললেন। মহাপ্রভু তখন দীনভাবে উত্তর দিলেন "আমার গুরুদেব আমাকে মূর্খ দেখে শাসন করে বললেন, 'তুমি মুর্খ, তাই তোমার বেদান্ত পাঠ করার অধিকার নেই। তুমি কেবল কৃষ্ণ নাম জপ কর। এই কৃষ্ণ মন্ত্র হচ্ছে সমস্ত বেদের সার। কৃষ্ণ নাম থেকে সংসার মোচন হবে। কৃষ্ণনাম থেকে তুমি শ্রীকৃষ্ণের চরণাশ্রয় লাভ করবে। নাম বিনা কলিকালে আর কোন ধর্ম নাই। সমস্ত মন্ত্রের সার নাম। এই বলে আমার গুরুদেব আমাকে একটি শ্লোক শিখিয়েছিলেন—

"হরের্নাম হরের্নাম হরের্নামৈব কেবলম্।
কলৌ নাস্ত্যেব নাস্ত্যেব নাস্ত্যেব গতিরন্যথা।"

গুরুদেবের এই আদেশ পেয়ে আমি নিরন্তর কৃষ্ণনাম জপ করতে লাগলাম। আর নাম নিতে নিতে আমার মন উদ্ভ্রান্ত হল। আমি উন্মাদের মত কখন হাসতে লাগলাম, কখনও কাঁদতে লাগলাম। কখনও নাচতে লাগলাম, আবার কখনও বা গান গাইতে লাগলাম। কৃষ্ণনামের প্রভাবে আমার জ্ঞান আচ্ছন্ন। আমি পাগল হয়ে গেছি। তখন আমি গুরুদেবকে গিয়ে বললাম—

'কিবা মন্ত্র দিলা গোসাঞি কিবা তার বল।
জপিতে জপিতে নাম করিল পাগল ॥
হাসায় নাচায় মোরে করায় ক্রন্দন ॥'

সেকথা শুনে গুরুদেব বললেন, 'কৃষ্ণ নাম মহামন্ত্রের এটাই স্বভাব, যে এই মহামন্ত্র জপ করে, তার চিত্তে কৃষ্ণ প্রেমের উদয় হয়। এই কৃষ্ণ প্রেম হচ্ছে পঞ্চম পুরুষার্থ। তার আগে ধর্ম, অর্থ, কাম, মোক্ষ এই চার পুরুষার্থ তৃণতুল্য। পঞ্চম পুরুষাথ প্রেমানন্দামৃত সমুদ্রের কাছে ব্রহ্মানন্দাদি আনন্দ এক বিন্দুর মতও নয়। স্বেদ, কম্প, অশ্রু; গদগদ, বৈবর্ণ, উন্মাদ, বিষাদ, ধৈর্য, গর্ব, হর্ষ, দৈন্য এতভাবে ভক্তদের নাচায় কৃষ্ণের আনন্দামৃত সাগরে ভাসায়। তুমি কৃষ্ণনাম উপদেশ দিয়ে সকলকে উদ্ধার কর। এখন আমি আমার নিজের ইচ্ছায় নাচিনা বা গাইনা। কৃষ্ণনামে যে আনন্দ আস্বাদন হয় তার তুলনায় ব্রহ্মানন্দ খালির অল্প জলের মত। শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর শ্রীমুখের মধুমাখা এই সব কথা শুনে প্রকাশানন্দ বললেন, 'শ্রীপাদ, আপনি যা বললেন, তা সবই সত্য। আপনি যে ভগবান শ্রীকৃষ্ণকে ভক্তি করেন, তা আমাদের বিশেষ সন্তোষের কারণ। কিন্তু আপনি বেদান্ত শ্রবণ করেন না কেন? বেদান্ত পাঠ

বা শ্রবণে কি দোষ হয়? মহাপ্রভু তখন ঈষৎ হেসে বিনীতভাবে উত্তর দিলেন 'শ্রীপাদ আপনারা যদি আমার কথায় দুঃখিত না হন তা হলে এই প্রশ্নের উত্তর দিতে পারি। আপনাদের মনে দুঃখ দিয়ে আমি কোন কথা বলতে চাইনা। মহাপ্রভুর এই দৈন্যমাখা মধুর বাণী শুনে প্রকাশানন্দ সরস্বতী এবং তাঁর সন্ন্যাসীদল সকলে একবাক্যে বললেন,

"তোমাকে দেখিয়ে যৈছে সাক্ষাৎ নারায়ণ।
তোমার বচন শুনি জুড়ায় শ্রবণ।
তোমার মাধুরী দেখি জুড়ায় নয়ন।
তোমার প্রভাবে সবার আনন্দিত মন ॥
কভু অসঙ্গত নহে তোমার বচন ॥

মহাপ্রভু তখন সকলের দিকে শুভ দৃষ্টিপাত করে বলতে লাগলেন, 'বেদান্ত সূত্র ভগবানেরই বাণী। ব্যাসদেব নারায়ণ তা প্রণয়ন করেছেন। ভগবানের বাক্যে ভ্রম, প্রমাদ, বিপ্রলিপ্সা বা করণাপাটব এই সমস্ত দোষ নাই। উপনিষদে সেই সূত্রে যে তত্ত্ব বিশ্লেষণ করা হয়েছে সেটাই হচ্ছে মুখ্যবৃত্তি। কিন্তু গৌণ বৃত্তি অবলম্বনে শঙ্করাচার্য যে ভাষ্য রচনা করেছেন, তা শ্রবণ করলে সর্বনাশ হয়।...

'ব্রহ্ম' শব্দের মুখ্য অর্থে ভগবানকেই ইঙ্গিত করা হয়েছে। তাঁর বিভূতি দেহ সব চিদাকার। কিন্তু তাঁর চিদ্বিভূতি আচ্ছাদন করে তাঁকে শঙ্করাচার্য নিরাকার বলে ঘোষণা করেছেন। শঙ্করাচার্য তাঁকে প্রকৃত শব্দের বিকার বলে বর্ণনা করেছেন। তাতে তাঁর কোন দোষ নাই; কেননা, তিনি হচ্ছেন আজ্ঞাবাহী দাস। কিন্তু যে তা শোনে তার হয় সর্বনাশ। ভগবানের সচ্চিদানন্দ কলেবরকে প্রাকৃত বলে মনে করা সবচেয়ে গর্হিত অপরাধ।

'ঈশ্বরের তত্ত্ব যেন জ্বলিত জ্বলন। আর জীব তার স্বরূপে সেই অগ্নিবৃন্দের স্ফুলিঙ্গ কণাসদৃশ। জীবতত্ত্ব শক্তি, কৃষ্ণ শক্তিমান। জীবতত্ত্ব শক্তি বিশেষ। সেই জীবতত্ত্বকে অণুচৈতন্য রূপে সিদ্ধ না করে ব্রহ্মরূপে সিদ্ধ করতে গেলে অবশ্যই ভ্রমময় সিদ্ধান্ত হবে। শ্রীশঙ্করাচার্য ভগবানের আজ্ঞাক্রমে? ভগবানের ভগবত্তা আচ্ছাদন করার অভিপ্রায়ে জীবতত্ত্বের সঙ্গে পরতত্ত্বের ঐক্য স্থাপন করে ভ্রমময় সিদ্ধান্ত প্রচার করেছেন।

'বেদের মূল্যবাক্য প্রণব, সুতরাং তাই-ই একমাত্র ব্রহ্ম। প্রণব ভগবানের স্বরূপব্যঞ্জক শব্দ। সুতরাং তা ভগবানের নাম, রূপ, ধামলীলা আদি সমন্বিত ভগবানকেই উদ্দেশ্যে করে। কিন্তু শঙ্করাচার্য 'তত্ত্বমসি সর্বম্ খল্বিদং ব্রহ্ম' আদি যে সমস্ত বেদবাক্যের উল্লেখ করেছেন, সেগুলি কেবল বেদের একদেশব্যাপী উপদেশ। যা বেদের সর্বদেশব্যাপী, তাই মহাবাক্য। সুতরাং প্রণব ছাড়া আর কোনটিই মহাকাব্য হতে পারেনা। এই তত্ত্বকে আচ্ছাদন করে শ্রীশঙ্করাচার্য 'তত্ত্বমসি'কে মহাবাক্য বলেছেন। সেই কল্পিত মহাবাক্য অবলম্বন করে বেদের মুখ্যবৃত্তি ছেড়ে গৌণবৃত্তির দ্বারা ব্যাখ্যা করা হয়েছে। তাতে বেদান্ত সূত্রের কৃষ্ণতত্ত্ব ব্যাখ্যাকে অকারণে তিরস্কার করা হয়েছে। স্বতঃপ্রমাণ বেদ হচ্ছে সমস্ত প্রমাণের শিরোমণি, কিন্তু তাতে যদি কল্পিত অর্থ আরোপ কার হয়, তাহলে সেই স্বতঃসিদ্ধ প্রমাণের প্রমাণতার হানি হয়।

এই বলে মহাপ্রভু বল্লেন, "শ্রীপাদ শঙ্করাচার্য ভগবানের আদেশ অনুসারে এইভাবে বেদান্ত সূত্রের সহজার্থ ত্যাগ করে কল্পনাপূর্বক গৌণার্থ ব্যাখ্যা ও প্রচার করেছেন। বেদান্ত সূত্র ব্রহ্ম বাক্য। ব্যাসাবতার রূপে ভগবান স্বয়ং এই বেদান্তসূত্র লিপিবদ্ধ করেছেন। সুতরাং বেদে ভ্রম, প্রমাদ, বিপ্রলিপ্সা, করণাপাটব প্রভৃতি দোষ থাকতে পারেনা। বেদান্ত সূত্রের অর্থ অতি সহজে পরিষ্কারভাবে বোঝা যায়। কিন্তু শঙ্করাচার্যের ভাষ্য বেদান্ত সূত্রকে জটিল করেছে। শঙ্করাচার্য সূত্রের মুখ্য অর্থ আচ্ছাদন করে কল্পিত অর্থের দ্বারা বেদকে বিভ্রান্ত করার

চেষ্টা করেছেন। তাই এই ভাষ্য শ্রবণ করলে জীবের সর্বনাশ হয়, শঙ্করাচার্যের তাতে অবশ্য দোষ নেই, কেননা, তিনি ভগবানের আদেশে তা করেছেন।

শ্রীচৈতন্যের মুখে এই মহাতেজস্বিতাপূর্ণ অপূর্ববাণী শ্রবণ করে প্রকাশানন্দ সরস্বতী প্রমুখ কাশীবাসী দশ সহস্র মায়াবাদী সন্ন্যাসী বিস্ময়ে অভিভূত হলেন। এ পর্যন্ত কেউই শঙ্কর ভাষ্যের এই রকম শাস্ত্র বিচারের মাধ্যমে বিশ্লেষণ করে দোষ দর্শন করতে সাহসী হন নি। কাশীধাম পণ্ডিতদের স্থান-মায়াবাদী বৈদান্তিক সন্ন্যাসীদের পীঠস্থান। এই যে দশ সহস্র সন্ন্যাসী উপস্থিত ছিলেন তাঁরা সকলেই মহা মহাপণ্ডিত। প্রকাশানন্দ সরস্বতী কাশীর পণ্ডিত ও বৈদান্তিক সন্ন্যাসীদের একচ্ছত্র সম্রাট। তাঁরা সকলেই মহাপ্রভুর এই অলৌকিক কাণ্ড দেখে হতবাক হলেন। তাঁর অপূর্ব সাহস দেখে ভীত হলেন। মহাপ্রভু একাকী নির্ভীক চিত্তে তাদের পরমগুরুর মত খণ্ডন করে তাদের সামনেই তাঁর নিন্দা করলেন। মহাপ্রভুর ব্যাখ্যায় সবচাইতে আশ্চর্য হলেন স্বয়ং প্রকাশানন্দ সরস্বতী। তিনি তখন বুঝতে পারলেন শ্রীচৈতন্য শ্রীপাদ শঙ্করাচার্য থেকেও অধিক প্রভাবসম্পন্ন ও প্রভাবশালী মহাপুরুষ। পূর্বে তাঁর নিন্দা করার জন্য তিনি মহালজ্জিত হলেন এবং তাঁর মনে আত্মগ্লানির উদয় হল। অত্যন্ত সম্ভ্রমের সঙ্গে তিনি মহাপ্রভুকে বললেন, "আপনি যে কথা বললেন তাতে আমাদের কোন সংশয় নাই। আপনার ব্যাখ্যা যে মূল সূত্রের দ্বারা অনুমোদিত এবং সরল তা বুঝতে পারছি। আর আমাদের যে মূল সূত্রের দ্বারা অনুমোদিত এবং সকল তা বুঝতে পারছি। আর আমাদের শঙ্করাচার্যের ভাষ্য যে তাঁর মনোকল্পিত, তাও আমরা এখন বুঝতে পারছি। আপনি বললেন বেদান্ত সূত্রের একটি মুখ্য অর্থ আছে। এখন আপনি দয়া করে তা ব্যাখ্যা করুন, আমরা শুনে কৃতার্থ হই।"

মহাপ্রভু তখন বললেন, 'বেদ ও পুরাণে ব্রহ্ম বলতে বৃহৎ বস্তু, ষড়ৈশ্বর্যপূর্ণ স্বয়ং ভগবানকে বলা হয়েছে। কিন্তু শঙ্করাচার্য এই বৃহৎ বস্তু ব্রহ্মকে নিরাকার বলে কল্পনা করেছেন। যে সমস্ত শ্রুতি শাস্ত্রে নিরাকার ব্রহ্মের বর্ণনা করা হয়েছে সেই শ্রুতিশাস্ত্রই আবার অন্যত্র সাকার ব্রহ্মেরও রূপ বর্ণনা করেছে। অতএব শ্রুতির উভয় স্থল বিচার করে দেখলে সবিশেষ অর্থাৎ সাকার ব্রহ্মের পক্ষে বহু প্রমাণ দেখতে পাওয়া যায়। ভগবানের ঐশ্বর্য তাঁর মতে চিদানন্দময়, তাতে মায়ার গন্ধ নাই এবং তার শক্তিও চিদরূপা। শঙ্করাচার্য ব্রহ্মের আকার, ঐশ্বর্যও শক্তি স্বীকার করেন না। কেবল ব্রহ্মের সত্তামাত্র স্বীকার করেন। এই মত দোষাবহ। ভগবানের চিদৈশ্বর্য চিদাকার এবং চিৎ শক্তি না মেনে কেবল সত্তামাত্র মানলে, তাঁর অর্ধস্বরূপ অস্বীকার করা হয়। তাতে ভগবানের পূর্ণতার হানি করা হয়। শ্রীকৃষ্ণের কৃপায় এবং তাঁর ভক্তের কৃপায় শ্রবণ কীর্তন আদি ভক্ত্যাঙ্গ অনুশীলনের ফলে কৃষ্ণপ্রাপ্তি হয়। এই শ্রবণাদি ভক্তির স্বরূপ বেদের অভিধেয়। সাধানভক্তির দ্বারা হৃদয়ে কৃষ্ণ প্রেমের উদয় হয়। শ্রীকৃষ্ণের চরণে যদি কারও প্রেমানুরাগ হয়, কৃষ্ণসম্বন্ধ ব্যতীত অন্য কোন বিষয়ে তার রুচি থাকেনা। এই যে কৃষ্ণ প্রেম তা পঞ্চম পুরুষার্থ তার দ্বারা নিখিল রসামৃত সমুদ্র শ্রীকৃষ্ণের মাধুর্যরস আস্বাদন করা যায়। শ্রীকৃষ্ণ সম্বন্ধ, কৃষ্ণ ভক্তি, অভিধেয় এবং প্রেম প্রয়োজন। এই তিনটি বিষয় সমস্ত বেদান্ত সূত্রে প্রতিপন্ন হয়েছে।'

এইভাবে ব্রহ্ম সূত্রের মুখ্য অর্থ ব্যাখ্যা করে শ্রীচৈতন্য উপস্থিত সন্ন্যাসীমণ্ডলীকে চমৎকৃত করলেন। প্রকাশানন্দ স্তম্ভিত হয়ে মহাপ্রভুর দিকে একদৃষ্টে তাকিয়ে থেকে ভাবতে লাগলেন, 'ইনি কে? ইনিই কি সাক্ষাৎ নারায়ণ?' তিনি বুঝলেন এই নবীন সন্ন্যাসীটি সামান্য সন্ন্যাসী নন। তিনি যেমন পরম সুন্দর সর্বচিত্ত আকর্ষক এবং পরম ভক্ত, তেমনি তিনি পরম পণ্ডিত এবং সর্বশাস্ত্রদর্শী, বিচারে কেউ তাঁকে পরাস্ত করতে পারবেনা। প্রকাশানন্দের 'অহং' চূর্ণ বিচূর্ণ হয়ে গেল। দর্পহারী শ্রীগৌরহরি তাঁর জ্ঞান গর্ব চূর্ণ করে তাঁর দর্প হরণ করলেন।

প্রকাশানন্দ সহ দশসহস্র মায়াবাদী সন্ন্যাসী পূর্বে মহাপ্রভুর নিন্দা করায় মর্মাহত হয়ে করজোড়ে তাঁকে বললেন, "বেদময় মূর্তি তুমি সাক্ষাৎ নারায়ণ
ক্ষম অপরাধ পূর্বে যে কৈল নিন্দন।"

তাঁদের মন ফিরে গেল। মহাপ্রভুর নিকট হরিনাম মহামন্ত্র গ্রহণ করে কৃষ্ণ নাম কীর্তন করতে লাগলেন। মহাপ্রভু কাশীধামে মায়াবাদী সন্ন্যাসীদের এইভাবে বৈষ্ণবে পরিণত করলেন।

শ্রী-শিক্ষাষ্টক

মহাপ্রভু শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় বৈষ্ণব সাধনা বা ভক্তিধর্ম প্রচারের জন্য কোন ধর্মপুস্তক রচনা করেন নি। "আপনি আচরি ধর্ম-"জগৎকে শিক্ষা দিয়েছিলেন। আমাদের পরম সৌভাগ্য যে শ্রীমন্মহাপ্রভুর শ্রীমুখনিঃসৃত শ্রীশিক্ষাষ্টক নামে পরিচিত অষ্ট শ্লোক লিপিবদ্ধ রয়েছে। এ কৃষ্ণপ্রাপ্তির পথ নির্দেশিকা। এই শ্লোকগুলির বঙ্গানুবাদ ও আলোচনা নিম্নে প্রদত্ত হল।

১। চরম সাধন কি?

"চেতোদর্পণ-মার্জ্জনং ভব মহাদাবাগ্নি-নির্ব্বাপণং
শ্রেয়ঃ কৈরব চন্দ্রিকা-বিতরণং বিদ্যাবধূ জীবনম্।
আনন্দাম্বুধিবর্ধনং প্রতিপদং পূর্ণামৃতাস্বাদনং
সর্বাত্মস্বপণং পরং বিজয়তে শ্রীকৃষ্ণ সংকীর্তনম্ ॥

সংকীর্ত্তন হৈতে পাপ সংসার-নাশন।
চিত্ত শুদ্ধি সর্বভক্তি সাধন উদ্গম ॥
কৃষ্ণ প্রেমোদ্গম্-প্রেমামৃত-আস্বাদন।
কৃষ্ণপ্রাপ্তি-সেবামৃত-সমুদ্রে মজ্জন ॥ (চৈ. চ. ২০/১৩-১৪)

এই সংসার আপাত মধুর হলেও এ নিবিড় অরণ্যাভ্যন্তর দাবাগ্নি সদৃশ। দাবাগ্নি দ্বারা কাননস্থিত বৃক্ষরাজি মধ্যে মধ্যে বিনাশপ্রাপ্ত হয়। কৃষ্ণবিমুখ জন সংসারের জ্বালা দাবাগ্নির তাপের ন্যায় সর্বদা সহ্য করেন, কিন্তু কৃষ্ণের সম্যক কীর্ত্তন হলেই এই সংসারে থেকেও কৃষ্ণোন্মুখতা হেতু দাবজ্বালার দহন হতে নিষ্কৃতি লাভ কবেন।

শ্রীকৃষ্ণসঙ্কীর্তন জীবের মলিন চিত্ত দর্পণের মার্জনকারী। কৃষ্ণবিমুখতারূপ অন্য অভিলাষ দ্বারা বদ্ধজীবের চিত্ত সম্পূর্ণভাবে আবৃত হয়ে আছে। জীবের চিত্তদর্পণ হতে ঐ আবর্জনা পরিষ্কার করার প্রধান উপায় শ্রীকৃষ্ণ সংকীর্তন। জীবচিত্তদর্পণে জীব-স্বরূপ প্রতিফলিত হওয়ার বাধারূপে কৃষ্ণবিমুখতারূপ বাধা বা আবরণ বর্তমান। শ্রীকৃষ্ণের সংকীর্তন-ই তা উন্মোচন করতে সমর্থ। শ্রীকৃষ্ণনাম হৃদয়ে যত গীত হবে, তত হৃদয় পবিত্র হবে। চিত্ত ঈশ্বরমুখী হবে এবং পাওয়া যাবে সত্যের সন্ধান। তাই বত্রিশ অক্ষর সমন্বিত তারকব্রহ্ম নাম দেব, দানব ও মানবের কণ্ঠে গীত হয়ে আসছে। যে তারকব্রহ্ম নাম গোলোকে ছিল এবং যার সন্ধান দেবতাবৃন্দ ও যোগীঋষিগণ অবগত ছিলেন, সেই মধুর নাম শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু জীবের কল্যাণ ও সদ্গতির জন্য ভূলোকে আনয়ন করে "হরের্নামৈব কেবলম্' এই মহামন্ত্র দেশে প্রচার করেছিলেন।

'চণ্ডাল, চণ্ডাল নহে যদি কৃষ্ণ বলে।
বিপ্র নহে বিপ্র, যদি অসৎ পথে চলে ॥

"হরের্নাম পরং ধ্যেয়ং গেয়ং চ নিরন্তরম্।
কীর্ত্তনীয়ঞ্চ বহুধা নিবৃত্তির্বহুধেচ্ছতা।

অর্থাৎ যারা সর্বাধিক আনন্দ লাভে ইচ্ছুক তাদের পক্ষে একমাত্র হরিনাম নিরন্তর জপ, ধ্যান, গান ও নানাপ্রকারে কীর্তন করা একান্ত কর্ত্তব্য।

"হরিনাম পরোযস্তু বিষ্ণু পূজা পরায়ণঃ।
কৃষ্ণ মন্ত্রং যো গৃহ্নাতি বিষ্ণুং জানাতি বৈষ্ণব।'
সর্বপাপ প্রশমনং সর্বাপদ নাশনম্।

সর্বদুঃখ ক্ষয়করং হরি নামানুকীর্ত্তনম্। অর্থাৎ শ্রীহরি নামকীর্তনে সর্ব পাপ ধ্বংস করে, সর্ব বিঘ্ন বিনাশ করে এবং সর্ব দুঃখ দূর করে।

বিষ্ণু পুরাণে আছে 'কৃতে যদ্ধ্যায়তো বিষ্ণুং ত্রেতায়াং যজতে মখৈঃ
দ্বাপরে পরিচর্যায়াং কলৌ তদ্ধহরি কীর্তনাৎ ॥

অর্থাৎ যে বিষ্ণুকে সত্যযুগে ধ্যানযোগে, ত্রেতায় যজ্ঞ দ্বারা, দ্বাপরে পূজার্চনা মাধ্যমে লাভ হয়েছে, কলিযুগে তাঁকে নাম কীর্তনের দ্বারা লাভ করা যায়।

মহাশক্তি শ্রীহরিনাম নিরন্তর জপ করলে জীবের অন্তর ও বাহির শুদ্ধ হয়, ব্রহ্মাচর্য লাভ হয়, ইন্দ্রিয় সংযত হয় ও রিপু বশীভূত হয়। কলিতে নাম ও নামযজ্ঞ শ্রেষ্ঠ ॥

'নামৈব পরমোধর্ম নামৈব পরমন্তপঃ।
নামৈব পরমোবন্ধু নামৈব পরমাগতি' ॥

ভগবান শ্রীকৃষ্ণের মাহাত্ম্য শ্রবণ করলে তিনি মানবের চিত্তে প্রবিষ্ট হয়ে সূর্য যেমন অন্ধকার রাশি নাশ করে প্রবলবায়ু যেমন মেঘরাশি বিনষ্ট করে, সেইরূপ যাবতীয় দুঃখ দূরীভূত করে থাকে। তাই

"হরে কৃষ্ণ হরে কৃষ্ণ কৃষ্ণ কৃষ্ণ হরে হরে।
হরে রাম হরে রাম রাম রাম হরে হরে"
প্রভু কহে কহিলাঙ এই মহামন্ত্র।
ইহা গিয়া জপ সবে করিয়া নির্বন্ধ।
ইহা হৈতে সর্বসিদ্ধি হইবে সবার।
সর্বক্ষণ বল ইথে বিধি নাহি আর ॥

২। নাম সাধন সুলভ কেন?

'নাম্নামকারি বহুধা নিজ সর্বশক্তি—
স্তত্রার্পিতা নিয়মিতঃ স্মরণে ন কালঃ।
এতাদৃশী তব কৃপা ভগবন্মমাপি
দুর্দৈবমীদৃশমিহাজনি নানুরাগঃ ॥

অর্থাৎ—হে ভগবন্। তুমি স্বীয় নাম বহুধা (কৃষ্ণ গোবিন্দ ইত্যাদি) করে তাকে সর্বশক্তি প্রদান করেছ এবং এতদূর দয়া করেছ যে সে সকল স্মরণ করতে কালাকাল বিচার বা কোন নিয়মের প্রয়োজন নেই তথাপি আমার ও জগতের লোকের এমন দুর্দৈব যে এই প্রকার নামেও অনুরাগ জন্মায় না।

"অনেক লোকের বাঞ্ছা অনেক প্রকার
কৃপাতে করিল অনেক নামের প্রচার।
খাইতে শুইতে যথা তথা নাম লয়।
কাল দেশ, নিয়ম নাহি সর্বসিদ্ধি হয় ॥
সর্বশক্তি নামে দিলা করিয়া বিভাগ।
আমার দুর্দৈব নামে নাহি অনুরাগ।" (চৈ. চ.)

হরিনামের শক্তি ঃ—

'ধর্ম যজ্ঞ যোগ জ্ঞানে যত শক্তি ছিল।
সব হরিনামে কৃষ্ণ স্বয়ং সমর্পিল ॥'

৩। যেরূপে নাম নিলে প্রেম উৎপন্ন হয়—

তৃণাদপি সুনীচেন তরোরিব সহিষ্ণুনা।
অমানিনা মানদেন কীর্তনীয়ঃ সদা হরিঃ ॥—

যিনি তৃণাপেক্ষাও আপনাকে ক্ষুদ্র জ্ঞান করেন, যিনি তরুর ন্যায় সহিষ্ণু, নিজে মানশূন্য ভেবে অপর লোককে সম্মান প্রদর্শন করেন, তিনিই সদা হরিকীর্তনের অধিকারী।

"উত্তম হঞা আপনাকে মানে তৃণাধম।
দুই প্রকারে সহিষ্ণুতা করে বৃক্ষসম।
বৃক্ষ যেন কাটিলেহ কিছু না বোলয় ॥
শুকাঞা মৈলেহ কারে পানী না মাগয় ॥
যেই যে মাগয়ে, তারে দেয় আপন ধন।
ঘর্মবৃষ্টি সহে, আনের করয়ে রক্ষণ ॥
উত্তম হঞা বৈষ্ণব হবে নিরভিমান।
জীবে সম্মান দিবে জানি কৃষ্ণ-অধিষ্ঠান ॥

জীব স্বরূপতঃ কৃষ্ণদাস বলে তাঁর নিত্যকাল হরি কীর্তনই ধর্ম। যেরূপে শ্রীনাম গ্রহণ করলে নামাপরাধ হয়না, নামাভাস হয় না, তা জানাবার জন্য তৃণাদপি শ্লোকের অবতারণা। নাম ভজনানন্দী বৈষ্ণব তৃণাপেক্ষা সুনীচ, বৃক্ষ অপেক্ষা সহ্যগুণ সম্পন্ন, নিজ প্রতিষ্ঠা সমূহে উদাসীন এবং পরকে প্রতিষ্ঠাদানে উদ্‌গ্রীব। ইহজগতে তিনিই সর্বদা হরিনাম করবার যোগ্য ও সমর্থ। নামোচ্চারণকারী শুদ্ধ ভক্ত আপনাকে প্রাকৃত জগতে সর্বপ্রাণী-পদদলিত তৃণ হতেও নিম্নভাগে অবস্থিত ধারণা করেন। আপনাকে কখনই বৈষ্ণব বা গুরু জ্ঞান করেন না। তিনি নিজেকে জগতের শিষ্য ও সর্বাপেক্ষা হীন জানেন। প্রত্যেক পরমাণু এবং প্রত্যেক অনুচিৎ জীবে কৃষ্ণের অধিষ্ঠান জেনে কোন বস্তুকে নিজাপেক্ষা ক্ষুদ্র জ্ঞান করেন না। নামোচ্চারণকারী জগতে কারও নিকট কিছুরই প্রার্থী নন। অপরে তাঁর হিংসা করলে তিনি কখনও প্রতিহিংসা করেন না। উপরন্তু হিংসাকারীর মঙ্গল প্রার্থনা করেন।

৪। সাধকের কামনা কি?

ন ধনং ন জনং ন সুন্দরীং কবিতাং বা জগদীশ কাময়ে।
মম জন্মনি জন্মনীশ্বরে ভবতাদ্ভক্তিরহৈতুকী ত্বয়ি ॥

হে জগদীশ! আমি ধনজন বা সুন্দরী যুবতী অথবা সুন্দরী কবিতা কামনা কবিনা। কেবল জন্মে জন্মে যেন তোমার প্রতি অহেতুকী ভক্তি থাকে এই আমার প্রার্থনা।

"ধনজন নাহি মাগো-কবিতা সুন্দরী
শুদ্ধভক্তি দেহ মোরে, কৃষ্ণ কৃপা করি"

হে জগদীশ, আমি ধন জন ও সুন্দরী কবিতা কামনা করিনা, আমার জন্ম জন্মান্তরে সেব্য তুমি, তোমাতেই যেন অহৈতুকী ভক্তি থাকে। সুন্দরী কবিতা অর্থে বেদকথিত ধর্ম, ধন শব্দে অর্থ এবং জন শব্দে কলত্রাদি কামনার বিষয় উদ্দিষ্ট হয়েছে। ভক্তের নিকট স্বর্গ, ব্রহ্মালোক, সার্বভৌম পদ, রসাধিপত্য ও যোগের অষ্ট বা অষ্টাদশসিদ্ধির প্রতি তুচ্ছতা লক্ষণীয়। তিনি শুধু শুদ্ধ অহৈতুকী ভক্তির জন্য লালায়িত।

"অতএব চৌদ্দলোকে দুর্লভ যে ধন।
সেই ভক্তি জন্য যত্ন করে বুধগণ ॥

৫। সাধকের প্রার্থনা

অয়ি নন্দতনুজ কিঙ্করং
পতিতং মাং বিষমে ভবাম্বুধৌ।

কৃপয়া তব পাদপঙ্কজ

স্থিতধূলীসদৃশং বিচিন্তয় ॥

ওহে নন্দনন্দন! আমি তোমার নিত্য কিঙ্কর হয়েও স্বকর্মবিপাকে বিষম ভবসমুদ্রে পড়েছি, তুমি কৃপা করে তোমার পাদপদ্মস্থিত-ধূলির সদৃশ করে আমাকে চিন্তা কর।

তোমার নিত্যদাস মুঞি তোমা পাশরিয়া।

পড়িয়াছোঁ ভবার্ণবে মায়াবদ্ধ হৈয়া ॥

কৃপা করি কর মোরে পদধূলি সম।

তোমার সেবক করোঁ তোমার সেবন ॥

হে হরে ! যাঁরা তোমার পাদমূল আশ্রয় করেছেন, আমি কি আবার তোমার সেই দাস গণেরও দাস হতে পারব? আমার মন যেন প্রাণপতি তোমার গুণাবলী স্মরণ করুক, বাক্য যেন তোমারই গুণকীর্তন এবং শরীরও তোমার সেবাকার্য সম্পাদন করতে থাকুক। (জীবের সেব্যবস্তু নন্দনন্দন, তারমধ্যে নিত্য স্বরূপে কৃষ্ণদাস্য বর্তমান। সেই কৃষ্ণদাস্যে উদাসীন হওয়ায় জীব দুষ্কর ভয়ঙ্কর সংসার সমুদ্রে ডুবে যাচ্ছে। এক্ষণে ভগবৎ কৃপাই তার একমাত্র অবলম্বন। কৃষ্ণ কৃপা করে স্বীয় পাদপদ্মের ধূলিসদৃশ বলে স্বীকার করলেই জীবের আচ্ছাদিত নিত্য বৃত্তি পুনঃপ্রকাশিত হয়)

৬। **সিদ্ধির বাহ্য লক্ষণ**

"নয়নং গলদশ্রুধারয়া

বদনং গদ্‌গদরুদ্ধয়া গিরা।

পুলকৈর্নিচিতং বপুঃ কদা।

তব নাম গ্রহণে ভবিষ্যতি ॥"

হেনাথ, তোমার নামগ্রহণে কবে আমার নয়নযুগল গলদশ্রুধারায় শোভিত হবে। বাক্য নিঃসরণ সময়ে বদনে গদ্‌গদ-স্বর বের হবে এবং আমার সমস্ত শরীর পুলকাঞ্চিত হবে?

"প্রেমধন বিনা ব্যর্থ দরিদ্র জীবন।

'দাস করি' বেতন মোর দেহ প্রেমধন ॥ (চৈ. চ. ২০/৩৭)

এইভাবে নাম করতে করতে শ্রীহরির সাক্ষাৎকার লাভ হয়। তখন,

"ভাবোদয়ে কভু কাঁদে, কৃষ্ণ চিন্তা ফলে।

হাসে আনন্দিত হয়, অলৌকিক বলে ॥

নাচে গায়, কৃষ্ণ আলোচনে সুখ পায়।

লীলা অনুভবে হয়, তুষ্ণীভূত প্রায় ॥

ভাগবত পুরুষগণ সাধনভক্তিসঞ্জাত প্রেমভক্তি বলে সর্বপাপবিনাশন শ্রীহরিকে স্মরণ করেন এবং পুলকিত শরীরে অবস্থান করেন।

৭। **সিদ্ধির অন্তর্লক্ষণ :—**

'যুগায়িতং নিমেষেণ চক্ষুষা প্রাবৃষায়িতম্।

শূন্যায়িতং জগৎ সর্বং গোবিন্দ বিরহেন মে ॥"—

হে গোবিন্দ! তোমার অদর্শনে আমার নিমেষসকল যুগবৎ বোধ হচ্ছে। চক্ষু হতে বর্ষার ন্যায় জল পড়ছে, সমস্ত জগৎ শূন্যপ্রায় বোধ হচ্ছে।

"উদ্বেগে দিবস না যায়, ক্ষণ হৈল যুগসম।

বর্ষার মেঘপ্রায় অশ্রু বর্ষে নয়ন ॥

গোবিন্দ বিরহে শূন্য হইল ত্রিভুবন।

তুষানলে পোড়ে, যেন না যায় জীবন ॥ (চ.চ. ২০/৪০-৪২)

কৃষ্ণবিরহী রাধার প্রলাপ স্মর্তব্য। (কৃষ্ণ কর্ণামৃত ৪১ শ্লোকের বঙ্গার্থ)।

না হেরিয়ে তব মুখ হৃদয়ে দারুণ দুঃখ,
দীনবন্ধো ! করুণা সাগর!
এ অধন্য দিবানিশি, কেমনে কাটাবে দাসী,
উপায় বলহ অতঃপর ॥

এ প্রসঙ্গে শ্রীমতী রাধার ভাবোন্মাদও স্মরণীয় ॥

'জাগর উদ্বেগ চিন্তা, তানবাঙ্গ মলিনতা,
প্রলাপ উন্মাদ আর ব্যাধি।
মোহমৃত্যু দশাদশ তাহে রাধা সুবিবশ
পাইল দুঃখ কুলের অবধি ॥

৮। সিদ্ধির নিষ্ঠা

'আশ্লিষ্য বা পাদরতাং পিনষ্টু মা
মদর্শনান্মর্মহতাং করোতু বা।
যথা তথা বা বিদধাতু লম্পটো
যৎ প্রাণনাথস্তু স এব না পরঃ ॥"—এই পাদরতা দাসীকে কৃষ্ণ আলিঙ্গনপূর্বক পেষণ করুন, অথবা অদর্শন দ্বারা মর্মাহতই করুন, তিনি লম্পট পুরুষ, আমার প্রতি যেরূপই বিধান করুন না কেন, তিনি অপর কেউ নন, আমারই প্রাণনাথ।

আমি কৃষ্ণপদ দাসী তিঁহো রস সুখরাশি
আলিঙ্গিয়া করে আত্মসাৎ।
কিংবা না দেন দরশন জারে মোর তনুমন
তবু তিঁহো মোর প্রাণনাথ ॥
সখি হে! শুন মোর মনের নিশ্চয়।
কিবা অনুরাগ করে কিবা দুঃখ দেন মোরে,
মোর প্রাণেশ কৃষ্ণ, অন্য নয় ॥ (চৈ. চ.)

শ্রীকৃষ্ণ স্বতন্ত্র পরম পুরুষ। তাঁর যা ইচ্ছা তারই অনুগমন আমার একমাত্র ধর্ম। আমি স্বেচ্ছাচারিণী নই যে তাঁর অভিলাষের প্রতিকূলে আমার সেবাপ্রবৃত্তি দেখাতে পারি।

শ্রীচৈতন্যের তিরোভাব

শ্রীচৈতন্য রাধাভাবদ্যুতি কৃষ্ণস্বরূপ। তিনি নরদেহ ধারণ করে তাঁর পার্থিব লীলা প্রকট করেছিলেন, সেজন্য তাঁর প্রাকৃতদেহ তিরোধান সম্পর্কে কৌতূহল হওয়া স্বাভাবিক। মহাপ্রভু ১৫৩৩ খৃষ্টাব্দে ইহজগৎ হতে বিদায় নিয়েছিলেন, কিন্তু এই তিরোধান কিভাবে হয়েছিল তা এখনও রহস্যাবৃত। শ্রীচৈতন্যের তিরোধান সম্পর্কে যে যে গ্রন্থে উল্লেখ আছে সেগুলি হ'ল বাংলাভাষায় কৃষ্ণদাস কবিরাজের, (১) শ্রীচৈতন্য চরিতামৃত (২) লোচন দাসের চৈতন্য মঙ্গল (৩) জয়ানন্দের চৈতন্যমঙ্গল (৪) ঈশান নাগরের অদ্বৈত প্রকাশ (৫) নরহরি চক্রবর্তীর ভক্তিরত্নাকর প্রভৃতি। এছাড়া ওড়িয়া গ্রন্থাবলীতেও কিছু কিছু উল্লেখ আছে।

ওড়িশার চৈতন্যভক্তগণের অন্যতম পঞ্চসখাগোষ্ঠীভুক্ত অচ্যুতানন্দ তাঁর শূন্যসংহিতা গ্রন্থে লিখেছেন

"চৈতন্য ঠাকুর মহানৃত্যকরে রাধা রাধা ধ্বনি বলে।
জগন্নাথ মহাপ্রভু শ্রীঅঙ্গরে বিদ্যুৎ প্রায় মিলি গলে"

সপ্তদশ শতাব্দীর ওড়িয়া লেখক দিবাকর দাসও অনুরূপ লিখেছেন। "এ মন্ত্র কহি শ্রীচৈতন্য শ্রীজগন্নাথ অঙ্গেলীন"।।

অপর একজন ওড়িয়া কবি সদানন্দ কবিসূর্য তাঁর প্রেম তরঙ্গিণী গ্রন্থে মহাপ্রভু চৈতন্যের টোটা গোপীনাথে লীন হওয়ার কথা বলেছেন। এছাড়া আরও ওড়িয়া কবি এ সম্বন্ধে কিছু কিছু আলোকপাত করেছেন। কিন্তু কোনটাই সন্দেহ-মুক্ত নয়।

বিখ্যাত বৈষ্ণব দার্শনিক কবি কৃষ্ণদাস কবিরাজ মহাপ্রভুর তিরোধান সম্পর্কে শুধু 'চৌদ্দশত পঞ্চান্নে হৈলা অন্তর্ধান লিখেই ক্ষান্ত হয়েছেন। কারণ অজানা। কেউ কেউ বলেন অত্যন্ত বিরহ ব্যথার জন্যই এ নীরবতা।

চৈতন্যদেবের তিরোধান সম্পর্কে লোচনদাস বলছেন—

আষাঢ় মাসের তিথি সপ্তমী দিবসে।
নিবেদন করে প্রভু ছাড়িয়া নিঃশ্বাসে ॥
তৃতীয় প্রহর বেলা ববিবার দিনে।
জগন্নাথে লীন প্রভু হইলা আপনে ॥

আষাঢ় মাসের সপ্তমী তিথিতে রবিবারে তৃতীয় প্রহরে মহাপ্রভু জগন্নাথ কলেবরে লীন হলেন। জয়ানন্দ মহাপ্রভুর অন্তর্ধান সম্পর্কে লৌকিক ও অলৌকিক ঘটনার সমাবেশ করেছেন। তিনি লিখেছেন—

'আষাঢ় বঞ্চিত রথ বিজয়া নাচিতে।
ইটাল বাজিল বাম পাএ আচম্বিতে ॥
চরণে বেদনা বড় ষষ্ঠীর দিবসে।
সেই লক্ষ্যে টোটায় শয়ন অবশেষে ॥

আষাঢ় মাসে রথযাত্রার দিন রথের অগ্রে নাচতে নাচতে চৈতন্য দেবের বাম পায়ে ইঁটের টুকরো বিদ্ধ হয়। যষ্ঠীর দিন পায়েব যন্ত্রণা খুব বেড়ে গেল। টোটো গোপীনাথ মন্দিরে আশ্রয় নিলেন।

গদাধবকে বললেন, 'কালি দশ দণ্ড রাত্রে চলিব সর্বথা।' অর্থাৎ সপ্তমীর দিন রাত্রি দশদণ্ডের সময় দেহরক্ষা করবেন। হলও তাই। পরদিন রাত্রে মর্ত্যদেহ ত্যাগ করে চলে গেলেন। তখন "বথ আন বথ আন ডাকেন দেবগণ।
গড়ুর ধ্বজ রথে করি আরোহণ ॥
মায়াশরীর তথা রহিল যে পড়ি।
চৈতন্য বৈকুণ্ঠে গেলা জম্বুদ্বীপ ছাড়ি।

এখানে দেখা যায়, লোচনদাস বলেছেন গুণ্ডিচাবাড়িতে চৈতন্যদেব জগন্নাথ দেহে লীন হয়েছেন আর জয়ানন্দের মতে টোটা গোপীনাথের মন্দিরে চৈতন্য দেহরক্ষা করেছিলেন।

মহাপ্রভুর নবদ্বীপের ব্যক্তিগত পরিচারক ঈশান নাগর তাঁর অদ্বৈত প্রকাশ গ্রন্থে লিখেছেন— 'একদিন মহাপ্রভু জগন্নাথ দর্শন করে 'হা নাথ' বলে মন্দিরে প্রবেশ করামাত্র আপনা আপনি দরজা বন্ধ হয়ে গেল। ভক্তেরা অতিশয় ভয়ব্যাকুল হয়ে পড়লেন। কিছুক্ষণ পরে দরজা আপনি খুলে গেল। কিন্তু তখন মহাপ্রভু আর ইহ জগতে নাই। জগন্নাথে লীন হয়ে গেছেন। ভক্তগণ শোকাকুল হয়ে কেঁদে উঠলেন। বিষাদের ছায়া এল নেমে।'

কোন কোন বৈষ্ণব কবি লিখেছেন, প্রেমোন্মত্ত হয়ে মহাপ্রভু সমুদ্রকে যমুনা ভেবে—

"যমুনার ভ্রমে প্রভু ধাইয়া চলিলা।
অলক্ষিতে যাই সিন্ধু জলে ঝাঁপ দিলা।
পড়িতেই হৈল মূর্চ্ছা, কিছুই না জানে।
কভু ডুবায় কভু ভাসায় তরঙ্গের গণে ॥

এইভাবে তাঁর নরলীলার সমাপ্তি ঘটল।

তদানীন্তন রাজনীতি বিশ্লেষণ করে কেউ কেউ গুপ্ত ঘাতকের হস্তে মহাপ্রভুর দেহপাত হওয়ার কল্পনাও করে থাকেন। মহাপ্রভুর তিরোধান ব্যাপারটি আজও রহস্য অবগুণ্ঠনে ঢাকা।

গৌড়ীয় বৈষ্ণব ধর্ম

মহাপ্রভু শ্রীচৈতন্য বিশ্বমানবতার পরম সুহৃৎ। তাঁর আবির্ভাবে নিপীড়িতজনের শৃঙ্খল খান খান হয়ে ছিঁড়ে পড়ল। তিনি ভক্তিধর্মকে পুঁথির পাতায় আটকে না রেখে "আপনি আচরি ধর্ম' সকলের মধ্যে প্রচার করলেন। নিপীড়িতজন মুক্তির নিঃশ্বাস ছেড়ে বাঁচল।

ভক্তির সাধনার পথ সার্বজনীন। ভাগবত পুরাণে চণ্ডালেরও ভক্তিলাভের পথ স্বীকৃত। কিন্তু ঐ পর্যন্তই। আটক জলাভূমির মত আবদ্ধ। সম্যকভাবে বহিঃপ্রকাশ ঘটে নি। ব্রাহ্মণ্য স্মৃতি শাসনে ধর্মাচরণের অধিকার অঙ্গাঙ্গিভাবে জড়িত ছিল। চৈতন্যদেবের ভক্তিধর্মে সামাজিক ভেদ বিচার নাই। জাতিধর্ম নির্বিশেষে সকলেই ভক্তিসাধনের উপযুক্ত পাত্র, ভক্তিলাভের অধিকারও সকলের সমান। এই ভক্তিসাধনা ক্ষুদ্র স্রোতস্বিনীর মত আচার্য মাধবেন্দ্র পুরীর মধ্যে প্রবাহিত ছিল। ঈশ্বর পুরীর মধ্য দিয়ে সেই ধারা মহাপ্রভুর মধ্যে প্রবেশ করে সমুদ্রের মত দিগ্বিদিক ভাসিয়ে দিল। এসম্বন্ধে কৃষ্ণদাস কবিরাজের উক্তি—

জয় শ্রীমাধব পুরী কৃষ্ণ প্রেমপুর।
ভক্তি কল্পতরু তেঁহো প্রথম অঙ্কুর ॥'

বৈদিক সাধনা অতি কঠোর। এই নিমিত্ত তন্ত্র কলিতে বিধান দিয়েছে 'জপাৎ সিদ্ধিঃ'। কলিযুগে দুর্বলতর জীবের পক্ষে তাও অত্যন্ত কঠিন। মহাপ্রভু দেখলেন, কলির জীব জপ করতে অক্ষম, তাই দয়াল ঠাকুর অতি গুহ্যতর তত্ত্ব জীবের হিতার্থে প্রচার করলেন। তিনি বললেন, নামই সর্বস্ব, নামই ব্রহ্ম, নাম ও ব্রহ্ম অভেদ জ্ঞান কর। ব্রাহ্মণ চণ্ডাল সকলে মিলে প্রেমানন্দে নাম কর তাহলেই ভবসাগর গোষ্পদের ন্যায় পার হয়ে যাবে। তিনি আরও বললেন 'জীবে দয়া রাখো, কোটি কোটি তপস্যার ফল প্রাপ্ত হয়ে চিত্তশুদ্ধি লাভ করবে, মানব জনম সার্থক হবে।'

শ্রীচৈতন্যদেব নিজের জীবনে ঈশ্বরের যে লীলা বৈচিত্র্য অনুভব করেছিলেন, ভক্ত বৈষ্ণবগণ সেখান থেকেই বৈষ্ণবধর্মের নিগূঢ় তাৎপর্য উপলব্ধি করেন। তিনি একই দেহে রাধা ও কৃষ্ণের যুগল বিগ্রহ ছিলেন এবং রাধাভাবে ভাবিত হয়েই কৃষ্ণপ্রেমের আস্বাদন করতেন। তাঁর মধ্যে অদ্বৈতবাদ ও দ্বৈতবাদ অঙ্গাঙ্গিভাবে মিশে গিয়েছিল। সেটা অবলম্বন করেই গৌড়ীয় বৈষ্ণব ধর্মের ভিত্তি সুপ্রতিষ্ঠিত হয়। গৌড়ীয় বৈষ্ণবগণ রাধাকৃষ্ণের যুগল মূর্তির উপাসক।

শ্রীচৈতন্য প্রয়াগে রূপ গোস্বামীকে এবং কাশীতে সনাতন গোস্বামীকে এই রাধাকৃষ্ণ তত্ত্বের শিক্ষা দিয়েছিলেন। রূপ সনাতন ও তাঁদের ভ্রাতুষ্পুত্র শ্রীজীব গোস্বামী গৌড়ীয় বৈষ্ণবধর্মকে একটি দার্শনিক ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত করেন।

গৌড়ীয় বৈষ্ণবধর্মের মূল নিহিত আছে ভাগবত পুরাণে। এছাড়া ব্রহ্মসংহিতা ও কৃষ্ণ কর্ণামৃত এ ধারাকে পরিপুষ্ট করেছে। রূপ গোস্বামী রচিত ভক্তিরসামৃত সিন্ধু, উজ্জ্বল নীলমণি, সনাতন গোস্বামীর ভাগবতের টীকাভাষ্য, জীব গোস্বামীর গোপাল চম্পু, ষট্‌সন্দর্ভ, গোপাল ভট্ট রচিত শ্রীহরিভক্তি বিলাস ও কৃষ্ণদাস কবিরাজের শ্রীগোবিন্দলীলামৃত, ও শ্রীচৈতন্য চরিতামৃত বৈষ্ণব দর্শনের ব্যাখ্যা সমৃদ্ধ গ্রন্থ। উপরোক্ত গ্রন্থগুলির মধ্যে শ্রচৈতন্য

চরিতামৃত বাংলায় ও অপরগুলি সংস্কৃতে লিখিত। মহাপ্রভুর জীবনই বাণী। একমাত্র শিক্ষাষ্টক ছাড়া তাঁর লেখা আর কিছু পাওয়া যায় নি।

কলিযুগে রাধার ভাবকান্তি অঙ্গে নিয়ে নিজের রস আস্বাদন করতেই শ্রীকৃষ্ণের গৌরাঙ্গ সুন্দর রূপে আবির্ভাব। রাধা স্বরূপতঃ কৃষ্ণ প্রেম। কৃষ্ণের হ্লাদিনী শক্তি। রাধা ও কৃষ্ণ ভিন্ন ভিন্ন সত্তা নয়, লীলার জন্য তাঁরা ভিন্ন ভিন্ন রূপে আবির্ভূত। রাধা ও কৃষ্ণ শ্রীচৈতন্যের মধ্যে একাকার হয়ে গেছে। দ্বাপরের কৃষ্ণলীলায় শ্রীকৃষ্ণের তিনটি স্বাদ অপূর্ণ রয়ে গিয়েছিল। সে তিনটি সাধ হল—(১) রাধা প্রেমের মহিমা কতখানি তা জানা, (২) রাধা প্রেমের স্পর্শে নিজের মাধুর্য কিরূপ তা উপলব্ধি করা এবং (৩) তাঁর মাধুর্যের চমৎকারিতা অনুভব করে রাধার আনন্দ কতখানি, তা জানা। শ্রীকৃষ্ণই রাধার ভাবযুক্ত হয়ে উক্ত তিনটি সাধ পূরণের জন্য শ্রীচৈতন্যরূপে আবির্ভূত হন।

গৌড়ীয় বৈষ্ণবমতে ব্রহ্ম অনাদি অনন্ত পুরুষ। তিনি অপ্রাকৃত ক্ষমতার অধিকারী। তিনিই কৃষ্ণ। সৎচিৎ আনন্দময় পুরুষ। শ্রীচৈতন্যদেবের প্রবর্তিত গৌড়ীয় বৈষ্ণবধর্ম যে দার্শনিক ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত তার নাম অচিন্ত্যভেদাভেদ তত্ত্ব। শ্রীজীব গোস্বামী রচিত ষট্‌সন্দর্ভ গ্রন্থের ভাগবত সন্দর্ভের ব্যাখ্যায় এই তত্ত্ব প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। এই দার্শনিক তত্ত্বের আলোচনা করেছেন কৃষ্ণদাস কবিরাজ। তৎপরে বিশ্বনাথ চক্রবর্তী ও বলদেব বিদ্যাভূষণ।

অদ্বৈতদর্শনে বলা হয়েছে একমাত্র ব্রহ্মই সত্য, জগৎ মিথ্যা। ব্রহ্মশব্দের অর্থ সুবৃহৎ, বিরাট ও অনন্ত। বেদান্ত দর্শনে ব্রহ্মকে অসীম, অনন্ত, নিরাকার, নিঃশক্তি, নির্গুণ ও নির্বিশেষ বলা হয়েছে। কিন্তু গৌড়ীয় বৈষ্ণব মতে ব্রহ্ম ও জীবের মধ্যে যেমন ভেদ আছে, তেমনি অভেদও আছে। ব্রহ্ম সর্বশক্তিমান ও সর্বগুণসম্পন্ন। স্বয়ং কৃষ্ণই সেই ব্রহ্ম। তিনি লীলার জন্য সৃষ্টি করেন। আপাতঃদৃষ্টিতে মনে হয় সৃষ্টি তার থেকে পৃথক, কিন্তু প্রকৃত পক্ষে সৃষ্টি তাঁরই অন্তর্ভুক্ত। জীবজগৎ পৃথক হলেও ব্রহ্মসাপেক্ষ। জীব ও ব্রহ্ম একেবারে এক অথবা দুটোই পৃথক সত্তা তা নয়। এদের ভেদও যেমন অচিন্ত্য, অভেদও তেমনি অচিন্ত্য। বস্তুতঃ, গৌড়ীয় বৈষ্ণবগণ ভেদবাদী নন, অভেদবাদীও নন, তাঁরা ভেদাভেদ বাদী। ব্রহ্মতত্ত্বের এই ব্যাখ্যার নাম অচিন্ত্যভেদাভেদ তত্ত্ব। পরব্রহ্মের শক্তিরূপে জীবজগতকে পরব্রহ্ম থেকে পৃথক করা যায় না। শক্তিকে বাদ দিয়ে শক্তিমানকে, কিংবা শক্তিমানকে বাদ দিয়ে শক্তিকে পরমবস্তু বলা যায় না। উভয়ের মিলিত স্বরূপই বস্তুর রূপ। দুয়ের মধ্যে অবিচ্ছেদ্য সম্পর্ক বিদ্যমান।

গৌড়ীয় বৈষ্ণবগণ পরব্রহ্মের সঙ্গে তার শক্তির যুগপৎ ভেদ ও অভেদ স্বীকার করেন। এই ভেদাভেদ সম্পর্ক অচিন্ত্যজ্ঞানগোচর। বুদ্ধির দ্বারা এর ব্যাখ্যা চলে না। গৌড়ীয় বৈষ্ণব মতে পরব্রহ্ম অর্থাৎ শ্রীকৃষ্ণের সঙ্গে জীব ও জগতের সম্পর্ক অচিন্ত্যভেদাভেদ সম্পর্ক। বিশ্বে ব্রহ্ম ও জীবজগতের নিত্যলীলা আবহমান চলছে এবং ভবিষ্যতেও চলবে। চৈতন্য দেব এই তত্ত্বেরই মূর্তবিগ্রহ।

গৌর পারম্যবাদ

চৈতন্যদেবের তিরোধানের পর বৈষ্ণব সম্প্রদায় অনেকগুলি উপসম্প্রদায়ে বিভক্ত হয়ে গিয়েছিল। এদের মধ্যে নবদ্বীপ-গৌড়সম্প্রদায় ও বৃন্দাবনের সম্প্রদায় প্রধান। নবদ্বীপ-গৌড়সম্প্রদায়ে ছিলেন মুরারী, কবি কর্ণপুর, বৃন্দাবন দাস, জয়ানন্দ ও গৌরাঙ্গ বিষয়ক পদকারগণ আর বৃন্দাবন সম্প্রদায়ে রূপ গোস্বামী, কৃষ্ণদাস কবিরাজ, নরোত্তম, শ্রীনিবাস প্রভৃতি। এই দুই দলের মধ্যে তত্ত্ব নিয়ে অল্পবিস্তর মতভেদ ছিল।

কাঁচড়াপাড়ার শিবানন্দ সেন, নবদ্বীপের মুরারী গুপ্ত ও শ্রীখণ্ডের নরহরি সরকার বাঙলাদেশে সর্বপ্রথম 'গৌরপারম্যবাদ সৃষ্টি করেছিলেন। এই মতে কৃষ্ণকে উহ্য করে গৌরাঙ্গকেই পরমতত্ত্বরূপে গ্রহণ করা হয়েছে। গৌরপারম্যবাদিগণ চৈতন্যদেবকে শুধু পরমতত্ত্বরূপে গ্রহণ করেন নি, গোপালমন্ত্র ছেড়ে গৌরমন্ত্রকে কৌলিক আচার হিসাবে মান্য করেছিলেন। এবং চৈতন্যের নবদ্বীপলীলার কিশোর মূর্তিটির অধিকতর অনুরাগী ছিলেন। অদ্বৈত আচার্য, নিত্যানন্দ প্রমুখ বিশিষ্ট ভক্তগণও মহাপ্রভুকে অবতার না ভেবে তাঁকে স্বয়ং কৃষ্ণরূপে উপাসনা করতেন। এঁরাই হলেন গৌরপারম্যবাদী।

ব্রজধামের গোস্বামীরা গৌরপারম্যবাদ বা গৌর নাগর ভাব কোনটারই সমর্থক ছিলেন না। তাঁদের একমাত্র উপাস্য ব্রজেন্দ্রনন্দন শ্রীকৃষ্ণ। অবশ্য শচীনন্দকেও তাঁরা হৃদয়কন্দরে ভক্তি করতেন।

গৌরনাগরবাদ

চৈতন্যদেব অর্থাৎ গৌরাঙ্গ স্বয়ং শ্রীকৃষ্ণ-এইমত অনুসারে তাঁকে শ্রীকৃষ্ণের মত নাগর অর্থাৎ পরমপুরুষ মনে করা হত। গৌরাঙ্গরূপ নাগরকে সুখী করবার জন্য তাঁর প্রতি প্রেম বশতঃ কান্তাভাবে ভজন করবার যে প্রণালী চালু হয় তার নাম গৌরনাগরবাদ। শ্রীখণ্ড ছিল গৌর-নাগরবাদের সবচেয়ে বড় ঘাঁটি। এখানে গৌরনাগরবাদের মুখ্য প্রবক্তা নরহরি সরকার ঠাকুর। মূলকথা গৌরনাগরবাদিগণ গৌরাঙ্গকে শৃঙ্গার রসের নায়ক আর নিজেদের বৃন্দাবনের গোপী মনে করতেন। গৌরনাগরভাবে আদিরস প্রাধান্য পাওয়ায় ক্রমে ক্রমে এতে রুচিহীনতা প্রবেশ করে। নরহরি সরকার ও তাঁর শিষ্য লোচনদাসের কবিতাগুলি এর নিদর্শন ঃ—

> এক নাগরী বলে দিদি নাইতে যখন যাই।
> ঘোমটা খুলে বদন তুলে দেখেছিলাম ভাই ॥
> রূপ দেখে চমকে উঠে ঘরকে এলাম ধেয়ে
> নয়ন দুটি বাঁধা রইলো, গৌর পানে চেয়ে ॥

আদিরসের বাড়াবাড়ি বৈষ্ণবীয় দর্শনকে কলুষিত করে অধঃপতনের দিকে নিয়ে যায়। আদিরসের আর একটি দৃষ্টান্ত ঃ—

> 'যখন আমি মাঝ নিশিতে ঘুমে হয়েছি ভোরা
> তখন আমি দেখছি যেন বুকের উপর গোরা ॥

তৃতীয় অধ্যায়

ভারতীয় সাহিত্যে শ্রীচৈতন্য

মহাপ্রভুর জীবনকাল ১৪৮৬ খৃষ্টাব্দ হতে ১৫৩৩ খৃষ্টাব্দ পর্যন্ত—৪৮ বৎসর। তন্মধ্যে নবদ্বীপ-লীলা ২৪ বৎসর বয়স পর্যন্ত আর বাকি ২৪ বৎসর নীলাচল লীলা। এই উত্তরার্ধ লীলার মধ্যে ছয় বৎসর গমনাগমনে কেটেছে অবশিষ্ট আঠার বৎসর অর্থাৎ ১৫১৫ খৃষ্টাব্দ হতে তিরোধান দিবস পর্যন্ত তিনি নীলাচলেই ছিলেন। মহাপ্রভু প্রায় সমগ্রভারত পর্যটন করে ভক্তিধর্ম প্রচার করেন। এই প্রচার অবশ্য বক্তৃতা বা উপদেশবাণী দ্বারা নয়, তাঁর অলৌকিক চরিত্র প্রভাবেই তাঁর আচরিত প্রেমধর্ম লোকে সানন্দে বরণ করে ধন্য হয়েছিল। ভ্রমণকালে তিনি যে সমস্ত দেশে গিয়েছিলেন স্বভাবতঃ তাঁর অসামান্য প্রভাব সেদেশের সাহিত্যে প্রতিফলিত হয়েছে।

অসমীয়া সাহিত্যে : আসামের মহাপুরুষ শঙ্করদেব চৈতন্যদেবের সমসাময়িক। গৌড়ীয় বৈষ্ণব ধর্মের সঙ্গে শঙ্করদেবের ধর্মমতের অনেক সাদৃশ্য আছে। উভয় ধর্মমতই শ্রীমদ্ভাগবতের প্রতি অগাধ শ্রদ্ধাশীল। উভয় ধর্মমতই নবধাভক্তির সাধনপন্থী। শ্রীচৈতন্য ও শঙ্করদেব উভয়েই কীর্তনের মাধ্যমে ধর্ম প্রচার করেছিলেন এবং উভয়েরই উপাস্য শ্রীকৃষ্ণ।

শঙ্কর দেবের দুই শিষ্য—দামোদর ও মাধবদেব। এঁদের মধ্যে দামোদর ছিলেন ব্রাহ্মণ। তাই তাঁর শিষ্যদের বামুনিয়া বা দামোদরিয়া সম্প্রদায়ভুক্ত বলা হত আর কায়স্থ মাধবদেবের শিষ্যগণ মহাপুরুষীয়া সম্প্রদায়ভুক্ত বলে পরিচিত। দামোদরীয়া সম্প্রদায়ভুক্ত রামকান্ত দ্বিজ ছিলেন গ্রন্থকার। তাঁর 'গুরুলীলা' গ্রন্থে শ্রীচৈতন্যদেবের সঙ্গে শঙ্করদেবের মিলনের কথা আছে। ঐ সম্প্রদায়ের কৃষ্ণভাবতী 'সন্ত নির্ণয়' গ্রন্থে শ্রীচৈতন্য সম্বন্ধে অনেক কথা লিখেছেন। মহাপুরুষীয়া সম্প্রদায়ের রামচরণ ঠাকুর। রামচরণের পুত্র দৈত্যারি ঠাকুর এবং শঙ্কর শিষ্য চক্রপাণির পৌত্র ভূষণদ্বিজ কবি রচিত একই নামধেয় 'শঙ্কর চরিত' গ্রন্থে শ্রীচৈতন্যের আসাম ভ্রমণের কাহিনী বিবৃত আছে।

উপরোক্ত দামোদরিয়াগণ চৈতন্যকে অবতার বলে স্বীকার করেন। শঙ্করদেবও চৈতন্যদেবকে পরম শ্রদ্ধা করতেন। এ সম্বন্ধে মহাপুরুষীয় সম্প্রদায়ভুক্ত দৈত্যারি ঠাকুর লিখেছেন—

"প্রভাতে উঠিয়া নৃত্যে গমন করন্ত। / কৃষ্ণ-চৈতন্যর গৈয়া থানকপাইলন্ত ॥
পথত চলন্তে শিক্ষা দিলন্ত লোকক। / না করিবা কেহোঁ নমস্কার চৈতন্যক ॥
যিছো জনে নমস্কার করে চৈতন্যক। / উলটায়া তেহোঁ প্রণামন্ত সিজনক ॥
মনে নমস্কার তাংক করিবা এতেকে। / এহি বুলি শিখাইলন্ত লোক সমস্তকে ॥
নীলাচল থেকে অদ্বৈত আচার্য ফিরে এসে গৌরাঙ্গ সম্বন্ধে বলছেন—
কে বুঝে সে সব মায়া কিবা আচরণ।
জে নমস্করে তারে দণ্ডবৎ হন ॥" (জয়ানন্দের চৈতন্য মঙ্গল ২/১২/১৪)

প্রণম্যজনের প্রণাম নিলে মহাপরাধ হয়। এজন্যই শ্রদ্ধাবশতঃ শঙ্করের সতর্কবাণী। এছাড়াও শঙ্করদেবের বিভিন্ন রচনায় চৈতন্য প্রভাব লক্ষ্য করা যায়। কয়েকটি উদাহারণ ঃ—

শ্রীচৈতন্যের ভক্তিসাধনায় ভক্তি নবধা-যথা শ্রবণ, কীর্তন, বিষ্ণুস্মরণ, পাদসেবন, অর্চন, বন্দন দাস্য ও আত্মনিবেদন। শঙ্করদেবের কীর্তনেও তার প্রতিধ্বনি শুনতে পাই।

"শ্রবণ কীর্তন স্মরণ বিষ্ণুর অর্চন পদসেবন।
দাস্য সখিত্য বন্দন বিষ্ণুত করিব দেহ অর্পণ ॥

কাটোয়ায় শিক্ষা দিতে গিয়ে গৌরাঙ্গ বলেছিলেন,

"পচা গৃহস্থের কথা কব কত আর।
পুত্র কন্যা বিষয় বিভবে জরজর ॥
নিশ্চয় হইবে মৃত্যু তাহে দৃষ্টি নাই।
চিরকাল বাঁচিব কেবল ভাবে তাই ॥" (গোবিন্দদাসের কড়চা)

শঙ্কর দেব— 'তুমি আত্মা হেন জানিয়া তোমাকে
চিত্তে ভজে যিটোজন।
তুচ্ছ পুত্র দারা বিষয় ভোগত
নাহি তার প্রয়োজন।'

শ্রীচৈতন্যদেবের উক্তি— 'আশে কৃষ্ণ পাশে কৃষ্ণ কৃষ্ণ জগময়।
সেই দেখিবারে পায় যেই ভক্ত হয় ॥'

শঙ্কর দেব—"জাহে ভকতি তাহে মুকতি ভকতে এ তত্ত্ব জানা ॥" শ্রীচৈতন্য স্পষ্টভাবে বলেছেন—"চণ্ডালোপি দ্বিজশ্রেষ্ঠঃ হরিভক্তি পরায়ণঃ"

এক্ষেত্রেও শঙ্কর দেব চৈতন্য অনুগামী—

"সমস্তে ভূততে ব্যাপী আছো মই হরি।
সবাকো মানিবা তুমি বিষ্ণু বুদ্ধি করি ॥"

উপরোক্ত উদাহারণগুলি হ'তে বোঝা যায়—শঙ্করদেবের উপর চৈতন্য প্রভাব কতখানি পড়েছিল।

ওড়িয়া সাহিত্যে চৈতন্যপ্রভাব : মহাপ্রভু ১৫১০ খৃষ্টাব্দে সন্ন্যাস গ্রহণ করে ঐ বৎসরেই পুরী আসেন। পুরীতে তাঁর স্থিতিকাল ১৫১০ খ্রীঃ হতে ১৫৩৩ খৃষ্টাব্দ পর্যন্ত। মধ্যে ছয় বৎসর ভারতের বিভিন্ন তীর্থ পর্যটন। দীর্ঘকাল ওড়িশায় বসবাস করার ফলে প্রভূত ব্যক্তিত্বসম্পন্ন মহাপ্রভুর প্রতি ওড়িশার রাজা থেকে নিঃস্ব প্রজাপর্যন্ত আকৃষ্ট হয়েছিলেন। এই আকর্ষণের ফলশ্রুতি ওড়িয়া সাহিত্যে চৈতন্য প্রভাব। প্রকৃতপক্ষে চৈতন্যের দিব্যোন্মাদনার প্রত্যক্ষ দ্রষ্টা ভাগ্যবান ওড়িশাবাসিগণ। Hunter তাঁর 'ওড়িষ্যা' গ্রন্থে (১৮৭২ খৃঃ) লিখেছেন—"The adoration of Chaitanya has become a sort of family-worship throughout Orissa. In Puri, there is a temple specially dedicated to his name and many shrines are scattered over the country" অর্থাৎ "সমগ্র ওড়িশায় চৈতন্য-অর্চনা পারিবারিক পূজায় পরিণত হয়েছে। পুরীতে একটি মন্দির বিশেষভাবে তাঁর নামেই উৎসর্গ করা হয়েছে এবং সমগ্র দেশে ছোট ছোট অনেক মন্দির চৈতন্য পূজার জন্য গড়ে উঠেছে।"

বাংলা সাহিত্যে ষোড়শ-সপ্তদশ শতাব্দীতে যেমন রচিত হয়েছিল গোবিন্দ কর্মকারের কড়চা, বৃন্দাবন দাসের চৈতন্য ভাগবত, লোচনদাসের চৈতন্যমঙ্গল, চূড়ামণিদাসের গৌরাঙ্গ বিজয়, শ্রীকৃষ্ণদাস কবিরাজের শ্রীচৈতন্য চরিতামৃত প্রভৃতি মহামূল্যবান গ্রন্থ, তেমনি ওড়িয়া সাহিত্যে উক্ত শতাব্দীতে রচিত হয়েছিল চৈতন্যচরিত গ্রন্থ—কহ্নাই খুন্টিয়ার মহাভাব প্রকাশ, মাধব রথের চৈতন্য বিলাস, ঈশ্বরদাসের চৈতন্যভাগবত ও দিবাকর দাসের জগন্নাথ চরিতামৃত।

শ্রীচৈতন্যদেবের ওড়িয়া অন্তরঙ্গদের মধ্যে বলরাম-জগন্নাথ যশোবন্ত-অনন্ত-অচ্যুতানন্দ বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। এঁদের বলা হয় পঞ্চসখা। এঁদের রচিত গ্রন্থমধ্যে চৈতন্য বন্দনা, চৈতন্য প্রচারিত প্রেমভক্তিবাদ প্রভৃতির উল্লেখ আছে। বলরামদাসের বেদান্তসার গুপ্তগীতা, জগন্নাথ দাসের ভাগবত, যশোবন্ত দাসের প্রেমভক্তি ব্রহ্ম, অনন্তের পদ্ম বনবাস এবং অচ্যুতানন্দের গুরুভক্তি গীতা উল্লেখযোগ্য।

পঞ্চসখার রচনা ও কর্মের মধ্য দিয়ে ষোড়শ শতকের ওড়িষী সমাজে ও ওড়িয়া সাহিত্যে নবজাগরণ এসেছিল। এই জাগরণের মূলে ছিলেন—শ্রীচৈতন্য, পঞ্চসখা রচনায় এর স্বীকৃতি মেলে।

"শ্রীচৈতন্য কলিযুগে কৃষ্ণ হেলে জাত।
তাঙ্ক সঙ্গে চারিসখা হোইলু যে জাত ॥" (গুরুভক্তি গীতা)

এই চারিসখার কাজ- "শিশু যে অচ্যুত যশোবন্ত বলরাম।
শূদ্রকুল উদ্ধারিবু আম্ভে চারিজন ॥"

জগন্নাথ সেবক কহ্নাই খুঁটিয়া হলেন শ্রীচৈতন্যের সেবক। হরিনামামৃতে তাঁর মনমগ্ন হলে—

এহিপরি মহাপ্রভু করিলে বিজয়।
এতদিনে অধমর গতি করি থয় ॥
ততপরু মুহিঁ প্রভু চরণে মজ্জিলি।
ভাগ্যহেতু সুদয়ারু কাণিচে মজ্জিলি ॥

চৈতন্য বিলাসের রচয়িতা মাধব রথও চৈতন্য সমসাময়িক ছিলেন। মাধবের কবিকৃতি অতি সুন্দর। নমুনা স্বরূপ 'শচীর বিলাপ" উদ্ধৃত হল।

"গৌরদেহবু কোলরে বসাঈ মুখরে দিঅন্তি চুম্বন।
মাথার কুলিশ পকাঈ জীবন ছাড়ি যিবু তুহি নন্দন।
কে তোতে এহু শিক্ষা দেলা।'
কহুঁ কহুঁ তোর কঠিন শরীর ফাটি ষাঈত রহিলা।
তু মোর অন্ধর লউরি, গলাহার, নেত্র পিতুলি, জীব, জীব
তোতে ন দেখি মু জীবন রাখিবি এহা মোর দেহ সহিব।
কি মর্মস্পর্শী ভাব!

অন্য একজন ওড়িয়া কবি দিবাকার দাস ইনি অতিবড়ী সম্প্রদায়ভুক্ত ছিলেন। ইনি পঞ্চসখার অন্যতম। ইঁহার রচিত গ্রন্থ- 'জগন্নাথ চরিতামৃত।

যেকালে নামের প্রচার ছিলনা, সকলে ছিল অহমিকাগ্রস্ত রাজসিক ও তামসিক প্রকৃতির লোকেরা নির্দোষীজনের বিনাশ ও অগম্যাগমন করে ধর্মভ্রষ্ট হয়ে পড়েছিল। সেকালে শ্রীকৃষ্ণ চৈতন্য রূপেজাত হলেন এবং জগতে ভক্তিস্থাপন করলেন। সেই কৃষ্ণ চৈতন্যের শরণপ্রার্থী দিবাকর দাস—

সেকালে নাম ন জানন্তি মুহিঁ বড় বোলি বোলন্তি ॥
নির্দোষী জনঙ্কু বিনাশ। রাজ্স তামসরে বশ ॥
অগমে করন্তি গমন। ভ্রষ্ট করন্তি নিজধর্ম ॥
কৃষ্ণচৈতন্য রূপে জাত। ভক্তি স্থাপি গলে জগত ॥
সে কৃষ্ণ চৈতন্য চরণ। বিপ্রদিবাকর শরণ ॥

চৈতন্যধর্ম গ্রহণকারী ওড়িয়া বৈষ্ণবেরা নিত্যানন্দ, গদাধর, গোপালগুরু ও শ্যামানন্দের শাখাভুক্ত। চৈতন্যদেবের শিষ্য বক্রেশ্বর, বক্রেশ্বরের শিষ্য গোপালগুরু, আর গোপাল গুরুর শিষ্য ধ্যানচন্দ্র। গোপাল গুরু 'রাধাকান্ত মঠ প্রতিষ্ঠা করেন। রাধাকান্ত মঠের আটটি শাখা আছে গঞ্জাম ও পুরী জেলায়।

শ্যামানন্দ, যাঁর পূর্বনাম ছিল দুখী মণ্ডল, তিনি ষোড়শ শতাব্দীর শেষভাগে মেদিনীপুর জেলার ধারেন্দা বাহাদুর গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। দুখীমণ্ডল কালনায় হৃদয়ানন্দের নিকট এবং বৃন্দাবনে শ্রীজীব গোস্বামীর নিকট বৈষ্ণবশাস্ত্র অধ্যয়ন করেন। শ্রীজীব গোস্বামীই তাঁর

নামকরণ করেন, শ্যামানন্দ। হৃদয়ানন্দ শ্যামানন্দকে আশীর্বাদ করে বলেন, 'উৎকলে বৈষ্ণব কর সর্ব ঘর ঘর।' (রসিকমঙ্গল) ধারেন্দার অধিবাসীবৃন্দ এমনকি ধারেন্দাব ফৌজদার—যিনি জাতিতে মুসলমান, তিনিও শ্যামানন্দের শিষ্যত্ব গ্রহণ করেন। তখন তাঁর নাম হয় চৈতন্য দাস। শ্যামানন্দ-সম্প্রদায়ের প্রধান মঠ আছে গোপীবল্লভপুরে।

শ্যামানন্দ শিষ্য রসিকানন্দ ময়ূরভঞ্জের মহারাজা বৈদ্যনাথ ভঞ্জকে দীক্ষাদান করেন। রসিকমঙ্গল হতে জানা যায় রসিকানন্দের সাতজন ব্রাহ্মণ শিষ্যও ছিলেন। রসিকানন্দ ১৬৫১ খৃষ্টাব্দে রেমুণায় পরলোকগমন করেন। কোরাপুট জেলার জয়পুরের জমিদারেরা নবদ্বীপের গোস্বামীদের শিষ্য হয়েছিলেন। উনিশ শতকে পুরীর রাজবংশ ও গঞ্জাম জেলার বড় খেমদির জমিদার বংশ গৌড়ীয় বৈষ্ণবধর্ম গ্রহণ করেন।

এইভাবে চৈতন্য ও চৈতন্য পরিবারের শিষ্য-প্রশিষ্যেরা বর্তমান কাল পর্যন্ত ওড়িশার জনমানসে বৈষ্ণবধারা প্রবাহিত করে রেখেছেন। নিম্নে কিছু নিদর্শন দেওয়া হল।

শ্রীহরিদাস নামে উৎকল দেশীয় গৌরভঞ্জ ষোড়শ শতকে ময়ূরচন্দ্রিকা গ্রন্থে লিখেছেন—

"কহন্তি গুরুদেব রায় রামানন্দ।
শুণন্তি আনন্দে শচীসূত গোরাচান্দ" ॥

রায় বামানন্দ এঁর গুরু ছিলেন। শ্রীগোপাল কৃষ্ণ পট্টনায়ক শ্রীগোপাল কৃষ্ণ পদ্যাবলী রচনা করেন—"ব্রজবিধু শ্রীমতীহোই গুটিয়ে মূর্ত্তি জন্মিছন্তি শ্রীশচীতুন্দরে।
স্ব স্ব কল্পনাবধি দয়া সদ্‌গুণ নিধি সদাবেষ্টিত ভক্তবৃন্দরে ॥

শম্বলপুরের শত্রুঘন মাঝির শ্রীগৌরাঙ্গ মহাপ্রভুঙ্ক চৌতিশায় :—

"কি কহিবি আহে ভাই, শ্রীগৌরাঙ্গ কথা।
কহিত ন পারে কোটী ব্রহ্মান্ড দেবতা ॥"

দক্ষিণ ভারতীয় সাহিত্যে চৈতন্যপ্রভাব : পূর্ব পূর্ব অধ্যায়ে মহাপ্রভুর দক্ষিণদেশ ভ্রমণের কথা উল্লেখ করেছি এক্ষণে ঐসব দেশের সাহিত্যে চৈতন্য প্রভাব নিয়ে আলোচনা করব। দক্ষিণভারতে সাধারণতঃ তামিল, তেলুগু, মালয়াল্‌ম প্রভৃতি ভাষা বিদ্যমান।

মহাপ্রভু দক্ষিণে যাত্রা করে ভারতের দক্ষিণতম প্রান্তস্থিত কন্যাকুমারী হয়ে পশ্চিম উপকূলভাগে কেরল-কর্ণাটক-কুর্গ-মহারাষ্ট্রের ভিতর দিয়ে উত্তরমুখে বরোদা-আমেদাবাদেব মধ্যদিয়ে দ্বারকা পর্যন্ত যান এবং নর্মদা নদীর তীর ধরে পূর্বমুখে হেঁটে এসে আবার দক্ষিণ মুখো হয়ে গোদাবরী তীরে রায় রামানন্দের সঙ্গে দেখা করেন।

ঐ সময় দক্ষিণভারতে ব্রাহ্মণ এবং ব্রাহ্মণেতর জাতির মধ্যে প্রচণ্ড বিভেদ ছিল। শূদ্র ও নারীর বেদপাঠে অধিকার ছিল না। শ্রীচৈতন্য এ শাস্ত্রাচারের বাইরে এসে ভক্তিধর্মের জোয়ার তুললেন। তিনি বলেন, "চণ্ডালোপি দ্বিজশ্রেষ্ঠঃ হরিভক্তি পরায়ণঃ।" দাক্ষিণাত্যে বৈরাগী দাস গায়কেরা, তামিল, তেলুগু, কানাড়ি ও মালয়াল্‌ম ভাষায় বৈষ্ণব গীত রচনা করেছিলেন। এঁদের গীতে চৈতন্য প্রভাব দুর্লভ নয়। তেলুগু কবি বেমন ষোড়শ শতাব্দীর লোক। অনেকে মনে করেন শ্রীচৈতন্যের প্রত্যক্ষ প্রভাবেই তিনি পদগুলি রচনা করেছিলেন। কানাড়ী সাহিত্যের ধারাও বৈষ্ণব ধর্মাদর্শকে অবলম্বন করে মধ্বাচার্য্যের মধ্য দিয়ে প্রবাহিত হয়ে চৈতন্যের সময় পুনরুজ্জীবিত হয়েছিল এবং একটি নতুন অধ্যায়ের সৃষ্টি করেছিল।

দ্রাবিড় সাহিত্যে ধ্রুবপদযুক্ত গীতি কবিতার ধারা—যা ষোড়শ শতাব্দীর সংযোজন তা বাংলা পদাবলীর অনুকরণ এবং এতে চৈতন্য প্রভাব সুপরিস্ফুট।

পরিশেষে বলা যায়, বাঙ্গালী মরমী বৈষ্ণব কবিদের ভক্তিসাহিত্যের ঢেউ দক্ষিণ ভারতকেও প্লাবিত করেছিল। মহাপ্রভু কেরলেও এসেছিলেন। তাঁর আগমনের ফলশ্রুতি সেখানে কৃষ্ণ উপাসনার ধারার নবযুগের সূচনা।

মারাঠী সাহিত্যে চৈতন্যপ্রভাব : বাংলা ও মহারাষ্ট্রের মধ্যে প্রাচীন যুগ থেকেই নিবিড় সংযোগ লক্ষ্য করা যায়। মহাপ্রভু শ্রীচৈতন্য দক্ষিণদেশ ভ্রমণকালে মহারাষ্ট্রে গিয়েছিলেন এবং সেখানে ভক্তিধর্ম প্রচার করেছিলেন। আর এই নব জাগরণের মূলে ছিল ধর্মীয় জাগরণ। তদানীন্তনকালে মারাঠী ভাষায় রচিত ভক্তি গীতিগুলিকে বলা হয় অভঙ্গ। এই অভঙ্গ রচয়িতারা অধিকাংশই ছিলেন বৈষ্ণব। তাঁদের একনিষ্ঠ ভক্তি ছিল পাঁচরপুরের বিঠোবা বা বিঠ্‌ঠলের (কৃষ্ণের) উপর। খৃষ্টীয় ত্রয়োদশ শতাব্দী থেকে সপ্তদশ শতাব্দী মারাঠা নবজাগরণের কাল। মারাঠী ভক্তিসাহিত্যের উজ্জ্বলতম রত্ন তুকারাম। কালবিচারে জ্ঞানেশ্বর ও নামদেব প্রাক্‌চৈতন্য এবং একনাথ ও তুকারাম চৈতনোত্তর যুগের কবি। একনাথ ও তুকারামের অভঙ্গে চৈতন্যপন্থার সাদৃশ্য লক্ষ্য করা যায়। অভঙ্গগুলি একনাথ রচিত 'নববিধা ভক্তি,' তুকারাম রচিত 'আর্ণিক দুসরে মজ নাহি," দিলা জীবভাব (আত্মসমর্পণ), যেথে যত তেথে তু "(সবখানে তুমি), নাম আঠবিতা'—নামের আনন্দ প্রভৃতি।

গুজরাটী সাহিত্যে চৈতন্যপ্রভাব : বৃন্দাবনে ভক্তিধর্ম প্রচার কেন্দ্র এবং লুপ্তবৃন্দাবন উদ্ধারের কাজের জন্য মহাপ্রভু ষড়গোস্বামীকে বৃন্দাবনে পাঠিয়েছিলেন। আনুমানিক ১৫১৩ খৃষ্টাব্দে তাঁর পার্ষদ লোকনাথ বৃন্দাবনের পবিত্রকুঞ্জে চৈতন্য সম্প্রদায়ের প্রধান কেন্দ্র স্থাপন করেন। বৃন্দাবনের এই প্রতিষ্ঠানের প্রভাব সারাদেশে ভক্তির বান ডাকিয়ে দিয়েছিল। এই প্রবাহ গুজরাটেও প্লাবন এনেছিল ষোড়শ শতাব্দীতে। অনুমান করা হয় গুজরাটের দুই-শ্রেষ্ঠ ভক্ত কবি মীরাবাঈ ও নরসিংহ মেহতা এই সম্প্রদায়ের ভক্তদের দ্বারা প্রভাবিত হয়েছিলেন। মীরাবাঈ পশ্চিমভারতের শ্রেষ্ঠ মহিলা কবি। স্বামী পরলোক গমন করলে তিনি উদয়পুরের রাজপ্রসাদ ত্যাগ করে গিরিধারীর আকর্ষণে বৃন্দাবন আসেন। এখানে তিনি শ্রীজীব গোস্বামীর কৃপালাভ করেন। শ্রীজীব গোস্বামীর পণ ছিল তিনি স্ত্রীমুখ দেখবেন না। বৃন্দাবনে এসে মীরাবাঈ শ্রীজীবের সে প্রতিজ্ঞা ভেঙ্গে দেন। 'বৃন্দাবন আঈ জীব গোঁসাঈ জুগো মিলী ঝিলী তিয়া মুখ দেখি বেকো "পণলে ছুড়ায়ো হে।।" মীরাবাঈ একটি গৌরপদ রচনা করেন।

"সাধো! অবতো হরিনাম লৌ লাগী।
সব জগাকা মন মাখনচোরা নাম ধর্‌যৌ বৈবাগী ॥

... ...

শ্যাম কিশোরা ভয়ো নব গোরা চৈতনবাক নাম ॥

অহ—সাধু। এখন তো হরিনাম নিতেই হবে। সবজগতের মনরূপ মাখন যিনি চুরি করেছেন তিনি বৈরাগী নাম ধারণ করেছেন।... সেই শ্যামকিশোর হলেন নবগোরা—চৈতন্য হল তাঁর নাম।

নরসিংহ মেহতার 'শৃঙ্গার মালা' ৭৪০টি পদের সংকলন গ্রন্থ। এই পদগুলিতে চৈতন্যের প্রভাব সুস্পষ্ট। মীরা এবং নরসিংহ মেহতা উভয়েরই নিকট শ্রীচৈতন্য কৃষ্ণ বই আর কেহ নন। অপর একটি গৌরাঙ্গবিষয়ক পদ যার ভাষা গুজরাতী এবং রচয়িতা কবি মধুসূদন। কবিতাটি—

"গৌরহরি রূপ ছে মদন সমান ;
চন্দন দিব্য, দিব্যমালা কণ্ঠ, দিব্য বসন পরিধান গৌরহরি।
দিব্য গৌর অঙ্গনী দ্যুতি আগল, ক্যাঁ ছে কনকনি শোভা,
অনুপম শ্রীমুখ জোতাং জানে পূর্ণ শশীনু মনমোহা-গৌরহরি
লাঁবানে রক্তনয়ন যুগ শোভে, জীত্যো কমলদল সার,
আজনুলম্বী ভুজ সুকণ্ঠ ছে, বিস্তৃত হৃদয় নিদ্ধরি গৌরহরি,
যজ্ঞ সূত্র ত্যাঁ জীণু সোহে শুভ্র সুরজুনী থায়।
মধুসূদন এ ছবিনে নিরখী, তনমন বারী জায়, গৌরহরি।

হিন্দী সাহিত্যে শ্রীচৈতন্য

খৃষ্টীয় সপ্তদশ শতাব্দী থেকে হিন্দী সাহিত্যে শ্রীচৈতন্য ও তাঁর পার্ষদবর্গের পুণ্যচরিত ও বৈষ্ণবীয় ভক্তিসাধনার উল্লেখ দেখা যায়। রামানন্দী সম্প্রদায়ের অগ্রদাস স্বামীর শিষ্য নাভাদাসজী হিন্দী ভাষায় ভক্তচরিতমালা রচনা করেন। তাঁর রচনাকাল ১৬০০ খৃষ্টাব্দ হতে ১৭০০ খৃষ্টাব্দ মধ্যে। নাভাজী তাঁর গ্রন্থে বিষ্ণুপুরী গুসাঁই, নিত্যানন্দ, শ্রীচৈতন্য, শ্রীরূপ, সনাতন ও শ্রীজীবের নামে 'ছপ্পয়' লিখেছেন, এছাড়া অন্যান্য বৈষ্ণবদের কথাও উল্লেখ করেছেন। নাভাজী শ্রীচৈতন্য সম্বন্ধে বলেছেন। শ্রীচৈতন্য পূর্বদেশে বিদিত অবতার গৌড়দেশে পাষণ্ড দমন করে সেই করুণা সাগর, অগতির গতি, মানুষকে ভজন পরায়ণ করেছেন। শ্রীনিত্যানন্দ কৃষ্ণচৈতন্য ভক্তি দশদিকে ছড়িয়ে পড়েছে তাঁরা উভয়ে পূর্বদেশে অবতীর্ণ হয়েছেন।

ছপ্পযটি নিম্নরূপ ঃ—

"গৌড়দেশ পাষণ্ড মেণ্ডি কিয়ো ভজনপরায়ণ।
করুণাসিন্ধু কৃতজ্ঞ ভয়ে অগতিন গতিদায়ন ॥
.. ... .
অবতার বিদিত পূরব মহী, উভৈ মহত দেহী ধবী।
শ্রীনিত্যানন্দ কৃষ্ণ চৈতন্যকী ভক্তি দশোঁদিশি বিস্তরী ॥"

অপর কবি প্রিয়াদাসজী তাঁর 'ভক্তরসবোধিনী' টীকায় শ্রীগৌরাঙ্গকে শ্রীকৃষ্ণের সঙ্গে অভেদ মনে করতেন।

"যশোমতী" সুত সৌঈ শচীপুত গৌর ভয়ে"।

হিন্দী সাহিত্যে অপর একটি অপূর্ব গ্রন্থ 'শ্রীগৌরাঙ্গ চরিত মানস।' গ্রন্থটি রামচরিত মানসের আদলে লিখিত। রচনাকাল ১৯১৬ খৃষ্টাব্দ। গ্রন্থের মঙ্গলাচরণে কবি লিখেছেন—

'কনককান্তি কমনীয়, যুগল জানুলম্বিত ভুজা।
বন্দো ভবভরণীয়, কমলনেত্র কীর্তন পিতা ॥
শ্রীচৈতন্য নিতাই, পালক দোউ কলি ধর্মকে।
জড় চেতন প্রিয় জাই, বিপ্রবর্ণ করুণাবতর ॥'

মঙ্গলাচরণ করে কবি একে একে জন্মলীলা থেকে আরম্ভ করে প্রভুর অপ্রকট লীলা পর্যন্ত বর্ণনা করেছেন। বাহুল্য ভয়ে শুধুমাত্র অপ্রকটলীলার কথা নিম্নে দিলাম।

প্রভু একদিন ভক্তগণের সঙ্গে কথা বলে জগন্নাথ মন্দিরে এলেন—

"কহি প্রভু মন্দির মেঁ গয়ে, লাগী স্বয়ং কপাট।
চকিত ভক্তগণ স্বজন মিলি, দেখি রহে প্রভু বাট ॥
উত গোপী গোলোক সেঁ স্থলে পহুঁচী ধাই।
নীলচক্র পর চমকি রহী, রবি শশি দ্যুতি লজাই।
বেদন অস্তুতি কর রহে, গোপী ছীটেঁ যুল।
চড়ি রথপৈ চল মহাপ্রভু, ভক্ত রহে ইত ভুল ॥"

কিছুক্ষণ পরে মন্দিরের কপাট খুলে গেল—কিন্তু ভক্তগণ আর মহাপ্রভুকে দেখতে পেলেন না।

কিছু বিলম্বপর খুলী কপাটা। তবহুঁ ভক্তগণ দেখহি বাটা ॥
মন্দির ভীতর জনমিলি গয়উ। খোঁজ হিঁ নহিঁ প্রভু মিলন ভয়উ ॥

হা শচীনন্দন তজি মন্দন কো কহাঁ বসে তুম জাঈ।
কঁহ পৈহৌ অব প্রেমরূপ রস, চখু শ্রুতি রহ ললচাঈ ॥
রে খল প্রাণ তজত তুঁ বপু নহি, গৌর ছারি তোহি গএউ।
রায় স্বরূপ গৌর। গৌ...গৌ... কহি, ছিতিমধি লোটত ভাএউ ॥

নীলাচল লীলা গেল ভেঙে, ভক্তরা উদাস হয়ে কেউ গেলেন বৃন্দাবনে, কেউ গেলেন লোকান্তরে—কেবল রয়ে গেল গৌর প্রেম—সারা সংসারকে ধন্য করার জন্য।

"ভৈ-সব ভক্ত উদাস, কোই ব্রজ গৈ কোই পরমপদ।
রহ গৈ ভক্তীভাস, গৌর প্রেম, সংসার মেঁ ॥

অপর একটি হিন্দী গ্রন্থ 'শ্রীশ্রীচৈতন্য চরিতাবলী" (লেখক শ্রী প্রভুদত্ত ব্রহ্মচারী) আধুনিক কালের হিন্দীভাষী ভক্ত পাঠকদের নিকট অমূল্য গ্রন্থ। গ্রন্থটি পাঁচটি খণ্ডে লিখিত। প্রত্যেক খণ্ডই গদ্যে লিখিত। গ্রন্থটিতে গোবিন্দ কর্মকারের কড়চার প্রভাব সুস্পষ্ট। বিভিন্ন ভাষায় রচিত চৈতন্য-বিষয়ক গ্রন্থ হতেও তিনি উপাদান গ্রহণ করেছেন। গ্রন্থকারের রচনারীতির কিছু নিদর্শন দেওয়া হল। এটি হরিদাস ঠাকুরের দেহান্ত বিষয়ক।

"হরিদাসজী অত্যন্ত হী পিপাসু কী তরহ প্রভুকী মকরন্দ মাধুরীকো পী রহে থে। উনকী আখোঁকে পলক গিরতে নহী থে। জিহ্বাসে ধীরে ধীরে 'শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য, শ্রীকৃষ্ণ চৈতন্য' ইন নামোঁকো উচ্চারণ কর রহে থে। দেখতে হি দেখতে উনকে প্রাণ পখেরু ইস জীর্ণ শীর্ণ কলেবরকো পরিত্যাগ করকে ন জানে কিস লোককী ওর চলে গয়ে। সভী ভক্তনে একসাথ হরিধ্বনি কী। মহাপ্রভু উনকে প্রাণহীন কলেবরকো অপনী গোদীমেঁ উঠাকর জোরোঁকে সাথ নৃত্য করনে লগে। সভী ভক্ত রুদন করতে হুএ। 'হরিবোল' কী হৃদয়বিদারক ধ্বনিকে মানো আকাশকে হৃদয়কে ভী টুকড়ে টুকড়ে করনে লগে। উস্ সময় কা দৃশ্য বড়া হী করুণাজনক থা। জহাঁ চৈতন্য হরিদাসকে প্রাণহীন শরীরকো গোদমেঁ লেকর রোতে রোতে নৃত্য কর রহে হোঁ, বহাঁ অন্য ভক্তোঁকী ক্যা দশা হুঈ হোগী, ইসকা পাঠক হী অনুমান লগা সকতে হৈঁ। উসকা কথন করনা হমারী শক্তিকে বাহর কী বাত হৈ।" (৫ম খণ্ড, পৃষ্ঠা-৮০)।

চতুর্থ অধ্যায়

গৌরলীলার তত্ত্বকথা

পঞ্চতত্ত্ব

শ্রীগৌরাঙ্গ, নিত্যানন্দ, অদ্বৈত, গদাধব ও শ্রীবাস এই পাঁচজনকে নিয়ে পঞ্চতত্ত্ব। বিভিন্ন বৈষ্ণবগ্রন্থে পঞ্চতত্ত্বের বিষয় বর্ণিত আছে। ঐ সব গ্রন্থানুসারে পঞ্চতত্ত্বের বর্ণনা করা হল।

'ঈশ্বর পরমকৃষ্ণ ব্রজেন্দ্র নন্দন।
জীব উদ্ধারিতে এবে শ্রীশচীনন্দন ॥
গোলকের গুপ্তধন ধরামাঝে আনি
প্রেমের ঠাকুর গৌর বিলান আপনি ॥
স্ত্রী শূদ্র-চণ্ডাল-যবন কভু না বিচারে।
যারে দেখে তারে প্রভু প্রেমদান করে।
... ...
"এ সব না মানে যেই পণ্ডিত সকল।
তা সবার বিদ্যাপাঠ ভেক কোলাহল ॥"—চৈ. চরিতামৃত

কি কারণে পঞ্চতত্ত্ব ঃ—

"ভক্তরূপধারী প্রভু শ্রীগৌরসুন্দর।
যাঁহার কৃপায় জীবের আনন্দ অন্তর ॥
ভক্ত স্বরূপ শ্রীনিত্যানন্দ কলেবর।
যাঁহার কৃপায় পাই শ্রীগৌর সুন্দর ॥
ভক্ত অবতার হন অদ্বৈত গোঁসাই।
যে আনিল ধরামাঝে গৌরাঙ্গ নিতাই ॥
প্রভু শক্তি অবতার পণ্ডিত গদাধর।
যাহারে দেখিলে প্রভু আনন্দ অন্তর ॥
শুদ্ধ ভক্ত তত্ত্ব শ্রীবাসাদি ভক্তগণ।
যাদেব সহিত প্রভু করে সঙ্কীর্তন ॥"

শ্রীস্বরূপ গোস্বামীর কড়চায়—

"পঞ্চতত্ত্বাত্মকং কৃষ্ণং ভক্তরূপ স্বরূপকম্।
ভক্তাবতারং ভক্তাখ্যং নমামি ভক্ত শক্তিকম ॥

গৌরগণোদ্দেশ দীপিকার মতে—

গৌব, নন্দ নন্দন, ব্রজের বলরাম-নিত্যানন্দ।
"এই পঞ্চতত্ত্বরূপে করি প্রেমাস্বাদন।
কলিযুগে প্রেম দান করে অনুক্ষণ ॥

চৈতন্য চরিতামৃতে— "পঞ্চতত্ত্ব একবস্তু নাহি কোন ভেদ।
রস আস্বাদিতে তত্ত্বে বিবিধ বিভেদ ॥
পঞ্চতত্ত্ব একবস্তু ধরি পঞ্চরূপ।

রস আস্বাদন করে ধরি পঞ্চরূপ ॥
পঞ্চতত্ত্বের এক তত্ত্ব ভিন্ন করে যেই।
আপন ভজন দোষে ধ্বংস হয় সেই ॥

পঞ্চতত্ত্ব, ষড়গোস্বামী, দ্বাদশ গোপালাদির নাম

(১) পঞ্চতত্ত্ব :—শ্রীগৌরাঙ্গ, নিত্যানন্দ, অদ্বৈত, গদাধর ও শ্রীবাস।

(২) ষড়গোস্বামী—শ্রীরূপ, সনাতন, রঘুনাথ ভট্ট, শ্রীজীব, গোপালভট্ট, রঘুনাথ দাস।

(৩) দ্বাদশ গোপাল—(১) শ্রীঅভিরাম গোস্বামী খানাকুল। (২) শ্রীধনঞ্জয় পণ্ডিত - শীতল গ্রাম, (৩) শ্রীকমলা কান্ত পিপ্পিলাই--মাহেশ (৪) শ্রীমহেশ পণ্ডিত—নশীপুর বা পালপাড়া (৫) শ্রীকানাই ঠাকুর—বোধখানা। (৬) শ্রীপুরুষোত্তম ঠাকুর—সুখসাগর (৭) শ্রীসুন্দরানন্দ ঠাকুর—মহেশপুর (৮) শ্রীগৌরদাস পণ্ডিত –অম্বিকা (৯) শ্রীউদ্ধারণ দত্ত— উদ্ধারণপুর (১০) শ্রীনাগর পুরুষোত্তম—নাগরদেশ (১১) শ্রীপরমেশ্বর ঠাকুর—ভরা আটপুর (১২) শ্রীধর পণ্ডিত—নবদ্বীপ।

(৪) ছয় চক্রবর্তী—(১) শ্রীবাস চক্রবর্তী (২) গোকুলানন্দ চক্রবর্তী (৩) শ্যামদাস চক্রবর্তী (৪) শ্রীদাস চক্রবর্তী (৫) গোবিন্দ চক্রবর্তী (৬) রামচরণ চক্রবর্তী

(৫) অষ্ট কবিরাজ ঃ—রামচন্দ্র কবিরাজ, (২) গোবিন্দ কবিরাজ, (৩) কবিকর্ণপুর কবিরাজ, (৪) নৃসিংহ কবিরাজ, (৫) ভগবান কবিরাজ, (৬) বল্লভীকান্ত কবিরাজ, (৭) গোপীরমণ কবিরাজ, (৮) গোকুল কবিরাজ।

(৬) অষ্ট প্রধান মোহান্ত—(১) স্বরূপ দামোদর (২) রায় রামানন্দ (৩) সেন শিবানন্দ (৪) গোবিন্দানন্দ, (৫)গোবিন্দ ঘোষ, (৬) মাধব ঘোষ, (৭) বসু রামানন্দ, (৮) বাসুদেব ঘোষ।

(৭) আটজন মোহান্ত ও প্রত্যেক মোহান্তের ৮ জন গণ বা সহযোগীর নাম।

(১) শ্রীস্বরূপের গণ— (১) চন্দ্রশেখর আচার্য, (২) রত্নগর্ভ ঠাকুর, (৩) গোবিন্দ, (৪) গড়ুর, (৫) মুকুন্দ দত্ত, (৬) দামোদর পণ্ডিত, (৭) কৃষ্ণদাস ঠাকুর, (৮) কৃষ্ণানন্দ ঠাকুর।

(২) রামানন্দ রায়ের গণ— (৯) মাধবাচার্য, (১০) দ্বিজ শুভানন্দ, (১১) বাসুদেব দত্ত, (১২) রামচন্দ্র দত্ত. (১৩) নন্দন আচার্য, (১৪) শঙ্কর ঠাকুর, (১৫) সুদর্শন ঠাকুর, (১৬) সুবুদ্ধি মিশ্র।

(৩) সেন শিবানন্দের গণ—(১৭) মকরধ্বজ দত্ত, (১৮) রঘুনাথ দত্ত, (১৯) মধুপণ্ডিত, (২০) বিষ্ণুদাস আচার্য, (২১) পুরন্দর মিশ্র, (২২) গোবিন্দ ঠাকুর, (২৩) পরমানন্দ গুপ্ত, (২৪) বলরাম দাস।

(৪) গোবিন্দানন্দ ঠাকুরের গণ—(২৫) শ্রীরাম পণ্ডিত, (২৬) জগন্নাথ দাস, (২৭) জগদীশ পণ্ডিত, (২৮) সদাশিব কবিরাজ, (২৯) রায় মুকুন্দ, (৩০) মুকুন্দানন্দ, (৩১) পুরন্দর আচার্য, (৩২) নারায়ণ বাচস্পতি

(৫) বসু রামানন্দের গণ— (৩৩) পরমানন্দ ঠাকুর, (৩৪) বল্লভ ঠাকুর, (৩৫) জগদীশ ঠাকুর, (৩৬) বনমালী দাস, (৩৭) শ্রীকর পণ্ডিত, (৩৮) শ্রীনাথ মিশ্র, (৩৯) শ্রীলক্ষ্মণ আচার্য, (৪০) পুরুষোত্তম পণ্ডিত।

(৬) গোবিন্দ ঘোষের গণ— (৪১) কাশী মিশ্র পণ্ডিত, (৪২) শিখি মাহিতি, (৪৩) শ্রীমান পণ্ডিত, (৪৪) বড় হরিদাস, (৪৫) কবিচন্দ্র ঠাকুর, (৪৬) হিরণ্য গর্ভ ঠাকুর, (৪৭) জগন্নাথ.. (৪৮) পীতাম্বর দ্বিজ।

(৭) মাধব ঘোষের গণ—(৪৯) মকরধ্বজ সেন, (৫০) বিদ্যাবাচস্পতি, (৫১) ঠাকুর

গোবিন্দ, (৫২) মহেশ ঠাকুর, (৫৩) শ্রীকান্ত ঠাকুর, (৫৪) মাধব পণ্ডিত, (৫৫) প্রবোধানন্দ সরস্বতী, (৫৬) বলভদ্র ভট্টাচার্য

(৮) বাসুদেব ঘোষের গণ—(৫৭) রাঘব পণ্ডিত, (৫৮) মুরারী চৈতন্যদাস, (৫৯) মকরধ্বজ পণ্ডিত, (৬০) কংসারি সেন, (৬১) শ্রীজীব পণ্ডিত, (৬২) মুকুন্দ কবিরাজ, (৬৩) ছোট হরিদাস, (৬৪) কবিচন্দ্র গুপ্ত।

'ভজ চৌষট্টি মোহান্ত আদি দ্বাদশ গোপাল।
ভজ ছয় চক্রবর্তী আদি অষ্ট কবিরাজ ॥'

ভবানন্দ

ভবানন্দ ছিলেন বাঙালী, তিনি বা তাঁর কোন পুরুষ কখন কিভাবে পুরীধামে গিয়ে বাস করেছিলেন তা জানা যায় না। তাঁর পাঁচটি পুত্র—জ্যেষ্ঠপুত্র-শ্রীরামানন্দ রায়। ওড়িশার রাজা প্রতাপরুদ্রের প্রিয়পাত্র ছিলেন। মহারাজ তাঁকে রাজমহেন্দ্রীর প্রদেশপাল নিযুক্ত করে আপন প্রীতির পরিচয় দিয়েছিলেন। (২) অপর পুত্র বানীনাথ। তিনি সর্বক্ষণ মহাপ্রভুর পরিচর্যা করতেন। (৩) তৃতীয় পুত্র কলানিধি রাজসেবক ছিলেন। (৪) চতুর্থ পুত্র সুধানিধি রাজ সেবক ছিলেন। (৫) গোপীনাথ পট্টনায়ক—ইনি ওড়িশার মালজাটা দণ্ডপাটের রাজস্ব আদায়ের উচ্চপদে ছিলেন।

সেন শিবানন্দের তিন পুত্র :—

শিবানন্দের তিন পুত্রের নাম— ১) চৈতন্য দাস, ২) রামদাস, ৩) কর্ণপুর। গৌরাঙ্গ প্রেমে— "পঞ্চপুত্র সঙ্গে নাচে রায় ভবানন্দ,
তিন পুত্র সঙ্গে নাচে সেন শিবানন্দ

সপ্তভারতী— (১) কেশব ভারতী, (২) ব্রহ্মানন্দ ভারতী, (৩) বলরাম ভারতী, (৪) রামানন্দ ভারতী, (৫) বল্লভভারতী, (৬) যদুনন্দন ভারতী, (৭) শ্যামানন্দ ভারতী

মহাপ্রভুর সাড়ে তিনজন ভক্ত। শ্রীচৈতন্য চরিতামৃত : (১) স্বরূপ দামোদর, (২) রায় রামানন্দ, (৩) শিখিমাহিতি

"জগতের মধ্যে "পাত্র" সাড়ে তিন জন"।
স্বরূপ গোসাঞি আর রায় বামানন্দ।
শিখি মাহিতি তিন, তাঁর ভগিনী অর্ধজন ॥
মাধবী দেবী শিখি মাহিতির ভগিনী।
শ্রীরাধার দাসী মধ্যে তার নাম গণি ॥"

চৌষট্টি মহান্তের ভোগ লাগাবার নিয়ম

চৌষট্টি মহান্তের আসন সর্বমোট ১৫৯টি।

পঞ্চতত্ত্ব—৫টি, পুরীবর্গ ১০টি, ভারতীবর্গ ৭টি, দ্বাদশ গোপাল ১২টি, পিতৃবর্গ ৩টি, মাতৃবর্গ ৩টি, অষ্ট গোস্বামী ৮টি, ঠাকুরগণ--৩টি, পুত্র ভৃত্য ভার্য্যা ১৬, প্রিয়াবর্গ ৬, ছয় চক্রবর্তী---৬টি, অষ্ট কবিরাজ ৮, অষ্ট প্রধান মহান্ত—৮টি, ৬৪ মহান্তের ৬৪টি মোট ১৫৯টি।

শ্রীগৌরাঙ্গ, নিত্যানন্দ, অদ্বৈত, গদাধর ও শ্রীবাস পূর্বমুখে বসিবেন, মাধবেন্দ্র পুরী, ঈশ্বর পুরী, পরমানন্দ পুরী, বিষ্ণুপুরী, রঘুনাথ পুরী কৃষ্ণানন্দ পুরী, নৃসিংহানন্দ পুরী, সুখদানন্দ পুরী, অনন্তপুরী, রামচন্দ্র পুরী এই পুরীবর্গ ও কেশব ভারতী ব্রহ্মানন্দ ভারতী,

রামানন্দ ভারতী, বল্লভভারতী, যদুনন্দন ভারতী, শ্যামানন্দ ভারতী এই ভারতী আসন মণ্ডলীর দক্ষিণে উত্তরমুখী বসবেন। শ্রীঅভিরাম, ধনঞ্জয়, কমলাকর, মহেশ পুরুষোত্তম, কালাকৃষ্ণ, সুন্দরানন্দ, গৌরীদাস, শ্রীনাগর পুরুষোত্তম, শ্রীধর, উদ্ধারণ দত্ত, পরমেশ্বর ঠাকুর এই দ্বাদশ গোপাল পূর্বদিকে পশ্চিমমুখে বসিবেন। কুবের আচার্য, জগন্নাথ মিশ্র, হাড়াই পণ্ডিত এবং নাভাদেবী, শচীদেবী, পদ্মাবতী দেবী এই ছয় জন মণ্ডলীর দক্ষিণে উত্তর মুখে বসবেন।

শ্রীরূপ গোস্বামী, লোকনাথ গোস্বামী, রঘুনাথ ভট্টগোস্বামী, রঘুনাথ দাস গোস্বামী, কৃষ্ণদাস কবিরাজ, নরোত্তম ঠাকুর, শ্রীনিবাস আচার্য ঠাকুর, শ্যামানন্দ ঠাকুর, উক্ত গোস্বামী ও ঠাকুর, মণ্ডলীর পশ্চিমদিকে পূর্বমুখে বসিবেন। বীরচন্দ্র গোস্বামী, রাসাই, নন্দাই, মীন কেতন, রামদাস অচ্যুতানন্দ, বলরাম মিশ্র, কৃষ্ণ মিশ্র, গোপাল দাস, জগদীশ নন্দনী, ডাবলী, নরহরি, রঘুনন্দন, চিরঞ্জীব, সুলোচন ও জাহ্নবী ঠাকুরানী, উক্তগণের পুত্র, ভৃত্য ও প্রিয়াবর্গ উত্তর পার্শ্বের দক্ষিণ মুখে বসবেন।

শ্রীরাম চক্রবর্তী, গোকুলানন্দ, শ্যামানন্দ, শ্রীদাস, গোবিন্দ ও রামচরণ চক্রবর্তী এবং রামচন্দ্র কবিরাজ, গোবিন্দ, কর্ণপুর, নৃসিংহ, ভগবান, বল্লভী, গোপীরমণ ও গোকুল কবিরাজ এই ছয় গোস্বামী এই অষ্ট কবিরাজের পূর্বপাশে পশ্চিমমুখে বসবেন।

বাসুঘোষ, মাধব ঘোষ, গোবিন্দ ঘোষ, সেন শিবানন্দ, বসু রামানন্দ, গোবিন্দানন্দ ঠাকুর, রায় রামানন্দ ও স্বরূপ দামোদর গোস্বামী এই অষ্ট প্রধান মহান্ত ও পূর্বোক্ত চৌষট্টি আসন মণ্ডলীর দক্ষিণ পার্শ্বে উত্তরমুখে বসবেন।

যে স্থানে ভোগদেওয়া হবে সে স্থান ভাল করে পরিষ্কার করে গোময় লেপন করে গঙ্গাজল ছিটিয়ে শুদ্ধ করে নিতে হয়। পরে সকলের বসবার জন্য পরিমাণ মত নূতন বস্ত্র বিছিয়ে আসন করতে হয়। ঐ বস্ত্রে আন্দাজ একহাত অন্তর একটি করে ভাঁজ দিতে হয়। অথবা কুশাসন কিংবা অন্যরূপ ভাল আসন দিলেও হয়। কুশাসনে নূতন বস্ত্র পেতে দিলে ভাল হয়। আসন ও বস্ত্রের উপর গঙ্গাজল ছিটিয়ে শুদ্ধ করতে হয়। ছোট কাগজের টুকরোয় প্রত্যেক মহান্তের নাম পৃথক পৃথক লিখে যার যেই আসনের উপর দিতে হয়। উৎকৃষ্ট চিড়া ভালরূপে ভিজিয়ে তার সঙ্গে দধি ও ভাল ইক্ষুগুড়, মুড়কী ও পাকা রম্ভা দিয়ে উত্তম রূপে মেখে তাতে একটু ঘৃত, মধু, এলাচ গুড়া দিয়ে মালসা ভর্তি করবে। পরে মালসার উপরে নানা প্রকার ফল, লুচি, পুরী মালপোয়া ও সন্দেশ সাজিয়ে দেবে। পরে প্রত্যেক আসনের সম্মুখে একটি করে মালসা দিতে হবে. একটি করে মাটীর অথবা পিতলের গ্লাসে গঙ্গাজল দিতে হবে। একটি করে খিলি পান ছোট পাতায় দিতে হয়। মধ্যস্থানে শ্রীরাধাকৃষ্ণের আসনের সম্মুখে একটা বড় পাত্রে আট দশটা মালসার পরিমাণ দ্রব্য দিতে হয়। সক্ষম হলে প্রত্যেক মালসায় ধুতি ও উত্তরীয় বা শুধু ধুতি দিতে হয়। অসমর্থ হলে একটা করে গামছা দিলেও হয়। দন্ত শোধনের জন্য মালসার কাছে একটি করে খড়িকা দিতে হয়। পঞ্চতত্ত্বের আসনে প্রত্যেকের জন্য একটি করে পৈতা দিতে হয়। চরণ ধৌত করবার জন্য পৃথক একটি স্থানে একটি বড় পাত্রে জল ও ৪/৫টি ঘটি রাখতে হবে।· ভোজনান্তে আচমনের জন্য অনুরূপ পাত্রে জল রাখতে হবে। সর্বাগ্রে করজোড়ে সকলকে সদৈন্যে ও আদরের সহিত আহ্বান পূর্বক মানসে শ্রীচরণ ধুইয়ে ও মুছিয়ে পরে আসনে উপবেশনের জন্য প্রার্থনা করতে হবে।

শ্রীনিত্যানন্দ প্রভুর জীবনী ও তীর্থ পর্যটন

কিঞ্চিদধিক পাঁচশত বৎসর আগেকার কথা। বীরভূমির একচক্রা আর নদীয়ার নবদ্বীপ ধন্য হয়েছিল যথাক্রমে শ্রীনিত্যানন্দ ও শ্রীগৌরচন্দ্রকে বক্ষে ধারণ করে। কলিতে জীব উদ্ধার মানসে উভয়ের আবির্ভাব।

শ্রীনিত্যানন্দ লীলামৃত গ্রন্থে আছে— "রাঢ় দেশে একচক্রা গ্রাম মনোহর।
ভারতের উচ্চভূমি অতিশোভাকর ॥"

এই একচক্রাগ্রামে বাস করতেন শ্রী নিত্যানন্দেরর পিতা শ্রীল মুকুন্দ বন্দোপাধ্যায়, ইনি হাড়াই পণ্ডিত বা হাড়ো ওঝানামে খ্যাত ছিলেন। এই হাড়াই পণ্ডিতের বিয়ে হয় নিকটস্থ ময়ূরেশ্বর গ্রামের জমিদার রাজা মুকুট নারায়ণের কন্যা, রূপে গুণে অনুপমা, পদ্মবতীর সঙ্গে। এঁদেরই প্রথম সন্তান নিত্যানন্দ। নিত্যানন্দ ছাড়া আরও পুত্র কৃষ্ণানন্দ, সর্বানন্দ, ব্রহ্মানন্দ, পূর্ণানন্দ, প্রেমানন্দ ও বিশুদ্ধানন্দ ছিল হাড়াই পণ্ডিতের। হাড়াই পণ্ডিত যাজকতাও করতেন।

১৪৭৩ খৃষ্টাব্দে অর্থাৎ ১৩৯৫ শকে মাঘ মাসে শুক্লা ত্রয়োদশীর দিনে মধ্যাহ্নে শ্রীপাদ হাড়াই পণ্ডিতের ধর্মপত্নী শ্রীমতী পদ্মাবতী দেবী এক অপরূপ পুত্ররত্ন প্রসব করেন। ইনিই শ্রীনিত্যানন্দ, শ্রীকৃষ্ণের অগ্রজ বলরাম। শ্রীমতী পদ্মাবতী গর্ভাবস্থায় নানা অলৌকিক রহস্য দর্শন করতেন। তিনি দেখতেন চতুর্মুখ ও পঞ্চমুখ প্রভৃতি অপূর্বসুন্দর দেবমূর্তিগণ এসে কাকে যেন স্তব করছেন, বলছেন, হে অনন্ত দিব্য প্রকাশ ধন্য তোমার গর্ভবাস। শ্রীশ্রীনিত্যানন্দ প্রভুর জন্মস্থানকে এখনও একচক্রা গর্ভবাস বলা হয়। প্রবাদ আছে যে শ্রীমতী পদ্মাদেবীর আটমাস গর্ভকালে আচম্বিতে এক যোগীরাজ শ্রীহাড়াই পণ্ডিতের গৃহে এসে "এই গর্ভবাস, এই গর্ভবাস," বলে নৃত্য করেছিলেন। তিনিই ছদ্মবেশী গর্গাচার্য। তাঁর প্রেম বিকার দেখে অনেকেই জিজ্ঞাসা করেছিলেন, আপনি কি বলছেন আমরা কিছুই বুঝতে পারছিনা। তিনি বলেছিলেন "শ্রীকৃষ্ণের অগ্রজ শ্রীবলরাম আসছেন। 'গর্ভবাস গর্ভবাস, মাঘী শুক্লা ত্রয়োদশী দিনে এই একচক্রায় তাঁর আশু প্রকাশ।" এ কথা বলতে বলতে ছদ্মবেশী অন্তর্হিত হন।

হাড়াই পণ্ডিত নিত্যানন্দকে খুব ভাল বাসেন।

"তিল মাত্র নিত্যানন্দ পুত্রেরে ছাড়িয়া।
কোথাও হাড়াই ওঝা না যায় চলিয়া ॥"

কিবা কৃষি কর্মে, কিবা যজমান ঘরে, "সবত্রই নিত্যানন্দকে সঙ্গে নিয়ে যান। কিন্তু দৈবে একদিন এক সন্ন্যাসী প্রবর। আইলেন নিত্যানন্দ জনকের ঘর।'

এই সন্ন্যাসী রাত্রিযাপন করে হাড়াইকে

'ন্যাসীবর বলে এক ভিক্ষা আছয়ে আমার।
নিত্যানন্দ পিতা বলে যে ইচ্ছা তোমার"

তখন সন্ন্যাসী তীর্থ ভ্রমণের সঙ্গী হিসাবে নিত্যানন্দকে ভিক্ষা চাইলেন, মনে হয় এ সন্ন্যাসী ঈশ্বর পুরী। মতান্তরে চৈতন্যাগ্রজ বিশ্বরূপ যাঁর সন্ন্যাসাশ্রমের নাম শঙ্করারণ্য পুরী। যাইহোক সন্ন্যাসীর সঙ্গে নিত্যানন্দ ফিরলেন সারা ভারতবর্ষে। কিশোর ক্রমে যুবক হলেন। দাক্ষিণাত্যে শ্রীপাদ মাধবেন্দ্র পুরীর গুরুদেব শ্রীপাদ লক্ষ্মীপতি পুরী নিত্যানন্দকে দীক্ষা দেন। শ্রীপাদ লক্ষ্মীপতি পুরীর অন্তর্ধানে শোকার্তচিত্তে শ্রীনিত্যানন্দ আসেন শ্রীবৃন্দাবন ধামে। তখন মাধবেন্দ্র পুরীও ছিলেন বৃন্দাবনে। যদিও উভয়ে এক গুরুর শিষ্য তথাপি শ্রীনিত্যানন্দ মাধবেন্দ্র পুরীকে গুরুর মত শ্রদ্ধা করতেন। তাঁরই আদেশে শ্রীনিত্যানন্দের নবদ্বীপে শুভাগমন।

তখন সবেমাত্র চৈতন্যদেবের দিব্য প্রকাশের শুভসূচনা হয়েছে নবদ্বীপে। নিত্যানন্দ গৌরাঙ্গের মিলন ঘটল। এ যেন মণিকাঞ্চন যোগ। শচীমাতা নিমাইকে পেয়ে বিশ্বরূপের শোক নিবারণ করেন। নিত্যানন্দ গৌরাঙ্গ আদেশে ঠাকুর হরিদাসের সঙ্গে নবদ্বীপের ঘরে ঘরে নাম প্রচারে প্রবৃত্ত হন। জগাই মাধাইকে উদ্ধার করে দয়াল নিতাই নামের সার্থকতা প্রদর্শন করেন। নিত্যানন্দ অবধূত, কিন্তু গৌরাঙ্গ তাঁকে চিনতে ভুল করলেন না। একান্ত অন্তরঙ্গরূপে গৃহীত হলেন। অধিকার করলেন শ্রীগৌরাঙ্গের জ্যেষ্ঠ সহোদরের পূজ্য স্থান। নিত্যানন্দ অবধূত সন্ন্যাসী। যিনি সম্পূর্ণ নিরাসক্ত হয়ে যুগপৎ ত্যাগ ও ভোগ আচরণ করেন তিনিই অবধূত। প্রকৃতি বিকার উপেক্ষা করেন বলে এইরূপ সাধক অবধূত বলে পরিচিত হন। এদিকে শ্রীবাস পণ্ডিত, অদ্বৈত আচার্য প্রভৃতি সকলেই মেনে নিলেন নিত্যানন্দের এই অধিকার। নবদ্বীপে শ্রীবাস অঙ্গনে হরিনামের রোল উঠল। এর ফলে বৈষ্ণব বিরোধী হিন্দুরা মিথ্যা অপবাদ দিয়ে চাঁদখাঁ কাজীর নিকট অভিযোগ করলে কাজী কীর্তন বন্ধ করে দেন। এ সংবাদ শুনে নিমাই ক্রুদ্ধ হয়ে প্রধানতঃ তিন সম্প্রদায় কীর্তন নিয়ে কাজীর বাড়ি আক্রমণ করেন। কাজী গৌরাঙ্গের রুদ্র মূর্তি দেখে ভয় পান নানাবিধ মিষ্ট কথায় ও ভাগনে সম্বোধন করে শান্ত করেন এবং তাঁদের ধর্মাচার পালনে পূর্ণ স্বাধীনতা দেন।

অন্যদিনের ঘটনা। চাঁদ কাজীর অধীনে নবদ্বীপে দুজন কোটাল ছিলেন। তাঁদের নাম শ্রীজগন্নাথ রায় ও শ্রীমাধব রায়। তাঁরা শুদ্ধ শ্রোত্রীয় ব্রাহ্মণ। এঁরাই জগাই মাধাই নামে বিখ্যাত। এই দুইজন অর্থ দিয়ে কাজীকে বশ করে নবদ্বীপে যথেচ্ছাচার করত। এঁদের ক্ষমতা ছিল বর্তমান থানার দারোগাদের মত। এদিকে নিত্যানন্দ, হরিদাস, শ্রীবাস প্রভৃতি ভক্তবৃন্দ সংকীর্তনসহ যাওয়ার সময় মদের নেশায় উন্মত্ত জগাই মাধাই কীর্তনের দলকে আক্রমণ করে এবং মাধাই নিতাইয়ের মাথায় কলসীর কানা ছুঁড়ে এমন আঘাত করে যে দরদর ধারে রক্ত পড়তে থাকে। দয়াল নিতাইয়ের সেদিকে ভ্রূক্ষেপ নাই। পক্ষান্তরে

"মারিলি-কলসীর কানা সহিবারে পারি।
তোদের দুর্গতি আমি সহিবারে নারি।
মেরেছিস কলসীর কানা তাতে ক্ষতি নাই।
সুমধুর হরিনাম মুখে বল ভাই ॥"

অবশেষে শ্রীচৈতন্যের অশেষ কৃপায় তারা দুজন উদ্ধার হল।

মাত্র চব্বিশ বৎসর বয়সে শ্রীগৌরাঙ্গ কাটোয়ার কেশব ভারতীর নিকট সন্ন্যাস গ্রহণ করেন। তদন্তর কয়েক দিন রাঢ়দেশ ঘুরে শান্তিপুরে অদ্বৈত আচার্যের গৃহে যান। সেখানে দুই চারিদিন থেকে ১৫১০ খৃষ্টাব্দে নীলাচল অভিমুখে রওনা হন। সঙ্গে গেলেন কেবল নিত্যানন্দ, জগদানন্দ, মুকুন্দ আর দামোদর। শ্রীমন্‌নিত্যানন্দ শ্রীচৈতন্যের সন্ন্যাস গ্রহণের সময় উপস্থিত ছিলেন এবং তাঁর সঙ্গে পুরীতে এসেও দুই বৎসর ছিলেন। মহাপ্রভু দক্ষিণ হতে নীলাচলে প্রত্যাবর্তের পর গৌড়ীয় বৈষ্ণবগণ শ্রীগৌরাঙ্গ দর্শনে চাতুর্মাস্য কালে নীলাচল যেতেন। মহাপ্রভু প্রেম প্রচারের জন্য নিত্যানন্দ কে গৌড়ীয় বৈষ্ণবগণের সঙ্গে গৌড়দেশে প্রেরণ করেন। প্রভু নিত্যানন্দ সপার্ষদে পানিহাটী গ্রামে আগমন করে রাঘব ভবনে অভিষিক্ত হন। তারপর আড়িয়াদহ, খড়দহ হয়ে সপ্তগ্রামে এসে সুবর্ণবণিক কুলকে উদ্ধার করেন এবং নবদ্বীপে এসে শচীমাতার সুখ বিধান করেন। প্রায় একবৎসর গৌড়দেশে প্রেম প্রচার করে পুনরায় নীলাচলে গৌরাঙ্গের নিকট উপস্থিত হন। সেখানে কিছুকাল থাকার পর শ্রীচৈতন্যের অনুরোধে তিনি বাংলা দেশে ফিরে এসে সংসার আশ্রমী হওয়ার মনস্থ করেন এবং সপ্তগ্রাম থেকে উদ্ধারণ দত্তকে সঙ্গে নিয়ে কালনায় আসেন। সেখানে সূর্যদাস পণ্ডিতের দুই কন্যা বসুধা ও জাহ্নবা দেবীর সঙ্গে পরিণয় সূত্রে আবদ্ধ হন। বসুধা দেবীর

গর্ভে এক কন্যা গঙ্গাদেবী ও এক পুত্র বীরচন্দ্র জন্মগ্রহণ করেন। নিত্যানন্দ প্রভু খড়দহে এসে শ্রীপুরন্দর পণ্ডিতের দেবালয়ে অবস্থান করে তথায় শ্রীপাট স্থাপন করেন। নিত্যানন্দ প্রভুর দুটি ধাম

'এক চক্রা জন্মভূমি খড়দহে বাস।
নিত্যানন্দের দুই ধাম জানিবে নির্য্যাস।'

খড়দহে অবস্থান করে মহাপ্রভুর আদেশে গৌড়মণ্ডলকে গৌরপ্রেমে উদ্ভাসিত করেন। শ্রীচৈতন্যের তিরোধানের কিছুকাল পরে ১৫৪৫ খৃষ্টাব্দে নিত্যানন্দের তিরোভাব ঘটে। নিত্যানন্দের তিরোধানের পর তাঁর কনিষ্ঠা-পত্নী জাহ্নবাদেবী এবং পুত্র বীরচন্দ্র বাংলার বৈষ্ণব সমাজের নেতা হন।

নিত্যানন্দের প্রেমধর্ম প্রচার : জীবকে নিত্য আনন্দ দান করাই নিত্যানন্দের স্বভাব। নিত্যানন্দ আনন্দঘন মূর্তি, প্রেমদাতা ও নির্মল প্রেমানন্দের মূর্ত্তবিগ্রহ, নিত্যানন্দ হতে জীব যে আনন্দ পায় সেটা নির্মল প্রেমানন্দ ও তাতে কোন আবিলতা নাই।

প্রভু নিত্যানন্দ অগতির গতি, পতিত পাবন এবং নিরাশ্রয়ের আশ্রয়, জগতে যাদের আপনার বলতে কেউ নেই, বা কিছু নেই, যারা সকলের কাছে অবহেলিত, অনাদৃত তাদের আপন করে কোলে তুলে নেবার জন্যই নিত্যানন্দের আবির্ভাব।

অনেকে মনে করেন ভগবানকে লাভ করতে হলে অতি কঠোর বৈরাগ্য ও কষ্টসাধ্য তপস্যার প্রয়োজন। কিন্তু দয়াল নিতাইচাঁদ জগতে এমন একটা অসাধারণ নিয়ম প্রবর্তন করলেন যাতে অতি সহজেই ভগবানকে লাভ করা যায়। তিনি বললেন, জীব ভগবানের পরম আত্মীয়। তাঁকে আত্মীয়জ্ঞানে সরলপ্রাণে হরি বলে ডাকলে তিনি সাড়া দেবেনই। আর নিতাইচাঁদ এ ভবার্ণবে বিনামূল্যের কাণ্ডারী, অবিচারে আচন্ডালে জাতপাত ধর্ম নির্বিশেষে সকল জীবকে কোলে নিয়ে পার করাই নিত্যানন্দের স্বভাব। হে জীব! তোমরা কি এ মহাসুযোগ গ্রহণ করবে না?

শ্রীশ্রী নিত্যানন্দের তীর্থ-ভ্রমণ

শ্রীশ্রীনিত্যনন্দ প্রভুর তীর্থ ভ্রমণ সম্পর্কে শ্রীশ্রীচৈতন্যভাগবতে—

"হেন মতে দ্বাদশ বৎসর থাকি ঘরে।
নিত্যানন্দ চলিলেন তীর্থ করিবারে।
তীর্থযাত্রা করিলেন বিংশতি বৎসর।
তবে শেষে আইলেন চৈতন্যগোচর ॥

শ্রীপাদ ঈশ্বরপুরী (মতান্তরে শঙ্করাবণ) চৈতন্যাগ্রজ স্বপ্নাদিষ্ট হয়ে শ্রীহাড়াই পণ্ডিত ভবনে গমন করে তীর্থসেবক হিসাবে ১৪০৭ শকে প্রভুনিত্যানন্দকে চেয়ে নিয়ে বহুতীর্থ পরিভ্রমণ করেন। যে বৎসর ফাল্গুনী পূর্ণিমায় শ্রীচৈতন্যের জন্ম, ঐবৎসর পৌষমাসে প্রভু নিত্যানন্দ গৃহত্যাগ করেন।

যাত্রাপথ ঃ—একচক্রা-বক্রেশ্বর-বৈদ্যনাথ-গয়া-কাশী-প্রয়াগ (মাঘ মাসে প্রাত্ স্নান) মথুরা (যমুনায় বিশ্রামঘাট দর্শন) গিরিগোবর্ধন-দ্বাদশবন ভ্রমণ-গোকুল-হস্তিনাপুর—দ্বারকা-সিদ্ধপুর (কপিলমুনির স্থান) মৎস্যতীর্থ-শিবকাঞ্চী বিষ্ণুকাঞ্চী-কুরুক্ষেত্র-পৃথুদক-বিন্ধ্যসরোবর-প্রভাস (সুদর্শন তীর্থ), ত্রিতকূপ-বিশালা-ব্রহ্মাতীর্থ : চক্রতীর্থ-প্রাতস্রোতা (প্রাচী সরস্বতী)-নৈমিষারণ্য-

অযোধ্যা-গুহক চণ্ডাল রাজ্য (তিনদিন) সরযূ-কৌশিকী স্নান (রামচন্দ্র গমনকৃত বনভ্রমণ), পুলজ আশ্রম (গোমতী, গণ্ডকী, শৈলতীর্থে স্নান) মহেন্দ্রপতি শিখর (পরশুরাম স্থান) হরিদ্বার-পম্পা-ভীমরথী-সপ্তগোদাবরী-রেম্বতীর্থ, বিপাশায় স্নান—কার্তিক দর্শন-শ্রীপর্বত (এখানে শিব-পার্বতী দর্শন করেন।) দ্রাবিড়—বেঙ্কটনাথ দর্শন করে কামকোষ্ঠীপুর-কাঞ্চিপুরী-কাবেরী শ্রীরঙ্গ নাথ-হরিক্ষেত্র-ঋষভ পর্বতঃ। দক্ষিণ মথুরা-কৃতমালা-তাম্রপর্ণী-যমুনা উত্তরা মলয় পর্বত (অগস্ত্য আলয়) বদরীকাশ্রম-নন্দীগ্রাম (ব্যাসের আলয়), বৌদ্ধভবন-কন্যকানগর (দুর্গাদেবী) দক্ষিণসাগর-অনন্তপুর-পঞ্চ অপ্সরা সরোবর-গোকন্যাখ্য (শিবমন্দির) কুলাচল-ত্রিগর্তক-দ্বৈপায়নী আর্য্যা-নির্বিন্ধ্যা-পরোষ্ণি-তাপীবেরা-মাহেষ্মতী-মল্লতীর্থ-সুপারক দিয়ে প্রতীচী গমন করেন। মাধেবেন্দ্র মিলন ঘটে-সেতুবন্ধ-রামেশ্বর-বিজয়নগর-মায়াপুরী-অবন্তী-গোদাবরী-জিওড়া-নৃসিংহদেবপুরী-ত্রিমল্ল-কূর্মনাথ-নীলাচল গঙ্গাসাগর-মথুরা তৎপরে বৃন্দাবনে এসে অবস্থান করেন। তথাহি প্রেম বিলাসে—

সর্বতীর্থ ভ্রমি শ্রীনিত্যানন্দ রায়।
চলিলেন বৃন্দাবনে আনন্দ হিয়ায় ॥
দ্বাদশ বন ভ্রমি করে কৃষ্ণ অন্বেষণ
ঈশ্বর পুরী সহ পুনঃ হইল মিলন ॥
প্রণমিয়া কহে গুরু কৃষ্ণ গেলা কোথা।
বোলেন ঈশ্বর পুরী নবদ্বীপ যথা ॥

শ্রীপাদ নিত্যানন্দ ঈশ্বরপুরীর সমীপে শ্রীগৌরাঙ্গ প্রকটবার্তা শুনে নবদ্বীপে আগমন করেন। এইরূপে শ্রীনিত্যানন্দ প্রভু বিংশতি বৎসর তীর্থ পরিভ্রমণ লীলা করেন এবং বিশাখার চিত্রপট নিয়ে শান্তিপুর আসেন।

নিত্যানন্দ সন্ন্যাসী হয়েও গৃহস্থের বাড়িতে বাস করতেন। বৈষ্ণবমণ্ডলীতে থেকেও বিলাস ব্যসনে তাঁর আসক্তি ছিল। তিনি ভাল ভাল গয়নাগাটি পরতেন এবং কর্পূর সহযোগে পান খেতেন। সে যাই হোক না কেন বাধাবন্ধনহীন আচরণের জন্যই বোধ হয় নিত্যানন্দ অতিশয় লোকপ্রিয় হয়েছিলেন। সাধারণ লোকের মধ্যে তখন বৌদ্ধ সহজপন্থী, নাথপন্থী, বৈষ্ণব সহজপন্থী ও তান্ত্রিক গুহ্য সম্প্রদায়ের ব্যাপক প্রভাব ছিল। এই সকল সম্প্রদায়ের অনুগামীরাই নিত্যানন্দের ভেদহীন উদার মেলামেশার ফলে বিশেষভাবে আকৃষ্ট হয়ে হরিনাম প্রেমে মাতোয়ারা হয়েছিল। কিন্তু ভক্তিধর্ম প্রচারে নিত্যানন্দের বাধাবন্ধনহীন আচরণ ও কাজকর্ম অনেকের ভাল লাগে নি। তাঁরা এজন্য চৈতন্যদেবের কাছে অভিযোগও করেছিলেন।

অদ্বৈত আচার্য জগদানন্দ পণ্ডিতের হাতে নীলাচলে একটা তরজা লিখে পাঠিয়েছিলেন—

'বাউলকে কহিও লোকে হৈল আউল।
বাউলকে কহিও হাটে না বিকায় চাউল ॥
বাউলকে কহিও কাজে নাহিক আউল।
বাউলকে কহিও ইহা কহিয়াছে বাউল। ॥ (চৈ. ভা. ৩/৭)

এই তর্জায় নিত্যানন্দ সম্পর্কে কটাক্ষ আছে বলে কেউ কেউ মনে করেন। নিত্যানন্দ সামাজিক রীতিনীতি উপেক্ষা করে যেভাবে প্রচার করছেন, তাতে সবকিছু আউলিয়ে (উল্‌টপালট) হয়ে যাচ্ছে। লোকসংঘট্ট করে নির্বিচারে প্রেমভক্তি প্রচার করা ঠিক নয়। মনে হয় চৈতন্য মহাপ্রভুও নিত্যানন্দের এইরকম কাজকর্ম সম্পূর্ণভাবে সমর্থন করতে পারেন নি।

একবার রথযাত্রায় নিত্যানন্দ নীলাচল গেলে বলেছিলেন,

'তুমার গৌড়রাজ্যে কার অধিকার নাঞি।'

কিন্তু, "কর্তাল মৃদঙ্গ যন্ত্র মাল্য চন্দনে।
শিঙ্গা বেত্র গুঞ্জাহারে নূপুর আভরণে।
মহোৎসবে নিত্যানন্দ নাচে সঙ্কীর্তনে ॥"
"হেনবুদ্ধি তুমারে দিলেক কোন জনে ॥ (জয়ানন্দের চৈ.ম. ৯/১০১-১০৩)

এতে 'শুনি নিত্যানন্দ গোঁসাই হাসি হাসি কহে।
কাঠিন্য কীর্তন কলিযুগ ধর্ম নহে ॥' (ঐ)

এ শোনার পর চৈতন্যদেব আর আপত্তি করেন নি। নিত্যানন্দ ছিলেন অতিশয় উদ্যমশীল এবং অক্লান্ত পরিশ্রমী। চৈতন্যদেবের নামে প্রেমভক্তি প্রচারে তিনি সর্বদা মেতে থাকতেন। বাঙ্গলায় গৌর পারম্যবাদের তিনিই ছিলেন সবচেয়ে বড় প্রবক্তা।

'দ্বাদশ বৎসর গৃহাশ্রমে করি বাস।
বিংশতি বৎসর কৈল তীর্থেতে বিলাস ॥
ছত্রিশ বৎসর করি গৌর প্রেমদান।
চৌদ্দশ তেষট্টি শকে করিল প্রয়াণ ॥'
"একদিন শান্তিপুরে অদ্বৈত আচার্য্য
গৌর গুণ স্মরি প্রেমে হইলা অধৈর্য ॥
হেন কালে পত্রী আইল খড়দহ হৈতে।
লিখিলা শ্রীনিত্যানন্দ আচার্য্যে যাইতে"

পত্র পেয়ে অদ্বৈত আচার্য গেলেন খড়দহে, সেখানে—

"ক্রমে সপ্তরাত্রি দুঁহে বসিয়া নির্জনে।
কিবা কথাবার্তা কহে কেহ নাহি জানে ॥
অষ্টম দিবসে শ্রীঅদ্বৈত মহারঙ্গে।
গৌরগুণ কীর্তন করয়ে ভক্তসঙ্গে ॥
মধ্যে নাচে নিত্যানন্দ প্রেমে আগোয়ান।
শ্রীগৌরাঙ্গ পাদপদ্ম করিয়া ধেয়ান ॥
যতেক মহান্ত প্রেমে বাহ্য পাশরিলা।
অলক্ষ্যোতে নিত্যানন্দ অন্তর্ধান কৈলা ॥"

জয়ানন্দের চৈতন্যমঙ্গলের উত্তরখণ্ডে :

"আশ্বিন মাসেতে যোগ কৃষ্ণাষ্টমী তিথি।
নিত্যানন্দ বৈকুণ্ঠ চলিলা ছাড়ি ক্ষিতি ॥"

নিত্যানন্দ চরিতামৃতে—

"নিরন্তর খড়দহে অভ্যন্তরে স্থিতি।
শ্যামসুন্দরেও কভু দেখে গৌর মূর্তি ॥
কে কহিতে পারে নিত্যানন্দের প্রভাব।
মন্দিরে প্রবেশ করি কৈলা তিরোভাব ॥
পুনঃ প্রভু মনে ভাবি প্রবোধ হইলা।
বসু -জাহ্নবারে লৈয়া গমন করিলা ॥
তথা হৈতে একচক্রা করিল গমন।
বঙ্কিম দেবেরে গিয়া করে দরশন ॥
কতদিন বঙ্কিম দেবেরে দেখি তথা।
বঙ্কিম দেবে অন্তর্ধান হৈলা সেথা ॥"

শ্রীশ্রীঅদ্বৈত আচার্য্য প্রভু

"ব্রজে আবরণরূপ সদাশিব ব্যূহ।
চৈতন্য অভিন্ন তনু শ্রীঅদ্বৈত তেঁহ ॥"

অদ্বৈত আচার্য ১৩৫৬ শকাব্দে মাঘ মাসের শুক্লা সপ্তমীতে শ্রীহট্টের লাউর বা নবগ্রাম পরগণায় আবির্ভূত হন। পিতার নাম কুবের পণ্ডিত, মাতা লাভাদেবী। কুবের পণ্ডিত লাউরের রাজা দিব্য সিংহের অমাত্য ছিলেন। কুবের পণ্ডিতের ছয়পুত্র ও এককন্যা। কন্যাটি শৈশবে মারা যায়। পুত্রদের নাম—শ্রীকান্ত, লক্ষ্মীকান্ত, হরিহরানন্দ, সদাশিব, কুশলদাস ও কীর্তিচন্দ্র। এই ছয়পুত্র তীর্থ পর্যটনে গিয়ে চারজন মারা যান। দুজন ফিরে আসেন। পুত্রশোকে কাতর হয়ে তাঁরা শান্তিপুরে চলে আসেন। অদ্বৈত আচার্যও শান্তিপুরে আসেন কিন্তু রাজ আজ্ঞায় সকলে লাউরে ফিরে যান। পরে বার বৎসর বয়সে অদ্বৈত আচার্য শান্তিপুরে আসেন এবং ফুল্লবটী (ফুলিয়া) গ্রামের শান্তাচার্যের নিকট বেদ পাঠ করেন। পিতামাতার অন্তর্ধানের পর শ্রীঅদ্বৈত পিতৃপিণ্ডদান উপলক্ষে গয়া যান। সেখান হতে নাভিগয়া যান। পরে ক্ষেত্রপথে রওনা হন।

শ্রীঅদ্বৈত্যের তীর্থভ্রমণ : গয়া, রেমুনা (গোপীনাথের মন্দির)-নাভিগয়া-জগন্নাথ-সেতুবন্ধ পথে গোদাবরী স্নান-শিবকাঞ্চী-বিষ্ণুকাঞ্চী, পরে কাবেরীতে স্নান-পাপনাশন-দক্ষিণ মথুরা-সেতুবন্ধ-ধেনুতীর্থ-মাধবাচার্যস্থান-দণ্ডকারণ্য-দ্বারকা প্রভাস-পুষকবাদি-কুরুক্ষেত্র-হরিদ্বার-বদরিকাশ্রম-গোমুখী পর্বত-শ্রীগণ্ডকী-মিথিলা (বিদ্যাপতিসহ মিলন) অযোধ্যা-বারাণসী-প্রয়াগ-মথুরা-বৃন্দাবনে মদনগোপাল প্রকট লীলা ও দ্বাদশ বন ভ্রমণ পরে বিশাখার চিত্রপট নিয়ে শান্তিপুরে আগমন। শান্তিপুর আসবার আগে তিনি মদনমোহনকে চৌবের হস্তে অর্পণ করেছিলেন। এবং গণ্ডকী হতে শালগ্রাম শিলা ও বিশাখার নির্মিত চিত্রপট এনেছিলেন। কিছুদিন পর যখন মধবাচার্য বৃন্দাবনের গোপালের জন্য চন্দন সংগ্রহার্থে নীলাচল আসছিলেন সে সময় শান্তিপুরে অদ্বৈত আচার্যকে দীক্ষার্পণ করেন। এর পর সপ্তগ্রাম নিবাসী নৃসিংহ ভাদুরীর দুই কন্যা শ্রী ও সীতাদেবীকে বিবাহ করেন। তাঁহাদের তিনপুত্র ও এক কন্যা হয়। আচার্যের আরাধনায় শ্রীশ্রী নিতাই গৌরাঙ্গদেব সপার্ষদে অবতীর্ণ হয়ে ত্রিভুবন উদ্ধার করেন। গৌরাঙ্গসহ লীলাবিহার করে শ্রীচৈতন্যের অন্তর্ধানের পঁচিশ বৎসর পর অদ্বৈত আচার্য লীলা সম্বরণ করেন।

"তবে প্রভু কহে এই পাইনু গৌরাঙ্গ।
কদম্ব কুসুম সম হৈল তাঁন অঙ্গ॥
হঠাৎ মদনগোপালের শ্রীমন্দিরে গেলা।"
প্রাকৃতজনের প্রভু অগোচর হৈলা ॥" (অদ্বৈত প্রকাশ)

তাঁর বিরহে সকলে কাঁদতে লাগলেন। পুত্র অচ্যুতানন্দ মহোৎসব করেন।
আসুন আমরা প্রেমগদগদ্‌চিত্তে বলি :—

"যদ্‌হুঙ্কারৈঃ প্রেমসিন্ধোর্বিকারৈ
রাকৃষ্টঃ সন্ গৌর গোলোকনাথঃ।
আবিভূতঃ শ্রীনবদ্বীপ-মধ্যে
শ্রীলাদ্বৈতাচার্যমেতং প্রপদ্যে ॥"

"শ্রীশ্রী গদাধর পণ্ডিত"

"নবোজ্জ্বলাদি-ভাবনা-বিধান-কর্ম্ম-পারগং
বিচিত্র গৌরভক্তিসিন্ধু-রঙ্গভঙ্গ-লাসিনম্।
সুরাগ-মার্গ-দর্শকং বজ্রাদি-বাস-দায়কং
ভজাম্যহং গদাধারং সুপণ্ডিতং গুরুং প্রভুম ॥"

চট্টগ্রামের বেলেটিগ্রামে শ্রীগদাধর পণ্ডিতের জন্মভূমি। পিতার নাম মাধব, মাতার নাম রত্নাবতী।

"বৈশাখের অমাবস্যা তিথি শুভক্ষণ।
আবির্ভূত গদাধর পতিতপাবন "

গদাধর নবদ্বীপে এসে বাস করেন। গৌরাঙ্গের সঙ্গে তিনি অধ্যয়ন করেন। শ্রীশ্রীগৌরাঙ্গের সঙ্গে কীর্তন বিলাস করে নীলাচল গমন করেন। মহাপ্রভু তখন তাঁকে যমেশ্বর টোটায় অবস্থানের নির্দেশ দেন। টোটাকথার অর্থ উদ্যান। শ্রীগদাধর পণ্ডিত যমেশ্বর টোটায় শ্রীগোপীনাথের সেবা স্থাপন করেন। একদা মহাপ্রভু গদাধরের মুখে শ্রীমদ্ভাগবতের রাসলীলা শ্রবণকালে রাসে কৃষ্ণের অন্তর্ধান কাহিনী চিন্তা করে ভাবাবেশে সমুদ্রোকূলে উপনীত হন। সেখানে বিরহিনী ভাবে বালুকা খনন করতে শ্রীমতী সহ গোপীনাথ ও ললিতা দেবীর মূর্তি প্রকট করেন।

মহাপ্রভু প্রায় প্রতিদিনই টোটায় গিয়ে অপরাহ্নে গদাধর পণ্ডিতের নিকট শ্রীমদ্ভাগবত পাঠ শ্রবণ করতেন। এখানেই নিত্যানন্দসহ ভোজনবিলাস হয়েছিল। একদিন—

"প্রভু কহে শুন ওহে পণ্ডিত গোঁসাই।
কি বা লিখিতেছ গ্রন্থ কহ মোর ঠাঁই ॥
পণ্ডিত বোলে গীতা করিতেছি লিখন।
শুনি প্রভু তাঁর হাত হৈতে গীতা কাড়িলন ॥
পুঁথি লইয়া এক শ্লোক লিখিলা তাহাতে।
লেহ গদাধর বলি দিলা তাঁর হাতে।"

মহাপ্রভুর অন্তর্ধান বিষয়ে ভক্তিরত্নাকরে—

"ওহে নরোত্তম এইখানে গৌরহরি।
না জানি কি পণ্ডিতে কহিল ধীরিধীরি ॥
দোঁহার নয়নে ধারা বহে অতিশয়।
তাহা নিরখিতে দ্রবে পাষাণ হৃদয় ॥
ন্যাসী শিরোমনি চেষ্টা বুঝে সাধ্যকার।
অকস্মাৎ পৃথিবী করিলা অন্ধকার।
প্রবেশিয়া এই গোপীনাথের মন্দিরে।
হৈলা অদর্শন পুন না আইলে বাহিরে।"

পণ্ডিত গদাধরের ভ্রাতুষ্পুত্র নয়নানন্দ গদাধর পণ্ডিতের তিরোধানকালে নীলাচলে ছিলেন।

"পণ্ডিত গোঁসাইপ্রভুর অপ্রকট সময়। / নয়নানন্দের ডাকি এই কথা কয় ॥
মোর গলদেশে থাকিত এই কৃষ্ণমূর্তি।/ সেবন করিহ সদা করি অতি প্রীতি ॥
তোমায় অর্পিলা এই গোপীনাথের সেবা।/ ভক্তিভরে সেবিবে না পূজিবে অন্য দেবীদেবা॥
স্বহস্তে লিখিত এই গীতা তোমায় দিলা। / মহাপ্রভু একশ্লোক ইহাতে লিখিলা ॥
ভক্তিভাবে ইহা তুমি করিবে পূজন। / এতকহি পণ্ডিত গোঁসাই হৈলা অদর্শন ॥

নয়ন পণ্ডিত গোঁসাঞির অন্ত্যেষ্টি ক্রিয়া করি।/ রাঢ়দেশে ভরতপুরে করিলেন বাড়ি ॥

অদ্যাপি শ্রীপাট ভরতপুরে (নয়নানন্দের শ্রীপাট) শ্রীশ্রীরাধা গোপীনাথ সেবা, গীতা গ্রন্থ, পণ্ডিত গোঁসাঞির গলদেশেস্থিত শ্রীকৃষ্ণমূর্তি" (ময়ো কৃষ্ণ) নাম ধারণ করে বিরাজিত আছেন।

শ্রীবাস

"শ্রীবাস-পণ্ডিতং নৌমি গৌরাঙ্গ প্রিয়-পার্ষদম্।
যস্য কৃপালবে নাপি গৌরাঙ্গে জায়তে রতিঃ ॥"

শ্রীবাস পণ্ডিত পঞ্চতত্ত্বের অন্যতম। নবদ্বীপে শ্রীবাস গৃহে শ্রীগৌরাঙ্গ দেবের মহাপ্রকাশ লীলা সংঘটিত হয়। শ্রীবাস গৃহেই সংকীর্তন বিলাসের শুভসূচনা। তিনি শ্রীহট্টের লোক। শ্রীবাস পণ্ডিতের পিতার নাম জলধর পণ্ডিত। জলধর পণ্ডিতের পাঁচপুত্র—নলিন, শ্রীবাস, রামাই, শ্রীপতি ও শ্রীনিধি। গৌরাঙ্গদেবের সন্ন্যাস গ্রহণের পর শ্রীবাস হালিশহরে এসে বাস করেন। নলিনী পণ্ডিতের কন্যাই নারায়ণী। বৃন্দাবন দাস নারায়ণীর পুত্র। শ্রীবাসের বাস ছিল কুমারহট্টে এবং নবদ্বীপে ; তবে বেশির ভাগ নবদ্বীপেই বাস করতেন। একদিন শ্রীবাস নৃসিংহ পূজা করে ধ্যানরত অবস্থায় আছেন, তখন মহাপ্রভু গিয়ে বলেন—"আমারে পূজহ।" আর শ্রীবাস শঙ্খ, চক্র, গদা পদ্মাধারী নারায়ণকে দেখতে পান।

শ্রীবাস পণ্ডিতের পত্নীর নাম মালিনী দেবী। শ্রীবাস গৃহে এক বৎসর কীর্তন করে মহাপ্রভু জীব উদ্ধারে বাহির হন। একদিন গৌরাঙ্গ শ্রীবাস ভবনে কীর্তন করছেন এমন সময় তাঁর পুত্র মারা যায়। শ্রীবাস বাড়ির ভিতরে এসে বলেন "যতক্ষণ কীর্তন চলে, ততক্ষণ কেউ কাঁদবে না।' বলে এসে কীর্তন মণ্ডপে নাচতে লাগলেন। অনন্তর গৌরাঙ্গ কৃপায় ক্ষণেকের জীবন পেয়ে বলেছিল

"মৃতপুত্র বলে, ইহা বিধির বিধান।
হেথা রহিবার ভাগ্য ছিল যতদিন।
পুনঃ যাই অন্য স্থানে রহি ততদিন ॥"

মহাপ্রভু নীলাচলে চলে গেলে শ্রীবাস ব্যথিত অন্তরে কুমারহট্টে থাকেন। মহাপ্রভু ভক্ত দুঃখ মোচনের জন্য বৃন্দাবন যাত্রাস্থলে পানিহাটী থেকে সেখানে যান। রামকেলী হতে ফেরার পরেও মহাপ্রভু শ্রীবাস ভবন যান এবং কয়েকদিন অবস্থান করেন। এই সময় শ্রীবাসকে মহাপ্রভু জিজ্ঞাসা করেন—"তুমি সবসময় কৃষ্ণপ্রেমে ডুবে থাক ; সংসার চলে কি করে?" শ্রীবাসের উত্তর—"ভাগ্যে থাকলে পাব, আর যদি তিনদিন কিছু না পাই তবে গলায় ঘট বেঁধে গঙ্গায় ডুবব।" তখন মহাপ্রভু বললেন, "যদি লক্ষ্মীকেও ভিক্ষা করতে হয়, তবুও তোমার ঘরে দারিদ্র্য হবে না।"

ষড়্‌গোস্বামী : সনাতন

গৌড়ের সুলতান হোসেন শা। রাজকর্মচারী শ্রীরূপ ও সনাতন। সনাতন সুলতানের সাগীর মালেক। (ছোট প্রভু অর্থাৎ মুখ্যমন্ত্রী) পূর্বনাম অমর। আর রূপ দবীর খাস (একান্ত সচিব বা Private Seceretary)। সুলতান হুসেন শাহ গৌড় সিংহাসন অধিকার পূর্বক দেশের অরাজকতা অনেকাংশে দূর করেছেন, তথাপি নেতৃহীন হিন্দুসমাজ তখন প্রায় ধ্বংসের মুখে। সমাজের অবহেলায় রাজার স্বজাতি হওয়ার প্রলোভনে, অভাবের তাড়নায়, চাকুরীর আকর্ষণে,

দলে দলে লোক মুসলমান হয়ে যাচ্ছিল। যদিও রূপ সনাতন সুলতানের কর্মচারী, রাজঅমাত্যরূপে রাজ্যের শীর্ষদেশে অধিষ্ঠিত তথাপি অসহায় দর্শকের মত নিতান্ত নিরুপায়ে এ দৃশ্য তাদেরকে দেখতে হত। অকস্মাৎ তাঁরা শুনলেন অসাধারণ প্রতিভাসম্পন্ন, অশেষ শাস্ত্র পারদর্শী, কূটতার্কিক গর্বোদ্ধত নিমাই পণ্ডিত সন্ন্যাস গ্রহণ করেছেন। আরও শুনলেন দাক্ষিণাত্য পর্যটনের পর সম্প্রতি বাঙ্গলায় এসেছেন। সন্ন্যাসীদের একবার জন্মভূমি দর্শন করতে হয়। তাই তিনি বাঙ্গালায় এসেছেন। অপর একটি উদ্দেশ্যে বৃন্দাবন যাত্রা। বৃন্দাবন যাত্রাপথে মহাপ্রভু বাঙলার রাজধানী গৌড়নগরীর উপকণ্ঠে, রামকেলীতে শুভাগমন করেছেন। গৌরাঙ্গ যখন মধুর কণ্ঠে হরি কীর্তন করতেন, তখন গৌরাঙ্গের স্বর্ণকান্তি বর্ণ, সুমধুর কণ্ঠ অষ্টসাত্বিকভাব দেখে কাতারে কাতারে লোক তাঁকে ঘিরে দাঁড়াত। রামকেলীতেও সেই একই দৃশ্য। অসংখ্য লোক সমাগমের কথা শুনে হোসেন শা সেনাপতি কেশবছত্রীকে পাঠালেন ব্যাপারটা জেনে আসতে। ছত্রীও মহাপ্রভুর একজন অন্তরঙ্গ ভক্ত। আসল সংবাদ গোপন করে তিনি খবর দিলেন। "দেখলাম তরুতলে একজন সামান্য ভিক্ষুক নেচে গেয়ে ভিক্ষা করে বেড়াচ্ছে দু চার জন লোক তাই দেখতে এসেছে।" গোপন করার কারণ যদি সুলতান মুসলমান মৌলবীদের কুপরামর্শে মহাপ্রভুর কোন ক্ষতিসাধন করেন। হোসেন শাহ সুচতুর। তিনি বললেন, 'সেনাপতি, তুমি কাকে ভিক্ষুক বলছ? আমিতো দেশের রাজা, কিছুদিন বেতন দিতে দেরী হলে আমার বিরুদ্ধে বিদ্রোহ হবে। আর ঘরের খেয়ে বিনা দানে ঐ হাজার হাজার লোক যার অনুসরণ করছে তাকে তুমি বলছ ভিক্ষুক। যা হোক আমার আদেশ, কাজী বা কোটাল কেউ যেন তাঁর কাজে বাধা না দেয়।'

রূপ ও সনাতন এই দিনেরই প্রতীক্ষা করছিলেন। দুই ভাই পরামর্শ করে স্থির করলেন রাজকার্য ত্যাগ করে, সংসার ছেড়ে মহাপ্রভুর চরণেই আত্মসমর্পণ করতে হবে। উদ্যোগ আরম্ভ হয়ে গেল. রাত্রি দ্বিপ্রহর। রামকেলী নিস্তব্ধ। শুধু হরি সংকীর্তনের মৃদু গুঞ্জন দূর হতে বাতাসে ভেসে আসছে। সনাতনকে মহাপ্রভুর নিকট নিয়ে এলেন নিত্যানন্দ এবং হরিদাস। তাঁরা কাঁদতে কাঁদতে বললেন—

"নীচ জাতি নীচ সঙ্গী করি নীচ কাজ।
তোমার অগ্রেতে প্রভু কহিতে বাসি লাজ ॥
পতিত তারিতে প্রভু তোমার অবতার।
আমা বই পতিত জগতে নাহি আর ॥"

মহাপ্রভু আলিঙ্গন দিয়ে দুই ভাইকে কোলে তুলে নিলেন। বললেন, তোমাদের জন্যই আমার রামকেলী আসা। এখন নিশ্চিন্ত হয়ে ঘরে যাও' অচিরেই শ্রীকৃষ্ণ তোমাদের উদ্ধার করবেন। ভক্তমণ্ডলী জয়ধ্বনি করে উঠল। যাওয়ার সময় বলে গেল—

"ইঁহা হইতে চল প্রভু ইঁহা নাহি কাজ।
যদ্যপি তোমারে ভক্তি করে গৌড় রাজ ॥
তথাপি যবন জাতি না করি প্রতীতি।
তীর্থযাত্রায় এত সংঘট্ট ভাল নহে রীতি ॥" তখন,
"প্রভুর সেই গ্রাম হৈতে চলিতে হৈল মন ॥

পরদিন প্রভাতে সনাতনের জন্য দশ সহস্র মুদ্রা একজন বিশ্বস্ত মুদীর নিকট রেখে রূপ কনিষ্ঠ ভ্রাতাকে নিয়ে চলে গেলেন। অসুস্থতার অছিলায় সনাতন রাজকার্যে না গিয়ে ঘরে বসে পণ্ডিতদের সঙ্গে শাস্ত্রালোচনায় রত থাকলেন। হোসেন রাজবৈদ্য পাঠিয়ে জানতে পারলেন কোন অসুখ নয়। স্বয়ং এসে অনুরোধ করা সত্ত্বেও সনাতন না যাওয়ায় সুলতান তাঁকে বন্দী করে রাখলেন।

সুলতান ওড়িশায়। সৈন্যবাহিনীর সঙ্গে প্রধান প্রধান কর্মচারীও অনুপস্থিত। সুযোগ বুঝে কারা রক্ষীকে প্রচুর অর্থ দিয়ে বশীভূত করে কারাগার হতে পলায়ন করলেন। সুন্দরী তরুণী ভার্যা, প্রচুর অর্থ, আরামের অজস্র উপকরণ, প্রভূত ক্ষমতা, দেশ জোড়া সম্মান—সব ছেড়ে পথের ভিখারী সাজলেন। সনাতন হাজীপুরে এসে এক বৃক্ষতলে বিশ্রাম করছেন এমন, সময় তাঁকে চিনতে পেরে ভগিনীপতি শ্রীকান্ত এসে হাজির হলেন। তিনি বঙ্গেশ্বরের জন্য ঘোড়া কিনতে হাজীপুর এসেছিলেন। সনাতনের কারারুদ্ধ হওয়ার খবর তিনি জানতেন। তাঁকে দেখে অত্যন্ত আনন্দিত হলেন কিন্তু একরাত্রিও রাখতে পারলেন না। বিশেষ অনুরোধে একখানি ভোটকম্বল গ্রহণ করলেন। কতদিন পরে সনাতন কাশীধামে উপনীত হলেন এবং জানতে পারলেন প্রভু চন্দ্রশেখর ভবনে আছেন। তিনি চন্দ্রশেখরের দুয়ারে বসলেন। অন্তর্যামী ভগবান জানতে পেরে চন্দ্রশেখরকে বললেন, দ্বারে একজন বৈষ্ণব বসে আছেন, তাঁকে নিয়ে এস। চন্দ্রশেখর বৈষ্ণব দেখতে পেলেন না, দেখলেন পথ শ্রমে ক্লান্ত, জীর্ণ বস্ত্র পরিহিত একজন দরবেশকে। প্রভু তাঁকেই আনতে বললেন। সনাতনকে দেখে মহাপ্রভু জড়িয়ে ধরে তাঁর উদ্ধার বার্তা জিজ্ঞাসা করলেন এবং বললেন সনাতন কৃপাপারাবার কৃষ্ণ তোমাকে উদ্ধার করেছেন। এর পর সনাতন মাধুকরী করে জীবন ধারণ করতে থাকেন। মহাপ্রভু সন্তুষ্ট হলেও ভেটকম্বলের দিকে তাঁর নজর পড়ল। মহাপ্রভুর অভিপ্রায় বুঝে তিনি গৌড়দেশীয় একজন সাধুর নিকট হতে তাঁর জীর্ণ কাঁথাখানি চেয়ে নিয়ে তাঁকে ভোটকম্বলটি দিয়ে দিলেন। এতে মহাপ্রভু আশীর্বাদ দিয়ে সনাতনকে বললেন, তোমার শেষ বিষয়ব্যাধি আরোগ্য হল। তিন টাকার ভোট গায়ে দিয়ে মাধুকরীতে তোমার ধর্মহানি হত, লোকেও উপহাস করত।

মহাপ্রভু প্রায় দুইমাস কাশীতে ছিলেন। সনাতনও ছিলেন। অবশেষে মহাপ্রভু পুরী যাত্রা করলেন, আর আদেশ পেয়ে সনাতন গেলেন বৃন্দাবনের দিকে। কিছুদিন বৃন্দাবন বাসের পর সনাতন মহাপ্রভুকে দেখবার জন্য পুরী এলেন। উঠলেন হরিদাসের কুটীরে। ঝাড়খণ্ডের পথে বন্য ফলমূল ভক্ষণে ও দূষিত জলপানে সনাতনের সর্বাঙ্গে চুলকানি হয়েছিল এবং পূজরক্ত পড়ত। মহাপ্রভু সনাতনকে দেখেই আলিঙ্গন করলেন। সনাতন সন্ত্রস্ত হলেন। নিষেধ সত্ত্বেও মহাপ্রভু ক্লেদাক্ত শরীর আলিঙ্গন করেন। তাই আগামী রথযাত্রায় রথের তলায় পড়ে প্রাণ বিসর্জন করবেন, মহাপ্রভু জানতে পেরে বললেন—

"কুবুদ্ধি ছাড়িয়া কর শ্রবণ কীর্তন।
অচিরাতে পাবে তুমি কৃষ্ণ প্রেম ধন ॥"

সনাতন বুঝতে পারলেন দেহত্যাগ মহাপ্রভুর অভিপ্রেত নয়।

তিনি বললেন, আমার এই অপবিত্র দেহ তোমার কোন্ কাজে লাগবে?

"প্রভু কহে তোমার দেহ মোর নিজ ধন।
তুমি মোরে করিয়াছ আত্মসমর্পণ।
পরের দ্রব্য তুমি কেনে চাহ বিনাশিতে।
ধর্মাধর্ম বিচার কিবা না পার করিতে ॥"

সনাতনকে বললেন, 'তোমার দেহকে তুমি বীভৎস মনে করছ, কিন্তু আমার অমৃত মনে হচ্ছে। সন্ন্যাসী আমি, সমদৃষ্টিই আমার ধর্ম। আমি আনন্দ পাই বলেই সনাতনকে আলিঙ্গন করি', এই বলে পুনরায় তিনি সনাতনকে আলিঙ্গন করলেন। সনাতনের ক্লেদযুক্ত দেহ ক্লেদমুক্ত হল। দেহ যেন স্বর্ণবর্ণ হয়ে উঠল। দোলযাত্রা দেখে সনাতন বৃন্দাবন যাত্রা করলেন। বৎসারাধিক পরে শ্রীরূপ বৃন্দাবনে এসে মিলিত হয়েছিলেন। জগদানন্দ একবার বৃন্দাবন গিয়েছিলেন। জগদানন্দ নীলাচল প্রত্যাবর্তন কালে সনাতন মহাপ্রভুর জন্য বৃন্দাবনের

রাসস্থলীর বালু, গিরি গোবর্ধনের শিলা, শুষ্ক পক্ক পিলু ফল আর গুঞ্জামালা ভেট দিলেন। মহাপ্রভু রাসস্থলীর বালু আদি রেখে ভক্তগণের মধ্যে পিলুফলগুলি বিতরণ করলেন। গৌড়ের ভক্ত যাঁরা পিলুফল খেতে জানেন না তাঁরা পিলু চিবিয়ে খেতে গিয়ে অপ্রস্তুত হলেন।

"মুখে তার ছলি গেল জিহ্বায় লালা।
বৃন্দাবনের পিলু খাইতে এই এক লীলা ॥"

বর্ধমান জেলার মানকরের এক দরিদ্র ব্রাহ্মণ জীবন চক্রবর্তী সনাতনের নিকট গিয়ে কিছু অর্থ প্রার্থনা করেছিলেন। সনাতন বললেন, 'আমি একজন সামান্য ভিক্ষুক আমি কি দিতে পারি!' ব্রাহ্মণ ভগ্নহৃদয়ে ফিরে আসছেন এমন সময় তাঁকে ডেকে বললেন—'একদিন একটা পরশপাথর পেয়েছিলাম কারও কাজে লাগতে পারে বলে যমুনার বালিতে পুঁতে রেখেছিলাম। দেখ দেখি সেটাতে কোন কাজ হয় কিনা।' জীবন পরশমণি পেয়ে স্তম্ভিত হয়ে গেলেন। জীবন মহামূল্য পরশমণি যমুনার জলে ফেলে দিয়ে বল্লেন,

'যে ধনে হইয়া ধনী, মণিরে মাননা মণি
তাহার খানিক মাগি আমি নত শিরে।
এত বলি নদীতীরে ফেলিলা মানিক।'

শ্রীরূপ গোস্বামী

শ্রীসনাতন গোস্বামী সম্বন্ধে আলোচনায় শ্রীরূপের কথাও বলা হয়েছে। শ্রীরূপ গোস্বামীও ছিলেন সুলতান হোসেন শাহের পদস্থ কর্মচারী দবিরখাস বা private Secretary। শ্রীগৌরাঙ্গ মহাপ্রভুর রামকেলী আগমন সংবাদে তিনিও শ্রীসনাতন গোস্বামীর সঙ্গে তাঁর নিকট উপস্থিত হন এবং সংসার বন্ধন হতে মুক্তি পাওয়ার পথের নির্দেশ প্রার্থনা করেন। দবিরখাসের প্রকৃত নাম সন্তোষ। চৈতন্যপ্রদত্ত নাম শ্রীরূপ। শ্রীরূপ গোস্বামী কনিষ্ঠ বল্লভকে নিয়ে প্রভূত অর্থসহ নৌকাযোগে বাকলা চন্দ্রদ্বীপের গৃহে গেলেন। সনাতনের জন্য দশ সহস্র মুদ্রা একজন বিশ্বস্ত মুদীর নিকট গচ্ছিত রাখলেন। ওদিকে অর্থাদির সুবন্দোবস্ত করে মহাপ্রভুর সংবাদ জানবার জন্য রূপ ওড়িশায় লোক পাঠালেন। সেই লোক এসে খবর দিল মহাপ্রভু ঝাড়িখণ্ড পথে বৃন্দাবন যাত্রা করেছেন। মহাপ্রভুর চরণ দর্শনের জন্য বল্লভকে সঙ্গে নিয়ে তিনি যাত্রা করলেন। সনাতনকে সংবাদ পাঠালেন 'মুদীখানায় দশ সহস্র মুদ্রা জমা আছে। অর্থ সাহায্যে যে কোন উপায়ে মুক্ত হয়ে আসুন। আমি বল্লভকে সঙ্গে নিয়ে বৃন্দাবন চললাম।' মহাপ্রভু পুরী যাত্রা করলেন। আদেশ পেয়ে সনাতন বৃন্দবনের পথে অগ্রসর হলেন। ওদিকে অনুপমকে সঙ্গে নিয়ে বৃন্দাবন হতে রূপ গৌড়ে ফিরছিলেন। ভিন্ন পথে যাতায়াতের জন্য পরস্পরের সঙ্গে সাক্ষাৎ হয় নি। বৎসরাধিক পরে শ্রীরূপ বৃন্দাবনে এসে সনাতনের সঙ্গে মিলিত হলেন। শ্রীরূপ গোস্বামী ষড়গোস্বামীগণের অন্যতম। তাঁর রচিত গ্রন্থাবলী বৈষ্ণব শাস্ত্রে অত্যুজ্জ্বল রত্নস্বরূপ। তিনি উজ্জ্বল নীলমণি, ভক্তিরসামৃত সিন্ধু লঘুভাগবত। এ সনাতন গোস্বামীর বৃহদ্ভাগবতামৃতের সংক্ষেপ হলেও প্রকৃতপক্ষে একটি সম্পূর্ণ নূতন গ্রন্থ।

শ্রীরঘুনাথ ভট্ট গোস্বামী

সন্ন্যাস গ্রহণের পর নীলাচল হতে ঝাড়খণ্ডের পথে বৃন্দাবন যাত্রাকালে শ্রীমন্মহাপ্রভু কাশীতে এসে তপন মিশ্রের গৃহেই কয়েকদিন ভিক্ষা করেছিলেন। মহাপ্রভু বাস করতেন চন্দ্রশেখর বৈদ্যের ভবনে, কিন্তু ভিক্ষা দিতেন তপন মিশ্র। বৃন্দাবনের তীর্থ পর্যটন শেষে মহাপ্রভু

পুনরায় কাশীধামে এসে দুইমাস অবস্থান করেন। তখনও ভিক্ষাদাতা ছিলেন তপন মিশ্র। তপন মিশ্রের পুত্রের নাম রঘুনাথ। তপন মিশ্রের গৃহে ভিক্ষা গ্রহণ করতেন মহাপ্রভু, এর ফলে প্রভুর প্রসাদ গ্রহণ, উচ্ছিষ্ট পাত্র মার্জন, পাদ সংবাহন—কত রূপেই না রঘুনাথ মহাপ্রভুর সেবা করেছিলেন। মহাপ্রভু পুরীধাম চলে গেছেন। বিরহকাতর রঘুনাথ পিতা মাতার অনুমতি নিয়ে উপস্থিত হলেন পুরীতে। নীলাচল আসার পথে এক ঘটনা ঘটল। রামদাস বিশ্বাস শাস্ত্রজ্ঞ, কায়স্থ, কাব্য প্রকাশের অধ্যাপক। রঘুনাথের সৌম্য মূর্তি দেখে আকৃষ্ট হয়ে রঘুনাথের ঝালিবাহকের নিকট থেকে ঝালি মাথায় নিয়ে চলতে লাগলেন। রঘুনাথের বড় সঙ্কোচ হল। বললেন, আমি অধম শূদ্র, ব্রাহ্মণের সেবাই তো আমার একমাত্র করণীয়। আপনি সম্ভ্রান্ত ব্যক্তি, বিদ্বান, আপনি ঝালি বইবেন কেন? রামদাস বললেন আপনি সঙ্কোচ করবেন না। আপনার এই সামান্য সেবা করে আমি আনন্দ পাচ্ছি।' দুজনে একসঙ্গে চলতে লাগলেন। নীলাচলে মহাপ্রভু রঘুনাথকে আলিঙ্গন করে বললেন, ভাল হল তুমি এসেছ। জগন্নাথ দর্শন করে এস, আজ আমার এখানেই প্রসাদ পাবে। তাঁর জন্য একটি বাসস্থান নির্দ্দিষ্ট হল। রামদাসও মহাপ্রভুর দর্শনলাভে কৃতার্থ হলেন। তিনি গোপীনাথ পট্টনায়কের গোষ্ঠীকে কাব্য প্রকাশ পড়াতে লাগলেন।

রঘুনাথ নীলাচলে আট মাস ছিলেন। তিনি ভাল রান্না করতে পারতেন। মাঝে মাঝে মহাপ্রভুকে ভিক্ষা দিয়ে পরম সন্তোষলাভ করতেন। রঘুনাথ গৃহে ফিরছেন—মহাপ্রভু আপন কণ্ঠমালা তাঁর গলায় দিয়ে বললেন 'গৃহে গিয়ে পিতামাতার সেবা কোরো, বিবাহ কোরোনা, আর একবার পুরীতে এসো।' পিতামাতার দেহান্তে উদাসীন রঘুনাথ পুনরায় পুরী এলেন। আটমাস থেকে মহাপ্রভুর আদেশে গেলেন বৃন্দাবন এবং রূপ সনাতনের নিকট থাকতেন এবং নিয়মিত ভাগবত পাঠ করতেন। রঘুনাথের যেমন মধুর স্বর। তেমনই সঙ্গীত নৈপুণ্য। যেমন উচ্চারণভঙ্গী তেমনি ব্যাখ্যাপ্রণালী। ছয় গোস্বামীর অন্যতম এই ভট্ট রঘুনাথ হতেই শ্রীমদ্ভাগবত পাঠের অভিনব ধারার প্রবর্তন হয়েছে।

শ্রীজীব গোস্বামী

জন্ম ১৪৪০ শকে। গৃহে স্থিতিকাল ২০ বৎসর। বৃন্দাবনে স্থিতিকাল ৬৫ বৎসর। জীবনকাল ৮৫ বৎসর। পৌষ শুক্লা তৃতীয়ায় অপ্রকট। রূপ সনাতনের কনিষ্ঠ ভ্রাতা রামভক্ত বল্লভ। এই রামোপাসক বল্লভের পুত্র শ্রীলজীব গোস্বামী। চন্দ্রদ্বীপেই জীবের বিদ্যারম্ভ। কিছুদিন পরে তিনি নবদ্বীপ আসেন এবং নিত্যনন্দ প্রভুর সঙ্গে সাক্ষাৎ হয়। নিত্যানন্দ বলেন, তোমাদের বংশকে মহাপ্রভু শ্রীবৃন্দাবন দান করেছেন, তুমিও সেখানে চলে যাও।' নবদ্বীপ হতে জীব আসেন কাশীধামে। সেখানে শ্রীমধুসূদন বাচস্পতির নিকট কাব্য, ব্যাকরণ, ছন্দ, জ্যোতিষ, দর্শনাদি সর্বশাস্ত্রে পারঙ্গম হয়ে বৃন্দাবনে শ্রীরূপের চরণাশ্রয় গ্রহণ করেন।

শ্রীরূপ নির্জনে বসে ভক্তিরসামৃত গ্রন্থ রচনা করছেন—এমন সময় শ্রীবল্লভ ভট্ট এসে মঙ্গলাচরণ শ্লোক শুনে বলেন, 'আমি সংশোধন করে দেব। কৃতার্থভাবে রূপ সম্মত হলেন। পাশে বসেছিলেন জীব। বল্লভভট্ট যমুনায় স্নান করতে গেলে জীব জল আনবার অছিলায় যমুনাতে গিয়ে ভট্টকে বললেন 'মঙ্গলাচরণের কোন্ অংশে আপনার সংশয় জেগেছে।' বল্লভভট্ট জীবকে চিনতেন না। তিনি আপন সন্দেহের কথা বললেন। প্রসঙ্গত অনেক আলোচনা হল। ভট্ট জীবের পাণ্ডিত্যে মুগ্ধ হয়ে রূপকে বললেন আমি উল্লসিত হয়ে ঐ যুবকটির পরিচয় জানতে এসেছি, তখন রূপ :—

"শ্রীরূপ বলেন কিবা দিব পরিচয়।
জীব নাম, শিষ্যমোর, ভ্রাতার তনয় ॥
এই কতোদিন হৈল আইলা দেশ হৈতে।
শুনি ভট্ট প্রশংসা করিল বহু মতে ॥"

রূপ বহুমানে ভট্টকে বিদায় দিলেন কিন্তু জীবকে বললেন, 'ভট্ট কৃপাকরে আমার লেখা সংশোধন করে দিতে চেয়েছিলেন। তোমার সহ্য হল না। অতএব পুনরায় পূর্বদেশে গমন কর। মন স্থির হলে বৃন্দাবনে এসো।' আদেশ মত জীব পূর্বদেশের এক গ্রামে পাতার কুটীর বেঁধে প্রায় উপবাসেই দিন কাটাতে লাগলেন। গ্রামবাসী সনাতনকে যুবকের দুর্দশার কথা বললেন। ইতিমধ্যে গ্রন্থরচনা সমাপ্ত। রূপ সনাতনকে বললেন, 'এই সময় জীব কাছে থাকলে তাকে দিয়ে সংশোধন করিয়ে নিতাম। সনাতন জীবের দুর্দশার কথা জানালে রূপ ক্ষমা করে জীবকে কাছে ডেকে নেন। শ্রীজীবের রচিত অনেক গ্রন্থ আছে—ষট সন্দর্ভ, ভক্তি সন্দর্ভ, গোপাল চম্পূ প্রভৃতি বৈষ্ণব সাহিত্যে তুলনাহীন গ্রন্থ। সমগ্র বৈষ্ণব সমাজ এই আকুমার ব্রহ্মচারী, কবি ও দার্শনিককে আপনাদের মণ্ডলেশ্বর পদে বরণ করে নিয়েছিলেন।

গোপাল ভট্ট

মহাপ্রভু নীলাচল হতে দক্ষিণদেশ ভ্রমণে বের হয়েছেন—যখন রঙ্গক্ষেত্রে প্রবেশ করলেন তখন আষাঢ় মাস। কাবেরীতে স্নান করে মহাপ্রভু রঙ্গনাথজীকে দর্শন করলেন। তাঁর প্রেমাবেশ দেখে মুগ্ধ হয়ে সেখানকার এক ব্রাহ্মণ তাঁকে বাড়ী নিয়ে গেলেন। এই ব্রাহ্মণের নাম বেঙ্কট ভট্ট। তাঁর অনুরোধে মহাপ্রভু চাতুর্মাস্যের চার মাস তাঁর বাড়িতে অবস্থান করেছিলেন। বেঙ্কট ভট্টের পুত্র গোপাল ভট্ট। মহাপ্রভুর পাদোদক পান করে গোপাল আনন্দে আত্মহারা হয়ে ছায়ার ন্যায় তাঁর অনুগত হলেন। বিদায়ের কালে মহাপ্রভু বলে গেলেন, 'এখন পিতা মাতার সেবা কর। এঁরা অন্তর্ধান করলে বৃন্দাবন যেও। সেখানে আমার প্রিয় রূপ সনাতন আছেন। তাঁদের সঙ্গে ভজন করবে এবং ভক্তি গ্রন্থাদি পাঠ করবে।' বেঙ্কট ভট্টের ত্রিমল্ল ও প্রবোধানন্দ নামে দুই ভাই ছিল। প্রবোধানন্দ ছিলেন মহাপণ্ডিত। গোপাল তাঁর কাছে বহু শাস্ত্র অধ্যয়ন করেন। লোকান্তরপ্রাপ্তির কালে গোপালের পিতা ও মাতা পুত্রকে বৃন্দাবন যাবার আজ্ঞা দেন। গোপাল বৃন্দাবন গিয়ে রূপ সনাতনের সঙ্গে মিলিত হন। এই সময়ে মহাপ্রভু নীলাচল থেকে চিঠি পাঠিয়ে গোপালের প্রতি স্নেহ প্রকাশ করেন। পত্রবাহকের আনা মহাপ্রভুর দেওয়া আসন ও ডোর নিয়ে রূপ সনাতন গোপালকে দিলেন।

"সম্বিৎ পাইয়া রূপ আসন লইয়া।
ভট্টের নিকটে যান গৌরব করিয়া ॥"

এবং মহাপ্রভুর পত্র পড়ে শোনালেন। মহাপ্রভুর আজ্ঞা লঙ্ঘন করতে না পেরে "গলে ডোর করি ভট্ট আসনে বসিলা।"

রূপ সনাতন ও অন্যান্য বৈষ্ণবগণ সঙ্গে ভজনানন্দে দিন কাটতে লাগল।

গোবিন্দদেবের স্বপ্নাদেশে রূপ গোস্বামীপাদ গোপালকে শালগ্রাম শিলা দেন। কোন ধনী ভক্ত বিগ্রহ সেবার যোগ্য বস্ত্রালঙ্কার উপহার দিলে গোপাল ভট্ট শালগ্রামের বিগ্রহরূপ ধারণের আকাঙ্ক্ষা করেন।

ভক্ত-বাঞ্ছাকল্পতরু বৈশাখী পূর্ণিমায় শ্রীরাধারমণরূপে প্রকট হয়ে অদ্যাবধি পৃষ্ঠদেশে শালগ্রাম ধারণ করে আছেন।

লোকনাথ ও ভূগর্ভ গোস্বামী, কাশীশ্বর পণ্ডিত, কৃষ্ণদাস কবিরাজ প্রভৃতি বৃন্দাবনবাসী সকলেই গোপালকে স্নেহ করতেন। এই গোপাল ভট্টের শিষ্য শ্রীনিবাস আচার্য প্রভু ॥

শ্রীরঘুনাথ দাস

শ্রীরঘুনাথ দাস। তদানীন্তন বাঙ্গলার অন্যতম সমৃদ্ধনগর সপ্তগ্রাম ছিল চতুষ্পাঠী, সঙ্গীত শিক্ষাকেন্দ্র ও সাধনকেন্দ্রের জন্য বিখ্যাত। এই গ্রামের হিরণ্যদাস ও গোবর্ধন দাস ছিলেন কায়স্থকুলতিলক প্রতিষ্ঠাবান ধনাঢ্য জমিদার। হিরণ্য দাসের কোন সন্তান ছিল না। গোবর্ধন দাসের একমাত্র পুত্র রঘুনাথ। তিনি বৃন্দাবনের ষড়গোস্বামীগণের মধ্যে একজন। জমিদারের পুত্র হলেও বিষয়ে উদাস।

শ্রীগৌরাঙ্গ সন্ন্যাস গ্রহণ করেছেন। সারা বাংলায় এই সংবাদ দাবানলের মত ছড়িয়ে পড়ল। শ্রীপাদ নিত্যানন্দ তাঁকে শান্তিপুরে অদ্বৈতগৃহে এনেছেন শুনে রঘুনাথ পিতা ও পিতৃব্যের অনুমতি নিয়ে বহুবিধ ভোজ্যাদি সহ শান্তিপুরে উপস্থিত হলেন। অদ্বৈত আচার্য পূর্ব হতেই যুবককে চিনতেন। তিনি রঘুনাথকে পরম সমাদরে গ্রহণ করলেন। রঘুনাথ শ্রীচৈতন্যকে দর্শন করে কৃতার্থ হলেন। কয়েক বৎসর পর যখন বৃন্দাবন গমন মানস মহাপ্রভু শান্তিপুর হয়ে রামকেলী যাচ্ছিলেন তখনও রঘুনাথ নানা পূজাসামগ্রী নিয়ে অদ্বৈতভবনে এসেছিলেন এবং সেবার বৃন্দাবন যাওয়া না হওয়ায় ফিরে আসার পথে শান্তিপুর আসেন। রঘুনাথও প্রভুর সেবার উপকরণ সহ শান্তিপুরে এলেন। মহাপ্রভু পুরী যাত্রার উদ্যোগ করছেন। রঘুনাথ মহাপ্রভুর পাদমূলে পতিত হয়ে বললেন, আমায় উদ্ধার কর করুণাময়। তখন মহাপ্রভু—

> "স্থির হইয়া ঘরে যাও না হও বাতুল।
> ক্রমে ক্রমে পায় লোক ভব সিন্ধু কূল ॥
> মর্কট বৈরাগ্য না কর লোক ভাঙ্গাইয়া
> যথাযোগ্য বিষয় ভুঞ্জ অনাসক্ত হইয়া"।

রঘুনাথ ঘরে ফিরলেন, কিন্তু অন্তঃপুরে প্রবেশ করলেন না। বাহির বাড়িতে শয়নের ব্যবস্থা করে নিলেন। ভাবগতিক দেখে পিতা গোবর্ধন দাস কয়েকজন প্রহরী নিযুক্ত করলেন।

রঘুনাথ মনে মনে চিন্তা করলেন, দয়াল নিতাই ছাড়া চৈতন্যপ্রাপ্তি সম্ভব নয়। তিনি পিতার অনুমতি নিয়ে গেলেন পানিহাটীতে। সেখানে নিত্যানন্দ শ্রীরাঘব পণ্ডিত ভবনে অবস্থান করছিলেন। রঘুনাথকে দেখেই নিত্যানন্দ বললেন, 'চোর, এতদিন তুমি লুকিয়ে বেড়াচ্ছ, আজ নাগাল পেয়েছি। তোমার দণ্ড করব।' অবশেষে দণ্ডস্বরূপ রঘুনাথকে বৈষ্ণবগণকে চিড়া, দধি, কলা, ভুড়া দিয়ে ফলাহার করাতে হল। এইই দণ্ডমহোৎসব নামে খ্যাতিলাভ করল।

উৎসবান্তে রঘুনাথ রাঘব পণ্ডিতের হাতে পণ্ডিতের জন্য এবং শ্রীপাদ নিত্যানন্দের জন্য এক এক শত টাকা ও পাঁচ পাঁচ তোলা ওজনের সোনা দান করলেন। অপরাপর বৈষ্ণবের জন্য যোগ্যতানুসারে পাঁচ, দশ, পনের, কুড়ি, পঁচিশ, পঞ্চাশ টাকা প্রত্যেকের নামে লিখিয়ে মকরধ্বজ করের হাতে দিয়ে এসে ইঙ্গিতে শ্রীপাদ নিত্যানন্দ গৌরচরণ শরণের অনুমতি দান করলেন। গৌরাঙ্গ বিরহে রঘুনাথ উন্মাদপ্রায়। পুত্রের মনোভাব বুঝে রঘুনাথ জননী বললেন 'রঘুনাথকে বেঁধে রাখ।' তখন রঘুনাথের পিতা বললেন,

> "ইন্দ্রসম ঐশ্বর্য স্ত্রী অপ্সরা সম।
> এ সবে বাঁধিতে নারিল যার মন।

দড়ির বাঁধনে তারে চাহিছ বাঁধিতে।
জন্মদাতা পিতা নারে প্রারব্ধ খণ্ডাইতে ॥"

রঘুনাথের গৃহত্যাগের সুযোগ মিলল। গোবর্ধন দাসের পুরোহিত এসে বললেন, 'রঘুনাথ আমার গৃহদেবতার পুরোহিত কয়েক দিন ধরে অনুপস্থিত। তুমি একজন পুরোহিত দেখে দাও।' রঘুনাথ যে আজ্ঞা বলে প্রস্থান করলেন আর ফিরলেন না। বারদিন ধরে ধনীর দুলাল পথ চলে অনাহারে অর্ধাহারে পুরীধামে পৌছোলেন। মহাপ্রভু গোবিন্দকে রঘুনাথের তত্ত্বাবধানের ভার দিলেন। মহাপ্রভু স্বরূপকে শিক্ষাগুরুরূপে ভার দিলেন। রঘুনাথের সাধনা আরম্ভ হল। মহাপ্রভু রঘুনাথকে বললেন,

"গ্রাম্য কথা না শুনিবে গ্রাম্য বার্ত্তা না কহিবে।
ভাল না খাইবে আর ভাল না পরিবে ॥
অমানি মানদ কৃষ্ণ নাম সদা লবে।
ব্রজে রাধা কৃষ্ণ সেবা মানসে করিবে ॥"

রঘুনাথ জীবন ধারণের জন্য যে ভিক্ষা গ্রহণ করতেন, তাও আস্তে আস্তে ত্যাগ করলেন। যে সমস্ত প্রসাদ অবিক্রীত থাকত সেগুলি মন্দিব সন্নিহিত পয়োনালীতে নিক্ষেপ করা হত। ভজন শেষে ঐ পরিত্যক্ত প্রসাদের শক্ত কণা শুধু লবণ দিয়ে রঘুনাথ ভক্ষণ করতেন। একদিন ঐ কণা মহাপ্রভু ভক্ষণ করে অমৃতবৎ মনে করেছিলেন।

ক্রমে মহাপ্রভু, স্বরূপ দামোদর লীলা সম্বরণ করলেন। বিরহ ব্যথায় রঘুনাথ এলেন বৃন্দাবনে, শ্রীরূপ সনাতন তাঁকে সহোদর-স্নেহে গ্রহণ করলেন। কৃষ্ণদাস কবিরাজ সেবকরূপে পরিচর্যার ভার পেলেন। রঘুনাথ গোস্বামীর—

"রঘুনাথ দাস গোঁসাইর গ্রন্থত্রয়।
স্তবমালা নাম স্তবাবলী যারে কয় ॥
শ্রীনাম চরিত মুক্তা চরিত মধুর।
যাহার শ্রবণে মহাদুঃখ হয় দূর ॥"

১। **উপেন্দ্র মিশ্র** :— গৌরাঙ্গের পিতামহ। উপেন্দ্র মিশ্রের স্ত্রীর নাম কমলাবতী তাঁর বাড়ি ছিল শ্রীহট্টের বড়গঙ্গা নামক গ্রামে। উপেন্দ্রের সাতপুত্রের মধ্যে জগন্নাথমিশ্র একজন। জগন্নাথ মিশ্র নবদ্বীপে পড়তে এসে শচীদেবীকে বিবাহ করে এখানেই বসতি স্থাপন করেন। জগন্নাথ মিশ্রের পুত্র গৌরাঙ্গ নবদ্বীপে টোল খোলার পর কতকগুলি ছাত্র নিয়ে বঙ্গদেশে যান পিতৃপুরুষদের বাসভূমি দেখতে। তিনি ক্রমে পদ্মাতীরবর্তী ফরিদপুর, বিক্রমপুর, নুরপুর হয়ে এগারসিন্ধুক গ্রাম এবং সেখান থেকে শ্রীহট্ট হয়ে বড়গঙ্গা গ্রামে পৌছোন। মহাপ্রভু গিয়ে প্রথমে পিতামহ এবং পরে পিতামহীকে প্রণাম করেন। তাঁরা তাঁর পরিচয় জানতে পেরে পরম আদর করেন। একদিন কমলাবতী স্বপ্নে দেখেন জগন্নাথ সুতই নারায়ণ। একথা জানিয়ে গৌরাঙ্গকে অনুরোধ করেন—

'ভক্তবাক্যে গৌরহরি সদয় হইল।
দিব্যরূপ দেখাইয়া কৃতার্থ করিল (প্রে. বি)

তখন, "মূর্ত্তিদেখিয়া দুই মনস্থির কৈল।
পার্ষদ দেহ ধরি দোঁহে নিত্যধামে গেল ॥"

২। **জগন্নাথ মিশ্র** :— বাৎস্যমুনি বংশ, বৈদিক শ্রীমধুমিশ্র "শ্রীহট্টে কৈল ধাম।" বাহ্মণের বসতিপূর্ণ বড়গঙ্গা গ্রামে বিবাহ করে সেখানেই থেকে যান। মধুমিশ্রের চারিপুত্র উপেন্দ্র, রঙ্গদা, কীর্ত্তিদ আর কীর্ত্তিবান। উপেন্দ্র মিশ্রের সাত পুত্র।

"কংসারি পরমানন্দ আর জগন্নাথ।
পদ্মনাভ, সর্বেশ্বর, জনার্দন, ত্রৈলক্যনাথ ॥"

জগন্নাথ মিশ্র নবদ্বীপের গঙ্গাতীরে বসতি স্থাপন করেন। জয়ানন্দের চৈতন্য মঙ্গলে আছে, মহাপ্রভুর পূর্বপুরুষগণের আদিবাস ছিল ওড়িষ্যার জাজপুরে। প্রভু নীলাচল যাত্রাকালে স্বীয় বংশধরের ভবনে অবস্থান করেছিলেন।

"চৈতন্য গোসাঞির পূর্বপুরুষ আছিল জাজপুরে।
শ্রীহট্ট দেশে পলাইয়া গেলা রাজা ভ্রমরের ডরে ॥"

ঐ গ্রন্থে সন্ন্যাসখণ্ডে :

"গৌরচন্দ্র শ্রাদ্ধ করিল একে একে।
বাপ জগন্নাথ মিশ্র দেখে অন্তরীক্ষে ॥
পিতামহ জনার্দন মিশ্র মহাশয়।
প্রপিতামহ রাজগুরু মিশ্র ধনঞ্জয়।
দিগ্বিজয় রামকৃষ্ণ বৃদ্ধ প্রপিতামহ।"

৩। **শ্রীবিশ্বরূপ** :— গৌরাঙ্গের জ্যেষ্ঠভ্রাতা। তিনি ঈশ্বরপুরীর নিকট দীক্ষিত হন। সন্ন্যাস নাম শঙ্করারণ্য পুরী। মাতুলভ্রাতা লোকনাথ তাঁর শিষ্য হন। তাঁকে নিয়ে শঙ্করারণ্য দক্ষিণ দেশ গমন করেন। ষোড়শ বর্ষীয় বিশ্বরূপের বিবাহের উদ্যোগ করলে বিশ্বরূপ "বার্তা শুনি বিশ্বরূপ করিল পলায়ন।' দৈবক্রমে ঈশ্বরপুরীর সঙ্গে তাঁর দক্ষিণদেশে দেখা হয়। তখন

"বিশ্বরূপ ঈশ্বরপুরীরে প্রণমিলা।
নিজ ঐশ তেজ তিঁহো পুরীতে স্থাপিলা ॥
বিশ্বরূপ বলে দেব এই তেজ ঘন
নিত্যানন্দে দীক্ষা দিয়া করহ স্থাপন ॥

তারপর "পাণ্ডুতীর্থে হৈল এই অদ্ভুত বিলাস।
অন্তর্ধানে বিশ্বরূপ নিত্যানন্দে প্রকাশ।'

৪। **কাশীমিশ্র** :— গৌরাঙ্গের প্রথম পক্ষের স্ত্রী লক্ষ্মীপ্রিয়া সর্পাঘাতে পরলোকগতা। গঙ্গার ঘাটে শচীদেবী বিষ্ণুপ্রিয়াকে দেখে মুগ্ধা হন। তাই পুত্রের দ্বিতীয়বার বিবাহের জন্য কাশীনাথ মিশ্রকে পাঠিয়েছিলেন রাজপণ্ডিত সনাতন মিশ্রের বাড়ি ঘটক রূপে। ফলে, সনাতন মিশ্রের কন্যা বিষ্ণুপ্রিয়ার সঙ্গে গৌরাঙ্গের বিবাহ হয়।

৫। **সনাতন মিশ্র** :—"শ্রীহট্ট নিবাসী দুর্গাদাস মহামতি।
সস্ত্রীক নদীয়া আসি করিল বসতি ॥

তাঁদের দুই পুত্র জ্যেষ্ঠ সনাতন, কনিষ্ঠ পরাশর। সনাতনের পত্নীর নাম মহামায়া। একমাত্র কন্যা বিষ্ণুপ্রিয়া। মহাসমারোহে বিষ্ণুপ্রিয়ার বিবাহ হয় জগন্নাথসুত গৌরাঙ্গের সঙ্গে।

৬। **নীলাম্বর চক্রবর্তী** :— "শ্রীহট্ট নিবাসী নীলাম্বর চক্রবর্তী
গঙ্গাতীরে নদীয়ায় করেন বসতি।
বেলপুকুরিয়া গ্রামে বাড়ি হয় তাঁর।
দুই পুত্র দুই কন্যা হইল তাঁহার ॥"

প্রথম যোগেশ্বর পণ্ডিত, দ্বিতীয় শচীদেবী, তৃতীয় রত্নগর্ভাচার্য, চতুর্থ সর্বজয়া। শচীদেবীর বিবাহ হয় পুরন্দর মিশ্র বা জগন্নাথ মিশ্রের সঙ্গে আর সর্বজয়ার বিবাহ হয় শ্রীচন্দ্রশেখরের সঙ্গে।

শচীনন্দনের তিথি লগ্ন বিচার করে তিনি বিস্মিত হয়েছিলেন। কেননা, গৌরাঙ্গের অঙ্গে :— "পঞ্চদীর্ঘ; পঞ্চসূক্ষ্মঃ সপ্তরক্ত ষড়ুন্নতঃ।
ত্রিহ্রস্ব পৃথুগম্ভীরো দ্বাত্রিংশ লক্ষণে মহান ॥'

"এই বত্রিশ হয় মহাপুরুষ লক্ষণ।
শিশু অঙ্গে সদা ইহা করিছে শোভন ॥"

৭। **বল্লভাচার্য** :— নদীয়া নিবাসী, গৌরাঙ্গের শ্বশুর লক্ষ্মীপ্রিয়ার পিতা। পূর্বজন্মের জনক।

৮। **মাধবেন্দ্র পুরী** : — বাড়ি ছিল-- "শ্রীহট্টজেলায় পূর্ণিপাট পুণ্যগ্রাম।
তথা আবির্ভূত মাধবেন্দ্র গুণধাম ॥
"ফাল্গুন মাসের শুভ শুক্লাদ্বাদশী
মাধবেন্দ্র নামে তেঁহ অবতীর্ণ আসি ॥

তিনি কাশ্যপ গোত্র, বারেন্দ্র ব্রাহ্মণ। বিবাহের পর একমাত্র পুত্র, তারপর পত্নী বিয়োগ। তখন তিনি পুত্রকে নিয়ে চলে এলেন

"কুলিয়া কুমার হট্টমাঝে বিষ্ণুপুর গ্রাম।
চতুষ্পাঠী খুলি তাঁহা করে অবস্থান।
দেশ বিদেশ হতে বহু বিদ্যার্থী আইল।
অদ্বৈত ঈশ্বরপুরী আদি তথায় মিলিল ॥
কিছুদিন প্রবল বৈরাগ্য উদ্‌গম।
অদ্বৈত পাশে পুত্র রাখি করিল গমন ॥"

পুত্রের নাম বিষ্ণু দাস। মাধবেন্দ্র উড়ুপেতে নিয়ে লক্ষ্মীপতির নিকট দীক্ষা নেন। উড়ুপেতে অদ্বৈতের সঙ্গে দেখা হয়। মাধবেন্দ্র অদ্বৈতকে বললেন—"অনন্ত সংহিতা গ্রন্থে আছে শীঘ্রই গৌরভগবান আসবেন। আচার্য ঐ গ্রন্থখানি লিখে নেন। নানাতীর্থ ভ্রমণ করে বৃন্দাবনে আসেন। তারপর গোবর্ধনগিরি পরিক্রমা করে গোবিন্দকুণ্ডে স্নান করে বৃক্ষতলে বসে সঙ্কীর্তন করছেন—এমন সময়ে এক শিশু একভাণ্ড দুগ্ধ এনে মাধবেন্দ্রকে পান করতে বলেন। তখন মাধবেন্দ্র বলেন "কহ বৎস কোথা হতে তব আগমন।" আর কিভাবেই বা জানলে আমি উপবাসী আছি। উত্তরে—" আমি গোপনন্দন। ব্রজবাসীগণ তোমাকে উপবাসী দেখে আমাকে দুধ নিয়ে পাঠালেন।' দুগ্ধ পান করে মাধবেন্দ্র ভাণ্ড রেখে দেন—গোপশিশু নিয়ে যাবে বলে। কিন্তু বালক আর এলো না। স্বপ্নে দেখেন কে যেন বলছেন—আমি রোদ বৃষ্টি ঝড়ে কষ্ট পাচ্ছি, আমার সেবক আমাকে যবনের ভয়ে রেখে পালিয়েছে, তুমি আমাকে উদ্ধার কর। মাধবেন্দ্র গ্রামে গিয়ে লোকজন এনে গোপাল উদ্ধার করে সেবা করতে লাগলেন। একদিন স্বপ্নে মাধবেন্দ্রকে বললেন, গরমে আমার দেহে বড় জ্বালা, তুমি নীলাচল থেকে মলয়জ চন্দন নিয়ে এসো। নীলাচল যাবার পথে শান্তিপুরে অদ্বৈতকে দীক্ষা দেন এবং রেমুণায় এসে 'অমৃত কেলী' ভোগ আস্বাদন করেন। পরে প্রয়াগ বারানসী প্রভৃতি তীর্থ ভ্রমণ করে গৌরাঙ্গের চূড়াকরণে নিমন্ত্রিত হয়ে সেখানে যান। পরে নানাদেশ ভ্রমণ করে রেমুণায় যান।

'হেনমতে কত কাল করিয়া যাপন।
রেমুণায় গোপীনাথে হৈল অদর্শন ॥

ঈশ্বরপুরী

'ভক্তিপথ আদি গুরু মাধবেন্দ্র পুরী।
তাঁহার সুযোগ্য শিষ্য শ্রীঈশ্বরপুরী ॥'
'রাঢ়ীয় ব্রহ্মণ শ্যামসুন্দর আচার্য্য।

কুমারহট্টবাসী বিপ্র সর্বগুণে বর্য্য ॥—প্রেম বিলাস

শুভ বৈশাখী পূর্ণিমায় ঈশ্বরপুরীর জন্ম।

"শ্রীমাধবেন্দ্র পুরী পরম মহান্ত।
দশাক্ষর মন্ত্র তাঁর উপাস্য একান্ত ॥
সেই মন্ত্র দিলা তিঁহ ঈশ্বরপুরীবে।
মন্ত্র সেই পাইয়া প্রেম সমুদ্রে বিহরে ॥

ঈশ্বর পুরী গোপীনাথ মন্দিরে শ্রীকৃষ্ণ লীলামৃত গ্রন্থ লিখে গদাধরকে দেখান। গৌরাঙ্গ গয়াতে গেলে সেখানে ঈশ্বরপুরীর সঙ্গে তাঁর সাক্ষাৎ হয়।

গয়াতে— 'দশাক্ষর মন্ত্র দিল ব্রহ্মকুণ্ডতীরে।
মন্ত্র পাইয়া মহাপ্রভু আপনা পাসরে ॥

১৪৩৬ শকাব্দে কার্তিক মাসের ত্রয়োদশী তিথিতে গৌরাঙ্গ বৃন্দাবন যাত্রা মানসে যখন রামকেলী অভিমুখে যাচ্ছিলেন তখন তিনি 'শ্রীগুরুভবন' এসেছিলেন এবং "শ্রীপাদের জন্মস্থানে গড়াগড়ি দিয়ে প্রভু বলেন—"এই কুমারহট্টেরে নমস্কার,
ঈশ্বরপুরীর যেই গ্রামে অবতার।"

১৪৩৩ শকে ফাল্গুনী কৃষ্ণা দ্বাদশীতে ঈশ্বরপুরী অন্তর্ধান করেন,
"কেশব ভারতী বন্দ সান্দীপনি মুনি।
প্রভু যাঁরে ন্যাসী গুরু করিলা আপনি।"

তথাহি প্রেমাবিলাসে— বারেন্দ্র ব্রাহ্মণ-শ্রীকাশীনাথ আচার্য,
কুলিয়া নিবাসী, বিপ্র সর্বগুণে বর্য্য ॥
মাধবেন্দ্র শিষ্য হইয়া করিলা সন্ন্যাস।
কেশব ভারতী নাম জগতে প্রকাশ ॥"

রাঢ়দেশে গ্রামে গ্রামে নাম প্রচার করে "নদীয়ানগরে যবে ভারতী আইল,
গৃহে আনি ভিক্ষা দিয়া প্রভু স্তুতি কৈল ॥

তারপর—"এত কহি কাটোয়ায় ভারতী চলিল।
গৃহ ত্যজি প্রভু গিয়া সন্ন্যাস করিল।

কথিত আছে প্রভু স্বয়ং কেশব ভারতীকে স্বপ্নাবেশে যে মন্ত্র দিয়াছিলেন—কেশব ভারতী সেই মন্ত্র দিয়েই প্রভুকে সন্ন্যাসী করেছিলেন এবং তাঁর নাম দিয়েছিলেন "শ্রীকৃষ্ণ চৈতন্য।" ১৪৩৩ শকে ফাল্গুনী কৃষ্ণা দ্বাদশীতে ঈশ্বরপুরী অন্তর্ধান করেন।

হরিদাস ঠাকুর

১৩২৭ শকে বুঢ়নে ভোটকলাগাছি গ্রামে ব্রাহ্মণ কূলে জন্মগ্রহণ করেন। বাবার নাম মনোহর, মায়ের নাম উজ্জ্বলা। বাল্যে পিতামাতার বিয়োগ ঘটলে আম্বয়ার অধিপতি মলয়া কাজী তাঁকে পালন করেন। মতান্তরে হরিদাসের নাম ছিল হারেশ—পিতা হাবিবুল্লা। যাই হোক, হরিদাসের কৃষ্ণভক্তিতে মুসলমানগণ মুসলমান শাসনকর্তার নিকট অভিযোগ করলে শাসনকর্তা তাঁকে বাইশ দিন বাইশ বাজারে বেত্রাঘাতের আদেশ দেন। শেষদিন বেত্রাঘাতের পর তাকে মৃত ভেবে গঙ্গাজলে নিক্ষেপ করা হয়। কেননা হরিনাম উচ্চারণকারীকে মুসলমান ধর্মমতে কবর দেওয়া বিধেয় নয়। অদ্বৈত মহাপ্রভু সেই ঘাটে স্নান করতে এসে ঐ ভাসমান দেহে প্রাণ আছে জেনে নিয়ে আসেন এবং যথাযথ শুশ্রূষায় সেরে উঠলে মন্ত্রদান করেন। পরে বেনাপোলে কুটির নির্মাণ করে হরিদাস ভজন করতে থাকেন। তখন প্রভাবশালী

রামচন্দ্র খান তাঁর ভজন নষ্ট করার জন্য লক্ষ্মীবাঈকে প্রেরণ করেন। কিন্তু হরিদাসের প্রভাবে লক্ষ্মীবাঈ প্রভাবিত হয়ে হরিনাম করতে থাকে এবং হরিদাস তাঁকে দীক্ষা দেন। পরে গৌরসহ হরিনাম প্রচার করে ক্ষেত্রধামে চলে আসেন। নীলাচলে এসে তিনি মহাপ্রভুকে এই কথা বলে পাঠালেন :—

"হরিদাস বলে আমি নীচ জাতি ছার।
মন্দির নিকটে যাইতে মোর নাহি অধিকার ॥
নিভৃতে টোটার মধ্যে স্থান যদি পাঙ।/
তাহা পড়ি রহো একলে কাল গোয়াঙ।

হরিদাসের বার্তা শুনে মহাপ্রভু আনন্দিত হলেন এবং গোপীনাথকে ডেকে বললেন—"আমার নিকটে এই পুষ্পের উদ্যানে।/একখানি ঘর আছে পরম নির্জনে॥ সেই ঘর আমাকে দেহ আছে প্রয়োজন।/নিভৃতে বসিয়া তাঁহা করিব স্মরণ॥/ মিশ্র কহে সব তোমার চাহ কি কারণ।/আপন ইচ্ছায় লহ যেই তোমার মন॥ পরে হরিদাসকে সেই ঘরটি মহাপ্রভু অর্পণ করেন এবং বলেন—

"মন্দিরের চক্র দেখি করিহ প্রণাম" এবং প্রতিদিন "এই স্থান আসিবে তোমার প্রসাদন্ন। মহাপ্রভু প্রতিদিন জগন্নাথ দর্শন করে হরিদাস ঠাকুরের সঙ্গে মিলন করে গম্ভীরায় যেতেন। বৃন্দাবন থেকে শ্রীরূপ, সনাতনাদি বৈষ্ণবগণ এলে হরিদাসের কাছে থাকতেন। শেষ বয়সে উত্থানশক্তি রহিত হয়ে তিন লক্ষ সংখ্যানাম পূর্ণ না হওয়ার কারণে প্রসাদগ্রহণ না করে কিঞ্চিৎ গ্রহণপূর্বক প্রসাদের মর্যাদা রক্ষা করতেন। মহাপ্রভু জানতে পেরে বললেন—সিদ্ধদেহে এত ভজনের চেষ্টা কেন? হরিদাসের শেষ নিবেদন—

"জিহ্বায় উচ্চারিত তোমার কৃষ্ণচৈতন্য নাম,
এই মত মোর ইচ্ছা ছাড়িব জীবন ॥"

মহাপ্রভু হরিদাসের বাঞ্ছা পূরণ করেছিলেন। হরিদাসের মৃতদেহ স্কন্দে লয়ে মহাপ্রভু নৃত্য করেছিলেন এবং স্বয়ং ভিক্ষাব্রতী হয়ে প্রসাদ গ্রহণ করে বিরহ উৎসব পালন করেছিলেন।

নরোত্তম ঠাকুর

১৪৫৫ শকে মাঘী পূর্ণিমা তিথিতে অধুনা বাঙলা দেশান্তর্গত রাজসাহী জেলার গড়েরহাট পরগনার অধীন খেতরী গ্রামে শ্রীনরোত্তম ঠাকুরের আবির্ভাব। পিতা কৃষ্ণানন্দ দত্ত মাতা নারায়ণী দেবী। মহাপ্রভু বৃন্দাবন যাত্রাচ্ছলে শ্রীরূপ সনাতনকে আত্মসাৎ করার জন্য রামকেলী গ্রামে এসে খেতরীগ্রামের দিকে চেয়ে 'নরু' নরু বলে প্রেম স্বরে আহ্বান করেছিলেন এবং পদ্মাবতীর নিকট প্রেম সম্পত্তি গচ্ছিত রেখেছিলেন। শ্রীনরোত্তমের জন্মকালে নিপদ গৌরাঙ্গ সুন্দর যে নৃত্য করেছিলেন, নারায়ণী দেবী তা প্রত্যক্ষদর্শন করেছিলেন। চূড়াকরণের পর নরোত্তমের বিদ্যাভ্যাস আরম্ভ হল এবং অল্পকাল মধ্যে তিনি সর্বশাস্ত্রে বিচক্ষণ হলেন। খেতরী গ্রামেরই এক প্রাচীন ব্রাহ্মণ কৃষ্ণদাস, নরোত্তমকে শ্রীচৈতন্যের আদি, মধ্য ও অন্ত্যলীলা প্রতিদিন যত্ন সহকারে শোনাতেন। ইতিমধ্যে একদিন নিত্যানন্দ স্বপ্নচ্ছলে নরোত্তমকে বললেন, "তুমি রজনীপ্রভাতে পদ্মায় স্নান করত যেও শ্রীগৌরাঙ্গের প্রেমধন পাবে। নরোত্তম পদ্মাস্নান করে প্রেমধন পেলেন এবং গৌরাঙ্গ প্রভাবে তাঁর শ্যাম তনু গৌরবর্ণ হল। পদ্মাতীরে প্রেমতলীঘাট এখনও তার সাক্ষ্য বহন করছে। প্রেমধন লাভ করে ঘরে এসে নরোত্তম কাঁদতে থাকেন। মা কান্নার কারণ জিজ্ঞাসা করলে বলেন—পদ্মায় স্নান করামাত্র এক গৌরবরণ পুরুষ আমার হৃদয়ে প্রবেশ করে আমাকে কাঁদাচ্ছেন। কোথায় গেলে আমি তাঁকে পাব।

নরোত্তম পালিয়ে যাবে আশঙ্কায় পিতা রক্ষক নিযুক্ত করলেন। কিন্তু যখন রাজা কৃষ্ণানন্দ কার্যব্যপদেশে গৌড়ে গেলেন, তখন জননীর নিকট বিদায় নিয়ে বুদ্ধিচাতুর্যে রক্ষকগণকে বঞ্চনা করে গৃহত্যাগ করলেন এবং হা গৌর, প্রাণ গৌর বলে কাঁদতে কাঁদতে ব্রজের পথে অগ্রসর হলেন। সুকুমারতনু রাজকুমার অনাহার, অনিদ্রায়, পথশ্রমে বড়ই কাতর হলেন কিন্তু কৃষ্ণের আকর্ষণে যে আকর্ষিত তাঁকে ফেরাবে কে? অবশেষে তিনি মথুরার বিশ্রামঘাটে উপনীত হলেন। একদিন এক বৈষ্ণব মাথুর বিপ্র স্নেহপরশ হয়ে নরোত্তমকে শ্রীকৃষ্ণপ্রসাদ ভোজন করালেন। সেই বিপ্রমুখে শ্রীরূপ সনাতন, শ্রীরঘুনাথ ভট্ট, শ্রীকাশীশ্বরের অন্তর্ধান সংবাদ সমাচার শুনে নরোত্তম মূর্ছিত হয়ে পড়লেন। পরদিন প্রভাতে উঠে নরোত্তম ব্যাকুল প্রাণে বৃন্দাবন এসে পৌঁছালেন। বৃন্দাবনে এসে তিনি শ্রীজীব গোস্বামী, শ্রীগোপালভট্ট গোস্বামী, শ্রীরঘুনাথ দাস গোস্বামী ও শ্রীলোকনাথ গোস্বামীর চরণ দর্শন করলেন। শ্রীমন্ মহাপ্রভুর স্বপ্নাদেশে শ্রীনরোত্তম শ্রীলোকনাথ গোস্বামীকে গুরুপদে বরণ করবার আজ্ঞা করেছিলেন, কিন্তু শুনলেন লোকনাথ গোস্বামী কাউকেও শিষ্য করেন না। কিন্তু নরোত্তমের একান্ত সেবানিষ্ঠায় প্রীত হয়ে শ্রাবণ পূর্ণিমার দিনে শ্রীলোকনাথ নরোত্তমকে দীক্ষা দিয়ে নিজ প্রেমসম্পত্তি অর্পণ করলেন এবং রূপসনাতন গোস্বামী কৃত ভক্তিগ্রন্থ অধ্যয়নের জন্য তাঁকে শ্রীজীব গোস্বামী-করে সমর্পণ করলেন। শ্রীনরোত্তমের ভক্তিশাস্ত্রে অপূর্ব অধিকার দেখে গোস্বামীগণের অনুমতি নিয়ে শ্রীজীব গোস্বামী নবোত্তমকে ঠাকুর মহাশয় উপাধি দান করলেন। শ্রীনিবাস আচার্য পূর্বেই বৃন্দাবনে এসেছিলেন। পরে শ্যামানন্দ এলেন। গৌরনিতাই আস্বাদনের স্বরূপত্রয় সম্মিলনে ত্রিবেণী সঙ্গম হল। নরোত্তম-শ্রীনিবাস-শ্যামানন্দ সমগ্র বৃন্দাবন পরিভ্রমণ করে সমস্ত রাসস্থলী পরিদর্শন করলেন। একদিন শ্রীজীব গোস্বামী অপরাপর গোস্বামীসহ আলোচনা করে ভক্তিগ্রন্থসমূহ শ্রীগৌড়মণ্ডলে প্রচার নিমিত্ত সম্পুটে স্থাপন করে প্রহরী সঙ্গে দিয়ে প্রভুত্রয়কে গৌড়মণ্ডলে প্রেরণ করলেন। পথিমধ্যে বনবিষ্ণুপুরের সন্নিকটে বনমধ্যে রাজা বীর হাম্বীরের দস্যুদল গ্রন্থ-সম্পুট চুরি করে। এতে প্রভুত্রয় অতিশয় ব্যাকুল হয়ে পড়েন। শ্রীনিবাস নরোত্তমকে খেতরী যেতে আজ্ঞা দিলেন এবং শ্যামানন্দকে খেতরী হয়ে ওড়িশার নরসিংহপুর যেতে আদেশ দিলেন। আর নিজে শ্রীগ্রন্থ অনুসন্ধানের নিমিত্ত সেখানে থাকলেন। এই শ্রীগ্রন্থ চুরি শ্রীগৌরসুন্দরের এক অপূর্ব কৃপাভঙ্গি। এর ফলে রাজা বীর হাম্বীর সপরিবারে আচার্য প্রভুর শিষ্য হলেন এবং ঐ সমস্ত গ্রন্থ প্রচারের ব্যবস্থা করলেন। কিছুদিন পরে শ্রীনিবাস প্রভু শ্রীগ্রন্থসহ যাজিগ্রাম এলেন। এদিকে নরোত্তম খেতরীতে ফিরে এলে সন্তোষ দত্ত, দেবীদাস, রাজা নরসিংহ, রাণী রূপমালা, রাজা চাঁদরায় প্রভৃতি শ্রীনরোত্তমের চরণাশ্রয়ে কৃতার্থ হয়ে জগতে ভক্তি প্রচার করতে লাগলেন। নদীয়া লীলায় পতিতোদ্ধার সূচনা খেতরীলীলায় পরিপূর্ণ হল। তারপর ঠাকুর নরোত্তম গৌরমণ্ডলের বিভিন্ন স্থান পরিদর্শন করেন। ভ্রমণপথে যাজিগ্রাম কন্টকনগরে প্রভুর সন্ন্যাস গ্রহণের স্থান দেখে খেতরীতে ফিরে এলেন। সেখানে এসে শ্রীফাল্গুনী পূর্ণিমায় শ্রীবিষ্ণুপ্রিয়াসহ শ্রীগৌরাঙ্গ, শ্রীরাধিকাসহ বল্লভীকান্ত, শ্রীকৃষ্ণ, শ্রীব্রজমোহন, শ্রীরাধারমণ, শ্রীরাধাকান্ত, সেবার শুভারম্ভ।

ঐ অনুষ্ঠানে নিমন্ত্রণ পেয়ে প্রকট শ্রীগৌরাঙ্গগণ শুভাগমন করেছিলেন। এই দেখে শ্রীনরোত্তমের নব আবিষ্কৃত অপূর্ব গরাণহাটী সংকীর্তনে গণসহ শ্রীগৌরসুন্দর প্রকট হয়ে ভুবনমোহন নৃত্য করেছিলেন।

শ্রীবীরভদ্র

শ্রীনিত্যানন্দ গৌরাঙ্গ অদ্বৈতাচার্যের অন্তর্ধানের পর বঙ্গদেশে বিশুদ্ধ বৈষ্ণব ধর্মের সংরক্ষণ ও প্রবর্তনের সর্বশ্রেষ্ঠ আচার্যরূপে শ্রীবীরচন্দ্রের প্রকাশ। মহাপ্রভুর আদেশক্রমে প্রভু নিত্যানন্দ

গার্হস্থাশ্রম গ্রহণ করেছিলেন। শালীগ্রাম নিবাসী শ্রীসূর্যদাস পণ্ডিতের দুই কন্যা বসুধা ও জাহ্নবা দেবীকে বিবাহ করে খড়দহে শ্রীপাট স্থাপন করেন। এখান বীরচন্দ্রের জন্ম হয়। বসুধার পুত্র বীরচন্দ্র এবং কন্যা গঙ্গাদেবী। বীরচন্দ্রের দুই পত্নী নারায়ণী ও শ্রীমতী এবং তিন পুত্র—গোপীজনবল্লভ, রামকৃষ্ণ ও রামচন্দ্র আর কন্যা ভুবনমোহিনী। ফুলিয়া নিবাসী পার্বতীচরণ মুখোটির সঙ্গে ভুবনমোহিনীর বিবাহ হয়। গোপীজনবল্লভের তিন পুত্র—শ্রীরামনারায়ণ, শ্রীরামলক্ষ্মণ, ও শ্রীরামগোবিন্দ।

বাল্যখেলারসে কতদিন অতিবাহিত হল। সহসা নিত্যানন্দের অন্তর্ধান ঘটল। অদ্বৈত আচার্যসহ প্রায় সমস্ত শ্রীগৌরাঙ্গ পার্ষদ খড়দহে একত্রিত হলেন। বিচিত্র বিধানে মহোৎসব অনুষ্ঠিত হল। বীরচন্দ্রের বয়স কুড়ি বৎসর। দীক্ষা লওয়ার উদ্দেশ্যে যাত্রা করলেন শান্তিপুরে অদ্বৈত আচার্যের নিকট তাঁর নিকট দীক্ষা গ্রহণ করতে। অদ্বৈত বীরচন্দ্র যাতে তাঁর মায়ের নিকট অর্থাৎ জাহ্নবা দেবীর নিকট দীক্ষা গ্রহণ করেন সেরূপ নির্দেশ দেন। ফিরে এসে মাতার অপ্রাকৃত বৈভব দর্শন করে চরণে লুণ্ঠিত হন এবং জাহ্নবা দেবীর নিকট দীক্ষা গ্রহণ করেন। এর পর বীরচন্দ্র অভিরামকে সঙ্গে নিয়ে দক্ষিণ দেশ ভ্রমণে বাহির হন। এর আগে তিনি নীলাচলে এসে বৈষ্ণবগণকে অলৌকিক প্রভাব দেখান। দক্ষিণদেশ ভ্রমণ শেষে নীলাচলে ফিরে আসেন এবং নারায়ণী দেবীকে বিবাহ করেন। এরপর তিনি আসেন খড়দহে। কিছুদিন খড়দহে থেকে প্রেম প্রচার উদ্দেশ্যে বাহির হন।

প্রভু দোলারোহনে চললেন—সঙ্গে জ্ঞানদাস, কৃষ্ণদাস, রামদাস, রামাই ও নিত্যানন্দ দাস। কতদিন পরে ঢাকায় উপস্থিত হলেন। সেখানে ঢাকার নবাবকে অপ্রাকৃত লীলা বৈভব প্রকাশ করে প্রেমদান করে মালদহের দিকে অগ্রসর হলেন। সেখানে মহানন্দাতীরে সংকীর্তন শুরু হল। সংবাদ পেয়ে হোসেন শাহের মন্ত্রী কেশব ছত্রীর পুত্র দুর্লভ ছত্রী এলেন এবং মহোৎসবের যাবতীয় খরচা বহন করলেন। মহোৎসব অন্তে ঐ স্থান দেবোত্তররূপে বীরচন্দ্র প্রভুকে দান করলেন। পরবর্তীকালে বীরচন্দ্রের মধ্যমপুত্র শ্রীরামকৃষ্ণপ্রভু উক্ত স্থানে শ্রীপাট স্থাপন করেন। মালদহ হতে বীরচন্দ্র পিতৃভূমি একচক্রা দর্শন করতে যান। একচক্রায় শ্রীবঙ্কিম দেবের দর্শনে বিভোর হন। সেখানে তিনদিন অবস্থান করে মহোৎসব করেন এবং স্থানটির নাম রাখেন বীরচন্দ্রপুর। সেখান থেকে আসেন যাজিগ্রামে। সেখানে রাজা বীর হাম্বীরকে শক্তিসঞ্চার করেন। সেখান হতে রাঢ়দেশে প্রেমপ্রদান করে সঙ্গীগণকে বিদায় দিয়ে ঝাড়িখণ্ড পথে শ্রীধামবৃন্দাবনের দিকে রওনা হন। শ্রীনিবাস ও নরোত্তমের সঙ্গে মিলিত হয়ে সমগ্র বঙ্গ দেশে গৌরাঙ্গের প্রবর্তিত বিশুদ্ধ প্রেমধর্ম প্রবর্তন ও সংরক্ষণ করেন। বীরচন্দ্র শ্রীখণ্ডে নরহরি সরকারের তিরোধান মহোৎসবে যোগ দেন এবং ভুবনমোহন নৃত্য করেন। লক্ষ লক্ষ লোক আকুল প্রাণে নৃত্য দেখতে আসেন।

প্রভু বীরচন্দ্রের বার হাজার নাড়া শিষ্য ছিল। তাদের মধ্যে কয়েকজন সাধন প্রভাবে যথেচ্ছাচার করত। বীরচন্দ্রের প্রভাবে তারাও বিশুদ্ধ ভক্তিধর্মের ছত্রছায়ায় আসে। প্রভু বীরচন্দ্র শ্রীপাট খড়দহে শ্রীশ্যামসুন্দর বিগ্রহ স্থাপন করেন। এরপর গৌড়মণ্ডলে প্রেম প্রচারে বাহির হন। গৌড়দেশে উপনীত হলে তদানীন্তন নবাব বীরচন্দ্রের জাহিরা (ক্ষমতা) দেখার উদ্দেশ্যে বাবুর্চিদ্বারা অখাদ্য পাক করিয়ে উত্তম বস্ত্রে আবৃত করে প্রভু সমীপে পাঠালেন। বাবুর্চি প্রভু সম্মুখে উপনীত হলে প্রভু আবরণ উন্মোচন করতে বললেন। কিন্তু আশ্চর্যের ব্যাপার। আবরণ খোলামাত্র যাতি যুথী মালতী ফুল দেখা গেল। তিনবার এইরূপ ঘটার পর নবাব বিমোহিত হয়ে প্রভুর চরণে প্রণত হয়ে কিছু দান গ্রহণ করতে অনুরোধ করেন। নবাবের তোরণে একটি তেলুয়া পাথর ছিল। বীরচন্দ্র ঐ পাথর চাইলেন। ঐ পাথর খড়দহে এনে তিনটি মূর্তি নির্মাণ করান। প্রথম মূর্তি খড়দহের 'শ্যামসুন্দর', দ্বিতীয় মূর্তি সাঁইবোনার

'শ্রীনন্দদুলাল' আর তৃতীয় মূর্তি মাহেশের 'শ্রীরাধাবল্লভজী'। এই তিনস্থানে প্রতিষ্ঠিত হন।

একদিন প্রভু বিষ্ণুপুরে শ্রীনিবাস ভবনে উপস্থিত হলেন। যথাযোগ্য আপ্যায়নের পর পাকের ব্যবস্থা হল। শ্রীনিবাসের কনিষ্ঠ পত্নী পদ্মাবতী পাক করলেন। ভোজনের পর সেবারত দম্পতিকে পুত্রকন্যার কথা জানতে চাইলে "আপনার কৃপাই ভরসা" বলাতে প্রভু চর্বিত তাম্বুল গ্রহণ করতে বলে পুত্রসন্তানের বর দেন। তাতেই শ্রীগতিগোবিন্দের জন্ম হয়।

মহীয়সী বৈষ্ণবী

শচীদেবী :—নীলাম্বর চক্রবর্তীর কন্যা শচীদেবী। নীলাম্বর চক্রবর্তী শ্রীহট্ট হতে নবদ্বীপে এসে বেলপুকুরায় বসতি স্থাপন করেন। শচীদেবীর বিবাহ হয় জগন্নাথ মিশ্রের সঙ্গে। ছোট বোন সর্বজয়ার বিবাহ হয় নবদ্বীপ নিবাসী চন্দ্রশেখর আচার্যের সঙ্গে। শচীদেবীর দুই পুত্র— বিশ্বরূপ ও বিশ্বম্ভর। এই কনিষ্ঠ পুত্রটিই গৌরাঙ্গ বা শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য।

"একদিন পূর্ণমাসী নিশি প্রভু গোরা রায়।
ব্রজেন্দ্র নন্দনভাবে মুরলী বাজায় ।
আই বিনা অন্য কেহ শুনিতে না পাই।
শুনি আনন্দিত আই প্রেমে মূর্ছা যায় ॥"

লক্ষ্মীপ্রিয়া—'নদীয়া নিবাসী বিপ্র শ্রীবল্লভ আচার্য।
তাঁর কন্যা লক্ষ্মীদেবী সর্বগুণে বর্য্য ॥"

শিশুকাল হতেই মাটির শিব তৈরি করে লক্ষ্মীদেবী পূজা করতেন। একদিন গৌরাঙ্গ সেই পূজা করা দেখে বললেন,

"আমারে পূজহ মুই হই মহেশ্বর।
পূজিলে পাইবে তুমি মন মত বর ॥
শুনি লক্ষ্মীদেবীঅতি আহ্লাদিত মন।
সচন্দন পুষ্পে পূজে প্রভুর চরণ ॥

কতদিনে প্রভুসহ বিবাহ হইল।
প্রভুপদ পায়া লক্ষ্মী আনন্দে ভাসিল ॥"

মহাপ্রভু টোল খোলার কিছুদিন পর কিছু ছাত্র নিয়ে বঙ্গদেশে যাবেন শুনে—

'বঙ্গযাত্রা শুনি কাঁদে লক্ষ্মীঠাকুরাণী।
কান্ধের যজ্ঞসূত্র তারে দিলা দয়ানিধি।"

আর বললেন,— 'আমার চরণধূলি রাখ কটুয়া ভরি।
কপালে তিলক নিহ মন্ত্র জপ করি ॥

এই উপদেশ দিয়ে "গেলা বঙ্গদেশে।"

প্রভু বঙ্গদেশে চলে গেলে 'গৌরাঙ্গের পৈতা পূজা মাল্যচন্দনে' করতে লাগলেন কিন্তু

'না হেরিয়া প্রভুপদ বিহ্বল হইল '
হেরিতে প্রভুর পদ যুকতি করিল
এ প্রাকৃত দেহরাখি অবনী উপরে।
অলক্ষিতে প্রভু পাশে চলয়ে সত্বরে ॥
প্রভুর বিরহ সর্প তাহারে দংশিল।
তাহাতে শ্রীলক্ষ্মীদেবী অন্তর্ধান কৈল ॥"

বিষ্ণুপ্রিয়া—নবদ্বীপবাসী সনাতন মিশ্রের একমাত্র কন্যা বিষ্ণুপ্রিয়া। সেই বিষ্ণুপ্রিয়া "শিশু হৈতে দুই তিন বার গঙ্গাস্নান করতে যেত। আর ঐ ঘাটেও যেতেন শচীদেবী স্নানোপলক্ষ্যে।

"আইরে দেখিয়া ঘাটে প্রতি দিনে দিনে।
নম্র হয়ে নমস্কার করেন চরণে ॥" বালিকাটিকে দেখে শচীমাতার খুব ভাল লাগে। শ্রীগৌরাঙ্গের তখন পত্নীবিয়োগ ঘটেছে। তাই শচীদেবী—

'কাশীনাথে ডাকি শচী করিল প্রেরণ।
মিশ্রগৃহে গিয়া কার্য করিল সাধন ॥
বুদ্ধিমন্ত খান ব্যয় করিল বহন।
প্রভু সহ বিষ্ণুপ্রিয়ার হইল মিলন ॥'

বিবাহের পর কিছুদিন যায়। অতঃপর গৌরাঙ্গের সন্ন্যাস গ্রহণের কথা শুনে

"বসন না দেয় গায়/না বান্ধয়ে চুলি।
হা কান্দ কান্দনা কান্দে উন্মতি পাগলী ॥"

তারপর গৌরাঙ্গ সন্ন্যাসে চলে গেলে বিরহে অভিভূতা বিষ্ণুপ্রিয়া শচীদেবীর সেবা করেন আর, "গৌরাঙ্গের রূপসাম্য চিত্রপট করি।
প্রতিষ্ঠা করিয়া সেবা করে ভক্তি করি ॥

তারপর যখন "শ্রীশচীদেবী অন্তর্ধান কৈল।
ভক্ত দ্বারে স্বেচ্ছাক্রমে দ্বার রুদ্ধ হৈল ॥
আজ্ঞা বিনা কোনজন যাইবারে নারে।
অত্যন্ত কঠোর তপ সদাই আচরে ॥
বাড়ির বাহির দ্বার মুদ্রিত করিয়া
ভিতরে রহিলা দাসী জনা কথো লয়া ॥
দুই দিগে দুই মই ভিতে লাগা আছে।
তাহে চড়ি দাসী আইসে যায় আগে পাছে ॥
ভিতরে পুরুষ মাত্র যাইতে না পায়।
দামোদর পণ্ডিত যায় প্রভুর আজ্ঞায় ॥
সেবার গঙ্গাজল দামোদর নিত্য আনে।
বহিরাচরণ জল আনে দাসীগণে ॥
প্রতি নামে এক তণ্ডুল মৃৎপাত্রে রাখি।
তৃতীয় প্রহর জলে ঝরে দুটি আঁখি ॥
তৃতীয় প্রহর জপি যে তণ্ডুল হয়।
তাহা পাক করি দেবী সুখে সমর্পয় ॥
সে প্রসাদ একমুষ্ঠি করিয়া ভোজন।
অবশিষ্ট ভক্তগণে করে বিতরণ ॥"

মহাপ্রভু অন্তর্ধান করলে বিরহকাতরা বিষ্ণুপ্রিয়া স্বপ্নাদেশ পেলেন—

"যে বৃক্ষতলে মাতা মোরে দিল স্তন।
সেই বৃক্ষদ্বারে কর শ্রীমূর্তি রচন ॥"

তখন— "কামার ডাকিয়া বৃক্ষ করিল ছেদন।
ভাস্করের দ্বারে কৈল শ্রীমূর্তি গড়ন ॥"

এতে— "প্রাণনাথে দেবী যেন পুনঃ ফিরে পেল।"
দিবা নিশি হেরে আর করয়ে সেবন ॥

পরে যাদব আচার্য বিষ্ণুপ্রিয়ার নিকট দীক্ষা গ্রহণ করে বিষ্ণুপ্রিয়াসেবিত গৌরাঙ্গ বিগ্রহ সেবায় নিযুক্ত হন। তাঁর বংশধরেরা অদ্যাপি নবদ্বীপে সেই বিগ্রহ সেবা করছেন।

জাহ্নবা দেবী :—শ্রীনিত্যানন্দ নীলাচলে মহাপ্রভু কর্তৃক আদিষ্ট হয়ে সংসারধর্ম পালনে এবং সমগ্র গৌড়মণ্ডলে নাম প্রচারে দায়বদ্ধ হন—

"প্রভুবলে শুন নিত্যানন্দ মহামতি।
সত্বরে চলহ তুমি নবদ্বীপ প্রতি।"

কেননা, "তবে মূর্খ নীচ যত পতিত সংসার।
বল দেখি আর কেবা করিবে উদ্ধার।"

নিত্যানন্দ এলেন পানিহাটী প্রভৃতি স্থানে। শালিগ্রাম নিবাসী সূর্যদাস পণ্ডিতের দুই কন্যা শ্রীবসুধা ও শ্রীজাহ্নবা। তাঁদেরকে বিবাহ করে খড়দহে আসেন। এবং পুরন্দর পণ্ডিতের দেবালয়ে অবস্থান করে তথায় শ্রীপাট স্থাপন করেন।

এখানে বসুধার গর্ভে এক পুত্র বীরচন্দ্র এবং কন্যা গঙ্গাদেবী জন্মগ্রহণ করেন। শ্রীনিত্যানন্দের তিরোধানের পর তাঁর পত্নী জাহ্নবা ঠাকুরানী তখন গৌড়ীয় বৈষ্ণব সমাজের শীর্ষস্থানে অধিষ্ঠিত। খেতরী উৎসবে নিমন্ত্রণ পেয়ে যাঁদের নিয়ে রওনা হয়েছিলেন---ভক্তি রত্নাকরে—

"কৃষ্ণদাস সরখেল মাধব আচার্য।
রঘুপতি বৈদ্য উপাধ্যায় মহা আর্য ॥
রামদাস, মনোহর, মুরারী, নকড়ি,
শ্রীমুকুন্দ দাস বৃন্দাবন আদি করি।
এ সবার সহ সুখে চলেন ঈশ্বরী ॥"

জাহ্নবা দেবী খড়দহ থেকে নৌকাযোগে এলেন সপ্তগ্রাম। সেখান থেকে অম্বিকা, নবদ্বীপ, আকাইহাট দিয়ে এলেন কাটোয়ায়। পথে অসংখ্য ভক্ত মিলিত হয়ে চললেন। শ্রীরঘুনন্দন, বাণীনাথ, মঙ্গল বৈষ্ণব প্রমুখও যোগ দিলেন। সকলেই সেদিনের মতো কন্টকনগরে যদুনন্দনের অতিথি হলেন। এই বিরাট দল চলল খেতুরী অভিমুখে। জাহ্নবা দেবী বিরাট দল নিয়ে বুধরীতে গোবিন্দ রামচন্দ্র আলয়ে রাত্রি যাপন করলেন। পরদিন পদ্মাতীরে গিয়ে তাঁরা রাজা সন্তোষ দত্ত নিযুক্ত নৌকায় উঠলেন। নৌকা যখন খেতরী পারে গিয়ে লাগল তখন তীরে জাহ্নবাঠাকুরাণীর জন্য দোলা ও অপর সকলের জন্য যান প্রস্তুত ছিল। জাহ্নবা ঠাকুরাণী দোলায় ও অচ্যুতানন্দ প্রভৃতি যানারোহনে চললেন। দূর পথ নয়, অনেকেই পদব্রজে চলতে লাগলেন, সংবাদ পেয়ে ঠাকুরমশায় ছুটে এলেন আচার্য প্রভুদের নিয়ে। তাঁদের দেখে জাহ্নবাদেবী দোলা থেকে নেমে পড়লেন। পথেই বিরাট হরিধ্বনির মধ্যে যে প্রণামালিঙ্গনের ধুম পড়ে গেল তা অবর্ণনীয়। সকলের জন্য পৃথক পৃথক বাসা দেওয়া হল। ফাল্গুনের শুক্লা পঞ্চমীতে খেতুরীর উৎসবের শুভারম্ভ। পূর্ণিমায় প্রতিষ্ঠা দিবস। চতুর্দশীর সন্ধ্যায় জাহ্নবা ঠাকুরাণী প্রভৃতি মোহান্তগণের আদেশ নিয়ে অধিবাস হল। আজ গৌর পূর্ণিমা। দেবতাগণের অভিষেক হবে। বিরাট চন্দ্রাতপ। এর তলে সকলে বসবেন,

"বসিবেন শ্রীজাহ্নবা ঈশ্বরী যেখানে।
সে অতি গোপন স্থান সভা সন্নিধানে ॥"

নরোত্তম স্বরচিত শ্লোকে ছয় বিগ্রহকে প্রণাম করলেন।

"গৌরাঙ্গ বল্লভীকান্ত শ্রীকৃষ্ণ ব্রজমোহন।
রাধারমণ হে রাধে রাধাকান্ত নমস্তুতে॥"

তখন, 'মাল্য চন্দন স্পর্শে জাহ্নবা ঈশ্বরী।
হইলেন যৈছে তাহা কহিতে না পারি

সংকীর্তন আরম্ভ হল। মূল গায়েন নরোত্তম। যে কীর্তন পরিবেশিত হল তা সত্যই অদ্ভুত। "প্রকটাপ্রকট দুই হৈলা এক ঠাঞি।
কি অদ্ভুত নৃত্যাবেশ দেহ স্মৃতি নাই ॥"

জাহ্নবা দেবীর নয়নে অশ্রুধারা প্রবাহিত হচ্ছিল। বহুকষ্টে নিজেকে সামলে নিয়ে তিনি নরোত্তমকে আশীর্বাদ করলেন। তারপর আরম্ভ হল হোলি খেলা। জাহ্নবা দেবী প্রথমে ঠাকুরদের গায়ে আবির দিয়ে খেলার সূচনা করেন। কীর্তন চলল সারারাত্রি। প্রাতঃকালে জাহ্নবা ঠাকুরাণী স্নানাহ্নিক সেরে অন্নব্যঞ্জন প্রস্তুত করে ঠাকুরদের ভোগ দিলেন। পরে জাহ্নবা দেবী প্রসাদ পরিবেশন করলেন। পরদিন রামচন্দ্র ও গোবিন্দ বুধরী পর্যন্ত গিয়ে মোহান্তদের এগিয়ে দিয়ে খেতুরী ফিরে এলেন। এদিকে অনেক বেলা। যাই হোক, তাঁরা ফিরে এলে তাঁদেরকে খাইয়ে জাহ্নবাদেবী প্রসাদ পেলেন।

আজ পঞ্চমী। জাহ্নবাঠাকুরাণী বৃন্দাবনে যাবেন। গোবিন্দ দাস, গোকুল, নৃসিংহ প্রভৃতিকে নিয়ে "খেতুরী হইতে চলিলেন ধৈর্য ধরি।
শীঘ্র আসিবেন জানাইলেন ঈশ্বরী ॥"

জাহ্নবা ঠাকুরাণী খেতুরী থেকে বৃন্দাবন চলেছেন। পথে জীব উদ্ধার লীলা হচ্ছে।

"ঐছে কত জীবের কলুষ নাশ করি।
প্রয়াগ হইয়া শীঘ্র গেলা মধুপুরী ॥"

ঠাকুরাণীগণসহ মথুরার বিশ্রামঘাটে স্নান করলেন। তারপর মথুরা দর্শনান্তে বৃন্দাবনে প্রবেশ করলেন।

"ঈশ্বরী নিকটে আসি গোস্বামী সকলে।
পরম আনন্দে প্রণমিলা মহীতলে ॥"

গোপাল ভট্ট, ভূগর্ভ ; লোকনাথ, শ্রীজীব প্রভৃতি এগিয়ে এসে ঠাকুরাণীকে নিয়ে গেলেন। তাঁরা অক্রূরঘাট দেখে শ্রীজীবের তত্ত্বাবধানে বাসা করলেন। গোবিন্দ, গোপীনাথ. মদনমোহন রাধাবিনোদ প্রভুর দর্শন করলেন। গোস্বামীরা গোবিন্দ দাসের কাব্য শুনে পরম প্রীত হলেন। ইতিমধ্যে রাধাকুণ্ড থেকে কবিরাজ গোস্বামী এসে ঠাকুরাণীকে দর্শন করলেন। অতঃপর তিনি নিজে রাধাকুণ্ডে গিয়ে রঘুনাথ গোস্বামীর সঙ্গে দেখা করলেন। রাধাকুণ্ডে তিন চারদিন থেকে শ্যামকুণ্ড, গোবর্ধন, মানসগঙ্গা প্রভৃতি দেখার পর বৃষভানুপুর, নন্দীশ্বর, যাবট ও রামঘাট হয়ে বৃন্দাবনে ফিরলেন। তারপর কয়েকদিন স্বহস্তে পাক করে গোবিন্দ গোপীনাথ প্রভুর সেবা করলেন। বৈষ্ণবেরা সেই প্রসাদ পেয়ে ধন্য হলেন। এবার বৃন্দাবন হতে বিদায়ের পালা। শ্রীজীব গোস্বামী গোবিন্দকে বললেন,

"বর্ণিলা যে গীতামৃত তাহা পাঠাইবা।
পাঠাইয়া দিবা পুনঃ আর যেবর্ণিবা ॥"

শ্রীজীব গোস্বামী ও অপরাপর বৈষ্ণবগণ মথুরা পর্যন্ত এগিয়ে দিয়ে গেলেন।

বৃন্দাপন থেকে বেরিয়ে জাহ্নবাদেবী খেতরীর উপকণ্ঠে এসে পড়েছেন শুনে নরোত্তম ও রামচন্দ্রগণ সহ এগিয়ে গিয়ে তাঁদেরকে নিয়ে এলেন। স্নান সেরে এসে

" শ্রীসন্তোষ দত্তের ভাগ্য কহিতে কি আর।
সবাসহ ঈশ্বরী পরিলা বস্ত্র যার ॥"

তিন-চার দিন সেখানে থেকে নৌকাযোগে বুধরী পৌঁছলেন পদ্মাতীরে স্নান সেরে।

সেখানে— "শ্রী ঈশ্বরী করি অতি সংক্ষেপে রন্ধন।
দুগ্ধাদি সহিত কৃষ্ণে কৈল সমর্পণ ॥"

তারপর এলেন একচক্রা। নিতাই-এর বাল্যলীলা স্থলগুলি দেখলেন। তারপর বক্রেশ্বর হয়ে কাটোয়া এবং পরদিন আচার্যের সঙ্গে যাজিগ্রাম। যাজিগ্রাম থেকে শ্রীখণ্ড এবং শ্রীখণ্ড থেকে নবদ্বীপ, অম্বিকা, সপ্তগ্রাম হয়ে খড়দহে ফিরলেন।

সীতাদেবী :— অদ্বৈতাচার্য তীর্থভ্রমণান্তে শান্তিপুরে ফিরে এলেন। নিরাকারবাদী ও ব্রহ্মজ্ঞানী শ্যামদাস নামক এক বিখ্যাত পণ্ডিতকে তর্কযুদ্ধে পরাভূত করায় চতুর্দিকে তাঁর নাম যশ ছড়িয়ে পড়ল। যথাকালে অদ্বৈতাচার্য নৃসিংহ ভাদুরীর দুই কন্যা সীতা ও শ্রীকে বিবাহ করলেন। সীতাদেবীর গর্ভে অদ্বৈতের পাঁচ সন্তান—অচ্যুতানন্দ, বলরাম, গোপাল, জগদীশ ও স্বরূপের জন্ম হয়। শ্রীর একটি সন্তান হয়েছিল বটে, কিন্তু জন্মের অল্প দিনের মধ্যেই তার মৃত্যু হয়।

সীতাদেবী বৈষ্ণব সমাজে বিশেষ শ্রদ্ধাসম্মানের পাত্রী ছিলেন। তিনি স্বামীর নিকট দীক্ষা গ্রহণ করেছিলেন। তিনি জাহ্নবাদেবীর মত বৈষ্ণব সমাজের নেতৃত্ব না করলেও তাঁর অনেক শিষ্য ছিল। শান্তিপুর সম্প্রদায়, অচ্যুতানন্দের শিষ্য ও শাখাভুক্ত সকলেই তাঁকে সবিশেষ ভক্তি করতেন।

সীতাঠাকুরাণীর দু'খানা জীবনীকাব্য পাওয়া গিয়েছে। একখানা লোকনাথের 'সীতাচরিত্র', অপরখানা বিষ্ণুদাসের 'সীতাগুণ কদম্ব।' বিষ্ণুদাস সীতাদেবীর শিষ্য ছিলেন। 'সীতাচরিত্র কাব্যে চৈতন্যদেবের তিরোধানে অদ্বৈত ও সীতাদেবীর বিলাপ বেশ সরস ও সরলভাবে বর্ণিত হয়েছে—

হরি হরি কি হৈল মরমের কাজ।
ছাড়ি মহীমণ্ডল গৌরাঙ্গ যে কোথা গেল
আচার্যের মাথে পৈল বাজ ॥
নীলাচলে ছিল গৌর ভরসা আছিল মোর
অনায়াসে হৈত দরশন।
কি বুঝিয়া কি না কৈনু কেনে পত্র পাঠাইনু
যৈছে কৃষ্ণ গেলা বৃন্দাবন।
মনে ছিল বড় সাধ ধরি প্রভুর শ্রীপাদ
নীলাচলে ছাড়িব জীবন।
ইহাতে বিপাক হৈল আগে লীলা সম্বরিল
এইসব বিধির ঘটন।

হেমলতা ঠাকুরাণী

"শ্রীআচার্য প্রভুর কন্যা হেমলতা।
প্রেমকল্প বলি রূপে নিরমিল ধাতা ॥"

শ্রীনিবাস আচার্য দুইবার বিবাহ করেছিলেন। প্রথমা পত্নী ঈশ্বরী আর কনিষ্ঠা গৌরাঙ্গপ্রিয়া। আচার্যের তিন পুত্র ও চার কন্যা ছিল। পুত্র ত্রয়ের নাম বৃন্দাবন, বল্লভ ঠাকুর, শ্রীরাধাকৃষ্ণ ঠাকুর ও গোবিন্দগতি ঠাকুর। চারিটি কন্যা হল—হেমলতা, কৃষ্ণপ্রিয়া, কাঞ্চন ও যমুনা। কন্যাদের মধ্যে হেমলতা ঠাকুরাণীই জ্যেষ্ঠা। গোবিন্দ বিলাস, কর্ণানন্দ প্রভৃতি কাব্য রচয়িতা যদুনন্দন দাস হেমলতা ঠাকুরাণীর শিষ্য ছিলেন। কর্ণানন্দ কাব্যের বিষয়বস্তু

কবি হেমলতা দেবীর কাছে শ্রবণ করেন এবং দেবী-নির্দেশেই কাব্যটি রচনা করেন। এমনকি কর্ণানন্দ নামটিও হেমলতা দেবীর দেওয়া।

হেমলতা দেবীর শিষ্য ও উপশিষ্যের সংখ্যা ছিল প্রচুর। এ সম্বন্ধে 'কর্ণানন্দে'র এক জায়গায় বলা হয়েছে—

"তবে প্রভুর নিজকন্যা শ্রীল হেমলতা।
তাহারে করিলা দয়া হঞা প্রসন্নতা ॥
তার শিষ্য উপশিষ্য অনেক হইল।
তিহো প্রেমামৃত সব মতি ভাসাইল ॥"

মধ্যযুগে আমাদের দেশে শিক্ষা, বিশেষত নারীশিক্ষার স্থান খুবই সঙ্কুচিত হয়ে পড়েছিল। সমাজজীবনে স্ত্রীলোকের স্বাধীনতা বলে কিছু ছিল না। তাদের শিক্ষাদীক্ষাও ছিল অবহেলিত। এমতাবস্থায় হেমলতা দেবী বৈষ্ণবধর্ম ও রসশাস্ত্রে অগাধ পাণ্ডিত্যের অধিকারিণী হয়েছিলেন। মধ্যযুগে যে কয়জন মহিলা কবি বাংলাসাহিত্যে স্মরণীয় হয়ে আছেন হেমলতা দেবী তাঁদের মধ্যে অন্যতম। তাঁর রচিত 'মানবি বিলাস' কাব্যে তাঁর সহজ কবিত্বশক্তির পরিচয় পাওয়া যায়। তাঁর কবিত্বের ভাষা সহজ, সরল ও প্রাঞ্জল। বৈষ্ণব রসশাস্ত্রের অতীব দুরূহ বিষয়কে সহজ সরল ভাষায় প্রকাশ করে তিনি অপ্রাকৃত ধর্ম ও জীবনকে প্রাকৃতজনের অনুগামী করে তুলেছেন। গ্রন্থটির মূল প্রতিপাদ্য বিষয় হল মানব। মধ্যযুগের বাংলাসাহিত্যে দেববাদেবই প্রাধান্য ছিল, মানব ছিল গৌণ। শ্রীচৈতন্যের আবির্ভাবের পর আমাদের সাহিত্যে একটা পরিবর্তন ঘটল। এই পরিবর্তন হল মানুষের মধ্য দিয়ে আপন অন্তরের দেবত্বকে উপলব্ধি করা। চণ্ডীদাসের 'সবার উপরে মানুষ সত্য তাহার উপরে নাই' প্রতিফলিত হয়েছে হেমলতা দেবীর মানবি বিলাস কাব্যেও— "এই শে মনুষ্যরতি য়ে কৃষ্ণভজন।
স্বভাব আচার প্রেমে করহ সাধন ॥"

শ্রীনিবাস আচার্যের মৃত্যুর পর হেমলতা ঠাকুরাণী বিষ্ণুপুর পাটে বিশেষ উল্লেখযোগ্য স্থান অধিকার করেছিলেন।

গৌরগণের পূর্বজন্মের পরিচয়
শ্রীশ্রীগৌরগণোদ্দেশানুযায়ী

	গৌরলীলায়	কৃষ্ণলীলায়
১।	জগন্নাথ মিশ্র (মহাপ্রভুর পিতা)	নন্দ (কৃষ্ণের পিতা)
২।	শচীদেবী (মহাপ্রভুর মাতা)	যশোদা (কৃষ্ণের মাতা)
৩।	কেশব ভারতী (মহাপ্রভুর সন্ন্যাস-গুরু)	সন্দীপনী মুনি (কৃষ্ণের শিক্ষাগুরু)
৪।	গঙ্গাদাস পণ্ডিত ও সুদর্শন পণ্ডিত (মহাপ্রভুর বিদ্যাগুরু)	বশিষ্ঠ (রামচন্দ্রের বিদ্যাগুরু)
৫।	হাড়াই পণ্ডিত (নিত্যানন্দের পিতা)	বসুদেব (রামকৃষ্ণের পিতা)
৬।	পদ্মাবতী (নিত্যানন্দের মাতা)	রোহিণী (বলরামের মাতা)
৭।	পুণ্ডরীক বিদ্যানিধি (জনৈক পণ্ডিত)	বৃষভানু রাজা (রাধিকার পিতা)
৮।	নিত্যানন্দ	বলরাম
৯।	বসুধা (নিত্যানন্দ-পত্নী)	বারুণী (বলরামের পত্নী)

১০।	জাহ্নবা (ঐ)	রেবতী (ঐ)
১১।	মাধব মিশ্র (গদাধরের পিতা)	বৃষভানুরাজ (প্রকাশ বিশেষ)
১২।	রত্নাবতী (গদাধরের মাতা)	কীর্তিদা (রাধিকার মাতা)
১৩।	বিশ্বরূপ (মহাপ্রভুর জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা)	সঙ্কর্ষণ
১৪।	অদ্বৈতাচার্য	সদাশিব (মহাদেব)
১৫।	সীতাদেবী (অদ্বৈত-পত্নী)	যোগমায়া (ভগবতী)
১৬।	গদাধর পণ্ডিত	শ্রীরাধারাণী
১৭।	শ্রীবাস পণ্ডিত	নারদ
১৮।	লক্ষ্মীপ্রিয়া (মহাপ্রভুর প্রথমা পত্নী)	রুক্মিণী
১৯।	বিষ্ণুপ্রিয়া (মহাপ্রভুর দ্বিতীয়া পত্নী)	সত্যভামা
২০।	গোপীনাথাচার্য	ব্রহ্মা
২১।	মুরারী গুপ্ত	হনুমান
২২।	পুরন্দর পণ্ডিত	অঙ্গদ
২৩।	গোবিন্দানন্দ	সুগ্রীব
২৪।	হরিদাস ঠাকুর	প্রহ্লাদ
২৫।	বৃন্দাবন দাস	বেদব্যাস
২৬।	বল্লভ	শুকদেব
২৭।	বনমালী ভিক্ষুক	সুদামা বিপ্র
২৮।	প্রতাপ রুদ্র	ইন্দ্র দ্যুম্ন
২৯।	পরমানন্দ পুরী	উদ্ধব
৩০।	সার্বভৌম ভট্টাচার্য	দেবগুরু বৃহস্পতি
৩১।	ভাস্কর ঠাকুর	বিশ্বকর্মা
৩২।	ঈশান দাস	শাণ্ডিল্য মুনি
৩৩।	রায় ভবানন্দ	পাণ্ডুমহারাজ

দ্বাদশ গোপাল

৩৪।	অভিরাম ঠাকুর	শ্রীদাম
৩৫।	সুন্দরানন্দ ঠাকুর	সুদাম
৩৬।	ধনঞ্জয় পণ্ডিত	বসুদাম
৩৭।	গৌরীদাস পণ্ডিত	সুবল
৩৮।	কমলাকর পিপ্পীলাই	মহাবল
৩৯।	উদ্ধারন দত্ত	সুবাহু
৪০।	মহেশ পণ্ডিত	মহাবাহু
৪১।	পুরুষোত্তম ঠাকুর	স্তোককৃষ্ণ
৪২।	নাগর পুরুষোত্তম	দাম
৪৩।	পরমেশ্বরদাস ঠাকুর	অর্জুন
৪৪।	কালাকৃষ্ণদাস	লবঙ্গ
৪৫।	শ্রীধর পণ্ডিত	কুসুমাশব

অষ্ট গোস্বামী

৪৬।	রূপ গোস্বামী	রূপমঞ্জরী

৪৭।	সনাতন	লবঙ্গমঞ্জরী
৪৮।	রঘুনাথ ভট্ট	রসমঞ্জরী
৪৯।	জীব গোস্বামী	বিলাস মঞ্জরী
৫০।	গোপাল ভট্ট	গুণমঞ্জরী
৫১।	রঘুনাথ দাস	কবিমঞ্জরী
৫২।	লোকনাথ গোস্বামী	মঞ্জুলালী মঞ্জরী
৫৩।	ভূগর্ভ গোস্বামী	প্রেম মঞ্জরী

অষ্টপ্রধান মহান্ত

৫৪।	স্বরূপ দামোদর	ললিতা
৫৫।	রায় রামানন্দ (স্বরূপ গোস্বামী)	বিশাখা
৫৬।	সেন শিবানন্দ	চিত্রা
৫৭।	বসু রামানন্দ (রাঘব গোস্বামী)	চম্পকলতা
৫৮।	মাধব ঘোষ (প্রবোধানন্দ)	তুঙ্গ বিদ্যা
৫৯।	গোবিন্দানন্দ ঠাকুর (কৃষ্ণদাস ব্রহ্মচারী)	ইন্দুরেখা
৬০।	গোবিন্দ ঘোষ (গদাধর ভট্ট)	রঙ্গদেবী
৬১।	বাসুদেব ঘোষ (অনন্তাচার্য গোস্বামী)	সুদেবী

পঞ্চম অধ্যায়

কবি জয়দেব

॥ দেহি পদপল্লবমুদারম্ ॥

অজয়ের তটে রাধাশ্যামের মন্দিরে জয়দেব বধূঁ-পদ্মাবতীকে নিয়ে শুরু করলেন এক অপরূপ প্রেমসাধনা। সারাদিন চলে রাধাশ্যামের অর্চনা—পদ্মাবতী করে সঙ্গীতে আর নৃত্যে রাধাশ্যামের পূজারতি আর জয়দেব রচনা করেন অমৃত-নিঃস্যন্দী কাব্য "শ্রীশ্রীগীতগোবিন্দ"। এইভাবে লিখতে লিখতে জয়দেব লিখে ফেলেছেন—'স্মর-গরল খণ্ডনং মম শিরসি মণ্ডনং" তার পরের কথাটি ভক্তকবি আর লিখতে পারেন না। পদ্মাদেবীকে ডেকে পাশে বসান। অশ্রুবিধৌত-কণ্ঠে কবি পড়ে শোনান স্মর-গরলখণ্ডনম্। পদ্মাবতী বলেন, 'প্রভু, দ্বিপ্রহর হয়ে গেছে, আপনি স্নান সেরে আসুন। তারপর আহারান্তে আবার লিখতে চেষ্টা করবেন।' কবি ভাবেন, তাইতো, পদ্মাবতী অভুক্ত রয়েছেন। তাই নদীতে স্নানের জন্য বেরিয়ে পড়েন। পদ্মাবতী আহারের আয়োজন করতে লাগলেন। অল্পক্ষণ পরেই দেখেন, স্নান সেরে স্বামী ফিরে এসেছেন। আহারান্তে জয়দেব বলেন, 'পদ্মাবতী আমার পুঁথিটা নিয়ে এস, অসমাপ্ত পদটি সমাপ্ত করে বিশ্রাম করবো।' পদ্মাবতী পুঁথি নিয়ে এলে জয়দেব অসমাপ্ত পদটি পূরণ করে লিখলেন—

স্মর-গরল খণ্ডনং মম শিরসি মণ্ডনং
দেহি পদ পল্লবমুদারম্ ॥

জয়দেব বিশ্রামের জন্য ঘরে প্রবেশ করলেন। পদ্মাবতী ভুক্তাবশিষ্ট নিয়ে খেতে বসবেন, এমন সময় দেখেন, কৃষ্ণনাম গাইতে গাইতে স্নানান্তে জয়দেব আসছেন। বিস্ময়ে পদ্মাবতী হতবাক। বিশ্রামকক্ষে গিয়ে দেখেন ঘর শূন্য। সমস্ত ঘর পদ্ম আর চন্দনের সৌরভে ভরপুর। বিস্ময়ে জয়দেবও বিহ্বল হয়ে পড়েন। পুঁথি খুলে দেখেন তাতে স্পষ্টাক্ষরে লেখা—"দেহি পদপল্লব মুদারম।" রোমাঞ্চিত হয়ে ওঠে জয়দেবের সর্বাঙ্গ। বুঝতে পারেন ভক্তবৎসল কৃষ্ণের অপার মহিমা। এটা জয়দেব সম্বন্ধীয় আখ্যানগুলির মধ্যে একটি।

এক্ষণে জয়দেবের কাব্যের অপরাপর বিষয়ের আলোচনা করব।

দ্বাদশ শতাব্দীর শেষভাগে রাজা লক্ষ্মণ সেনের সময় কবি জয়দেব বর্তমান ছিলেন। তাঁর রাজসভায় সে যুগের বাংলার সর্বশ্রেষ্ঠ কবিদের সম্মেলন ঘটেছিল। এঁরা হলেন কবি উমাপতি ধর, গোবর্ধন আচার্য, কবি শরণ, কবি ধোয়ী এবং কবি জয়দেব। বিক্রমাদিত্যের সভায় কালিদাসের মতন লক্ষ্মণ সেনের রাজসভাকে কবি জয়দেবের নাম ও কীর্তিই অমর করে রেখেছে।

জয়দেবের পিতার নাম ভোজদেব, মাতার নাম বামা দেবী, পত্নী পদ্মাবতী ও বন্ধু পরাশর। বাসস্থান বীরভূম জেলার অজয়নদের তীরে কেন্দ্রবিল্ব গ্রামে। এর চেয়ে আর বেশি কিছু জানা যায় না।

জয়দেব রচিত অমর কাব্যগ্রন্থ শ্রীশ্রীগীতগোবিন্দ। জয়দেব সংস্কৃত সাহিত্যের শেষ বড় কবি এবং বাংলা প্রভৃতি আধুনিক সাহিত্যের আদি কবি। তাঁর রচিত গীতগোবিন্দ কাব্যখানি সংস্কৃত সাহিত্য ও দেশজ প্রাকৃত ভাষার সাহিত্যের সন্ধিক্ষণে বিরাজ করছে। কাব্যখানি

দ্বাদশ সর্গে বিভক্ত। প্রত্যেক সর্গের তিনি নামকরণও করেছেন। সর্গানুযায়ী নাম হল সামোদ দামোদর, অক্লেশ কেশব, মুগ্ধ মধুসূদন, স্নিগ্ধমধুসূদন, সাকাঙক্ষ পুণ্ডরীকাক্ষ, ধৃষ্ঠ বৈকুণ্ঠ, নাগর নারায়ণ, বিলক্ষ লক্ষপতি, মুগ্ধ মুকুন্দ, মুগ্ধ মাধব, সানন্দ গোবিন্দ ও সুপ্রীত পীতাম্বর। এই নামকরণের মধ্যেও জয়দেবের অপরূপ ভাষা শিল্পের পরিচয় পাওয়া যায়। প্রত্যেকটি নাম অনুপ্রাস, শব্দ ঝঙ্কার ও লালিত্যের দিক থেকে অপরূপ। গীতগোবিন্দ কাব্যে চব্বিশটি গান আছে। সখীর গানের সংখ্যাই বেশী, তারপরে রাধিকার। গানের সংখ্যা মাত্র তিনটি। পালাটি রাধাবিরহ পালা। পাত্রপাত্রী তিনজন—রাধা, কৃষ্ণ ও সখী। তার মধ্যে সক্রিয় ভূমিকা সখীর। কৃষ্ণ রাধাকে এড়িয়ে অন্য গোপীর সঙ্গে মিলিত হয়েছে জেনে রাধার দুর্জয় মান, ভর্ৎসিত ও পরিত্যক্ত কৃষ্ণের নির্বেদ এবং সখীর মধ্যস্থতায় রাধাকৃষ্ণের মিলন—এইই গীতগোবিন্দ কাব্যের বিষয়বস্তু।

কবি হিসাবে জয়দেবের বৈশিষ্ট্য হল ধ্বনির সঙ্গে সুরের অপূর্ব মিলন। চিত্রের সঙ্গে গতিকে রূপদান ও ছন্দের ঝঙ্কারের সঙ্গে বাণীর অপূর্ব প্রকাশভঙ্গী। গীতগোবিন্দের মধ্যে যে রস পরিবেশিত হয়েছে, তার নাম শৃঙ্গার রস বা আদিরস। এই কাব্যের প্রত্যেক শ্লোক, শ্লোকের প্রতিটি অক্ষর এই রসে পরিপূর্ণ। সমস্ত কাব্যের মধ্যে এমন কোন শ্লোক নাই যা এই অমৃতরসে নিষিক্ত হয়নি। দু-একটি উদাহরণ দেওয়া হল।

(১) "শ্রিত কমলাকুচ মণ্ডল ধৃত কুণ্ডল
কলিত ললিত বনমাল।"

"রাসে হরিমিহ বিহিত কলাপম
স্মরতি মনোমম কৃত পরিহাসম্"

অথবা

"ধীর সমীরে যমুনাতীরে বসতি বনে বনমালী।
পীন পয়োধর পরিসর মর্দন চঞ্চল করযুগশালী ॥"

বিদ্যাপতি

"চণ্ডীদাস বিদ্যাপতি রায়ের নাটক গীতি
কর্ণামৃত শ্রীগীতগোবিন্দ।
স্বরূপ রামানন্দ সনে মহাপ্রভু রাত্রিদিনে
গায় শুনে পরম আনন্দ ॥"

নীলাচলে মহাপ্রভু যেসব শাস্ত্র, পদ এবং গান শুনে পরম আনন্দ লাভ করতেন তার মধ্যে বিদ্যাপতি রচিত পদগুলি অন্যতম। বাঙালী বৈষ্ণব কবিদের রচনার প্রধান আদর্শ ছিল বিদ্যাপতির গান। সম্ভবত চতুর্দশ শতাব্দীর শেষভাগে বিদ্যাপতি জন্মগ্রহণ করেন এবং পঞ্চদশ শতাব্দীর ষাট বা সত্তর দশক পর্যন্ত জীবিত ছিলেন।

অদ্বৈত আচার্যের দেশভ্রমণকালে তাঁর সঙ্গে বিদ্যাপতির সাক্ষাৎ হয়েছিল বলে অনুমিত হয়। মিথিলার রাজা শিব সিংহের সভাষদ ছিলেন তিনি। চতুর্দশ ও পঞ্চদশ শতাব্দীতে মিথিলার সঙ্গে বাংলাদেশের যোগাযোগ নানাদিক দিয়ে বেশ ঘনিষ্ঠ ছিল। বহু বাঙালী ছাত্র মিথিলায় গিয়ে পড়াশুনা করে আসত। এই সকল সূত্রে বিদ্যপতির পদ বাঙালী সারস্বত সমাজে বিশেষ পরিচিতি লাভ করে এবং বিদ্যাপতির পদাবলী ভাব ও রূপরীতির দিক দিয়ে সমকালীন ও উত্তরকালীন বাঙালী পদকর্তাদের নিকট আদর্শরূপে গৃহীত হয়।

মধ্যযুগে বিদ্যাপতি ছিলেন এক এবং অনন্য মহাকবি। পূর্বরাগ হতে আরম্ভ করে তাঁর

পদাবলীতে রাধার ক্রমবিকাশ বর্ণিত হয়েছে। প্রেমবিহ্বলা শ্রীরাধার মনস্তত্ত্ব অপূর্ব নৈপুণ্যে কবি বিকশিত করেছেন। কখনো তিনি চঞ্চলা, কখনো পুলকে আকুলা—আবার পর মুহূর্তেই বিরহ বিধুরা। যমুনা পুলিনে কৃষ্ণ দরশনে—নব অনুরাগিনী, আবার কখনো তার মধ্যে অতৃপ্তির আকুলতা—

"লাখ লাখ যুগ হিয়ে হিয়া রাখলুঁ
তবু হিয়ে জুড়ন না গেল ॥"

মাথুর এবং ভাবসম্মিলনের পদে বিদ্যাপতি অতুলনীয়। ভাবসম্মিলনের মনস্তাত্ত্বিক বিকলনকে কাব্যে রূপায়িত করার কৃতিত্ব একান্তই বিদ্যাপতির—

"আজু রজনী হাম ভাগে পোহায়লুঁ
পেখলুঁ পিয়া মুখচন্দা।
জীবন যৌবন সফল করি মানলুঁ
দশদিক ভেল নিরদন্দা ॥"

সত্যই, 'মৈথিল কোকিল' বিদ্যাপতি অভিনব জয়দেব।

চণ্ডীদাস

বাংলা ভাষায় প্রথম বৈষ্ণব পদ রচনা করেন কবি চণ্ডীদাস। কিন্তু এই চণ্ডীদাসের পরিচয় নিয়ে বাংলা পদ সাহিত্যে একটা বিরাট জটিলতার সৃষ্টি হয়েছে—যা এখনও নিরসন হয় নি। চণ্ডীদাসের নামাঙ্কিত যত পদ এ পর্যন্ত পাওয়া গেছে সেগুলি বিশ্লেষণ করলে দেখা যায় যে চণ্ডীদাস নামধারী অন্তত চারজন কবি এই পদগুলি রচনা করেছিলেন। চণ্ডীদাস নামাঙ্কিত সমস্ত পদই এক ব্যক্তির রচনা নয়। কেননা, (১) চণ্ডীদাস নামাঙ্কিত সমস্ত পদের ভাব, রীতি ও মান একপ্রকার নয় (২) বিভিন্ন পদে চণ্ডীদাস শব্দটির সঙ্গে 'বড়ু', 'দ্বিজ', 'দীন' ইত্যাদি বিভিন্ন প্রকার বিশেষণ যুক্ত হতে দেখা যায়। (৩) রচনারীতি বিশ্লেষণ করলে দেখা যায় যে তাদের মধ্যে চারটি স্পষ্ট স্তর আছে। এই চারটি স্তরের মধ্যে দুইটি স্তর আখ্যানুযায়ী লেখা, অপরদুটিতে আখ্যান নাই, কেবল রাধাকৃষ্ণের বিশেষ মুহূর্তের মনোভাব বর্ণিত হয়েছে। বর্তমানে পণ্ডিতগণ একাধিক চণ্ডীদাসের অস্তিত্ব স্বীকার করে নিয়েছেন। চণ্ডীদাস সম্পর্কিত তথ্যাদি বিশ্লেষণ করে তাঁরা বড়ু চণ্ডীদাসের শ্রীকৃষ্ণকীর্তন ও পদাবলীর চণ্ডীদাসের পালাগানও সহজিয়া চণ্ডীদাসের সাধন ভজন সংক্রান্ত পদ চৈতন্যোত্তর যুগের বলে মনে করেন। নূতন কোন নির্ভরযোগ্য তথ্য না পেলে এ বিষয়ে শেষ কথা বলা যায় না।

পদাবলীর চণ্ডীদাস :—চণ্ডীদাসের পদাবলীর যদি কোন একটি স্থায়ী সুর থাকে, তবে তা বেদনার সুর। চণ্ডীদাস মানবী প্রেমের দুঃখের কবি। রাধার দুঃখে তিনি নিজে যেমন কাঁদেন—তেমনি কাঁদান পাঠকদের। চণ্ডীদাস যে বেদনার কবি, তা আক্ষেপানুরাগের পদগুলি হতে স্পষ্ট বোঝা যায়। রাধা নিজে দুর্ভাগ্য স্মরণ করে আক্ষেপ করছেন—

"রাতি কৈনু দিবস দিবস কৈনু রাতি।
বুঝিতে নারিনু বঁধু তোমার পিরীতি ॥"

কিন্তু সকলই যে ভাগ্যের দোষ। পরিজনের পরিবাদে রাধার জীবন দুঃসহ হয়েছে। তবু তিনি স্বামী সোহাগিনী ভাগ্যবতীদের বলেন—

"তোরা কুলবতী ভজ নিজপতি
যার মনে যেবা লয়।

ভাবিয়া দেখিলাম শ্যামবঁধু বিনে
আর কেহ মোর নয় ॥"

যদিও রাধাকে শাশুড়ি ননদী, পাড়াপড়শী কৃষ্ণ অনুরাগের জন্য কুবচন বলে তবু রাধার ভ্রূক্ষেপ নাই ; এ সমস্ত যেন তার আভরণ স্বরূপ—

"গুরু দুরজন বলে কুবচন
সে মোব চন্দন চুয়া।
শ্যাম অনুরাগে এ তনু বেচিনু
তিল তুলসী দিয়া ॥"

এতেও কোন দুঃখ নাই। কিন্তু তার বঁধুয়া আন বাড়ি যাওয়াতে হিয়া ফেটে যায়। নারী হয়ে সে কেমন করে সইবে—

সই কেমনে ধরিব হিয়া।
আমার বঁধুয়া আন বাড়ি যায়
আমার আঙ্গিনা দিয়া"—

এ দুঃখ লজ্জা সহ্য করা যায় না। তাই শ্যাম সোহিগিনীদের অভিশাপ দেন

"যুবতী হইয়া শ্যাম ভাঙ্গাইয়া
এমতি করিল কে।
আমার পরাণ যেমতি করিছে
সেমতি হউক সে॥"

শাশুড়ী ননদীর ভয়ে রাধা কাঁদতেও পারেন না। তাঁর মনের অবস্থা

"চোরের মা যেন পোয়ের লাগিয়া
ফুকারি কাঁদিতে নারে ॥"

পদগুলি অশ্রু বেদনায় সকরুণ হয়ে উঠেছে।

প্রেমবৈচিত্ত্য পদে কৃষ্ণপ্রেমে রাধিকার জীবনে এক বিচিত্র অনুভূতি দেখা যায়। তিনি ভেবেছিলেন কৃষ্ণকে ভাল বেসে তিনি চরম সুখ পাবেন, কিন্তু যখন তিনি সেই প্রেমের স্বরূপ বুঝবার চেষ্টা করলেন তখন বুঝলেন কৃষ্ণপ্রেম রহস্যময়। ঐ প্রেম প্রেমিকাকে সুখী করে না, অথচ এক সুখকর যন্ত্রণার অনুভূতি দেয়। কৃষ্ণপ্রেম দুঃখদায়ক জেনেও রাধা কৃষ্ণকেই জন্মান্তরেব প্রাণনাথ বলে কামনা করে।

"বঁধু কি আর বলিব আমি।
জীবনে মরণে জনমে জনমে
প্রাণনাথ হৈও তুমি ॥"

জ্ঞানদাস

মধ্যযুগীয় বৈষ্ণব পদ সাহিত্যে চণ্ডীদাস, জ্ঞানদাস ও গোবিন্দ দাস এই কবিত্রয় একটি বিশিষ্ট স্থান অধিকার করে আছেন। চণ্ডীদাসের মতই জ্ঞানদাসকে নিয়ে অনেক জটিলতা আছে। জ্ঞানদাস ভণিতাযুক্ত সব পদগুলি কি একজন জ্ঞানদাসের বা একাধিক জ্ঞানদাস ছিলেন—এ নিয়েও প্রশ্ন উঠেছে। কোন কোন পণ্ডিতের মতে জ্ঞানদাস নাম তখন এবং পরেও অনেকের নিশ্চয়ই ছিল এবং তাঁদের মধ্যে কেউ না কেউ পদ রচনা করে থাকবেন। এ নামে দ্বিতীয় কোন ব্যক্তিকে ধরা না যাওয়ায় আপাততঃ জ্ঞানদাস নামিত সমস্ত পদই একজনের লেখা বলে গণ্য করতে হয়।

জ্ঞানদাস সম্বন্ধে বিশেষ কিছু জানা যায় না। চৈতন্য চরিতামৃত গ্রন্থে যেটুকু আছে তা হল :--

"পীতাম্বর মাধবাচার্য দাস দামোদর।
শঙ্কর মুকুন্দ জ্ঞানদাস মনোহর"

নিত্যানন্দের ভক্ত ছিলেন জ্ঞানদাস। তিনি নিত্যানন্দ পত্নী জাহ্নবা দেবীর নিকট দীক্ষা গ্রহণ করেন। বর্ধমান জেলার কাটোয়া হতে দশ মাইল দূরে কাঁদরা গ্রাম। ঐ গ্রামে ব্রাহ্মণবংশে সম্ভবতঃ ১৫৩০ খৃষ্টাব্দে জ্ঞানদাস জন্মগ্রহণ করেন। নিত্যানন্দের তিরোধানের বেশ কিছুদিন পর জাহ্নবাদেবী বৃন্দাবনে তীর্থ করতে যান। জ্ঞানদাসও তাঁর সঙ্গী ছিলেন। তখন তিনি শ্রীজীব, রঘুনাথ দাস, গোপাল ভট্ট, কৃষ্ণদাস কবিরাজ প্রভৃতি বিখ্যাত বৈষ্ণব সাধক ও দার্শনিকদের সান্নিধ্যে আসেন।

ষোড়শ শতাব্দীর শেষে বা সপ্তদশ শতাব্দীর গোড়ার দিকে দেববিগ্রহ প্রতিষ্ঠা উপলক্ষ্যে খেতুরীতে যে বিরাট বৈষ্ণব মহোৎসব হয়েছিল জ্ঞানদাস সেই অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন এবং সেখানে গোবিন্দদাস কবিরাজ, বলরাম দাস প্রমুখ বৈষ্ণব কবিদের সঙ্গে তাঁর সাক্ষাৎ হয়। তাঁর জীবন সম্পর্কে এর বেশি আর কিছু জানা যায় না।

জ্ঞানদাস বাংলা ও ব্রজবুলি উভয় ভাষাতেই পদ লিখেছিলেন। পদকল্পতরুতে গৃহীত তাঁর পদের অর্ধেকের বেশি পদ ব্রজবুলিতেই রচিত। কিন্তু বিচারে তাঁর বাংলা পদগুলিই অধিকতর সমৃদ্ধ। ব্রজবুলির পদগুলিতে বিদ্যাপতির প্রভাব সুস্পষ্ট। যেমন,

কষিত কনক রুচির গৌর অখিল ভুবন মরমচৌর
করভণ্ড বাহুদণ্ড কল্মষ-তাপ-ত্রাসনি।
প্রচুর পুলক শোভিত অঙ্গ নটনলীলা অধিক রঙ্গ
বয়ান শরদ পুনিম ইন্দু সরস হাসভাষণি ॥"

এখানে ব্রজবুলির ধ্বনিঝঙ্কার ও ছন্দচাতুর্য থাকলেও ভাবগম্ভীর ব্যঞ্জনা বা সূক্ষ্মতের রসের ব্যঞ্জনা নেই। কিন্তু যখন তিনি কৃত্রিমতা ত্যাগ করে রাখালি সুরে রাধাকৃষ্ণের সুখদুখের কথা শুনিয়েছেন তখনই তিনি পাঠককে মুগ্ধ করেছেন! উদাহরণস্বরূপ নবজাতা রাধাকে দেখে পুরশ্রীগণ রাধার মাতা কীর্ত্তিদাকে যা বলছেন তা উদ্ধার করা যেতে পারে --

ও তোর বালিকা চান্দের কলিকা
দেখিয়া জুড়ায় আঁখি।
হেন মনে লয়ে সদাই হৃদয়ে
পসরা করিয়া রাখি ॥
শুন বৃষভানু প্রিয়ে।
কি হেন করিয়া কোলেতে রেখেছে
এ হেন সোনার ঝিয়ে ॥
কমল জিনিয়া বদন সুন্দর
মুখে হাসি আছে আধা।
গনকে যে নাম সে নাম রাখুক
আমরা রাখিলাম রাধা ॥

পদটি বাৎসল্য রসের অন্যতম শ্রেষ্ঠ নিদর্শন।

ভাবের গভীরতা, রসানুভূতির তীব্রতা ও প্রকাশভঙ্গীর লালিত্যে জ্ঞানদাসের পদগুলি সমৃদ্ধ।

জ্ঞানদাসের দানখণ্ডের পদগুলির মধ্যে কিছু কিছু পদ স্বাভাবিকতায় অতিশয় মনো মুগ্ধকর—ঃ রাধা দধিদুগ্ধ ছানার পশরা নিয়ে বিক্রয়ের জন্য মথুরাগামিনী—পথে কৃষ্ণ দানী। ভরদুপুরে প্রখর রোদে রাধাকে যেতে দেখে সশ্লেষে বলছেন--

"আইস বৈস মোর কাছে রৌদ্রে মিলাও পাছে
বসনে করিয়ে মন্দ বায়।
এ দুখানি রাঙ্গা পায় কেমনে হাঁটিছ তায়
দেখিয়া হেলিছে মোর গায় ॥
কেমনে তোমার গুরুজন কি সাধে আনিল ধন
কেনে বিকে পাঠাইল তোমা
তোর নিজ পতি যে কেমনে বাঁচিবে সে
পাঠাইয়া চিতে দিয়ে খেমা ॥"

জ্ঞানদাস রূপানুরাগ ও আক্ষেপানুরাগের পদে বিশেষ কৃতিত্ব প্রদর্শন করেছেন। এই জাতীয় পদে জ্ঞানদাসকে চণ্ডীদাসের উত্তরসূরী বলে মনে হয়। কারণ এই শ্রেণীর পদে তিনি প্রায় চণ্ডীদাসেব মত দক্ষতা দেখিয়েছেন যেমন---

'সুখের লাগিয়া এঘর বাঁধিনু
অনলে পুড়িয়া গেল।
অমিয় সাগরে সিনান করিতে
সকলি গরল ভেল ॥"

রাধার ভাগ্যদোষে সবই বিপরীত। চাঁদের স্নিগ্ধ কিরণে রবিদাহ, তৃষ্ণার্ত প্রাণ, মেঘে যে বিদ্যুৎ লাভ করল, অমিয় সাগর যে গরলে ভরে গেল। কিন্তু এতে আশ্চর্যের কি আছে। "কানুর প্রেম তো আনন্দ বয়ে আনেনা "এ প্রেমে সুখের চেয়ে দুখের পশরাই যে বেশি—কানুর পীরিতি মরণ অধিক শেল"। তবুও যে রাধার কানুকে ছাড়ার উপায় নাই—

"তোরা কুলবতী ভজ নিজ পতি
যার সেবা মনে লয়।
ভাবিয়া দেখিলুঁ শ্যামবন্ধুবিনে
আর কেহ মোর নয়।"

একেই তো বলে ভগবানের কাছে ভক্তের আত্মসমর্পণ।

গোবিন্দদাস (কবিরাজ)

বৈদ্য বংশোদ্ভুত গোবিন্দদাস কবিরাজ (কৌলিক উপাধি সেন) বর্ধমান জেলার কাটোয়া থেকে দশ মাইল দূরে শ্রীখণ্ডে মাতামহ ভবনে ১৫৩৭ খৃষ্টাব্দে জন্মগ্রহণ করেন। পিতা কুমার নগর নিবাসী প্রসিদ্ধ চৈতন্যভক্ত চিরঞ্জীব সেনমাতা-সুনন্দা। গোবিন্দ দাসেব মাতামহ দামোদর সেন সংস্কৃত সাহিত্যে প্রগাঢ় পাণ্ডিত্য অর্জন করেছিলেন। তাঁব সংস্কৃতে 'রচিতসঙ্গীত দামোদর সঙ্গীতবিষয়ক প্রসিদ্ধ গ্রন্থ। চিরঞ্জীব সেন বেশ কিছুদিন শ্বশুরালয়ে থাকার পর ধর্মমতের অমিল হেতু দুই পুত্র রামচন্দ্র এবং গোবিন্দকে নিয়ে মুর্শিদাবাদ জেলার তেলিয়া বুধরী গ্রামে গিয়ে বাস করেন।

"তেলিয়া বুধরী গ্রামে গোবিন্দের স্থিতি।
তেলিয়ায় নির্জন স্থানেতে অতি প্রীতি ॥

বধুরী পশ্চিমে শ্রীপশ্চিম পাড়া নাম।
তথা সর্বারম্ভে বাস সেহ রম্যস্থান ॥" (ভক্তি রত্নাকর)

গোবিন্দদাস প্রথম জীবনে শক্তির উপাসক ছিলেন। পরে শ্রীনিবাস আচার্যের নিকট দীক্ষা গ্রহণ করেন এবং তাঁর নির্দেশে রূপগোস্বামীকৃত ভক্তি রসামৃত সিন্ধু, উজ্জ্বল নীলমণি প্রভৃতি অধ্যয়ন করেন। এবং রাধাকৃষ্ণ লীলা বিষয়ক পদ লিখতে আরম্ভ করেন। জাহ্নবা দেবীর সঙ্গে তিনি বৃন্দাবন যান। বৃন্দাবনের গোস্বামীগণ তাঁর পদাবলী শুনে পরম প্রীত হয়ে তাঁকে কবিরাজ উপাধিতে ভূষিত করেন।

খেতুরী উৎসবে গোকুলদাস কীর্তনীয়া গোবিন্দদাসের পদ গান করেছিলেন। ঐ গান শুনে নিত্যানন্দপুত্র বীরচন্দ্রের প্রতিক্রিয়া—

"শ্রীগোবিন্দ কবিরাজে দুটি করে ধরি।
কহে তুয়া কাব্যের বালাই লইয়া মরি ॥ (ভ. র)

বিদ্যাপতির বাকরীতি ও অলঙ্করণ এবং সংস্কৃত প্রেমভক্তিরসের উদ্ভট কবিতাকে আশ্রয় স্বরূপ গ্রহণ করে গোবিন্দদাস প্রায় সাত শত পদ রচনা করেছিলেন। এই পদগুলির অধিকাংশই ব্রজবুলিতে লেখা।

বিদ্যাপতি ও চণ্ডীদাসের পর গোবিন্দদাসই বৈষ্ণব কবিকুলের শীর্ষস্থানীয়। তাঁর রচিত

'করি কঙ্কণ পণ ফণী মুখ বন্ধন
শিখই ভুজগ গুরু পাশে'

অথবা

'যো পদতল থল কমল
ধরণী পরশে উপশঙ্ক।
অব কন্টকময় বাটহি আওত
যাত নিশঙ্ক—

এই পদগুলি প্রেম যে ইন্দ্রিয় বিকার নয়, কঠোর সাধনা, তাই প্রমাণ করছে।

শ্রীগৌরাঙ্গদেবকে অবলম্বন করে তিনি অনেক গৌরপদও রচনা করেছিলেন। চৈতন্য দেবের দিব্যোন্মাদ মূর্তিটির রেখাচিত্র যে কোন প্রথম শ্রেণীর গীতিকবির সাধনার বিষয়—

'লহু লহু হাসনি গদ গদ ভাষনি
কত মন্দাকিনী নয়নে ঝরে।'

অথবা

'নীরদ নয়ন নীর ঘন সিঞ্চনে
পুলক-মুকুল অবলম্ব।
স্বেদ মকরন্দ বিন্দু বিন্দু চুয়ত
বিকশিত ভাব কদম্ব ॥"

সমস্ত রস পর্যায়ের মধ্যে অভিসারের পদেই গোবিন্দদাসের শ্রেষ্ঠত্ব। অলংকার শাস্ত্রে অভিসার আট রকমের—যেমন জ্যোৎস্নাভিসার, দিবাভিসার, তামসাভিসারিকা, বর্ষাভিসারিকা, কুজ্ঝটিকাভিসারিকা, তীর্থযাত্রাভিসারিকা, উন্মত্তাভিসারিকা এবং অসমঞ্জাভিসারিকা। এবার অভিসারের একটি পদ :

"কন্টক গাড়ি কমলসম পদতল মঞ্জীর চীরহি ঝাঁপি।
গাগরি বারি ঢারি করি পীছল চলতহি অঙ্গুলী চাপি ॥
তুয়া অভিসার কি লাগি।

দূতর পন্থ গমন ধনী সাধয়ে মন্দিরে যামিনী জাগি ॥
করযুগে নয়ন মুদি চলু ভামিনী তিমির পয়ানক আশে।
করকঙ্কণ পণ ফণীমুখ বন্ধন শিখই ভুজগ গুরুপাশে ॥
গুরুজন বচন বধির সম মানই আন শুনই কহ আন।
পরিজন বচনে মুগধিসম হাসই গোবিন্দ দাস পবমাণ ॥"

কৃষ্ণ মথুরায় অর্থাৎ মধুপুরে চলে গেছেন তার ফলে গোকুল বৃন্দাবনের অবস্থা পারিপার্শ্বিক বর্ণনার মাধ্যমে চমৎকার ফুটে উঠেছে :

'তোহে রহল মধুপুর।
ব্রজকুল আকুল গোকুল কলরব
কানু কানু করি ঝুর ॥
যশোমতী নন্দ অন্ধসম বৈঠত
সঘনে উঠিতে নাহি পারে।
সখাগণ ধেনু বেণু নাহি পুরত
কিছুরল নগর বাজারে ॥
কুসুম ত্যজি অলি ভূমিতলে লুঠত
তরুগণ মলিন সমান।"
সারী শুক পিক ময়ূরী না নাচত
কোকিল না করতহি গান ॥
বিরহিনী বিরহ সে কি কহব মাধব
দশদিশে বিরহ-হুতাশ।
সোই যমুনা জল অনল অধিক ভেল
কহতহি গোবিন্দদাস ॥

বৈষ্ণব-গ্রন্থ পরিচয়

বৈষ্ণব গ্রন্থ সমূহ অসংখ্য। তার মধ্যে বিশেষ বিশেষ গ্রন্থের পরিচয় নিম্নে দেওয়া হল।

১। উজ্জ্বল নীলমণি—এর রচয়িতা শ্রীরূপ গোস্বামী। গৌড়ীয় বৈষ্ণব ধর্মে, উজ্জ্বল, মধুর বা শৃঙ্গার রসের প্রাধান্য। শ্রীরূপ গোস্বামী সাধারণভাবে ভক্তি রসামৃত সিন্ধুতে শান্ত, দাস্য, সখ্য, বাৎসল্য ও মধুর রসের অর্থ আলোচনা করেছেন আর উজ্জ্বল নীলমণিতে কেবলমাত্র রসের কথাই বিচার করেছেন। উজ্জ্বল নীলমণি ভক্তি রসামৃত সিন্ধুর পরিশিষ্ট হলেও এর বিশ্লেষণ রীতি ও সিদ্ধান্ত গৌরব এই মহাগ্রন্থকে সমগ্র গৌড়ীয় বৈষ্ণব সাহিত্য ও দর্শনের ভিত্তিভূমিতে পরিণত করেছে। এতে নায়ক নায়িকার শ্রেণীবিভাগ, তাদের অনুরাগের ক্রমবিকাশ ও অবস্থান্তর ইত্যাদি বিশদভাবে বর্ণিত হয়েছে। প্রেমের এরূপ সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম বিচার ও বিশ্লেষণ অন্য কোথাও দেখা যায় না। জীব গোস্বামী ও বিশ্বনাথ চক্রবর্তী এর দুইখানি টীকা রচনা করেছেন। খুব সম্ভব এর রচনাকাল ষোড়শ শতাব্দীর মধ্যভাগ।

২। ভক্তিরসামৃত সিন্ধু—শ্রীরূপ গোস্বামী রচিত গ্রন্থ। এটি বৈষ্ণবগণের ভক্তিরাজ্যের পথ প্রদর্শক। এই গ্রন্থ ভক্তিরসের অমৃতসিন্ধু স্বরূপ। তার চারিটি বিভাগ। পূর্ব, দক্ষিণ, পশ্চিম ও উত্তর বিভাগ। পূর্ব বিভাগে সাধারণ ভক্তি, সাধনভক্তি, ভাব ও প্রেমভক্তির সংজ্ঞা ও বৈশিষ্ট্য দেখান হয়েছে। দক্ষিণ বিভাগে ভক্তিরসের বিভাব, অনুভাব, সাত্ত্বিক, ব্যভিচারী

ও স্থায়ীভাব আলোচিত হয়েছে। পশ্চিম বিভাগে মুখ্য ভক্তিরসের নির্ণয় করতে গিয়ে তিনি শান্ত, দাস্য, সখ্য, বাৎসল্য ও মধুর রসের বর্ণনা করেছেন। উত্তরভাগে—হাস্য, অদ্ভুত, বীর, করুণ, রৌদ্র, ভয়ানক, বীভৎস, মৈত্রবৈর ও রসাভাস আলোচিত হয়েছে। শ্রীরূপ গোস্বামীর বিশ্লেষণ সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম ও মনোবিজ্ঞানসম্মত।

৩। গীতগোবিন্দ—গৌড়ের রাজা লক্ষ্মণসেনের মহাকবি ছিলেন জয়দেব। 'গীতগোবিন্দ' কাব্যগ্রন্থ তারই রচনা। রাধাকৃষ্ণের প্রেমলীলা এই কাব্যের বিষয়বস্তু। এই কাব্য নায়ক, নায়িকা বা সখীর উত্তর প্রতিউত্তর সম্বলিত নাটগীত। এই কাব্যটি দ্বাদশসর্গে বিভক্ত। কাব্যটি অতি মধুর, ভাষা সুললিত ও শ্রুতিসুখকর। এই কাব্য থেকেই বৈষ্ণব সাহিত্যে রাধাকৃষ্ণ প্রেমধারার প্রবল প্রেরণা এসেছে। প্রেম কবিতার বিবর্তন ইতিহাসে এই কাব্যগ্রন্থ একটি বিশিষ্ট স্থান অধিকার করে আছে।

৪। গোবিন্দলীলামৃত—বৈষ্ণবশাস্ত্রের শ্রেষ্ঠতম দর্শন কবিতার রচয়িতা কৃষ্ণদাস কবিরাজের মহামূল্যবান মহাকাব্য গোবিন্দলীলামৃত। এই মহাকাব্যে গোলোকে রাধাকৃষ্ণের অষ্টপ্রহরীয় নিত্যলীলা তেইশটি সর্গে বর্ণিত হয়েছে। এতে নানারূপ ছন্দ ও অলঙ্কার ব্যবহারের পরিচয় পাওয়া যায়। মনে হয় এই গ্রন্থ লিখেই কৃষ্ণদাস, কবিরাজ উপাধি লাভ করেছিলেন।

৫। পদ্যাবলী—এটি শ্রীরূপ গোস্বামী বিরচিত। এই গ্রন্থে শ্রীরূপ গোস্বামী তাঁর সমসাময়িক ও তৎ পূর্বেকার বহুখ্যাত ও অখ্যাত নামা কবিদের রচিত প্রকীর্ণ শ্লোকসমূহের সঙ্কলন করেছেন। এই গ্রন্থ-বর্ণিত অধিকাংশ শ্লোকই রাধাকৃষ্ণবিষয়ক। পদ্যাবলীতে শ্রীরূপের রচনা সহ জ্ঞাত ও অজ্ঞাত প্রায় ১২৫ জন কবির মোট ৩৮৬টি শ্লোক উদ্ধৃত হয়েছে।

৬। বিষ্ণুপুরাণ—এই পুরাণ বৈষ্ণবদের একটি বিশিষ্ট গ্রন্থ। আচার্য রামানুজ তাঁর বেদান্তসূত্রের টীকায় এই গ্রন্থটিকে বৈষ্ণব সম্প্রদায়ের প্রামাণ্য গ্রন্থরূপে উল্লেখ করেছেন। এই গ্রন্থে বিষ্ণুর উদ্দেশে কোনও যাগযজ্ঞ অনুষ্ঠানের বা কোন বিষ্ণু মন্দিরের উল্লেখ নেই। এর শ্লোকসংখ্যা তেইশ হাজার। এই গ্রন্থ দুটি ভাগে বিভক্ত। প্রথম ভাগটিই বিশেষ মূল্যবান। বিষ্ণুপুরাণেই পুরাণের পাঁচটি লক্ষণ বিদ্যমান। বিষ্ণুপুরাণ প্রাচীন পুরাণগুলির অন্যতম।

৭। লঘু ভাগবত—শ্রীরূপ গোস্বামী বিরচিত গ্রন্থ। এটি সনাতন গোস্বামীর বৃহৎ ভাগবতামৃতের সংক্ষেপ হলেও প্রকৃতপক্ষে একটি সম্পূর্ণ নূতন গ্রন্থ। কৃষ্ণামৃত ও ভক্তামৃত এই দুইভাগে গ্রন্থটি বিভক্ত। প্রথম খণ্ডে আছে শ্রীকৃষ্ণের বিবিধ রূপ ও অবতার লীলার বিশ্লেষণ এবং দ্বিতীয় খণ্ডে তাদের আরাধনার উৎকর্ষ দেখিয়ে ভক্তগণের মধ্যে তারতম্য দেখান হয়েছে।

৮। ললিতমাধব—শ্রীরূপ গোস্বামী বিরচিত নাটক—ললিতমাধব। নাটকের প্রারম্ভে বলা হয়েছে যে গ্রন্থখানি গোপীশ্বরের স্বপ্নাদেশে রচিত। দশ অঙ্কবিশিষ্ট এই নাটকে কৃষ্ণের দ্বারকালীলা বর্ণিত হয়েছে। এই নাটকের প্রথম অঙ্ক থেকে চতুর্থ অঙ্ক পর্যন্ত কৃষ্ণের মাধুর্য্যপূর্ণ বৃন্দাবন লীলার অবতারণা থাকলেও পঞ্চমহতে দশম অঙ্ক পর্যন্ত দ্বারকালীলা মিশ্রভাবে সন্নিবিষ্ট থাকায় এই নাটক দ্বারকালীলা বলেই পরিচিত। নাটকের দশটি অঙ্কের নাম—নাথমুৎসব, শঙ্খচূড়র্বব, উন্মত্তরাধিকা, রাধাভিসার, চন্দ্রাবলীলাভ, ললিতোপলব্ধি, নববৃন্দাবন সঙ্গম, নববৃন্দাবন বিহার, চিত্রদর্শন, পূর্ণমনোরথ। 'ল·লিতমাধব' নাটকে রূপ গোস্বামীর প্রভূত কল্পনাশক্তির পবিচয় পাওয়া যায়। স্বর্গ, মর্ত্ত, পাতাল ও সূর্যালোকের ঘটনাবলী একসূত্রে দশ অঙ্কের মধ্যে সুনিপুণভাবে গ্রথিত করেছেন নাট্যকার।

৯। শ্রীমদ্ভাগবদ্‌গীতা—গীতা পৃথিবীর অন্যতম শ্রেষ্ঠ ধর্মগ্রন্থ, মহাভারতের ভীষ্মপর্বে ধর্মবিষয়ক রচনার সর্বশ্রেষ্ঠ অংশ। কুরুপাণ্ডবের যুদ্ধ আরম্ভ হওয়ার পূর্বে সারথী কৃষ্ণকে উভয় সেনাবাহিনীর মধ্যে রথ স্থাপন করতে অনুরোধ জানালেন অর্জুন। কৌরব পক্ষের

যে সব বীর অর্জুন দেখতে পেলেন তাঁরা সকলেই যে স্বজন, গুরু ইত্যাদি। আত্মীয় ও গুরুজন হত্যা করে রাজ্যলাভ করতে অর্জুনের মন চাইল না। শরীর অবশ হয়ে কাঁপতে লাগল। জিহ্বা শুষ্ক হয়ে এল। হাত থেকে গাণ্ডীব খসে পড়ল। রথের উপরে, অর্জুন বসে পড়লেন। তিনি পিতামহ ভীষ্ম, আচার্য দ্রোণ, জ্ঞাতিভ্রাতা দুর্যোধনাদিকে বধ করার চেয়ে ভিক্ষান্নে জীবনধারণ করা শ্রেয় বলে মনে করলেন। অর্জুনের ক্লৈব দেখে শ্রীকৃষ্ণ যে মূল্যবান উপদেশ দিয়ে তাঁর ক্ষাত্রশক্তি উদ্বোধিত করতে চেয়েছিলেন তাই গীতা। ভারতীয় দর্শনশাস্ত্র সমূহে মোক্ষপ্রাপ্তির যে সকল পথ নির্দিষ্ট হয়েছে তার মধ্যে আপাত বিরোধ দেখা যায়। গীতা সেই বিরোধের সমাধান করেছে বিভিন্ন মত ও পথের সমন্বয় সাধন করে। জ্ঞানযোগ, ভক্তিযোগ ও কর্মযোগ এই তিনের সমন্বয়ে গীতা। আত্মার অবিনশ্বরত্ব, নিষ্কাম কর্মযোগ ও ঈশ্বরে পরিপূর্ণভাবে আত্মসমর্পণ—এই তিনটি হল গীতার মর্মবাণী। গীতার অধ্যায় সংখ্যা অষ্টাদশ। গীতা হিন্দুদের নৈতিক উন্নতি, সাহিত্য-সৃষ্টি ও পৌরাণিক রহস্যভেদের আশ্চর্যজনক প্রামাণিক গ্রন্থের শ্রেষ্ঠ নির্দশন। গীতার মৌলিকত্ব, ভাবের গভীরতা ও অভিনবত্ব, দার্শনিক তত্ত্বের উচ্চতা, বলিষ্ঠ যুক্তিতর্ক ও ব্যাখ্যাকৌশল অপূর্ব ও অসাধারণ।

১০। শ্রীমদ্ভাগবত— ভারতবর্ষে ভাগবত পুরাণ অপেক্ষা অধিক প্রসিদ্ধ ও অধিক জনপ্রিয় পুরাণ আর নাই। বৈষ্ণব সম্প্রদায়ের নিকট এই গ্রন্থ বেদতুল্য। এটি দ্বাদশ স্কন্ধে বিভক্ত। শ্লোক সংখ্যা ১৮০০০। দশম স্কন্ধ ভাগবতের প্রধান অংশ। এতে শ্রীকৃষ্ণের জীবনলীলা বিবৃত হয়েছে। দশম স্কন্ধের উনত্রিশ হতে তেত্রিশ অধ্যায়কে রাস পঞ্চাধ্যায়ী বলা হয়। এতে রাসের বিবরণ ও অন্তর্নিহিত রসের ব্যাখ্যা আছে। কৃষ্ণের ব্রজ লীলার অংশও অতি মধুর। শ্রীমদ্ভাগবত কাব্যাংশ উৎকৃষ্ট। এর ভাষা, রীতিও ছন্দের ব্যবহারে পারিপাট্য—একে অন্যান্য পুরাণ হতে বৈশিষ্ট্য দান করেছে।

১১। শ্রীচৈতন্য ভাগবত শ্রীগৌরাঙ্গদেবের জীবনালেখ্য সম্বলিত গ্রন্থাবলীর মধ্যে শ্রীল বৃন্দাবনদাস ঠাকুর বিরচিত শ্রীচৈতন্য ভাগবত একটি বিশিষ্ট স্থান অধিকার করে আছে। গ্রন্থটির পূর্বনাম চৈতন্য মঙ্গল, নরহরি সরকারের শিষ্য লোচনদাস শ্রীচৈতন্যমঙ্গল রচনার পর শ্রীবৃন্দাবনের বৈষ্ণবমণ্ডলী এই গ্রন্থের নাম পরিবর্তন করে রাখেন শ্রীচৈতন্য ভাগবত। বৃন্দাবন জন্মগ্রহণ করেন ১৪২৯ শকে বৈশাখী কৃষ্ণা দ্বাদশীতে। প্রৌঢ় যৌবনেই বৃন্দাবনদাস চৈতন্য ভাগবত রচনা করেন। এই গ্রন্থে শ্রীগৌরাঙ্গ, শ্রীনিত্যানন্দ ও শ্রী অদ্বৈততত্ত্ব সুন্দর ও নিপুণভাবে পরিবেশিত হয়েছে। শ্রীগৌরাঙ্গদেবের প্রথম জীবনের নিগূঢ় রহস্য প্রকাশ ঘটেছে এই মহাকবির মহাগ্রন্থে। নিখিল জগতের নাটুয়া শ্রীগৌরাঙ্গদেবের এমন প্রাণবন্ত মনোহারী মূর্তি চিত্রিত করা বৃন্দাবনদাসের মত মহাকবির পক্ষেই সম্ভব। কবি খোলাবেচা দরিদ্র ব্রাহ্মণ শ্রীধরের হৃদয় কন্দরে প্রবেশ করে তার মনের ভাব অবগত হয়ে যেভাবে প্রকাশ করেছেন তা চিরস্মরণীয় হয়ে থাকবে।

"যে ব্রাহ্মণ কাড়িলেন মোর খোলাপাত।
সে ব্রাহ্মণ হউমোর জন্মে জন্মে নাথ ॥"

১২। শ্রীশ্রীচৈতন্য চরিতামৃত—এর রচয়িতা কৃষ্ণদাস কবিরাজ একজন মধ্যযুগের শ্রেষ্ঠ দার্শনিক কবি। পাণ্ডিত্য মনীষায়, দার্শনিকতায় এবং রসশাস্ত্রে তাঁর অগাধ পাণ্ডিত্য ছিল। চৈতন্য জীবনাদর্শ, ভক্তিবাদ, দ্বৈতবাদী দার্শনিক চিন্তার গৌড়ীয় ভাষ্য এবং বৈষ্ণব মতাদর্শকে সংহত ও মননিষ্ঠ রূপদান তাঁর অবিস্মরণীয় কীর্তি। এই গ্রন্থে আদিলীলা, মধ্যলীলা ও অন্ত্যলীলা বর্ণিত আছে। আদিলীলার সতেরটি পরিচ্ছেদে বাল্যলীলা হতে কাজীর পরাভব

পর্যন্ত বর্ণিত, মধ্যলীলায় পঞ্চবিংশটি পরিচ্ছেদ, উহাতে শ্রীরূপের সহিত মিলন পর্যন্ত বর্ণিত এবং অন্ত্যলীলার বিংশতি পরিচ্ছেদে শিক্ষাষ্টক পর্যন্ত বর্ণিত। শেষে

"অনিপূনা বাণী আপনে নাচিতে না জানে।
যত নাচিইল নাচি করিল বিশ্রামে ॥"

—শেষে শ্রোতাদের নিকট প্রার্থনা—"শ্রোতার পদরেণু করোঁ মস্তক ভূষণ।
তোমরা এ অমৃত পিলে সফল হয় শ্রম ॥"

দ্বিতীয় পর্ব

ষষ্ঠ অধ্যায়

বৈষ্ণব ধর্মের কয়েকটি বিশিষ্ট তত্ত্ব

১। কৃষ্ণতত্ত্ব : "স্বয়ং ভগবান কৃষ্ণ, কৃষ্ণ পরতত্ত্ব।
পূর্ণজ্ঞান পূর্ণানন্দ পরম মহত্ত্ব ॥
প্রকাশ বিশেষ তেহোঁ ধরে তিন নাম।
'ব্রহ্ম' 'পরমাত্মা' আর 'পূর্ণ ভগবান।'
সর্ব্ব আদি, সর্ব্বঅংশী, কিশোরশেখর।
চিদানন্দ দেহ, সর্ব্বাশ্রয় সর্ব্বেশ্বর ॥
স্বয়ং ভগবান কৃষ্ণ, গোবিন্দ পরনাম।
সর্ব্বৈশ্চর্য্য পূর্ণ যার গোলোক নিত্য ধাম ॥
জ্ঞান যোগ ভক্তি তিন সাধনের বশে।
ব্রহ্ম, আত্মা, ভগবান ত্রিবিধ প্রকাশে ॥
পরমপুরুষ কৃষ্ণ সর্ব্বোপাধি মুক্ত।
প্রকৃতির গুণত্রয়ে হইয়া সংযুক্ত ॥
জগতের সৃষ্টি স্থিতি লয়েব কাবণ।
'হরি' 'ব্রহ্মা' হর নাম করেন ধারণ ॥
সর্বশক্তি পূর্ণ হেতু নন্দ সুত হরি।
এক মাত্র ভগবান জান দৃঢ় কবি ॥

কৃষ্ণের স্বরূপ শক্তি তিন প্রকার—সৎ, চিৎ ও আনন্দ। ঈশ্বরের সৎশক্তির নাম সন্ধিনী। এই শক্তির সাহায্যে তাঁর অস্তিত্ব সুনিশ্চিত থাকে। চিৎশক্তির সাহায্যে তিনি চৈতন্যময় পুরুষ। আনন্দশক্তির নাম হ্লাদিনী শক্তি। এই হ্লাদিনী শক্তি দ্বারা তিনি বিশ্ব সৃষ্টি করে আনন্দময় লীলা উপভোগ করেন। তিনি লীলাচ্ছলে নানা রূপ গ্রহণ করেন। কিন্তু নররূপে লীলাখেলাই সর্বোত্তম।

'কৃষ্ণের যতেক খেলা সর্বোত্তম নরলীলা
নরবপু তাঁহার স্বরূপ।' (চৈ.চ)

জীব কৃষ্ণবিমুখ হয় কেন?

কৃষ্ণ পরম করুণাময়। তত্রাচ জীব ত্রিতাপ জ্বালা ভোগ করে কেন? এর উত্তরে বলা যায় জীবের ত্রিতাপ ভেদ তারই অর্ন্তমুখ ও বর্হিমুখ হওয়ার স্বাধীনতা, এই স্বাধীনতা যদি না থাকত, জীব যদি যন্ত্রই হত, তবে ভগবৎ কারুণ্য রসের কোন স্থান থাকত না। করুণার মাধুর্য আস্বাদনের জনাই মায়াশক্তি নিত্য বর্হিমুখী এবং জীবকে প্রলোভন দেখিয়ে নিজের অধীনে আনার চেষ্টা করে। জীব যখন সেই প্রলভন মুক্ত হয়ে ভগবদ্ উম্মুখ হয়, তখন মায়া ও জীবশক্তি উভয়েই ভগবৎ কারুণ্য আস্বাদন করে নিজেকে ধন্য মনে করে। কৃষ্ণকে পেতে হলে তাঁর কথাকেই অনুসরণ করতে হবে 'সর্বধর্মানি পরিত্যজ্য মামেকং শরণংব্রজ'—গীতা।

ব্রজলীলায় শ্রীকৃষ্ণ—অন্য সব অবতার ভগবানের এক অংশ হতে আবির্ভূত হয়ে জগতের সৃষ্টি স্থিতি ও লয় সাধন করছেন। কিন্তু ব্রজলীলার নায়ক পুরুষোত্তম শ্রীকৃষ্ণ অংশ অবতার নহেন, ইনি পূর্ণ অবতার।

শ্রীবেদব্যাস রচিত দ্বাদশ স্কন্ধ সম্বলিত শ্রীমদ্ভাগবতের দশম স্কন্ধে তৃতীয় হতে ঊনচল্লিশ অধ্যায়ে বর্ণিত আছে শ্রীকৃষ্ণ জীবনের প্রথমাংশ অর্থাৎ তাঁর জীবনের মথুরা গমনের পূর্ব পর্যন্ত। কিশোর শ্রীকৃষ্ণ দশবৎসর আটমাস কাল পর্যন্ত ব্রজে ছিলেন। তাঁর প্রথমভাগ গোকুলে এবং দ্বিতীয় ভাগ কাটে বৃন্দাবনে। গোকুলের লীলাগুলির মধ্যে পড়ে পুতনা মোক্ষণ, শকটভঞ্জন, ঘূর্নাবর্তাসুর বধ, শ্রীকৃষ্ণের মুখবিবরে মা যশোদার বিশ্বরূপ দর্শন, শ্রীকৃষ্ণের নামকরণ, শ্রীকৃষ্ণের হামাগুড়ি, উত্থান ও উৎপতন প্রভৃতি বালক সুলভ ক্রীড়া, গোপুচ্ছ ধারণ ও আকর্ষণ, প্রতিবাসিনী মাতৃস্থানীয়া গোপীগণের গৃহে বালক সুলভ দৌরাত্ম্য, শ্রীকৃষ্ণের মৃত্তিকাভক্ষণ উপলক্ষ্যে তদীয়বদনমধ্যে মা যশোদার সৃষ্টিতত্ত্ব দর্শন, উপদ্রুতা মা যশোদা কর্তৃক শ্রীকৃষ্ণের বন্ধন, শ্রীকৃষ্ণ কর্তৃক যমলার্জুন ভঙ্গকরণ, (শ্রীকৃষ্ণ উদুখলে বদ্ধাবস্থায় গৃহপ্রাঙ্গণস্থিত যামল—অর্জুন বৃক্ষদ্বয়ের মধ্য দিয়ে গমন করেন উদূখল আকর্ষণ করায় ঐ বৃক্ষদ্বয় ভগ্ন হয় এবং বৃক্ষরূপী কুবের পুত্রদ্বয় মণি-গ্রীব ও নলকুবের দেবর্ষি নারদের শাপমুক্ত হয়ে শ্রীকৃষ্ণকে স্তব করেন) ফলবিক্রয়িনীর নিকট শ্রীকৃষ্ণের ফল যাচঞা ইত্যাদি। গোকুলে অনুষ্ঠিত লীলাগুলিই বাল্যলীলা। ঐসব লীলায় বাৎসল্যরসের মাধুর্য আস্বাদিত হয়েছে। যমলার্জুন ভঙ্গলীলার পরই কংস কর্তৃক অত্যাচারিত নন্দ মহারাজ ও অন্যান্য গোপবৃন্দ গোকুল ত্যাগ করে বৃন্দাবনে গিয়ে বাস করেন। গোকুল ত্যাগের সময় শ্রীকৃষ্ণের কৌমার বয়স। বৃন্দাবনে শ্রীকৃষ্ণ গোষ্ঠলীলাব মধ্যে বৃষাসুর, বকাসুর, অঘাসুর বধের পর ব্রহ্মামোহনালীলা হয়। তারপর ধেনুকাসুর বধ, যমুনা হ্রদে কালীয়দমন, দাবানল পান, প্রলম্বাসুর বধ এবং অরণ্যাগ্নি পান লীলা অনুষ্ঠিত হয়।

কিশোর বয়সে যখন শ্রীকৃষ্ণ যমুনাপুলিনে বংশীবব করতেন তা শ্রবণে গোপবালিকাদের মনে উদিত হত পূর্বরাগ। এই পূর্বরাগজনিত বিরহ প্রশমনের জন্য তাঁরা করেন কাত্যায়নীব্রত যাতে তাঁরা শ্রীকৃষ্ণকে পতিরূপে প্রাপ্ত হন। ঐ ব্রত উদ্‌যাপনের পর যখন গোপীগণ বিবস্ত্রা হয়ে যমুনায় স্নানরতা, তখন শ্রীকৃষ্ণ তাঁদের বস্ত্রহরণ করেন এবং বিবস্ত্রা অবস্থায় তাঁদেরকে নিজের নিকট এনে বস্ত্র প্রত্যার্পণ করেন। এতে মধুর বসাত্মক পরমরমণীয় রাসলীলার সূত্রপাত হয়। পরে যজ্ঞদীক্ষিত ব্রাহ্মণ পত্নীগণের নিকট অন্ন প্রার্থনা, গোবর্ধন ধারণ ইত্যাদি কয়েকটি লীলার পর বাসলীলা অনুষ্ঠিত হয়। রাসলীলার পর শঙ্খচূড়, অরিষ্ট, কেশী, ব্যোমাসুর আদি অসুরকে শ্রীকৃষ্ণ বধ করেন। এই সমস্ত লীলা শেষ হলে কংস অক্রূরকে বৃন্দাবনে পাঠিয়ে কৃষ্ণ ও বলরামকে মথুরায় নিয়ে আসেন। এই পর্যন্ত ব্রজলীলা। শ্রীকৃষ্ণ মথুরায় যাওয়ার পব উদ্ধব মহাশয় দ্বারা তিনি ব্রজবাসীদের খবর নিয়েছিলেন। তারপর শ্রীবলরাম ব্রজে এসে ব্রজবাসীদের সান্ত্বনা দেন। সর্বশেষে প্রভাস যজ্ঞ উপলক্ষ্যে ব্রজবাসীগণ কুরুক্ষেত্রে গিয়ে শ্রীকৃষ্ণের দর্শন পান।

২। রাধাতত্ত্ব

রাধাতত্ত্ব শ্রীকৃষ্ণ তত্ত্বেরই অনুরূপ। কৃষ্ণ সচ্চিদানন্দের বিগ্রহ আর তাঁর আনন্দাংশের বিগ্রহের নাম রাধা, ভগবান নিজে আনন্দস্বরূপ। যে শক্তির দ্বারা তিনি আনন্দ অনুভব করেন এবং জীবকুলকে আনন্দ দেন, তার নাম হ্লাদিনী।। হ্লাদিনী শক্তির নাম প্রেম। প্রেমের সার মহাভাব। শ্রীরাধা সেই মহাভাবস্বরূপিনী। রাধা কৃষ্ণের অবিচ্ছেদ্য অংশ। রাধা শক্তি, কৃষ্ণ শক্তিমান। বৈষ্ণব ধর্মে 'কান্তাপ্রেম সর্বসাধ্য সার।' রাধা হলেন সাধ্য শিরোমণি। তিনি প্রেমের মূর্ত বিগ্রহ। তিনি কান্তা শক্তি, নয়নে তাঁর কৃষ্ণরূপের অঞ্জন, মুখে কৃষ্ণ নামামৃত, তিনি

কৃষ্ণকে প্রেমামৃত পান করান। রাধার এই অসামান্য প্রেম-তন্ময়তা কৃষ্ণকেও প্রেমাবিষ্ট করে রেখেছে। রাধার সঙ্গে তাঁর নিত্য মিলন। এই মিলনের মধ্য দিয়েই তিনি আনন্দ আস্বাদন করছেন।

"কৃষ্ণকে আহ্লাদে তাতে নাম হ্লাদিনী
সেই শক্তিদ্বারে সুখ আস্বাদে আপনি ॥
সুখরূপ কৃষ্ণ করে সুখ আস্বাদন।
ভক্তগণে সুখ দিতে হ্লাদিনী কারণ ॥
হ্লাদিনীর সার অংশ তার প্রেম নাম।
আনন্দ চিন্ময় রস প্রেমের আখ্যান ॥
প্রেমের স্বরূপ সার মহাভাব জানি।
সেই মহাভাব রূপা রাধা ঠাকুরাণী ॥"

বস্তুতঃ রাধা কৃষ্ণ একই তত্ত্ব। দেহভেদে দুই হলেও "না সো রমণ না হাম রমণী।" শ্রীকৃষ্ণ যে রমণ বা কান্ত এই রূপ জ্ঞান কৃষ্ণের মনেও থাকে না, রাধা কান্তা বা রমণী, এ জ্ঞানও রাধার থাকে না। এ কেবল পরস্পরকে সুখী করার অভিলাষ মাত্র।

৩। গোপীতত্ত্ব— বৈষ্ণব ধর্মে গোপীর স্থান অতি উচ্চে। বৈষ্ণবধর্মে গোপী ও সখী সমার্থক। কৃষ্ণের জীবনের সঙ্গে গোপীরা অঙ্গাঙ্গীভাবে সম্পর্কযুক্ত। বৃন্দাবনের অসংখ্য গোপী আপন মাধুর্যে কৃষ্ণের প্রাণপ্রিয়া। রাধা গোপী শ্রেষ্ঠা।

গোপী—অবিবাহিতা অথচ কৃষ্ণ অনুরাগিনী তাদের বলা হয় কন্যা। কৃষ্ণানুরাগিনী বিবাহিতা গোপীরা পরোঢ়া। এরাই কৃষ্ণের প্রিয়তমা। এই পরোঢ়া গোপীরা আবার তিন শ্রেণীভুক্ত। সাধনপরা, দেবী ও নিত্যপ্রিয়া। পূর্বজন্মের সাধনার ফলে যে সকল কৃষ্ণভক্ত গোপীদেহ নিয়ে নবজন্ম লাভ করেছেন, তাঁরা হলেন সাধনপরা। যে সকল গোপী নিত্যকালের জন্য বৃন্দাবনে কৃষ্ণের লীলারসের সঙ্গিনী তাঁরা নিত্যপ্রিয়া, আর কৃষ্ণ যখন দেব যোনীতে জন্মগ্রহণ করেন, তখন তাঁর সম্ভোগ সাধনের জন্য নিত্যপ্রিয়ারা নবজন্ম গ্রহণ করেন তখন তাঁরা দেবী নামে পরিচিতা। বৃন্দাবনে রাধা এবং চন্দ্রাবলী এই দুইজন কৃষ্ণের নিত্যপ্রিয়া। এ দুজনের মধ্যে শ্রেষ্ঠ হলেন রাধা। গোপীরা আবার সখী এবং মঞ্জরী—এই দুই ভাগে বিভক্ত।

সখী— সখীরা রাগাত্মিকা প্রেমের সাধিকা। অভিলষিত বস্তুতে স্বভাবসিদ্ধ যে পরম আবিষ্টতা, তাই রাগ, আর সেই রাগময়ী যে ভক্তি সেটাই রাগাত্মিকা ভক্তি। এই রাগাত্মিকা ভক্তিযুক্তা সখীরা অন্তরঙ্গা স্বরূপ শক্তি। তাঁরা স্বীয় অঙ্গাদি দ্বারা কৃষ্ণসেবা করেন।

মঞ্জরী—মঞ্জরীরা রাগানুগা ভক্তির সাধিকা। নির্হেতুক প্রেমকে রাগ এবং রাগের অনুগ যে প্রেম তাই রাগানুগা প্রেম। এই রাগানুগা প্রেমভক্তির মধ্যে বাঞ্ছিতকে পাওয়ার আকাঙ্ক্ষা তীব্র থাকে। গোপীদের কৃষ্ণপ্রেম স্বভাবসিদ্ধ কিন্তু অন্যান্য জীবের কৃষ্ণপ্রেম সাধনালব্ধ। সখীরা অন্তরঙ্গা স্বরূপ শক্তি পক্ষান্তরে, মঞ্জরীরা বহিরঙ্গা তটস্থা শক্তি, তারা শ্রীরাধার কিঙ্করী বা আনুগত্যাময়ী সেবিকা। শ্রীরাধাকৃষ্ণের মিলন ব্যবস্থা বা সেবা করাই মঞ্জরীদের ধর্ম। রাধাকৃষ্ণের মিলন কালে সখীরা থাকে না। কিন্তু মঞ্জরীদের থাকার অধিকার আছে। সখীরা নিত্যসিদ্ধা বলে তারা রাগাত্মিকা ; কিন্তু মঞ্জরীরা সাধনসিদ্ধা। প্রেমের সাধনা করে তাদের সিদ্ধিলাভ করতে হয়। সখীরা বয়সে এবং প্রেম চেতনায় রাধার সমকক্ষ। মঞ্জরীরা কিশোরী ও সেবাকারিণী। উভয়েরই প্রেমে কামগন্ধের চিহ্নমাত্র নেই। গোপীদের প্রেম প্রাকৃত কাম নয়। তারা কৃষ্ণসেবা করে প্রেমমিলনের থেকে অধিক সুখ পায়।

"কৃষ্ণ সেবা সুখপুর। সঙ্গম হৈতে সুমধুর।"

... .

"সহজে গোপীর প্রেম নহে প্রাকৃত কাম।
কামক্রীড়া সাম্যে তার কহি কাম নাম।।" (চৈ. চ.)

গোপীভাব—যে রাগানুগা ভক্তিকে হৃদয়ে জাগরূক করে অর্থাৎ মধুর প্রেমভাবকে জাগরিত করে, নিজেকে প্রকৃত জ্ঞান করে, শ্রীকৃষ্ণ তথা শ্রীগৌরাঙ্গকে প্রাণপ্রিয়তম কল্পনা করে, নিজেকে তাঁর দাসী ভেবে যে অহরহ কৃষ্ণনাম উচ্চারণ করে, সেই ভক্ত হলেন গোপীভাবে ভাবিত।

গোপীযজ্ঞ—দ্বাপরে ব্রজগোপিনীরা কাত্যায়নী পূজা করেছিলেন—তাঁরা মা কাত্যায়নীকে চাননি। তাঁদের প্রার্থনা ছিল 'হে দেবী কাত্যায়নী, তুমি আমাদের প্রতি সন্তুষ্ট হয়ে কৃষ্ণভক্তি দাও।' দেবী কাত্যায়নীর করুণায় তাঁদের কৃষ্ণভক্তি হয়েছিল।

"কৃষ্ণভক্তিপ্রদে দেবী কাত্যয়ান্যাং নমোহস্তুতে।' ব্রজগোপীরা চেয়েছিলেন নির্মল, পবিত্র, নিষ্কাম, বিশুদ্ধ কৃষ্ণপ্রেম। তাঁরা চেয়েছিলেন, যেন তাঁদের মন কামনা-কলঙ্কিত না হয়।

কামগন্ধহীন এই যে সাধন, গোপীভাবে বিভাবিত হয়ে এই যে কৃষ্ণপ্রেম প্রাপ্তির জন্য নিষ্কাম ভজন—এই হলো গোপীপ্রেম। আর তার জন্য যে যজ্ঞ বা পূজা গোপিকারা করলেন তা হলো গোপীযজ্ঞ। আরও বলা যায়—সবার সেরা যে মধুর রস, সেই রস হৃদয়ে ধারণ করে যে শ্রীকৃষ্ণের ভজনা তাই হল গোপীভাব, আর গোপীভাব নিয়ে যে সংকীর্তন যজ্ঞ তাই হলো গোপীযজ্ঞ, যে কোন গুণের যা শ্রেষ্ঠতম, তা কৃষ্ণের মধ্যে প্রকাশিত। তাই তাঁর প্রতি প্রেম ভালবাসা অর্পণই শ্রেষ্ঠ প্রেমতত্ত্ব।

"নায়কানাং শিরোরত্নং কৃষ্ণস্তু ভগবান্ স্বয়ম্।
যত্র নিত্য তয়া সর্বে বিরাজন্তে মহাগুণাঃ।।"—ভক্তিরসামৃত সিন্ধু

দূতী—নায়ক-নায়িকার মিলনসাধনই দূতীর কার্য। যে দূতী প্রাণান্তেও বিশ্বাস ভঙ্গ করে না তাকেই বলে আপ্তদূতী আর দ্বিতীয় প্রকারের দূতীকে স্বয়ং দূতী বলা হয়। শ্রীকৃষ্ণের কটাক্ষ, ও বংশীধ্বনি তাঁর স্বয়ংদূতী। আপ্তদূতীর বিভিন্ন শ্রেণীবিভাগ আছে, তন্মধ্যে তিনটি প্রধান। অমিতার্থা, নিসৃষ্টার্থা এবং পত্রহারী।

নায়ক-নায়িকার দু'জনের মধ্যে একজনের ইঙ্গিত জেনে উপায়যোগে উভয়ের মিলন সাধনকারিণীর নাম অমিতার্থা, একজন কর্তৃক কার্যভার প্রাপ্ত হয়ে যুক্তি সহকারে যে নায়ক-নায়িকা উভয়কে মিলিত করায় তাকে নিঃসৃষ্টার্থা, এবং যে দূতী নায়ক-নায়িকার বার্তামাত্র বহন করে তাকে বলে পত্রহারী দূতী।

নিম্নে **অষ্টসখা, অষ্টপ্রধান মঞ্জরা** ও তদায় অনুগতা **ষোড়শ প্রিয়নর্মসখার** নাম দেওয়া হল

সখী	মঞ্জরী	প্রিয়নর্মসখী	
১। ললিতা	১। অনঙ্গমঞ্জরী	১। লবঙ্গমঞ্জরী	৯। শ্রীরূপমঞ্জরী
২। বিশাখা	২। মধুমতী	২। রসমঞ্জরী	১০। গুণমঞ্জরী
৩। চিত্রাদেবী	৩। বিমলা	৩। রতিমঞ্জরী	১১। ভদ্রমঞ্জরী
৪। ইন্দুরেখা	৪। শ্যামলা	৪। বিলাসমঞ্জরী (১)	১২। লীলামঞ্জরী
৫। চম্পকলতা	৫। পালিকা	৫। কেলীমঞ্জরী	১৩। বিলাসমঞ্জরী (২)
৬। রঙ্গদেবী	৬। মঙ্গলা	৬। কুন্দমঞ্জরী	১৪। মদনমঞ্জরী
৭। তুঙ্গবিদ্যা	৭। ধন্যা	৭। অশোকমঞ্জরী	১৫। মঞ্জুলীলামঞ্জরী
৮। সুদেবী	৮। তারকা	৮। সুধামুখীমঞ্জরী	১৬। পদ্মমঞ্জরী

সখী ও মঞ্জরীদের সেবানির্ণয় ঃ "তাম্বুলে ললিতাদেবী কর্পূরাদৌ বিশাখিকা।
চামরে চম্পকলতা চিত্রা বসন সেবনে ॥
রাগে তুরঙ্গদেবী সা সুদেবী জলসেবনে।
নানাবাদ্যে তুঙ্গবিদ্যা ইন্দুরেখা চ নর্তনে ॥
দর্পণে শশিরেখাচ বিমলা পাদসেবনে।
পালী কুসুম শয্যায়াং বেশে চানঙ্গমঞ্জরী ॥
শ্যামলা চন্দনাদৌ চ গানে মধুমতী তথা ॥
ধন্যা রত্নবিভূষায়াং মঙ্গলা মাল্যসেবনে ॥"

রাধার পাঁচ প্রকারের সখী— ১। সখী ২। নিত্যসখী ৩। প্রাণসখী ৪। প্রিয়সখী ৫। পরম শ্রেষ্ঠসখী। কুসুমিকা, বিন্ধ্যা, ধনিষ্ঠাদি সখী, কস্তুবিকা, মণিমঞ্জরী প্রভৃতি নিত্যসখী, শশিমুখী, বাসন্তী ও লাসিকাদি প্রাণ সখী, কুরুঙ্গাক্ষী, সুমধ্যমা, মদনালসা, কমলা, মাধুরী, মঞ্জুকেশী, কন্দর্পসুন্দরী, মাধবী, মালতী, কামলতা, শশিকলা প্রভৃতি প্রিয়সখী আব ললিতাদি অষ্টসখী পরমশ্রেষ্ঠ সখী।

ললিতাদি অষ্ট সখীর বর্ণ, বস্ত্র ও সেবাদি ঃ—

	নাম	পিতা	মাতা	পতি	গৃহ	বর্ণ	বস্ত্র	সেবা	ভাব	কুঞ্জ	বয়স ব মা দি
১।	ললিতা	বিশোবক	শাবদা	ভৈরবগোপ	যাবট	গোবচনা	মযূবপুচ্ছাভ	তাম্বুল	খণ্ডিতা	বিদ্যুদ্বর্ণ	১৪-৩-১২
২।	বিশাখা	পাবন	দক্ষিণা	বাহুক	ঐ	বিদ্যুৎ	তাবাবলীপ্রভ	কপুবাদি	স্বাধীনভর্তৃকা		১৪-২-১৫
৩।	চিত্রাদেবী	চতুর	ভচ্চিকা	পীঠবক	ঐ	কাশ্মীব	কাচপ্রভ	দিবাভিসাবিকা	বিঞ্জল্কবর্ণ		১৪-১-১৯
৪।	ইন্দুবেখা	সাগব	বেলা	দুবল	ঐ	হবিতাল	দাড়িম্বকুসুমবর্ণ	নৃত্য	প্রোষিতভর্তৃকা	স্ববর্ণ	১৪-২-১২
৫।	চম্বকলতা	আবাম	বাটিকা	চণ্ড	ঐ	চম্পকপুষ্প	চাসপক্ষীবর্ণ	চামব	বাসক সজ্জা	তপ্তস্বর্ণবর্ণ	১৪-২-১৪
৬।	রঙ্গদেবী	বঙ্গসাগর	করুণা	বক্রেক্ষণ	ঐ	পদ্মকিঞ্জল্ক	জবা কুসুমবর্ণ	অলক্ত	উৎকণ্ঠিতা	শ্যামবর্ণ	১৪-২-৮
৭।	তুঙ্গবিদ্যা	পুষ্কব	মেধা	বালিশ	ঐ	চন্দ্রকুসুম	পাণ্ডববর্ণ	গীতবাদ্য	বিপ্রলব্ধা	অরুণবর্ণ	১৪-২-২০
৮।	সুদেবী	বঙ্গসাগর	করুণা-বক্রেক্ষণেব কনিষ্ঠাভ্রাতা		ঐ	সুবর্ণ	প্রবালবর্ণ	জল	কলহন্তবিতা	হবিদ্বর্ণ	১৪ ২-৮

শশিরেখা—দর্পণসেবা, বিমলা—পদসেবা, পালী—কুসুমশয্যা।

অনঙ্গমঞ্জরী—বেশ, শ্যামলা—চন্দনাদি. মধুমতী—গীত, ধন্যা—রত্নালঙ্কার, মঙ্গলা— মাল্য ইত্যাদি।

কোটি কোটি গোপীগণ শ্রীরাধাবিনোদের চতুর্দিকে অবস্থিত থেকে নানা প্রকারে তাঁদের সেবা করছেন। সাধক সম্প্রদায়ী সদ্‌গুরু কর্তৃক প্রদত্ত সিদ্ধপ্রণালী অনুসারে শ্রীগুরু পরম্পরা ক্রমে ব্রজের নিত্য গোপবনিতা মঞ্জরীস্বরূপ শ্রীশ্রীরাধা বিনোদের নিত্যসেবা সদাই নিরতভাবে ধ্যান করেন।

কান্তাপ্রেম :—প্রেম অর্থে বুঝায় প্রণয়, অনুরাগ বা প্রীতি। বৈষ্ণবশাস্ত্রে কান্তা বলতে পরকীয় ভাবাপন্না ব্রজগোপীদের বুঝায়। কান্তাপ্রেম—শ্রীকৃষ্ণকে আপনাদের প্রাণবল্লভ, আর আপনাদের তাঁর উপভোগ্য। কান্তা মনে করে সমস্ত সুখবাসনা পরিত্যাগপূর্বক একমাত্র শ্রীকৃষ্ণের সুখের নিমিত্ত শ্রীকৃষ্ণের সঙ্গে যে সম্ভোগলালসা তাকে বলে কান্তা প্রেম। আর এই গোপীগণই কৃষ্ণবল্লভা।

"প্রণমামি তাং পবম মাধুরীভৃতাঃ কৃতপুণ্য কুঞ্জ রমণী শিরোমণীঃ।
উপসন্ন যৌবন গুরোরধীত্য যাঃ স্মরকেলি কৌশলমদাহরণ হরৌ ॥

অর্থাৎ যাঁরা যৌবন গুরুর নিকট স্মরকেলি কৌশল অধ্যয়ন পূর্বক শ্রীকৃষ্ণের প্রতি উদাহারণ স্থাপন করেন, সেই বহুপুণ্যকাবিণী রমণীকুলের শিরোমণি পরম মাধুর্যবতী কৃষ্ণবল্লভাগণের চরণে প্রণাম করি।

স্বকীয়া প্রেম :—এই কৃষ্ণবল্লভগণ দুই শ্রেণীর—১। স্বকীয়া ২। পরকীয়া।

স্বকীয়া বলতে বিবাহবিধি অনুসারে গৃহীতা পতিব্রতা রমণীদের বুঝায়। এইরূপ রমণীদের যে প্রগাঢ় কৃষ্ণপ্রেম তাকেই স্বকীয়া প্রেম বলা হয়। দ্বারকাপুরী মধ্যে শ্রীকৃষ্ণের স্বকীয়া মহিষী ষোল হাজার একশত আট। এঁদের মধ্যে রুক্মিনী, সত্যভামা, জাম্ববতী, কালিন্দী, শৈব্যা, ভদ্রা, কৌশল্যা এবং মাদ্রী—এই আটজন প্রধানা। এঁদের মধ্যে রুক্মিণী ও সত্যভামা শ্রেষ্ঠা।

পরকীয়া প্রেম :—যে রমণীগণ ইহকাল-পরকাল সম্বন্ধীয় ধর্মের অপেক্ষা না রেখে অত্যাশক্তিবশত পরপুরুষে আত্মসমর্পণ করে, যাঁরা বিবাহবিধি অনুসারে স্বীকৃতা নহে তাঁদেরই বলা হয় পরকীয়া। সাধারণভাবে মনে হতে পারে এইরূপ পরকীয়া রমণী বা পরকীয়া প্রেম নিন্দার্হ। কিন্তু ব্রজের পরকীয়া প্রেমের আদর্শ যে প্রেম উহা কখনই নিন্দনীয় নয়। এ সম্পর্কে কৃষ্ণদাস কবিরাজ বলেন—

"পরকীয়া ভাবে অতি রসের উল্লাস।
ব্রজ বিনা ইহার অন্যত্র নাহি বাস ॥"

বৃন্দাবন লীলায় রাধা অভিমন্যু বা আয়ানের স্ত্রী, চন্দ্রাবলী গোবর্ধনের পত্নী, তাই কৃষ্ণের পক্ষে তাঁরা পরকীয়া নায়িকা। কিন্তু এ পরকীয়া লৌকিক পরকীয়া নহে। শ্রীকৃষ্ণ সৎ চিৎ ও আনন্দের মূর্তবিগ্রহ, মানবরূপী ভগবান। ললিতা, বিশাখা, চন্দ্রাবলী, রাধা সকলেই হ্লাদিনীর মানবীরূপ। হ্লাদিনীর পূর্ণপ্রকাশ শ্রীরাধিকা। রাধাকৃষ্ণের প্রেমলীলার অর্থ সচ্চিদানন্দ শ্রীকৃষ্ণ কর্তৃক আপন আনন্দেরই অভিনব উপায়ে আস্বাদন। এ প্রেম কখনই লৌকিক প্রেম নয়।

"সহজে গোপীর প্রেম নহে প্রাকৃত কাম।
কাম ক্রীড়া সাম্যে তারে কহে কামনাম ॥" (চৈ. চ.)

গোপীরা হল শ্রেষ্ঠ কৃষ্ণভক্তের প্রতীক। ঘরসংসার, সমাজ প্রভৃতির মোহবন্ধন ছিন্ন করে কিরূপ গভীর আকুতি নিয়ে ভগবানকে পাওয়ার জন্য সর্বস্ব ত্যাগ করতে হয়, গোপীগণ তার উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত।

কৃষ্ণের গোপীপ্রেম কি লৌকিক?—বৃন্দাবনের রাধাকৃষ্ণ লীলায় গোপীগণের একটি প্রধান স্থান আছে। গোপীরাই হল লীলাবিস্তারিণী। লৌকিক প্রেম চিরস্থায়ী নয়। এ প্রাকৃত কামমাত্র। কিন্তু কৃষ্ণের গোপীপ্রেম চিরন্তন—অনাদি কাল হতে প্রবাহিত এবং অনন্তকাল এই লীলা চলমান থাকবে। শ্রীচৈতন্য চরিতামৃত বলেন—

সহজে গোপীর প্রেম নহে প্রাকৃত কাম।
কামক্রীড়া সাম্যে তার কহি কামনাম।"

লৌকিক প্রেমের তাৎপর্য হল নিজের ইন্দ্রিয়ের সুখ বিধান করা। কিন্তু গোপীদের প্রেমে ইন্দ্রিয়বৃত্তির বাসনার গন্ধমাত্রও নাই। যা প্রকৃতি হতে উৎপন্ন নয়, যা চিন্ময়, তাকে বলে অপ্রাকৃত। যে কামনা জন্মায়, তাকে বলে কাম। প্রাকৃত বস্তুতে উদ্দাম কামনা জন্মিয়ে যিনি মত্ত করেন তিনি প্রাকৃত মদন। আর অপ্রাকৃত বস্তুতে উদ্দাম কামনা জাগিয়ে যিনি মত্ত করে তোলেন তাঁকে বলে অপ্রাকৃত মদন। শ্রীকৃষ্ণ অপ্রাকৃত বস্তু, তাঁর সৌন্দর্য মাধুর্য সমস্তই অপ্রাকৃত বস্তু। প্রাকৃত জগতে কাম্যবস্তু লাভের পরে তৎপ্রাপ্তিলালসা প্রশমিত হয় কিন্তু কৃষ্ণপ্রাপ্তির বিষয়ে লালসা কামনা আরও বেড়ে যায়। শ্রীকৃষ্ণ তাঁর অচিন্ত্যশক্তির প্রভাবে নিত্য নবায়মান মত্ততা জাগিয়ে থাকেন বলে তাঁকে অপ্রাকৃত মদন বলা হয়। শ্রীকৃষ্ণ অপ্রাকৃত মদন বলে পুরুষ-নারী, স্থাবর জঙ্গম সকলকেই আকর্ষণ করেন। সুতরাং কৃষ্ণের গোপীপ্রেম কোনমতেই লৌকিক নয়।

রতি ও কৃষ্ণরতি :—রতি শব্দের অর্থ আসক্তি, অনুরাগ বা প্রীতি। রতি থেকেই আরতি দেবতার আরতি দ্বারা দেবতার প্রতি অনুরাগ বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হয়।

কৃষ্ণরতি বলতে বোঝায় কৃষ্ণকে সমস্ত অর্পণ করে তাঁর প্রতি একান্তভাবে অনুরাগ। এই রতি জন্মালে জীবের কোন ভয় থাকে না। গীতায় ভগবান শ্রীকৃষ্ণের উক্তি,

"সর্বধর্মান্ পরিত্যজ্য মামেকং শরণং ব্রজ।
অহং ত্বাং সর্বপাপেভ্যো মোক্ষয়িষ্যামি মা শুচঃ

(হে অর্জুন) তুমি সকল ধর্ম পরিত্যাগ করে একমাত্র আমারই শরণ লও, আমি তোমাকে সকল পাপ হতে মুক্ত করব, শোক কোর না। এই-ই গীতার শ্রীভগবানের অভয়বাণী, এই-ই ভক্তিমার্গের সারকথা। এর নাম ভগবৎশরণাগতি বা কৃষ্ণরতি ; আত্মসমর্পণ যোগ। প্রকৃত কৃষ্ণরতি জন্মালে ভক্তিশাস্ত্রোক্ত শরণাগতির ষড়্‌বিধি লক্ষণ প্রকাশ পায়।

॥ কিলকিঞ্চিত ভাব ॥

গর্ব, অভিলাষ, রোদন, হাস্য, অসূয়া, ভয়, ক্রোধ ও হর্ষের একত্র সমাবেশে কিলকিঞ্চিত ভাবের আবির্ভাব ঘটে। এই ভাবের মধ্যে হর্ষই প্রধান। হর্ষের আতিশয্যেই গর্ব আদি সাতটি ভাবের উদয় হয়। সখীগণ সাক্ষাতে শ্রীকৃষ্ণ অঙ্গ স্পর্শ করলে অথবা দানঘাটে পথরোধ করলে শ্রীরাধার এই ভাবের উদয় হয়। কিলকিঞ্চিত ভাব শ্রীরাধার অঙ্গের অলংকার স্বরূপ এবং মাধুর্যাদি গুণসমূহ তাঁর গলার পুষ্পমালাসদৃশ। এই ভাবরূপ অলংকার তিন ভাগে বিভক্ত। ১। অঙ্গজ ২। অযত্নসিদ্ধ ৩। স্বভাবজাত।

হাব, ভাব ও হেলা এই তিনটি—অঙ্গজ। শোভা, কান্তি, দীপ্তি, মাধুর্য্য, প্রগল্‌ভতা, ঔদার্য ও ধৈর্য, এই সাতটি অযত্নসিদ্ধ ও লীলা, বিলাস, বিচ্ছিতি, বিভ্রম, কিলকিঞ্চিত, মোট্টায়িত, কুট্টমিত, বিব্বোক, ললিত, বিকৃত, মৌগ্ধ ও চকিত এই বারটি স্বভাবজ অলংকার। মোট্টায়িত—কান্তের স্মরণ ও তদীয় বার্তা শ্রবণে হৃদয়ে যে অভিলাষের প্রাকট্য, তাই মোট্টায়িত।

কুট্টমিত—কান্ত কর্তৃক স্তন ও অধরাদি গ্রহণে হৃদয় উৎফুল্ল হলেও সম্ভ্রমবশত ব্যথিতের ন্যায় বাহ্যক্রোধ প্রকাশের নাম কুট্টয়িত।

বিব্বোক—গর্ব ও মানহেতু কান্তদত্ত বস্তুর প্রতি অনাদরের নাম বিব্বোক।

ললিত—যাতে অঙ্গসকলের বিন্যাসভঙ্গী, সৌকুমার্য ও ভ্রূবিক্ষেপের মনোহারিত্ব প্রকাশ পায়, তার নাম ললিত।

বিকৃত—লজ্জা, মান, ঈর্ষা হেতু যেখানে বিবক্ষিত বিষয় প্রকাশিত হয় না, তাকে বিকৃত বলে।

মৌগ্ধ—প্রিয়তমের অগ্রে জ্ঞাত বস্তু বিষয়েও অজ্ঞের ন্যায় জিজ্ঞাসা করা হল—মৌগ্ধ বা মুগ্ধতা।

চকিত—প্রিয়তমের সকাশে ভয়ের কারণ না থাকলেও যে ভীতিভাব, তাই চকিত।

॥ কামবীজ ও কামগায়ত্রী ॥

প্রাকৃতবস্তুতে বা দৈহিক বস্তুতে কামনা-জাগরণকারী হল প্রাকৃত কামদেব আর অপ্রাকৃত বস্তু পাওয়ার নিমিত্ত উদ্দাম-কামনা জাগরণকরী অপ্রাকৃত মদন। শ্রীকৃষ্ণ অপ্রাকৃত বস্তু, তাঁর সৌন্দর্য মাধুর্যাদি সমস্তই অপ্রাকৃত বস্তু। এই অপ্রাকৃত বস্তুতে নিজের প্রতি, নিজের সৌন্দর্য মাধুর্যাদির আস্বাদনের নিমিত্ত কামনা জন্মান বলে শ্রীকৃষ্ণ অপ্রাকৃত কামদেব এবং এই কামনাকে উদ্দাম—অত্যন্ত বলবতী—করে মত্ততা জন্মিয়েছে বলে তিনি অপ্রাকৃত মদন। প্রাকৃত জগতে দেখা যায় কাম্যবস্তু লাভের পর তার লালসা প্রশমিত হয়, কিন্তু কৃষ্ণপ্রাপ্তিতে কৃষ্ণপ্রাপ্তির লালসা-কামনা আস্তে আস্তে বেড়ে যায়। শ্রীকৃষ্ণ তাঁর অচিন্ত্যশক্তির প্রভাবে অচিন্ত্যমাহাত্ম্যে

স্বীয় সৌন্দর্য মাধুর্যাদি বিষয়ে নিত্য নবায়মান মত্ততা জন্মিয়ে থাকেন বলে তিনি অপ্রাকৃত নবীন মদন। "কামানাং স্বাভিলাসাঞ্চ বীজং। যদ্বা কামোদীপনস্য বীজং অথবা কালৈ পূর্ণং বীজং।।" শ্রীকৃষ্ণ অপ্রাকৃত নবীন মদন হলেও তাঁর সৌন্দর্য মাধুর্যাদি প্রবলবেগে সকলের চিত্তকে আকর্ষণ করলেও মায়ামুগ্ধ জীবের চিত্ত সেই আকর্ষণে সাড়া দেয় না। মায়ামুগ্ধ চিত্তকে সেই আকর্ষণে সাড়া দেওয়ার যোগ্য করতে হলে উপাসনা বা সাধনের প্রয়োজন।

"বৃন্দাবনে অপ্রাকৃত নবীন মদন।
কামগায়ত্রী কামবীজে যাঁর উপাসন।
পুরুষ যোষিৎ কিবা স্থাবর জঙ্গম।
সর্বচিত্তাকর্ষক সাক্ষাৎ মন্মথ মদন। (চৈ. চ. ১১০)

গায়ত্রী : "গায়ন্তং ত্রায়ন্তং ত্রায়তে যস্মাৎ গায়ত্রীত্বং ততঃ স্মৃতম্।" অর্থাৎ গায়ত্রী গানকারীকে ত্রাণ করেন বলে এর নাম গায়ত্রী।। যেভাবের প্রাধান্য দিয়ে যে দেবতার উপাসনা করা যায়, সেই ভাবের দ্যোতকস্বরূপ প্রকাশক-ধ্যানাত্মক মন্ত্রই গায়ত্রী। শ্রীকৃষ্ণ অপ্রাকৃত নবীন **মদন**-অপ্রাকৃত কামদেব ; তদনুরূপ স্বরূপদ্যোতক গায়ত্রীমন্ত্রই কামগায়ত্রী।

অষ্টসাত্ত্বিক ভাব : সাক্ষাৎ কিম্বা পরম্পরায় কৃষ্ণ সম্বন্ধে ভাব দ্বারা আক্রান্ত চিত্তকে সত্ত্ব বলে। এ হতে উৎপন্ন ভাবের নাম সাত্ত্বিক ভাব। এ আট প্রকার—স্তম্ভ, স্বেদ, পুলক (রোমাঞ্চ) স্বরভেদ, কম্প, বৈবর্ণ, অশ্রু ও প্রলয় (মূর্চ্ছা)। হর্ষ, ভয়, আশ্চর্য, বিষাদ ও অমর্ষ হতে স্তম্ভ উৎপন্ন হয়। এতে বাক্যশূন্যতা, নিশ্চলতা জন্মে। কর্মেন্দ্রিয় ও জ্ঞানেন্দ্রিয়ের ক্রিয়া লোপ পায। স্বেদ :—হর্ষ, ভয় ও ক্রোধাদিবশতঃ শরীরের আদ্রতা বা ঘর্ম ; অশ্রু :—হর্ষ, ক্রোধ, বিষাদাদির দ্বারা বিনাযত্নে চক্ষু হতে জল বের হয়—তা অশ্রু। কম্প :—ক্রোধ, ত্রাস ও হর্ষাদি হেতু যে গাত্রের চাঞ্চল্য হয়, উহা কম্প। পুলক :—আশ্চর্য-বস্তুর দর্শন, হর্ষ, উৎসাহ ও ভয়াদিবশত পুলক হয়। বৈবর্ণ :—বিষাদ, ক্রোধ ও ভয়াদিবশতঃ বর্ণবিকার। স্বরভেদ—গলার স্বরের বিকার এবং প্রলয় অর্থাৎ মূর্চ্ছা।

আগে রাধা পরে কৃষ্ণ কেন?

নারদ পঞ্চরাত্রে বলা হয়েছে

"আদৌ সমুচ্চ রাধাং পশ্চাৎ কৃষ্ণঞ্চ মাধবম্।
বিপরীতং যদি পঠেৎ ব্রহ্মহত্যাং লভেদ্ ধ্রুবম্ ॥"

আগে রাধার নাম উচ্চারণ করে পরে মাধবকৃষ্ণের নাম উচ্চারণ করতে হয়। কেউ তার বিপরীত করলে ব্রহ্মহত্যার পাপে লিপ্ত হবে। ঐ গ্রন্থে এর কারণ হিসাবে বলা হয়েছে—

"শ্রীকৃষ্ণো জগত্যাৎ তাতো জগন্মাতা চ রাধিকা।
পিতু: শতগুনৈঃ মাতা বন্দ্যা, পূজ্যা গরীয়সী।"

অর্থাৎ "শ্রীকৃষ্ণ জগতের পিতা, আর রাধিকা জগন্মাতা। মাতা পিতার চেয়ে শতগুণ গরীয়সী, বন্দনীয়া ও পূজনীয়া। উক্ত গ্রন্থ আরও বলেছেন—"রাধার প্রসাদেই কৃষ্ণ গোলকের অধীশ্বর এবং পরমপ্রভু।

এ সম্পর্কে নির্বাণ তন্ত্র বলছেন—
"আদৌ রাধাং ততঃ কৃষ্ণং জপন্তি যে মানবাঃ।
তেষাং চ সদ্গতিঞ্চাত্র দাস্যামি নাস্তি সংশয়ঃ ॥"

অর্থাৎ যারা প্রথমে রাধানাম জপ করে কৃষ্ণনাম জপ করে আমি তাদের সদ্গতি প্রদান করি।

রাধাকৃষ্ণের যুগল রূপ এক হয়েও দুই এবং দুই হয়েও এক হওয়া—এইটিই রাসলীলার চরমতত্ত্ব। রাধাকৃষ্ণের মিলনানন্দই বৈষ্ণবের চরম রসতত্ত্ব।

সপ্তম অধ্যায়

বৈষ্ণব শাস্ত্রে রস

বৈষ্ণব শাস্ত্রে রস :— রস সম্বন্ধে শ্রুতির উক্তি শ্রীভগবান রসস্বরূপ—'রসো বৈ সঃ' যা আস্বাদনীয়, আস্বাদনযোগ্য, তাই রস। রস্যতে ইতি রসঃ। রস আপনি আপনাকে আস্বাদন করতে পারে, সুতরাং রস যেমন আস্বাদনীয়, তেমনি আস্বাদক। কিন্তু আস্বাদ্য বস্তু মাত্রকেই রস বলা যায় না রসশাস্ত্র মতে। কতকগুলি অনুকূল বস্তু সংযোগে যখন অন্তরিন্দ্রিয় ও বহিরিন্দ্রিয়ের বৃত্তি কোন রসাস্বাদনে চমৎকারিতা প্রাপ্ত হয় তখন তা রস নামে অভিহিত। ভক্তিরসামৃত সিন্ধুতে শান্ত, দাস্য, সখ্য, বাৎসল্য ও মধুর এই পঞ্চভক্তিরসকে মুখ্য এবং হাস্য, অদ্ভুত, বীর, করুণ, রৌদ্র, ভয়ানক ও বীভৎস এই সপ্তরসকে গৌণ রস বলা হয়েছে। সুতরাং ভক্তি রসের সংখ্যা দাঁড়ায় দ্বাদশ।

ভাব : 'ভু'ধাতুর অর্থ হওয়া।' ভবতীতি ভাবঃ। একটা কিছু হওয়া, একটি সৃষ্টি। সৃষ্টি অর্থে আচার্য ভরত বলেছেন—বিভাব, অনুভাব ও ব্যভিচারীভাবের সংযোগে রস নিষ্পত্তি হয়। "বিভাবানুভাব ব্যভিচারি সংযোগাদ্রস নিষ্পত্তিঃ। বিভাবিত অর্থাৎ উৎপাদিত করে যে এই অর্থে বিভাব শব্দে কারণ বুঝায়। অনু অর্থাৎ পশ্চাৎ যে ভাবের উৎপত্তি হয় উহা অনুভাব।

ব্যভিচারী ভাব : সঞ্চারী ভাব :— স্থায়ীভাবের অভিমুখে গমনশীল যে ভাব তার নাম ব্যভিচারীভাব। এই **ব্যভিচারীভাব** স্থায়ীভাবের পুষ্টিসাধন করে তাতেই বিলীন হয়ে যায়। এজন্য এর অপর নাম **সঞ্চারী**। এই তিনের সম্মেলনে স্থায়ীভাব রসকে উদ্রিক্ত এবং আকার দান করে। ব্যভিচারীভাবের প্রকাশ দেখা যায় বাক্য, ভ্রূনেত্রাদি অঙ্গ এবং সত্ত্বোৎপন্ন ভাবের মধ্যে। আর এই ব্যভিচারী ভাবসকল ভাবের গতিকে সঞ্চারণ করায় বলে তাদেরকে সঞ্চারী ভাবও বলে। এই সঞ্চারীভাব তেত্রিশটি। যথা—নির্বেদ, বিষাদ, দৈন্য, গ্লানি, শ্রম, মদ, গর্ব, শঙ্কা, ত্রাস, আবেগ, উন্মাদ, অপস্মৃতি, ব্যাধি, মোহ, মৃত্যু, আলস্য, জাড্য, ব্রীড়া অবহিত্থা, স্মৃতি, বিতর্ক, চিন্তা, মতি, ধৃতি, হর্ষ, ঔৎসুক্য, ঔগ্র, অমর্ষ, অসূয়া, চাপল্য, নিন্দ্রা, সুপ্তি ও বোধ।

স্থায়ী ভাব :—যা হাস্যাদি অবিরুদ্ধভাব এবং ক্রোধাদি বিরুদ্ধভাবকে বশীভূত করে নরপতির ন্যায় বিরাজমান হয়, তাকেই স্থায়ীভাব বা মধুরারতি বলে। মধুরারতি হল কৃষ্ণ বিষয়িনী রতি। ভগবান শ্রীকৃষ্ণের ভক্তিমনের রতি পাঁচভাবে হতে পারে। পাঁচ প্রকারের রতির পরিণতি পাঁচ প্রকার রসে। উক্ত পাঁচ প্রকার রস শান্ত, দাস্য, সখ্য, বাৎসল্য ও মধুর। নিম্নে পাঁচ প্রকার রসের সংক্ষিপ্ত বর্ণনা দেওয়া হল।

শান্তরস :— শান্তি অর্থাৎ মনের সংশয়রাহিত্য শম। বিষয় বাসনা ত্যাগ হতে মনের যে আনন্দ। শমঃপ্রধান গণের হৃদয়ে শ্রীকৃষ্ণে পরমাত্মা জ্ঞানে মমতাগন্ধ-বর্জিত রতি উদিত হয়। শ্রীকৃষ্ণকে সর্বৈশ্বর্যশালী নিত্যরসস্বরূপে জেনে ভক্ত বিষয় বাসনা বর্জনপূর্বক ঐকান্তিক নিষ্ঠায় তাঁর চরণে আত্ম সমর্পণ করেন। এ অবস্থায় ভক্ত ও ভগবানে আত্মীয়তার সম্বন্ধ থাকে না। এতে স্থায়ীভাব শম নামে রতি।

দাস্যরস :— শ্রীকৃষ্ণ আরাধ্য—এই জ্ঞান। এই জ্ঞানে হরিতেই প্রীতি হয়। অন্য প্রীতি থাকে না। দাস্যভাব। এই রসে ভগবান প্রভু, ভক্ত তাঁর ভৃত্য। ভগবান ঐশ্বর্যশালী, ভক্ত

দীন। এতে স্থায়ীভাব সেবা নামে রতি। যেমন মীরার ভজনে 'চাকর রাখোজী' অথবা নরোত্তম ঠাকুরের "সেবা দিয়া কর অনুচর।"

সখ্যরস :— এই রসে ভগবান ও ভক্তের মধ্যে সমপ্রাণতার সম্পর্ক। সখাগণের রতি বিশ্বাস রূপা। সখাগণ শ্রীকৃষ্ণতুল্য। শান্তের কৃষ্ণনিষ্ঠা, দাস্যের সেবা ছাড়াও এতে আছে সমপ্রাণতা। খেলায় হেরে সখাগণ যখন শ্রীকৃষ্ণকে কাঁধে করেন কিম্বা কোনও সখা প্রীতিভরে তাঁর মুখে উচ্ছিষ্ট ফল দেন, তখন তিনি সখ্য রসের বিষয়; আবার যখন খেলায় হেরে তিনি তাঁর সখাগণকে কাঁধে বহন করেন, প্রীতিভরে কোনও সখার মুখে উচ্ছিষ্ট ফল দেন, তখন তিনি সখ্যরসের আশ্রয়।

'সব সখা মিলি করিয়া কুণ্ডলী
ভোজন করয়ে সুখে।
ভাল ভাল কয়ে মুখ হতে লয়ে
সভে দেয় কানু মুখে ॥

অথবা "হৈ হৈ রবে রাখাল সবে
গোষ্ঠে খেলিছে।
মিষ্টি ফল উচ্ছিষ্ট করি
কৃষ্ণ বদনে দিতেছে ॥"

বাৎসল্য : এখানে ভগবান সন্তান, ভক্ত, মাতা বা পিতা। এতে শান্ত, দাস্য, সখ্য ভাবতো আছেই উপরন্তু লালন মমতাধিক্য বর্তমান। শ্রীকৃষ্ণে বাল্যজ্ঞান, আমরা পালক এই জ্ঞান"

"বিপিনে গমন দেখি হয়ে সকরুণ আঁখি
কান্দিতে কান্দিতে নন্দরাণী
গোপালেরে কোলে লৈয়া প্রতি অঙ্গে হাত দিয়া
রক্ষামন্ত্র পড়য়ে আপনি ॥"

মায়ের প্রাণ সন্তানের জন্য সদা উদ্বিগ্ন। মাতা যশোদা কৃষ্ণের সর্বাঙ্গে হাত দিয়ে যে রক্ষামন্ত্র পাঠ করছেন, তিনি যে চতুর্দশ ভুবনের রক্ষাকর্তা সেটা তিনি মোটেই জানেন না। এ জ্ঞান থাকলে বাৎসল্য রস মোটেই সম্ভবে না।

মধুর রস : ভগবান এখানে কান্ত, ভক্ত কান্তা। শান্ত ইত্যাদি রসের গভীর মিলনে মধুর রস। শান্তরসে ভগবানকে ভালবাসার অবকাশ নাই। ভালবাসার সূত্রপাত দাস্যে আর চরম পরিণতি মধুরে। মধুর রসের স্থায়ীভাব মধুরা নামে রতি। এ তিন প্রকার। সাধারনী, সামঞ্জসা ও সমর্থা। সমর্থা সর্বশ্রেষ্ঠ। মথুরায় কুব্জার রতি সাধারনী, দ্বারকায় রুক্মিনী-সত্যভামার রতি সমঞ্জসা এবং কৃষ্ণের নিত্যপ্রিয়া বিশাখা-রাধিকাদির রতি সমর্থা। এঁদের মধ্যে রাধা শ্রেষ্ঠতমা। তিন প্রকারের মধুরারতি সম্বন্ধে আর একটু বিস্তৃত আলোচনা করা যাক্।

সাধারণী : কুব্জা মথুরার সাধারণী রমণী, কংসের মাল্য সরবরাহকারিণী রূপে বন্দিনী। কিন্তু যে মুহূর্তে মথুরার রাজপথে তিনি শ্রীকৃষ্ণকে দেখলেন তৎক্ষণাৎ কংসের ভয়াবহ রাজশক্তিকে উপেক্ষা করে কৃষ্ণকেই প্রার্থনা করলেন-বললেন আমি তোমারই, আমাকে গ্রহণ কর। কুব্জার আত্মসুখের কামনা, কিন্তু শুধু কৃষ্ণকেই প্রার্থনা। এই রতি সাধারণী। কুব্জার আত্মসুখের সম্বন্ধ থাকলেও কৃষ্ণভিন্ন অন্য পুরুষ কাম্য নহে। তাই এই রতি অন্যভাগ্যবতীরও হতে পারে। কুব্জার কৃষ্ণাসক্তি পণ্যার প্রেম নয়। তবে সাধারণ স্তরের। এই প্রকার রতিকেই বলে সাধারণী। এই রতিতে ব্যাধি, শঙ্কা, অসূয়া, শ্রম, ক্লম, নির্বেদ, ঔৎসুক্য, দৈন্য, চিন্তা, নিদ্রা, প্রবোধ, বৈয়গ্র, জড়তা, উন্মাদ, মোহ ও বিলাপ এই ষোলটি ভাবের উদয় হয়ে থাকে, কিন্তু এ ভাব সকল তেমন গাঢ়তা প্রাপ্ত হয় না।

সমঞ্জসা :— শ্রীশক্তি শ্রীরুক্মিণী এবং লক্ষ্মীস্বরূপা অন্যান্য মহিষীবর্গ। এখানে তাঁদের

আর্তি—যে কুলে জন্মগ্রহণ করেছি, সেই কুলধর্ম রক্ষা করেও তোমাকে চাই। হে প্রিয়তম, তুমি আমার। আমাকে তুমি গ্রহণ কর। এই যে সামঞ্জস্য একদিকে কুলরক্ষা ও অপরদিকে কৃষ্ণপ্রাপ্তির উদগ্র অভিলাষ এর জন্যই সমঞ্জসা। রুক্মিনীকে বিবাহ করবার জন্য পাপ শিশুপাল সমাগত, তখন রুক্মিণী দ্বারকায় শ্রীকৃষ্ণের নিকট পত্র লিখলেন—"আমি ক্ষত্রিয়কুমারী রাজকন্যা। পাপ শিশুপাল আমাকে বিবাহ করতে এসেছে। হে দয়াময় তুমি এসে আমাকে উদ্ধার কর, যেন সিংহের ভোগ্য, শৃগালে স্পর্শ না করে। তবে তুমি একা আসিও না। আসিও যদুসৈন্যসহ। কেননা, শিশুপাল ও জরাসন্ধের সৈন্যবল অসীম। তাঁদের সৈন্যদল মথিত করে আমাকে নিয়ে গিয়ে রাক্ষসবিধি অনুসারে বিবাহ কর। শ্রীকৃষ্ণ সেইভাবে জরাসন্ধ এমন কি রুক্মিনী ভ্রাতা রুক্ম প্রভৃতির সেনাদলকে মথিত করে রুক্মিনীকে দ্বারকায় আনয়ন করেন এবং বিবাহ করেন। এঁরা পরিণীতা পত্নী। সমঞ্জসা রতিতে পূর্বরাগে অভিলাষ, চিন্তা, উদ্বেগ প্রভৃতি ক্রমশঃ উৎপন্ন হয়। সমঞ্জসা নায়িকার অভিসারাদি নাই।

সমর্থা : লীলাশক্তি, শ্রীমতী রাধা ঠাকুরাণী। শ্রীকৃষ্ণ একমাত্র তাঁরই। তিনি কৃষ্ণের প্রেয়সী শ্রেষ্ঠা। নারীধর্ম, কুলধর্ম, সমাজধর্ম, গৃহধর্ম, দেহধর্ম, সর্বধর্ম পরিত্যাগ করে তিনি এবং তাঁর অংশ স্বরূপা অনুগামিনী গোপীগণ কৃষ্ণের জন্যই কৃষ্ণকে ভালবেসেছিলেন। এই রতিই রাগাত্মিকা রতি। মহাভাব-স্বরূপিনী রাধারাণীতেই সমস্ত ভাবের পর্যবসান। এরই অপর নাম প্রৌঢ় রতি। এতে লালসা, উদ্বেগ, জাগর্য্যা, তানব, জড়তা, বৈয়গ্র্য, ব্যাধি, উন্মাদ, মোহ ও মৃত্যু এই দশ দশা প্রকটিত হয়। পদাবলীর মধ্যে, এই দশটি দশারই পৃথক পৃথক গৌরচন্দ্র ও পৃথক পৃথক পদ আছে।
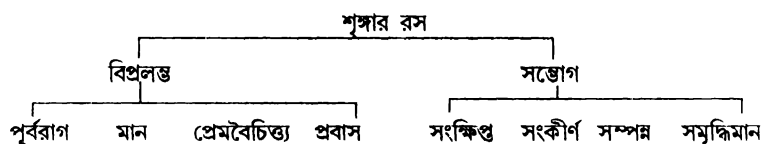
উপরোক্ত আটটি রসের প্রত্যেকের আবার আটটি করে ভাগ আছে।

সুতরাং রসের সংখ্যা দাঁড়ায় ৮×৮=৬৪

এখন প্রত্যেক রসের সংক্ষিপ্ত পরিচয় দিচ্ছি।

বিপ্রলম্ভ :— মিলনের পূর্বে অথবা পরে পরস্পর অনুরক্ত নায়ক-নায়িকার চুম্বন আলিঙ্গনাদির অপ্রাপ্তিতে যে ভাব উহাই বিপ্রলম্ভ। শ্রীপাদ রূপগোস্বামী বলেছেন "ন বিনা বিপ্রলম্ভেন সম্ভোগঃ পুষ্টিমশ্রুতে।" অর্থাৎ বিপ্রলম্ভ বিনা সম্ভোগ পুষ্টি লাভ করে না।

পূর্বরাগ : — 'সঙ্গ নহে রাগ জন্মে কহি পূর্বরাগ"

"রতির্যা সঙ্গমাৎ পূর্ব্বং দর্শন শ্রবণাদিজা।

তয়োরুন্মীলতি প্রাজ্ঞেঃ পূর্ব্বরাগ স উচ্যতে ॥'

যে রতি মিলনের পূর্বে দর্শন বা শ্রবণ মাধ্যমে উৎপন্ন হয়ে নায়ক নায়িকা উভয়ের হৃদয়কে উন্মীলিত করে, তারই নাম পূর্বরাগ। পূর্বরাগ নায়ক বা নায়িকার উভয়েরই হতে পারে।

শ্রীরাধার পূর্বরাগ: 'সজনি কি হেরিনু যমুনার কূলে

ব্রজকুল নন্দন,, হরিল আমার মন, ত্রিভঙ্গ দাঁড়ায়ে তরুমূলে"

শ্রীকৃষ্ণের পূর্বরাগ : অথবা, সখি, কেবা শুনাইল শ্যামনাম।" (সাক্ষাৎদর্শন)

বড়াই এর মুখে রাধার রূপের কথা শুনে কৃষ্ণের পূর্বরাগ জন্মেছে —

"তোর মুখে রাধিকার রূপ কথা শুনি।
ধরিবারে না পারোঁ পরাণি ॥" (শ্রবণজনিত)

অথবা "যব গোধুলি সময় বেলি, ধনি মন্দির বাহির ভেলি।
নব জলধর বিজুরি রেহা দ্বন্দ্ব পসারিয় গেলি ॥
ধনি অলপ বয়সী বালা, জনু গাথনি পহুপ মালা।
থোরি দরশনে, আশে না পূরল, বাঢ়ল মদন জ্বালা" (সাক্ষাৎদর্শন)

পূর্বরাগ আট প্রকারে উৎপন্ন হতে পারে—

১। সাক্ষাৎ দর্শন, ২। চিত্রপটে দর্শন ৩। স্বপ্নে দর্শন ৪। ভাটমুখে শ্রবণ ৫। পূতীমুখে শ্রবণ ৬। সখীমুখে শ্রবণ ৭। গুণীজনের গানে শ্রবণ এবং ৮। বংশী ধ্বনিশ্রবণ।

মান

মান : — 'স্নেহস্তূকৃষ্টতা ব্যাপ্তা মাধুর্যং মানবন্নবম্।
যো ধারয়ত্য দাক্ষিণ্যং স মান ইতি কীর্ত্যতে ॥' —উজ্জলনীলমণি।

পরস্পর অনুরক্ত ও একত্রে অবস্থিত নায়ক নায়িকার দর্শন আলিঙ্গনাদি নিরোধক হল মান। যেখানে প্রণয় সেখানেই মান। মানের কারণ ঈর্ষা। মান কীর্তন প্রধানত দুই ভাগে বিভক্ত। (১) খণ্ডিতা, (২) কলহান্তরিতা । নায়ক সময় মত মিলন না করে পূর্ব সাঙ্কেতিক কাল ব্যত্যয় করে যদি প্রিয়তম অন্য প্রেয়সীসহ নিশি যাপন করেন, তদীয় ভোগচিহ্ন ধারণপূর্বক প্রাতঃকালে সমাগত হন, তদ্দর্শনে পূর্ব-নায়িকা খণ্ডিতা অবস্থা প্রাপ্ত হন। ক্রোধ, দীর্ঘনিঃশ্বাস পরিত্যাগ তুষ্ণীভাব অবলম্বন ইত্যাদি খণ্ডিতা নায়িকার লক্ষণ । মানপ্রাপ্ত নায়িকা তিন প্রকার হয়। ধীরা, অধীরা, ধীরাধীরা।

"উল্লঙ্ঘ্য সময়ং যস্যাঃ প্রেয়ার্নন্যোপভোগবান্।
ভোগলক্ষাঙ্কিতঃ প্রাতরাগচ্ছেৎ খণ্ডিতা হি সা ॥"
"চন্দ্রাবলী সনে, কুসুম শয়নে সুখেতে ছিলেন শ্যাম।
প্রভাতে উঠিয়া ভয়ে ভীত হৈয়া, আইল রাধার ঠাম ॥

তখন রাধা "রোষেতে নাগরী, থাকিতে না পারি, নাগরে পারয়ে গালি।
চণ্ডীদাস ভনে লম্পটের সনে, কথা কৈলে, তবু ভালি।

কলহান্তরিতা : প্রত্যাখ্যাত নায়ক চলে গেলে, পরে অনুতপ্তা—

"যো হাম মান, বহুত করি মানলু, কানুক মিনতি উপেখি।
সো অব মনসিজ শরে ভেল জরজর তাকর দরশ না পেখি ॥
ধৈরজ লাজ, মান সঞে ভাগল, জীবন রহত সন্দেহ।
গোবিন্দ দাস, কহই সতী ভামিনী, কানুক ঐছন লেহ ॥"

মানের কারণ ৮টি। সখীমুখে শ্রবণ, শুক মুখে শ্রবণ, মুরলীধ্বনিশ্রবণ, নায়কের দেহে ভোগচিহ্ন দর্শন, প্রতিপক্ষ নায়িকার অঙ্গের ভোগচিহ্ন দর্শন, গোত্রস্খলন, স্বপ্নে দর্শন ও অন্য নায়িকার সঙ্গে দর্শন।

প্রেম-বৈচিত্ত্য : — "প্রিয়ের নিকটে রহে প্রেমের স্বভাবে।
প্রেম-বৈচিত্ত্য হেতু বিরহ করি ভাবে ॥"
**"প্রিয়স্য সন্নিকর্ষেখপি প্রেমোৎকর্ষ স্বভাবতঃ
যা বিশ্লেষ ধিয়ার্ত্তিস্তৎ প্রেম-বৈচিত্ত্যমুচ্যতে ॥**

প্রিয়ের নিকটে থেকেও ভাবী বিরহ আশঙ্কা কল্পনা করে ভাবনা। এতে শ্রীকৃষ্ণের প্রতি আক্ষেপ, মুরলীর প্রতি আক্ষেপ, নিজের প্রতি আক্ষেপ, সখীর প্রতি আক্ষেপ, দূতীর প্রতি আক্ষেপ, বিধাতার প্রতি আক্ষেপ, কামের প্রতি আক্ষেপ ও গুরুজনের প্রতি আক্ষেপ দেখা যায়।

'সজনি প্রেমকি কহব বিশেষ।
কানুক কোরে কলাবতী কাতর কহত কানু পরদেশ ॥'

প্রেমের স্বভাব এমনি, কানুর কোলে থাকিয়াও মনে হয় কানু পরদেশ চলে গেছে। প্রিয়তমার দর্শন না পেলে ক্ষণমাত্রকে যুগ বলে মনে হয়, আবার মিলন হলে সন্দেহ হয়, পেয়েছি তো? অভাগীর অদৃষ্টে এ সুখ স্থায়ী হবে তো? হয়ত এখনই হাবাব। মিলনের দীর্ঘসময়কেও পল বলে মনে হয়।

প্রবাস : পূর্ব্বসঙ্গ তয়োযূনোর্ভবেদ্দেশান্তরা দিভিঃ।
ব্যবধানস্তু যৎ প্রাজ্ঞৈঃ স প্রবাস ইতীর্য্যতে ॥— উজ্জ্বলনীলমণি

পূর্বে সম্মিলিত নায়ক-নায়িকার যে দেশ গ্রাম বনাদি স্থানান্তরের ব্যবধান, প্রাজ্ঞ ব্যক্তিগণ তাকেই প্রবাস বলে থাকেন। এই প্রবাস দুই প্রকার (১) অদূর প্রবাস (২) সুদূর প্রবাস। শ্রীকৃষ্ণ যখন কালিয় দমন, গোচারণ, নন্দমোক্ষণ বা রাসে অন্তর্হিত হওয়ার কারণ অদূরে অবস্থান করেন, সেটা অদূর প্রবাস, আর যখন তিনি মথুরা প্রভৃতি দূরদেশে গমন করেন তখন সেটা সুদূর প্রবাস।

"সুদূর প্রবাস হয় তিন প্রকার।
ভাবী, ভবন্, ভূত এই ভেদ তার ॥"

সুদূর প্রবাস : —কল্য প্রাতে শ্রীকৃষ্ণ মথুরা যাবেন। পথে পথে ঘোষণা হচ্ছে। শ্রীরাধিকা বলছেন, সখি আমার দক্ষিণ চক্ষু স্পন্দিত হচ্ছে—না জানি কি অমঙ্গল ঘটবে। এ ভাবী প্রবাস। ভবন বিরহ বর্তমানে ঘটেছে। শ্রীকৃষ্ণ মথুরায় যাচ্ছেন অক্রুর প্রস্তুত। শ্রীরাধিকার আর্তি ওরে কঠিন প্রাণ, শ্রীকৃষ্ণের রথারোহণের পূর্বেই আমাকে ত্যাগ কর। নতুবা মথুরাবাসী অশ্ব ক্ষুরতলে পিষ্ট হয়ে আমি তোকে ত্যাগ করব।

শ্রীকৃষ্ণ মথুরায় গিয়েছেন কাল আসব বলে। কিন্তু কতকাল অতিবাহিত হল, কিন্তু কৃষ্ণ কোথায়? শ্রীকৃষ্ণের ভুবনভুলান রূপ, মনভুলানো হাসি আমরা ভুলতে পারিনা। নন্দমহারাজ, মা যশোদা, রাখালগণ, শ্রীরাধাতো বটেই, পশুপক্ষী, তরুলতা, কীটপতঙ্গ পর্যন্ত কৃষ্ণবিরহে মৃত্যুপথযাত্রী। এই-ই ভূত প্রবাস। শ্রীমদ্ভাগবতের দশম স্কন্দের পঁয়তাল্লিশ অধ্যায়ানুসারে— দ্বাদশ বৎসরে ফাল্গুন দ্বাদশীতে কৃষ্ণ কেশী বধ করে পরের দিনই মথুরা গমন করেন এবং দুই দিবস ব্যবধানে চতুর্দশী তিথিতে কংশ নিহত হয়। শ্রীকৃষ্ণ কিঞ্চিদধিক একাদশ বৎসর শ্রীবৃন্দাবনে অবস্থান করেছিলেন। এর পরই মথুরা যাত্রা—মাথুর লীলা।

(১) **অভিসারিকা** : ১। জ্যোৎস্নাভিসারিকা, ২। তামসাভিসারিকা, ৩। বর্ষাভিসারিকা, ৪। দিবাভিসারিকা, ৫। কুজ্ঝটিকাভিসারিকা, ৬। তীর্থযাত্রাভিসারিকা, ৭। (বংশীধ্বনিশ্রবণে) উন্মত্তাভিসারিকা, ৮। অসমঞ্জসাভিসারিকা (যার বেশবস্ত্রাদি অসম্বৃত)।

(২) **বাসকসজ্জা** (কৃষ্ণাগমন প্রতীক্ষায় কুঞ্জ সাজিয়ে এবং নিজে সেজে অপেক্ষামানা) ১। মোহিনী, ২। জাগ্রতিকা, ৩। রোদিতা, ৪। মধ্যোক্তিকা (কান্ত এসে প্রিয়বাক্য বললেন, এরূপ চিন্তাযুক্তা), ৫। সুপ্তিকা (কপট নিদ্রায় নিদ্রিতা), ৬। চকিতা (নিজাঙ্গ ছায়ায় কৃষ্ণভ্রম), ৭। সুরসা (সঙ্গীতপরায়ণা), ৮। উদ্দেশা (দূতীপ্রেরণকারিণী)।

(৩) **উৎকণ্ঠিতা** : ১। দুর্মতি (কেন খলের কথায় বিশ্বাস করলাম), ২। বিকলা (পরিতাপ যুক্তা), ৩। স্তব্ধা, ৪। উচ্চকিতা, ৫। অচেতনা, ৬। মুখরা (দূতীর সঙ্গে কলহপরায়ণা),

৭। সুখোৎকণ্ঠিতা, ৮। নির্বন্ধা (আমারি কর্মদোষে তিনি এলেন না, আমি বাঁচবনা—এরূপ খেদযুক্তা)।

(৪) **বিপ্রলব্ধা** : সংকেত করেও প্রিয় কেন এলেন না এই চিন্তায় বিভোরা। ১। বিকলা, ২। প্রেমমত্তা, ৩। ক্লেশা, ৪। বিনীতা (বিলাপযুক্তা), ৫। নির্দয়া (কাণ্ড নির্দয়—এইরূপ ভাব)। ৬। প্রখরা (শয্যা এবং বেশভূষাদি) অগ্নি অথবা যমুনাজলে নিক্ষেপ করব এরূপ সংকল্প যুক্তা। ৭। দূত্যাদরা (দূতীকে আদরকারিণী)। ৮। ভীতা-প্রভাত হতে দেরী নাই—এই আশঙ্কা যুক্ত।

(৫) **খণ্ডিতা** : (অন্যনায়িকার সম্ভোগচিহ্নযুক্ত নায়ককে দেখে কুপিতা) ১। নিন্দা, ২। ক্রোধ, ৩। ভয়ানকা (কান্তকে সিন্দুরকজ্জলে মণ্ডিত দেখে ভীতা,) ৪। প্রগল্‌ভা, ৫। মধ্যা (অন্যা নায়িকার সম্ভোগচিহ্নে লজ্জিতা), ৬। মুগ্ধা, ৭। কম্পিতা, ৮। সন্তপ্তা (কান্তের অঙ্গে ভোগ চিহ্ন দেখে তাপযুক্তা)।

(৬) **কলহান্তরিতা** : (প্রত্যাখ্যাত নায়ক চলে গেলে অনুতপ্তা) ১। আগ্রহা ২। ক্ষুব্ধা ৩। ধীরা (পাদ পতিত মায়রাকে কেন দেখি নাই।) ৪। অধীরা ৫। কুপিতা ৬। সমা (কান্তের একা দোষ নাই, দূতীর দোষ, সময়ের সঙ্গে এবং আমার নিজের দোষে এরূপ হল।) ৭। মৃদুলা ৮। বিধুরা।

(৭) প্রোষিত ভর্তৃকা (প্রবাসে যার পতি।) ১। ভাবি (কান্ত প্রবাসে যাবেন এই সংবাদে কাতরা ২। ভবন্ (বর্তমান বিরহ) ৩। ভূত (কান্ত মথুরায়) ৪। দশদশা (চিন্তা, জাগরণ, উদ্বেগ, কৃশতা, জড়তা, প্রলাপ ব্যাধি, উন্মাদ, মোহ, মৃত্যু) ৫। দূতসংবাদ (উদ্ধবাদি মুখে) ৬। বিলাপা ৭। সখ্যুক্তিকা ৮। ভাবোল্লাসা।

(৮) স্বাধীন ভর্তৃকা (নায়ক যার সদা বশীভূত) ১। কোপনা ২। মানিনী ৩। মুগ্ধা ৪। মধ্যা ৫। সমুক্তিকা (সমীচীন উক্তিযুক্তা) ৬। অনুকূলা ৭। সোল্লাসা (কান্তের ব্যবহারে উল্লসিতা) ৮। অভিষিক্তা (অভিষেকপূর্বক নায়ক যাকে চামর ব্যাজনাদি করেন)।

সম্ভোগ

"দর্শনালিঙ্গ নাদীনামানু কূল্যান্নিষেবয়া।
মুনেরুল্লাসমারোহন্ ভাবঃ সম্ভোগ ঈর্য্যতে ॥"

দর্শন ও আলিঙ্গনাদি প্রাপ্ত হয়ে নায়ক নায়িকার যে ভাবোল্লাস তারই নাম সম্ভোগ। সম্ভোগ চারিপ্রকার।

১। সংক্ষিপ্ত, ২। সঙ্কীর্ণ, ৩। সম্পন্ন, ৪। সমৃদ্ধিমান।

যুবক যুবতীর ভয় লজ্জা ও অসহিষ্ণুতাদিহেতু ভোগের উপচার সংক্ষেপে গ্রহণ সংক্ষিপ্ত সম্ভোগ। সংক্ষিপ্ত সম্ভোগ ৮ প্রকার। ১) বাল্যাবস্থায় মিলন ২) গোষ্ঠে গমন ৩) গোদোহন ৪) অকস্মাৎ চুম্বন ৫) হস্তাকর্ষণ ৬) বস্ত্রাকর্ষণ ৭) বর্ত্মরোধন ৮) রতিভোগ

"অভিনব গোরি বসতি পি গেহ।
ঘর সঞে করষয়ে নওল সুনেহ ॥
কি কহব রে সখি কহই ন জান।
পহিল সমাগম রাধা কান ॥" (সংক্ষিপ্ত)

সংকীর্ণ সম্ভোগ : নায়ক কর্তৃক বিপক্ষগুণ কীর্তন শ্রবণে ও স্ব-বঞ্চনাদি স্মরণে নায়িকা আলিঙ্গন চুম্বনাদিতে সম্পূর্ণ সম্মিলিতা না হলে সম্ভোগ সংকীর্ণ হয়। এ আট প্রকার—

১) মহারাস ২) জলক্রীড়া ৩) কুঞ্জলীলা ৪) দানলীলা ৫) বংশীচুরি ৬) মধুপান ৭) নৌকাবিলাস ৮) সূর্য পূজা।

সম্পন্ন সম্ভোগ : অদূর প্রবাস হতে কান্ত ফিরে এলে যে মিলন হয় তাতে সম্পন্ন সম্ভোগ নিষ্পন্ন হয়। এ আট প্রকার—

১) সুদুর দর্শন ২) ঝুলন ৩) হোলি ৪) প্রহেলিকা ৫) পাশাখেলা ৬) নর্তকরাস ৭) রসালস ৮) কপট নিদ্রা।

সমৃদ্ধিমান সম্ভোগ : পরাধীনতার জন্য নায়ক নায়িকার বিয়োগ ঘটেছে, পরস্পরের দর্শনও দুর্লভ—এই অবস্থার অবসান ঘটলে, উভয়ের মিলনে যে উপভোগ—তাহাই সমৃদ্ধিমান সম্ভোগ নামে পরিচিত। এও আট প্রকার—

১) স্বপ্নে বিলাস ২) কুরুক্ষেত্রমিলন ৩) ভাবোল্লাস ৪) ব্রজাগমন ৫) বিপরীত সম্ভোগ ৬) ভোজন কৌতুক ৭) একত্র নিদ্রা ৮) স্বাধীনভর্তৃকা।

কীর্তনীয়াগণ বিপ্রলম্ভ ও সম্ভোগের চৌষট্টি বিভাগের কীর্তনকেই চৌষট্টি রসের গান বলে থাকেন, মান পর্য্যায়ে অভিসারিকাদির স্থান আছে। নিম্নে নায়িকার অভিসারিকাদি অষ্ট অবস্থা ও তাদের প্রত্যেকের আট আট ভেদের বিবরণ দেওয়া হল। অভিসারিকা (যিনি স্বযং অভিসার করেন অথবা নায়ককে অভিসার করান।

নায়ক নায়িকা : বৈষ্ণব শাস্ত্রে একমাত্র শ্রীকৃষ্ণকে নায়ক বলে গণ্য করা হয়।

এই শ্রীকৃষ্ণ "বর্হাপীড়ং নটবরবপুঃ কর্ণয়োঃ কর্ণিকারং
বিভ্রদ্বাসঃ কনক কপিশং বৈজয়ন্তীঞ্চ মালাম্।
রন্ধ্রান্ বেণোধরসুধয়া পূরয়ন গোপবৃন্দ
বৃন্দারণ্যং প্রাবিশদ্ গীতকীর্তিঃ ॥"

মাথায় ময়ূরের পাখাযুক্ত চূড়া, কানে মণিকার, পরণে স্বর্ণবর্ণ পীতবসন, এবং গলায় বৈজয়ন্তী মালা ধারণ করে নটবর বিগ্রহ শ্রীকৃষ্ণ অধরসুধায় মুরলীরন্ধ্র ধ্বনিত করে স্বীয় পদচিহ্ন শোভিত বৃন্দারণ্যে প্রবেশ করছেন। শ্রীকৃষ্ণ ষড়ৈশ্বর্য সম্পন্ন স্বয়ং ভগবান। ত্রিভুবনে তাঁর সমান বা অধিক রূপবান বা গুণবান কেহ নেই।

কৃষ্ণপ্রিয়াগণের মধ্যে যিনি সর্বপ্রধানা, রপে গুণে যিনি ত্রিলোকমধ্যে শ্রীকৃষ্ণের সর্বাপেক্ষা প্রিয়তমা, মহাভাবস্বরূপিণী শ্রীকৃষ্ণমোহিনীর নাম রাধা। ইনিই বৈষ্ণব সাহিত্যে নায়িকা।

উপরে কীর্তনের বৈষয়বস্তু সম্পর্কে আলোচনা করা হয়েছে। এবার কীর্তন গানের বিশেষ করে গৌরচন্দ্রিকা বিষয়ে আলোচনা করতে চাই। কীর্তন শব্দের সাধারণ অর্থ সংশব্দন, কথন, বচন, বর্ণন, ঘোষণা ।

লীলাকীর্তন : ধর্মতত্ত্ব, কাব্য, গীত, বাদ্য ও নৃত্য লয়ে লীলা কীর্তন। সঙ্গীতে পারদর্শীর সঙ্গে শাস্ত্র জ্ঞান না থাকলে ভাল কীর্তনীয়া হওয়া যায় না। ঠিকমত কীর্তন গাইতে হলে ভক্তিশাস্ত্রে ও বসশাস্ত্রে পারঙ্গম হতে হয়।

চৈতন্যদেবের ধারায় আদি কীর্তনীয়া চৈতন্যদেব স্বয়ং। তিনি ছিলেন কাব্য ও সঙ্গীত প্রিয় এবং নৃত্য ও গীতকুশলী। নৃত্য, গীত ও বাদ্য নিয়ে নামকীর্তন। আর লীলাকীর্তনে এগুলি ছাড়াও থাকে কাব্য ও অভিনয়। চৈতন্য পারিষদদের মধ্যে অনেক গায়ক, বাদক, নর্তক ও কবি ছিলেন। সর্বপ্রধান চৈতন্য পরিকর শ্রীঅদ্বৈত আচার্য ও নিত্যানন্দ উভয়েই নাচে ও গানে পারঙ্গম ছিলেন।

গায়ক হিসাবে নবদ্বীপ পর্বের মুকুন্দ দত্ত ও নীলাচল পর্বের স্বরূপ দামোদর সবিশেষ উল্লেখযোগ্য। তারপর তিন ভাই গোবিন্দ ঘোষ, মাধব ঘোষ ও বাসুদেব ঘোষ। এঁরা চৈতন্যদেবের অতি প্রিয় গায়ক ছিলেন। চৈতন্যদেবের অন্য পার্ষদদের মধ্যে গায়ক হিসাবে

প্রসিদ্ধি লাভ করেছিলেন, শ্রীবাস, তাঁর ছোট ভাই শ্রীরাম পণ্ডিত, গোবিন্দ ও তাঁর ছোট ভাই বাসুদেব দত্ত।

মহারাস

শ্রীরাসলীলা শ্রীমদ্ভাগবতের উনত্রিশ অধ্যায় হতে তেত্রিশ অধ্যায় এই পঞ্চ অধ্যায়ে বিধৃত। এটিই পঞ্চাধ্যায়ী রাস নামে পরিচিত। এই লীলা, তত্ত্বের দিক দিয়ে যেমন শ্রেষ্ঠ, কবিতাংশেও তদ্রূপ মধুর। তৈত্তরীয় উপনিষদে ব্রহ্মকে সত্যং জ্ঞানমনন্তম্ বলেও তাঁকে রসো বৈ সঃ বলা হয়েছে। তিনি অর্থাৎ ভগবান রসস্বরূপ। এই রসকে কেন্দ্র করেই রাস বা মহারাস। সাধারণতঃ অনেক নর্তকীকে (সাতজন হতে ১০ জন) নিয়ে মণ্ডলাকারে একজন পুরুষের হাবভাব যুক্ত নৃত্যগীতকে হল্লীয় বা হল্লীয়ক বলা হয়ে থাকে।

"নর্ত্তকীভিরনেকাভিঃ মণ্ডলে বিচরিষ্ণুভিঃ।
যত্রৈকো নৃত্যতি নট স্তদ্বৈহল্লীষকং বিদুঃ"

কিন্তু যখন সেই নৃত্য বিশুদ্ধ তালযুক্ত এবং বিবিধ গতিভেদে বৈচিত্রপূর্ণ হয় তাকেই রাস নাম দেওয়া যায়। শ্রীমদ্ভাগবতে—

তদেবেদং তালবদ্ধ গতিভেদেন ভূয়সা।

রাসঃ স্যান্নসনাকেঽপি বর্ততে কিং পুর্নভুবি।—এই রাসনৃত্য মর্ত্তের কথা কি স্বর্গেও দুর্লভ।

গীতায় শ্রীভগবান বলেছেন, "মূঢ়োঽয়ং নাভিজানাতি লোকোমামজমব্যয়ম" অর্থাৎ মূঢ়লোকে আমাকে অজ, অব্যয় পরমেশ্বর বলে জানতে পারে না। কেননা, "নাহং প্রকাশঃ সর্বস্য যোগমায়া সমাবৃতঃ।" আমি যোগমায়া সমাবৃত থাকায় সকলের নিকট প্রকাশিত হইনা। এই যোগমায়াই শ্রীকৃষ্ণের অন্তরঙ্গা স্বরূপ শক্তি, চিৎশক্তি। ইনি শ্রীরাধারই অংশ স্বরূপ। যোগমায়া দেবীর অপর নাম পৌর্ণমাসী। এই জন্যই পৌর্ণমাসী অর্থাৎ পূর্ণিমা রজনীতে মেঘবিমুক্ত শরৎকালে রাসলীলা অনুষ্ঠিত হয়েছিল বৃন্দাবনের নিকুঞ্জ কুঞ্জে। বিষ্ণুপুরাণ ও শ্রীমদ্ভাগবতে এই শারদরাসের বিবরণ আছে আর বৈবর্ত্তপুরাণে বাসন্তরাসের এবং পদ্মপুরাণে শারদ ও বাসন্ত উভয় রাসেরই বর্ণনা আছে।

দেহদৃষ্টি যতক্ষণ থাকে, ততক্ষণ পরমাত্মার সঙ্গে জীবের মিলন অধিকার জন্মে না। যিনি অখণ্ড, অনন্ত, এই মায়িক দেহের সীমায় তাঁকেও সীমাবদ্ধ বলে মনে হয়। তাই অভিন্ন হয়েও জীবশিবের মধ্যে একটি ভেদদৃষ্টির ব্যবধান খাড়া হয়ে ওঠে। এই ভেদদৃষ্টি যতক্ষণ না ঘুচে ততক্ষণ পরমাত্মার সঙ্গে জীবের মিলনপথ অবরুদ্ধ হয়ে থাকে, এই ভেদদৃষ্টি থাকতে ভক্ত প্রাণনাথকে আত্মসমর্পণ করতে কখনই সমর্থ হয় না। ভগবান শ্রীকৃষ্ণ বস্ত্রহরণের অভিনয়ে এইই বুঝিয়ে দিয়েছিলেন। গোপীগণের যখন মোহ ঘুচল, বন্ধন টুটল, তখনই প্রকৃত রাসলীলা সম্ভোগের অধিকারিণী হলেন। সিদ্ধদেহ পেয়ে এখন অকামচিত্তে রাসেশ্বর লয়ে গোপীদের যে সম্ভোগবিলাস সে এক অপূর্ব কথা। গোপিকারাও বিষয় বিনিবৃত্তচিত্তা, অতএব অকামা, কিন্তু তথাপি তাঁরা কৃষ্ণকামা। এ আকাঙক্ষা যদিও আকাঙক্ষা তথাপি সাত্ত্বিক, কেননা ঈশ্বর ব্যতীত অন্য বস্তুর ইচ্ছাকেই কামনা বলে। ভগবৎপ্রাপ্তির ইচ্ছাকে কামনা বলে না। "ন তু কামায় কল্পতে", এইই ভাগবতের সিদ্ধান্ত।

যেখানে বিশুদ্ধ আনন্দ সেখানে বাস্তবিক কোন কামনা নেই, সেখানে সবই যে পূর্ণ, যেখানে অপূর্ণতা, সেখানেই তো কামনার প্রবেশাধিকার। সুতরাং এ যে আনন্দ তা পূর্ণত্বের আনন্দ, অনন্তের আনন্দ, এ অকামের আনন্দ। এ সীমাবদ্ধ ইন্দ্রিয়জ্ঞান দ্বারা বাধিত হবার নয়। হৃদরোগ যাঁদের নষ্ট হয় নাই তাঁরা এ লীলা বুঝবার অধিকারী নন। সেই জন্য এ লীলার

অভিনয় যখন হয়, সে সভায় দেবতাদেরও স্থান হয়নি। কতিপয় বাছা বাছা ভক্তজ্ঞানী, ব্রহ্মাদি দেবেন্দ্রগণ, এবং মদনমথনকারী কৈলাসপতি শিবই এই মদনগর্বহারী মদনমোহনের মদনলীলা দর্শনের পূর্ণ অধিকার লাভ করেছিলেন।

দর্শনের কথা দূরে থাক, এ লীলা শ্রবণেরও সকলে অধিকারী নয়। বহুভাগ্যফলে, জন্ম জন্মান্তর তপঃ সঞ্চিত বলে এ লীলা শ্রবণে চিত্তের চাঞ্চল্য রহিত কামগন্ধহীন আনন্দ সমুদ্ভূত হয়। যাঁদের দেহাত্মজ্ঞান সুতরাং যাঁরা জড়াত্মা, তাঁরা এ লীলা শ্রবণ করলে ধর্ম হতে স্খলিত হবেন। অমৃতলাভ না করে বিষের জ্বালায় জর্জরিত হবেন। তাঁরা একে প্রাকৃত নরনারীর কাম-চরিতার্থতা ছাড়া অন্য কিছু মনে করতে পারবেন না। সুতরাং হিতে বিপরীত হবে। রাসে কাম গন্ধের স্থান নেই, ধনপুত্র বিষয়লাভের প্রত্যাশা নেই, এ যে আত্মরতি, এ যে আত্মবিসর্জন, ভগবানের সঙ্গলাভে ঐকান্তিকী বাসনা।

"কামগন্ধহীন স্বাভাবিক গোপীপ্রেম।
নির্মল উজ্জ্বল শুদ্ধ যেন দগ্ধ হেম ॥
কৃষ্ণের সহায় গুরু বান্ধব প্রেয়সী।
গোপিকা হয়েন প্রিয়া, শিষ্যা সখী দাসী ॥" (চৈ. চরি)

আরও বলেছেন— "সহজে গোপীর প্রেম নহে প্রাকৃত-কাম।
কামক্রীড়া-সাম্যে তার কহি কাম-নাম।"

কামের তাৎপর্য হল—নিজের ইন্দ্রিয়ের সুখ বিধান করা। আর গোপী প্রেমের তাৎপর্য হল শ্রীকৃষ্ণের সুখ সম্পাদনা করা। গোপীদের দ্বারা ইন্দ্রিয়তৃপ্তির বাসনার গন্ধ মাত্রও নাই। উপরোক্ত প্রেক্ষাপটে এবার রাসলীলায় আসি। পূর্বেই বলেছি রাসলীলার সূত্রপাত বস্ত্রহরণ লীলায়। এই বস্ত্রহরণ লীলায় অতি কৃচ্ছ্রসাধন করে সর্বপ্রকার কামনা বাসনা এমনকি লজ্জা পর্যন্ত ত্যাগ করে গোপীগণ শ্রীকৃষ্ণের সম্মুখীন হলে শ্রীকৃষ্ণ তাঁদের বলেছিলেন তোমাদের মনস্কামনা পূর্ণ হবে। তাই, যখন শারদ পূর্ণিমারাত্রে তরুলতা পুষ্পবন হেসে উঠেছে ঠিক সেই সময়ে শ্রীকৃষ্ণের অভিসাররাত্রি নির্দিষ্ট হল। যথা শ্রীমদ্ভাগবতে—

"ভগবানপি তা রাত্রিঃ শারদোৎফুল্লমল্লিকাঃ।
বীক্ষ্যরন্তুং মনশ্চক্রে যোগমায়ামুপাশ্রিতঃ ॥

শ্রীকৃষ্ণের প্রতিজ্ঞারূপ সেই শারদীয় যামিনী সমাগত হল। সেই সুখময়ী যামিনীতে মল্লিকা মালতী পুষ্পসমূহ প্রস্ফুটিত হয়েছে দেখে ভগবান শ্রীকৃষ্ণ যোগমায়া আশ্রয়পূর্বক বিহার করতে মানস করলেন। এখানে যোগমায়া বলতে কি বোঝায় জানা দরকার। এই যোগমায়াই তাঁর "স্বাং প্রকৃতিং", যোগমায়া ব্যতীত ভগবান আপনাকে প্রকাশ করতে পারেন না। যেখানে তাঁর প্রকাশ, যেখানে তাঁর লীলা, সেখানেই তিনি সগুণ, সেখানেই তিনি মায়া শ্রিত। কিন্তু তিনি মায়াশ্রিত হয়েও মায়াতীত। কেননা, তিনি জীবের ন্যায় মায়াধীন নহেন, পরন্তু মায়ার অধীশ্বর। নির্গুণভাবে কোন লীলাবিলাস নাই, কোন প্রকাশ নাই, আপনাতে আপনি স্তব্ধ হয়ে থাকা ; আর সগুণভাবে কেবল আপনাকে প্রকাশিত করবার চেষ্টা, আপনাকেই বহুরূপে প্রকাশ করে বহুর মধ্যে সেই ঐক্যটিকে উপলব্ধি করবার চেষ্টা। এখানেই যোগমায়ার প্রয়োজন।

মহারাসে যাঁরা শ্রীকৃষ্ণের সঙ্গে মিলনাকাঙ্ক্ষায় সমাগতা হয়েছিলেন তাঁদেরকে পরিহার করার উপায় ছিল না। কেননা, সকলেই ছিলেন বাগদত্তা। ত্রেতাযুগে দণ্ডকারণ্যনিবাসী মহর্ষিগণ শ্রীরামচন্দ্রকে দেখে তাঁকে উপভোগের প্রার্থনা জানিয়েছিলেন। পুরুষদেহে তা অসম্ভব জেনে জন্ম জন্মান্তরের তপস্যার ফলে এঁরা ব্রজগোপীরূপে বৃন্দাবনে আবির্ভূতা হয়েছিলেন। এঁরাই ঋষিচরি গোপী। সমস্ত উপনিষদ ব্রহ্মকে মধু বলে, রস বলে, আনন্দ বলে অনুভব করেছিলেন। তাঁরাও সচ্চিদানন্দ বিগ্রহকে পরিপূর্ণভাবে পাওয়ার জন্য ব্রজগোপীরূপে জন্মগ্রহণ করেছিলেন।

গায়ত্রীদেবীও গোপীদেহ লাভ করেছিলেন। ইহারা শ্রুতিচরী গোপী। আর দেবীগণও শ্রীকৃষ্ণের প্রিয়কার্য্য সাধনের জন্য গোপীরূপে আবির্ভূতা হয়েছিলেন এঁরা দেবীচরী গোপী। এঁরা সকলেই সাধনসিদ্ধা গোপী। যূথসহ শ্রীরাধা ও চন্দ্রাবলী নিত্যসিদ্ধা। সাধনসিদ্ধা গোপীগণই কাত্যায়নী ব্রতাচরণ করেছিলেন। ব্রতসমাপ্তি দিনে রাধাসহ সকলেরই বস্ত্রহরণ হয়েছিল।

সবধর্ম পরিত্যাগ না করলে শ্রীভগবানকে পাওয়া যায় না। সংসার ধর্ম, সমাজধর্ম, ইন্দ্রিয়াদিও সর্বধর্মের অন্তর্ভুক্ত। রমণীদের সর্বশ্রেষ্ঠ ভূষণ লজ্জা। শ্রীকৃষ্ণ প্রীতির জন্য গোপীগণ সবধর্মই পরিত্যাগ করেছিলেন। শ্রীকৃষ্ণ বস্ত্রহরণের দিনেই প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন 'আগামী যামিনীসমূহে আমি তোমাদের কামনা পূর্ণ করব। এই প্রতিশ্রুতির ফলশ্রুতিই শারদ পৌর্ণমাসী রজনীতে রাসের প্রথমা রজনী।

শ্রীকৃষ্ণের মুরলীসংকেত শুনে গোপাঙ্গনাগণ একে অপরের অলক্ষিতে পতি, পুত্র, সংসার, আত্মসম্মান পরিত্যাগসূচক শ্রীকৃষ্ণ সমীপে বনে উপস্থিত হলেন। চারিদিকে অরণ্য, হিংস্র পশুরা ইতস্ততঃ বিচরণ করছে। কতশত দংশক, বৃশ্চিক ও সর্প পথ আগলে বসে আছে, কন্টকাকীর্ণ অপ্রশস্ত অরণ্যপথে পদে পদে পদস্খলিত ও কণ্টক ক্ষত হয়ে গমনপথ রুদ্ধ করছে, তথাপি তাঁদের দৃকপাত নাই। পথের বিঘ্ন, গৃহের ও ধর্মের বাধা তাঁদেরকে শ্রীকৃষ্ণমিলনের অভিসার থেকে বিমুখ করতে পারল না। ফেলে এলেন গৃহ, গৃহকাজ, লজ্জা, মান ইত্যাদি। কোথায় রইল স্বজন, সমাজ, সংসার। প্রসাধন, রইল অসমাপ্ত। কোথাকার ভূষণ কোথায় পরলেন ভ্রূক্ষেপ নেই। শুধু

"তাহি চলত, যাহি বোলত, মুরলীক কলকলনী।

আর বেশভূষার ব্যাপারে— "বিছুরি গেহ নিজহু দেহ, একনয়নে কাজর রেহ,
বাহে রঞ্জিত মঞ্জীর এক, এক কুণ্ডল দোলনী ॥"

ব্রজগোপীগণ সর্বস্ব ত্যাগ করে, উক্ত প্রকারে অভিসার করে কৃষ্ণসমীপে আগমন করলে কৃষ্ণ প্রথমে উপেক্ষাত্মক অথচ আকর্ষণশীল বাক্যাবলীতে গোপীদের মিলন ইচ্ছা আরও বর্ধিত করে বিমোহিত করলেন। গৃহধর্ম স্বজনসেবা, পতিসেবা যে রমণীগণের পরমধর্ম সেই সেই বিষয়ে নানারূপ উপদেশ দিলেন। কিন্তু গোপীগণ তাতে মোটেই কর্ণপাত করলেন না। শ্রীকৃষ্ণ গোপী গণের সঙ্গে মিলিত হলেন। জগতের সামনে কৃষ্ণপ্রাপ্তির রাজপথ খুলে গেল। আরম্ভ হল রাসলীলা। শ্রীকৃষ্ণকে কেন্দ্র করে গোপীগণের যে নৃত্য তাইই রাসলীলা। এ রাসলীলা নিত্য চলমান। এর অবসান কোথায়। নিত্য বৃন্দাবনে নিত্য রাসলীলা চলছে। 'ভাগ্যবান জনে কেহ দেখিবারে পায়।'

কৃষ্ণসঙ্গলাভে গর্বিতা গোপীগণের গর্বনাশ করতে শ্রীভগবান অন্তর্হিত হলেন। যদিও শ্রীমদ্ভাগবতে রাধার নাম নেই, তথাপি গোপীমণ্ডলী হতে যাকে নিয়ে কৃষ্ণ নির্জনে প্রস্থান করেছিলেন তিনিই যে রাধা, অপরাপর পুরাণ ও তন্ত্রাদি থেকে এর প্রমাণ পাওয়া যায়। শ্রীকৃষ্ণকে রাসমণ্ডলে না দেখে প্রাপ্তনিধি হারিয়ে গোপীগণ অতিশয় অধীরা হয়ে উঠলেন।

"ততশ্চান্তর্দধে কৃষ্ণ সা বধূবন্যতপ্যত
হা নাথ রমণ প্রেষ্ঠ ক্বাসি ক্বাসি মহাভুজ
দাস্যতে কৃপণায়া সখে দর্শয় সন্নিধিম্ ॥"

তাঁরা স্থাবর জঙ্গমের ভেদ ভুলে গিয়ে

"সবহ বন ঢুঁড়ই, পুছই তরুগণ পাশ।
কাঁহা মঝু প্রাণনাথ ভেল অতি অলখিত
না দেখিয়া জীবন নৈরাশ ॥
কহ কুসুমপুঞ্জ তুঁহু ফুল্লিত, শ্যাম ভোমরা কাঁহা পাই।'

কৃষ্ণবার্তা জিজ্ঞাসা করতে করতে তাঁরা এমনই তন্ময় হয়ে উঠলেন যে আমিই কৃষ্ণ, এইভাবে বিভাবিত হয়ে পড়লেন। তখন সকলে মিলে কৃষ্ণলীলাব অভিনয়ে মেতে উঠলেন। কেহ কৃষ্ণ, কেহ পুতনা, কেহ যশোদা ইত্যাদি। তন্ময়তা যখন চরমে উঠল, তাঁদের নয়ন সম্মুখে ভেসে উঠল শ্রীকৃষ্ণ পদচিহ্ন। কৃষ্ণ ভাবনায় যখন অন্তর বাহির কৃষ্ণময় হয়ে ওঠে তখনই কৃষ্ণপদচিহ্ন নয়নপথে উদ্ভাসিত হয় । শ্রীরাধিকার চরণ যে আবও দুর্লভ, কৃষ্ণের করুণা না হলে শ্রীরাধাকে পাওয়া যায় না--সাধনসিদ্ধা গোপীগণ এ জগতকে তাই দেখালেন। কৃষ্ণপদাঙ্ক অনুসরণ করে কিছুদূর অগ্রসর হয়ে একজন মহিলার পদচিহ্ন দেখতে পেলেন। ঐ পদচিহ্ন দেখে গোপীগণ ভাবতে লাগলেন, এ কোন ভাগ্যবতীর পদচিহ্ন? কোন্ কামিনী কৃষ্ণের কাঁধে হাত দিয়ে গমন করেছে। তাই শ্রীগোবিন্দ আমাদের পরিত্যাগ করে একে নির্জনে নিয়ে এসেছেন। এইভাবে যুগলের পদচিহ্ন অনুসরণ করে গোপীগণ শ্রীরাধার দর্শনপ্রাপ্ত হলেন। তখনও কৃষ্ণপ্রাপ্তি ঘটে নাই। মধ্যে অপেক্ষমানা শ্রীরাধিকা। শ্রীরাধার কৃপা না হলে, তাঁর দর্শন না মিললে যে কৃষ্ণকে দর্শন পাওয়া যায় না, তা জগতকে বোঝাবার জন্যই শ্রীরাধাকে পথের মাঝে অপেক্ষার ইঙ্গিত করেছিলেন। এ যেন ভক্ত ও ভগবানের মিলন সেতু শ্রীমতী রাধিকা। এখন শ্রীমতী রাধাসহ গোপীগণ একত্রে কৃষ্ণান্বেষণে চলতে লাগলেন। শ্রীমদ্ভাগবতের দশম স্কন্ধের একত্রিশ অধ্যায়ের ঊনত্রিশটি শ্লোক গোপীগীতা নামে প্রসিদ্ধ। ঐ শ্লোকগুলিতে গোপীগণের আর্তি বিশেষভাবে প্রকাশিত হয়েছে। গোপীগণের আর্তিতে আকৃষ্ট হয়ে আবির্ভূত হলেন—

"পীতাম্বর ধর স্রগ্বী সাক্ষান্মথমন্মথঃ ॥

অভিমানিনী গোপীগণ ঈষৎ কোপ প্রকাশ বারে শ্রীকৃষ্ণের অন্তর্ধানের কারণ জানতে চাইলেন। শ্রীকৃষ্ণ তাঁর উত্তরে বললেন,

"এবং মদর্থোজিবা ত লোক বেদ-স্নানাং হিরোমথ্যনুবৃত্তয়েহবলাঃ।
ময়া পরোক্ষং ভজতা তিরোহিতং
মাসূয়িতং মার্হথ তৎ স্ত্রিয়ং প্রিয়া:
ন পারয়েহহং নিরবদ্যসংযুজাং স্বমধুকৃত্যং বিবুধায়ুষাপি বঃ।
যা মাভজন্ দুর্জর গেহশৃঙ্খলাঃ সংবৃশ্চ্য তদ্বঃ প্রতিযাতু সাধুনা ॥"

১০/৩২/২২-২২

প্রথম শ্লোকটিতে শ্রীকৃষ্ণ গোপীমাহাত্ম্য এবং নিজের অন্তর্ধানের কারণ বলে দ্বিতীয় শ্লোকটিতে গোপীপণের প্রত্যুপকার সুচিরকালেও সাধন করতে পারবেন না—এ কথাই বলেছেন। শ্রীকৃষ্ণ যে তিরোহিত হয়েছিলেন তার কারণ বলেছেন যে গোপীগণ যেরূপ সর্বস্বত্যাগ করে শ্রীকৃষ্ণভজনে এসেছিলেন, শ্রীকৃষ্ণ সেইরূপ পরোক্ষ ভজনের জন্য তিরোহিত হয়েছিলেন। এই পরোক্ষ ভজনই শ্রীকৃষ্ণ কর্তৃক বিপ্রলম্ভ রসের আস্বাদন। (বিপ্রলম্ভ বলতে বোঝায় মিলনের পূর্বে অথবা পরে পরস্পর-অনুরক্ত নায়ক নায়িকার চুম্বন আলিঙ্গনাদির অপ্রাপ্তিতে যে ভাব তাই বিপ্রলম্ভ।) শ্রীকৃষ্ণ আরও বলছেন যে তিনি গোপীদেব প্রেমের ঋণে অনন্তকাল ঋণী। যুগে যুগে এই ঋণ পরিশোধের চেষ্টা করেও তাতে কৃতকার্য হননি এবং অনন্তকাল ধবেও হবেন না। এরপর আরম্ভ হল মহারাসলীলা। দুই দুই গোপী এক এক কৃষ্ণ। মহাযোগেশ্বর পূর্ণব্রহ্ম সনাতন শ্রীকৃষ্ণের পক্ষেই এ সম্ভব। আরম্ভ হল বাসনৃত্য তালবদ্ধ এবং গতিবৈচিত্র্যে সমৃদ্ধ। পরস্পর পরস্পরের বাহু গ্রথিত করে দাঁড়ালে শ্রীকৃষ্ণ—

"রাস্যেৎসবঃ সংপ্রবৃত্তো গোপীমণ্ডল মণ্ডিতঃ।
যোগেশ্বরেণ কৃষ্ণেণ তাসাং মধ্যে দ্বয়োর্দ্বয়ো ঃ
প্রবিষ্টেন গৃহীতানাং কণ্ঠে স্বনিক স্বনিকটং স্ত্রিয়ঃ ॥"

১০/৩৩-৩৪

গোপীমণ্ডল মণ্ডিত রাসোৎসব আরম্ভ হল। শ্রীকৃষ্ণ যিনি গোপেশ্বর, তিনি প্রতি গোপী যুগলের মধ্যে প্রবিষ্ট হয়ে তাঁর উভয় হস্ত দুই দিকস্থ গোপীদ্বয়ের কণ্ঠে অর্পণ করলেন। এইরূপে একই কৃষ্ণ বিগ্রহ একই স্বরূপে, একই রূপে বহু হয়ে রাসোৎসব রস আস্বাদন করেছিলেন।

"অঙ্গনামঙ্গনামন্তরা মাধবো, মাধবং চান্তারেণাঙ্গনা।
ইত্থমাকল্পিতে মণ্ডলে মধ্যগো, বেণুনা সংজগৌ দেবকী নন্দনঃ ॥"

দুইটি গোপীর মধ্যে মাধব অথবা দুই পার্শ্বে দুই মাধব, মধ্যে এক গোপী এই প্রকার মণ্ডলীর মধ্যে শ্রীকৃষ্ণ বেণুবাদন করতে লাগলেন।

ব্রজাঙ্গনাগণের মনোবাসনা পূর্ণ করবার জন্য পূর্ণতম ভগবান শ্রীকৃষ্ণই বহু হলেন। কিন্তু যোগমায়ার মায়ার প্রভাবে গোপীগণ বহু কৃষ্ণ জানতে পারেননি। তাঁরা জানেন এক কৃষ্ণই আমার কাছে রয়েছেন।

এইভাবে মহাযোগেশ্বর পূর্ণব্রহ্ম সনাতন শ্রীকৃষ্ণের গোপীগণের সঙ্গে আরম্ভ হল তালবদ্ধ এবং গতি বৈচিত্র্যে সমৃদ্ধ রাসলীলা। বৈষ্ণব পদকর্তাগণ এই রাসলীলায় প্রভূত পরিমাণে রসের জোগান দিয়েছেন রাসনৃত্যে শ্রীকৃষ্ণের তালভঙ্গ হওয়ায়। রাধিকার উক্তিঃ—

"কৈ ছে নাচবি, নাচত দেখি, মুরলীতে নহে গান" ॥
রাখালের গাঁথা বনমালা পরি রমণীভুলান নয়।
কঙ্কণের তালে নাচিতে নাচিতে তালছাড়া কেন হয়?"

শ্রীমতীর কথা শুনে শ্রীকৃষ্ণ বলতে লাগলেন—দেখ, আমি ধেনুর রাখাল, আমার তাল মান জ্ঞান কম থাকতে পারে, তোমরা গুণী, হে রাধে এই তালে একবার নাচ; আমি দেখি—দেখো—

"না হবে ভুষণের ধ্বনি না নড়িবে চীর।
দ্রুত গতি চরণে না বাজিবে মঞ্জীর ॥
বিষম সঙ্কট তালে বাজাইব বাঁশী।
ধনু অঙ্ক মাঝে নাচ বুঝিব প্রেয়সী।
এই নৃত্যে যদি তুমি হার,—তবে "হারিলে তোমার লব বেশর কাঁলী।
আর যদি আমি হারি—জিনিলে তোমারে দিব মোহন মুরলী।
কিন্তু যখন—যেমন বলেন শ্যাম নাগর, তেমন নাচেন রাই।
তখন—মুরলী লুকান শ্যাম চারিদেকে চাই।
এবার শ্যামের পালা—' 'শ্যাম' তোমারে নাচতে হবে।'

কিভাবে—না নড়িবে গণ্ডমুণ্ড নূপুরের কড়াই।
না নড়িবে বনমালা বুঝিব বড়াই ॥
না নড়িবে ক্ষুদ্র ঘন্টি শ্রবণের কুণ্ডল।
না নড়িবে নাসার মতি নয়নের পল।
সর্ত— উদ্ভট্ট তালেতে যদি হার বনমালী।
চূড়া বাঁশি কেড়ে লব দিব করতালি ॥
আর, "যদি জিন রাইকে দিব আমরা হব দাসী" ॥

এইভাবে মহানন্দে রাসলীলা চলতে থাকল। ব্রজগোপীগণের গানে ব্রহ্মাণ্ড পরিব্যাপ্ত হল। গোপীগণ ও শ্রীকৃষ্ণ আলো ও ছায়ার ন্যায়, এক ছাড়া অন্য থাকতে পারে না। গোপী ও গোপীনাথের রাসনৃত্য দর্শনে পূর্ণচন্দ্র ও গ্রহণক্ষত্রাদি নিজেদের গতি বিস্মৃত হয়ে নিশ্চল হয়েছিল। এই শ্রীকৃষ্ণ আত্মারাম হয়েও লীলানিমিত্ত রাসক্রীড়া করেছিলেন। এই প্রকারের

রাসলীলা করে শ্রীকৃষ্ণ স্বয়ং যে রাস অনন্তকাল হতে করছেন, তারই এককণা প্রকৃতির সমস্ত বস্তুকে রসময় করছে।

শ্রীমদ্ভাগবতের দশম স্কন্ধের বত্রিশ অধ্যায়ের শেষ শ্লোকে গোপীগণের নিকট শ্রীকৃষ্ণের ঋণ-স্বীকৃতি কৃষ্ণাভিমুখী ভক্তজনের পরম ভরসাস্থল।

"ন পারয়েহহং নিরবদ্য সংযুজাং
স্বসাধুকৃতং বিবুধায়ুষাপি বঃ।
যা মাভজন্ দুর্জরগেহ শৃঙ্খলাঃ
সংবৃশ্চ্য তদ্বঃ প্রতিযাতু সাধুনা ॥"

দুর্জর গৃহশৃঙ্খল নিঃশেষে ভগ্ন করে তোমরা এই যে নিরবদ্যভাবে আমার সঙ্গে মিলিত হয়েছ, আমি দেবতার পরমায়ু পেলেও তার প্রতিদান দিতে পারব না। তোমাদের সাধুকৃত্য তোমাদের সাধুতাতেই সার্থকতা লাভ করুক।

সত্য সত্যই শ্রীকৃষ্ণকে আশ্রয় করে সমস্ত সংসার চক্র ঘূর্ণিয়মান। গোপীগণ অন্তর্মুখ। তাঁদের সকল চক্রের মধ্যবিন্দু শ্রীকৃষ্ণ স্থির। তাই তাঁরা সকল কর্ম করেও, সর্বদা সংসার চক্রে নৃত্য করে ফিরলেও তাঁদের কোন কষ্ট নেই, কেননা তাঁরা সকলেই সকল সময়ে সর্বকার্যের মধ্যে শ্রীকৃষ্ণকেই দেখেন।

"রাসপঞ্চাধ্যায়ের সমাপ্তি শ্লোক ঃ—
"বিক্রীড়িতং ব্রজবধূভিবিদঞ্চ বিষ্ণোঃ
শ্রদ্ধান্বিতো হ নু শৃণুয়াদথ বর্ণ য়েদ যঃ।
ভক্তিং পরাং ভগবতি প্রতিসভ্য রামঃ
হৃদ্রোগমাশ্বপর্হিনোত্যচিরণে ধীরঃ ॥"

যেজন সশ্রদ্ধচিত্তে ব্রজ বধূগণের সঙ্গে মিলিত শ্রীকৃষ্ণের মহারাসলীলা শ্রবণ অথবা বর্ণনা করবেন, সেই ধীর ব্যক্তি অচিরেই শ্রীভগবানে পরাভক্তি প্রাপ্ত হবেন। তাঁব বিবিধ দুর্বাসনাপূর্ণ হৃদরোগ চিরতরে প্রশমিত হবে।

আমরা বহির্মুখ জীব। গোপীগণের ন্যায় তাঁকে সর্বস্ব অর্পণ করে দিতে পারিনা বলেই তাঁর মুখারবিন্দ দেখতে পাই না। কেবল সংসারচক্রে ঘুরে ঘুরে অস্থির হচ্ছি। হে গোপীজন বল্লভ! তোমার বংশীরব কি আমাদের মত হতভাগ্য জনের কর্ণে প্রবেশ করবে না?

অষ্টম অধ্যায়

কীর্তন গান

শ্রীকৃষ্ণপ্রাপ্তির জন্য শ্রীমদ্ভাগবতে নয়টি উপায়ের কথা বলা হয়েছে। তা হল :—

"শ্রবণং কীর্ত্তনং বিষ্ণোঃ স্মরণং পাদসেবনম্।

অর্চনং বন্দনং দাস্যং সখ্যমাত্ম নিবেদনম্ ॥

শ্রবণ, কীর্ত্তণ, বিষ্ণুস্মরণ, পাদ সেবন, অর্চনা, বন্দনা, দাস্য, সখ্য ও আত্মনিবেদনের দ্বারা শ্রীকৃষ্ণ কৃপালাভ করা যায়। অতিপ্রাচীন কাল থেকে ভগবানের নাম, গুণ উচ্চৈঃস্বরে কীর্তনের প্রথা ভারতের সর্বত্র প্রচলিত আছে। কিন্তু বাঙ্গলায় 'কীর্তন' একটি বিশেষ অর্থে বিশেষিত।

কীর্তন শব্দের ব্যুৎপত্তিগত অর্থ প্রশংসা বা কীর্তিসূচক গান। যিনি রূপে, শৌর্যে, জ্ঞানে ও কর্মে শ্রেষ্ঠ তাঁর গুণাবলি সম্বলিত যে গান তাকে কীর্তন বলা হয়। ঈশ্বর সর্বশক্তিমান, পরমান্দস্বরূপ, সকলের আশ্রয়স্থল, তাঁর গুণের সীমা নেই। তাই ঈশ্বরের নাম, গুণ ও যশোকথা আবৃত্তি ও গান কীর্তনের বিশিষ্ট অর্থ। ভক্তও সঠিক 'কীর্তন' শব্দটি এই অর্থেই গ্রহণ করে থাকেন।

কীর্তন গানের ব্যাখ্যা বিভিন্ন পুরাণে ও অন্যান্য ধর্মশাস্ত্রে আলোচিত হয়েছে। শ্রীমদ্ভাগবত পুরাণে—শ্রীকৃষ্ণ বিরহে গোপীকাকুলের সকলে মিলে উচ্চৈঃস্বরে কৃষ্ণনাম কীর্তন করার উল্লেখ আছে। "গায়ন্ত্য উচ্চৈবমেব সংহতা"। উচ্চৈঃস্বরে হরিনাম করার নির্দেশ ব্রহ্মাণ্ড পুরাণেও দেখা যায়। শ্রীরূপগোস্বামী তাঁর ভক্তিরসামৃতসিন্ধুগ্রন্থে বলেছেন, নামলীলা গুণাদিনামুচ্চৈর্ভাষা তু কীর্তনম্। অর্থাৎ (ভগবানের) নামলীলা গুণাদি উচ্চৈঃস্বরে উচ্চারণ হল 'কীর্তন'। জীব গোস্বামী তাঁর 'ভক্তিসন্দর্ভ-গ্রন্থে শুধু নামগানকেই সংকীর্তন বলে উল্লেখ করেছেন। আরও বলেছেন "অত্রচ বহুভির্মিলিত্বা কীর্তনং সঙ্কীর্তনমিত্যুচ্যতে' অর্থাৎ অনেকে একত্র মিলিত হয়ে যে কীর্তন উহাই সংকীর্তন।

সংকীর্তন সম্বন্ধে বৃন্দাবন দাসের চৈতন্য ভগবতে—

"কলিযুগে ধর্ম হয় নাম সংকীর্তন।

এতদর্থে অবতীর্ণ শ্রীশচীনন্দন ;

'চৈতন্যমঙ্গল' গ্রন্থে লোচনদাস বলছেন—

সর্ব্বধর্ম্মসার এই সংকীর্তন ধর্ম্ম।

বিশেষ জানিবে কলিযুগে এই কর্ম্ম ॥"

জয়ানন্দের চৈতন্যমঙ্গলেও "কীর্তন সকল কর্ম্ম কীর্তন সকল ধর্ম

কীর্তন সকল ব্রহ্মজ্ঞান।"

বলা হয়েছে। আর কৃষ্ণদাস কবিরাজ বলেছেন—"নাম সংকীর্তন সব আনন্দস্বরূপ"।

সর্ব সাধারণের মধ্যে কীর্তন মাধ্যমে ভক্তিধর্ম প্রচার করা ছিল শ্রীচৈতন্যের মুখ্য উদ্দেশ্য। একদিন অদ্বৈত আচার্যের সঙ্গে কীর্তন সম্বন্ধে তিনি যা বলেছিলেন—তা বৃন্দাবন দাসের চৈতন্যভাগবতে বিধৃত আছে।

"ঘরে ঘরে করিমু কীর্তন পরচার।

মোর যশে নাচে যেন সকল সংসার।"

তার উত্তরে অদ্বৈত আচার্য মহাপ্রভুকে বলেছিলেন—

"অদ্বৈত বলেন যদি ভক্তি বিলাইবা।
স্ত্রী শূদ্র আদি যত মূর্খেরে সে দিবা।"

আরও বলেছিলেন, "চণ্ডাল নাচুক তোর নাম গুণ গায়্যা।"

শাস্ত্রে বিভিন্ন যুগে বিভিন্ন প্রকারে ভগবানের নামকীর্তন করার বিধান আছে,

'সত্যে যদ্ ধ্যায়তে বিষ্ণুং ত্রেতায়াং যজতে মখৈঃ।
দ্বাপরে পরিচর্যায়াং কলৌ তদ্ধরি কীর্ত্তনাৎ ॥

অর্থাৎ সত্যযুগে ধ্যানে, ত্রেতায় যজ্ঞে, দ্বাপরে পরিচর্য্যাদ্বারা এবং কলিতে হরিকীর্তনে বিষ্ণুর আরাধনা করবে।

"হরের্নাম হরের্নাম হরের্নামৈব কেবলম্।
কলৌ নাস্ত্যেব নাস্ত্যেব নাস্ত্যেব গতিরন্যথা।"

কলিযুগে হরিনাম ছাড়া কোন গতি নাই।

কীর্তনের প্রধানত দুইটি রূপ—১। নামকীর্তন ২। লীলাকীর্তন। এ ছাড়া আছে—সূচক কীর্তন ও বেড়া কীর্তন।

নামকীর্তন—সমবেতভাবে ঈশ্বরের নাম-গুণ-লীলা যশোগান করা হল নামকীর্তন। ভক্তিবাদীদের শাস্ত্রমতে নাম ও নামী অভিন্ন, নামের মধ্যেই নামীর আবির্ভাব ঘটে।

লীলাকীর্তন :—কৃষ্ণের বিভিন্ন লীলাকাহিনী পালাক্রমে গাওয়া হয় লীলা কীর্তনে। এই লীলাকীর্তন গোস্বামী রসশাস্ত্রানুযায়ী পরিবেশিত হয়। গোস্বামী রসতত্ত্ব রূপগোস্বামীর 'উজ্জ্বল নীলমণি' গ্রন্থে বিশেষভাবে আলোচিত, শ্রীকৃষ্ণকে লক্ষ্য করে পারমার্থিক আস্বাদনের নাম রস। লীলাকীর্তন রসের বিলাস মাধ্যমে শ্রীকৃষ্ণের উপভোগকে ফুটিয়ে তোলা হয়। রস সম্পর্কে পুর্বোল্লিখিত অধ্যায়ে আলোচনা করা হয়েছে। উজ্জ্বলরস বা আদিরস বা শৃঙ্গার রসের সংখ্যা চৌষট্টি। তবে চৌষট্টি রসেরই লীলা গান হয় না। এর মধ্যে বিপ্রলম্ভের পূর্বরাগ, মান, প্রেমবৈচিত্ত্য বা আক্ষেপানুরাগ ও প্রবাস এবং সম্ভোগের গোষ্ঠ, রাস, দানলীলা, নৌকাবিলাস, ঝুলন, হোলি, অভিসার, বিপ্রলব্ধা, খণ্ডিতা, কলহান্তরিতা, ও প্রোষিতভর্তৃকা বা মাথুর লীলাকীর্তনে গীত হয়।

সূচককীর্তন—বিশিষ্ট বৈষ্ণব মহাজনের পরলোকগমনকে কেন্দ্র করে তাঁর স্মরণ-মনন-সূচক যে কীর্তন তাকে সূচককীর্তন বলা হয়। এই সূচক কীর্তন সংশ্লিষ্ট মহান্তের তিরোধান তিথিতে সাধারণত গীত হয়ে থাকে। যেমন, শ্রীরামচন্দ্র কবিরাজের সূচক কীর্তন ঃ--

'যেই সঙ্গ সুখ লাগি নরোত্তম অনুরাগী
সকাতরে করেন প্রার্থনা।
সেই রামচন্দ্র কবিরাজ ভ্রাতা শ্রীগোবিন্দ সাথ
অধমে কি করিবে করুণা।"

বেড়া কীর্তন :—পিতৃশ্রাদ্ধ উপলক্ষ্যে চৈতন্যদেব গয়া যান। কৃষ্ণভাব-বিহ্বল চৈতন্যদেব টোল বন্ধ করে ছাত্রদেরকে কীর্তন শেখান। হরি হরয়ে নমঃ কৃষ্ণ যাদবায় নমঃ। তিনি নিজেও ঐ গান গেয়েছিলেন। পড়ুয়ারা চৈতন্যদেবকে বেড় দিয়ে কীর্তন করেছিলেন বলে একে বেড়াকীর্তন বলা হয়। তাছাড়া মহাপ্রভু ভক্তগণকে নীলাচলে কীর্তন করতে করতে জগন্নাথ মন্দির প্রদক্ষিণ করেছিলেন তাই ঐ কীর্তনও বেড়াকীর্তন নামে অভিহিত।

পরবর্তীকালে সংকীর্তনসহ মন্দির পরিক্রমা চলে আসছে।

॥ নীলাচলে কীর্তনগান ॥

মহাপ্রভু নীলাচলে ১৫১৫ খৃষ্টাব্দের মে মাস হতে ১৫৩৩ খৃষ্টাব্দ পর্যন্ত জীবনের শেষ আঠার বৎসর শ্রীরাধাভাব মাধুর্যে বিভোর ছিলেন। কৃষ্ণের সঙ্গে মিলনাকাঙ্ক্ষায় তিনি ভাবোন্মত্ত হয়ে কৃষ্ণবিহ্বল হয়ে পড়তেন। কিন্তু এ অবস্থাতেও তাঁর দৈনন্দিন কীর্তন গান অব্যাহত ছিল।

দক্ষিণ ভারত থেকে চৈতন্যদেবের নীলাচল ফিরে আসার সংবাদ পেয়ে বাংলার ভক্তরা নীলাচল আসার জন্য উদ্‌গ্রীব হয়ে পড়লেন এবং ১৫১৩ খৃষ্টাব্দে রথযাত্রার পূর্বেই নীলাচল এসে পৌঁছোলেন। চৈতন্যদেব প্রত্যেককে যথোপযুক্ত প্রীতিসম্ভাষণ করে গায়ে হাত বুলিয়ে বসালেন। তাঁদেরকে প্রতিবছর রথের সময় নীলাচল আসার নির্দেশও দিলেন। সেই সময় হতে মাত্র দুই বৎসর বাদ দিলে বাংলার ভক্তরা প্রতিবৎসরই রথযাত্রায় আসতেন এবং চাতুর্মাস্য ব্রত চার মাস ধরে পালন করতেন।

প্রথমবার যখন বাংলার ভক্তগণ নীলাচল এলেন তখন চৈতন্যদেব একদিন তাঁদের নিয়ে সন্ধ্যাবেলায় জগন্নাথ মন্দিরে সংকীর্তন আরম্ভ করলেন। আটখানা মৃদঙ্গ ও বত্রিশ জোড়া করতাল বেজে উঠল, চৈতন্যসহ ভক্তগণ মন্দিরকে বেড় দিয়ে প্রদক্ষিণ করলেন। কীর্তনের আনন্দে সর্বদিক মুখরিত হয়ে উঠল।

এরপর আরম্ভ হল বড় সংকীর্তনের আসর। চারটি সম্প্রদায় গঠিত হল। প্রত্যেক সম্প্রদায়ে একজন করে নাচতে লাগলেন। প্রথম দলে অদ্বৈত, দ্বিতীয় দলে নিত্যানন্দ, তৃতীয় দলে বক্রেশ্বর এবং চতুর্থ দলে শ্রীবাস নাচতে লাগলেন। আর চৈতন্যদেব মাঝখানে থেকে কীর্তনানন্দে বিভোর হয়ে গেলেন। নীলাচলবাসীরা অবাক বিস্ময়ে মুগ্ধ হয়ে কীর্তন গান উপভোগ করতে লাগলেন।

এরপর শীঘ্রই রথযাত্রা এসে পড়ল। জগন্নাথ, বলরাম ও সুভদ্রা বিগ্রহকে রথে চড়িয়ে গুণ্ডিচা (বাগান) বাড়ি নিয়ে যাওয়া হবে সেখানে তাঁরা সাতদিন থাকবেন। রাজা প্রতাপরুদ্র বংশপরাম্পরা প্রথানুয়ী ঝাড়ুদারের মত পোষাক পরে সোনার ঝাঁটা নিয়ে রথের সামনের রাস্তা পরিষ্কার করতে লাগলেন। গৌড়ীয় বৈষ্ণবদের নিয়ে শ্রীচৈতন্য রথযাত্রা উপলক্ষ্যে সংকীর্তনের আয়োজন করেছিলেন।

কীর্তনীয়াগণ সাত সম্প্রদায়ে বিভক্ত হল। সংকীর্তন শুরু করার আগে চৈতন্যদেব নিজ হাতে কীর্তনীয়াদের মালা ও চন্দন দিয়ে ভূষিত করলেন। তারপর জগন্নাথের রথ ঘিরে কীর্তন আরম্ভ হল। কীর্তনীয়াগণ সাত সম্প্রদায়ে বিভক্ত হয়ে রথের দু'পাশে দুই সম্প্রদায়, রথের সামনে চারি সম্প্রদায় এবং রথের পিছনে এক সম্প্রদায় থেকে কীর্তন গাইতে লাগলেন।

"জগন্নাথ আগে চারি সম্প্রদায় গায়।
দুই পাশে দুই, পাছে এক সম্প্রদায় ॥
সাত ঠাঞি বুলে প্রভু হরি হরি বুলি।
জয় জগন্নাথ বলে হস্ত যুগ তুলি।" (চৈ. চ. ২/১৩)।

এবার সাত সম্প্রদায়ের পরিচয় দিই। প্রত্যেক সম্প্রদায়ে একজন মূল গায়েন, একজন নর্তক, দুইজন মৃদঙ্গ বাদক ও পাঁচজন পালি দোহার ছিলেন।

প্রথম সম্প্রদায়ে—মূল গায়ক স্বরূপ দামোদর, নর্তক-অদ্বৈতাচার্য, আর পালগায়ক বা দোহার-দামোদর আচার্য, গোবিন্দ দত্ত, রাঘব পণ্ডিত, গোবিন্দানন্দ ঠাকুর ও নারায়ণ পণ্ডিত।

দ্বিতীয় সম্প্রদায়ে— মূল গায়ক-শ্রীবাস, নর্তক-নিত্যানন্দ এবং পালগায়ক-গঙ্গাদাস পণ্ডিত, শ্রীমান পণ্ডিত, শ্রীরাম পণ্ডিত, শুভানন্দ দ্বিজ এবং হরিদাস, (ঠাকুর হরিদাস নয়)।

তৃতীয় সম্প্রদায়ে—মূল গায়েন-মুকুন্দ দত্ত, নর্তক-হরিদাস, পালদোহার-শ্রীকান্ত সেন, বল্লভ সেন, হরিদাস ঠাকুর এবং অপর দুইজন।

চতুর্থ সম্প্রদায়ে—মূল গায়ক-গোবিন্দ ঘোষ, নর্তক-বক্রেশ্বর পণ্ডিত। পালিগায়ক—মাধব ঘোষ, বাসু ঘোষ, রাঘব, বিষ্ণুদাস ও হরিদাস।

উপরোক্ত প্রধান চার সম্প্রদায় ছাড়া ছিলেন পঞ্চম সম্প্রদায়ে কুলীন গ্রামের দল। এই পঞ্চম দলে ছিলেন নর্তক রামানন্দ বসু, শান্তিপুরের ষষ্ঠ দলের নর্তক অদ্বৈত আচার্য-পুত্র অচ্যুতানন্দ ও শ্রীখণ্ডের সপ্তম সম্প্রদায়ের নর্তক ছিলেন নরহরি সরকার ও তাঁর ভাইপো রঘুনন্দন।

কীর্তন গাইতে গাইতে ভাবাবেশে পড়ে গিয়ে আঘাত প্রাপ্ত হন এই আশঙ্কায় তিনটি মণ্ডল করে মহাপ্রভুকে তিনটি মণ্ডল গঠিত হয়। প্রথম মণ্ডলে মহাবলশালী নিত্যানন্দ, দ্বিতীয় মণ্ডলে কাশীশ্বর, গোবিন্দ প্রভৃতি এবং তৃতীয় মণ্ডলে পারিষদসহ স্বয়ং রাজা প্রতাপ রুদ্র।

মহাপ্রভুর নির্দেশে সুকণ্ঠ স্বরূপ দামোদর গান ধরলেন—

"সেইত পরাণ নাথ পাইলুঁ।
যাহা লাগি মদন মোহনে ঝুরি গেঁলু ॥"

গানের তালে তালে হাতভঙ্গি মুদ্রাসহ মহাপ্রভু নাচতে লাগলেন।

"এই ধুয়া উচ্চৈঃস্বরে গায় দামোদর।
আনন্দ মধুর নৃত্য করেন ঈশ্বর।
জগন্নাথে মগ্ন প্রভুর নয়ন হৃদয়।
শ্রীহস্ত যুগলে করে গীতের অভিনয়।।

চৈতন্যদেবের নির্দেশে স্বরূপ দামোদর নয়জন বাছাই করা গায়কনিয়ে নৃত্যরত চৈতন্যদেবের সঙ্গে গেয়ে চললেন। এই নয়জন বিশিষ্ট গায়ক (১) শ্রীবাস পণ্ডিত (২) শ্রীরাম পণ্ডিত (৩) রাঘব পণ্ডিত (৪) গোবিন্দ দত্ত (৫) মুকুন্দ দত্ত (৬) ছোট হরিদাস এবং (৭) গোবিন্দানন্দ। অন্যরা চারপাশ ঘিরে গাইতে লাগলেন। চৈতন্যদেব তাণ্ডব নৃত্যের সঙ্গে জগন্নাথস্তোত্র পাঠ করছিলেন। এইভাবে জগন্নাথের রথ গুণ্ডিচাবাড়িতে প্রবেশ করল। তারপর ন'দিন ধরে এই গুণ্ডিচা মন্দিরের প্রাঙ্গণে সংকীর্তন ও নৃত্যগীত চলল।

খেতুরীতে সংকীর্তন

মুর্শিদাবাদ জেলার বুধরী থেকে পদ্মা পার হলে খেতুরী গ্রাম—অধুনা বাংলাদেশের রাজশাহী জেলায়। খেতরী গড়েরহাট পরগণায়। তাই নরোত্তম ঠাকুর প্রবর্তিত সংকীর্তন ধারার নাম গরাণহাটী। শুভারম্ভ হয় বুধরীতে শ্রীনিবাস আচার্যের আগমনকে স্মরণীয় করার জন্য। এই কীর্তনে মূল গায়েন নরোত্তম, দোহার বায়েন গোকুল, দেবীদাস প্রমুখ।

খেতুরিতে বিগ্রহ প্রতিষ্ঠা উপলক্ষ্যে মহামহোৎসবের আয়োজন হয়েছে এখবর সর্বত্র প্রচারিত। একে একে মহান্তগণ খেতুরীর পথে চলেছেন। খড়দহে নিত্যানন্দপত্নী জাহ্নবাঠাকুরাণী তখন গৌড়ীয় বৈষ্ণবসমাজে শীর্ষস্থানে অধিষ্ঠাতা। তিনি যাঁদেরকে নিয়ে খেতুরী অনুষ্ঠানে বসেছিলেন তাঁরা হলেন—

কৃষ্ণদাস সরখেল মাধব আচার্য।
রঘুপতি বৈদ্য উপাধ্যায় মহা আর্য ॥

শ্রীমীনকেতন, রামদাস মনোহর, কমলাকর পিপ্পলই প্রভৃতি বৈষ্ণবগণ।

শ্রীমুকুন্দদাস বৃন্দাবন আদি করি।
এ সবার সহ সুখে চলয়ে ঈশ্বরী।"

জাহ্নবাদেবী খড়দহ থেকে নৌকাযোগে এলেন সপ্তগ্রাম। সেখান থেকে অম্বিকা, নবদ্বীপ, আকাইহাট দিয়ে এলেন কণ্টকনগর বা কাটোয়ায়। পথে বহু ভক্ত মিলিত হয়ে চললেন। এঁদের মধ্যে প্রধান প্রধান হচ্ছেন নয়ন ভাস্কর, রঘুনাথাচার্য, চৈনত্যদাস, শ্রীপতি, শ্রীনিধি, অচ্যুতানন্দ, গোপাল, কানু পণ্ডিত, নারায়ণ দাস, বিষ্ণুদাসাচার্য, কামদেব, জনার্দন, বনমালী, পুরুষোত্তম প্রমুখ। এছাড়া এসেছিলেন শ্রীরঘুনন্দন, শিবানন্দ, বাণীনাথ, রঘু মিশ্র, কাশীনাথ, নয়নানন্দ, মঙ্গলবৈষ্ণব প্রমুখ। এঁরা সকলেই কাটোয়া এসে যদুনন্দনের অতিথি হলেন।

"উথলিল প্রেমসিন্ধু কন্টকনগরে।
গৌরাঙ্গ প্রাঙ্গণে সবে কীর্ত্তনে বিহরে।।" (ভক্তি রত্নাকর)

এরপর এলেন বুধরীতে। রামচন্দ্র ও গোবিন্দদাস তখন খেতুরী উৎসবের আয়োজন উপলক্ষ্যে উভয়েই খেতুরীতে। বাড়িতে ছিলেন সুনন্দা, মহামায়া, রত্নমালা ও বালক দিব্যসিংহ। জাহ্নবাদেবী এই বিরাট দল নিয়ে গোবিন্দগৃহেই সেদিনের মতো থাকলেন। সুনন্দা ও বধূদের যত্নে সকলেই পরমানন্দ পেলেন। পরদিন তাঁরা পদ্মাতীরে গিয়ে নরোত্তমের খুড়তুতো ভাই সন্তোষদত্ত প্রেরিত নৌকায় উঠে পদ্মাপার হয়ে খেতুরীতে উঠলেন। জাহ্নবাদেবী দোলায় ও অচ্যুতানন্দ প্রমুখ যানারোহণে এবং অনেকে পদব্রজে গিয়ে খেতুরী পথে অগ্রসর হলেন। বৈষ্ণবদের আগমনবার্তা শুনে নরোত্তমসহ অনেকেই এগিয়ে এলেন, তাঁদের দেখে জাহ্নবাদেবী দোলা থেকে নেমে পড়লেন। অচ্যুতানন্দও যান থেকে নামলেন। পথে বিরাট হরিধ্বনির মধ্যে যে প্রণাম অলিঙ্গনের ধুম পড়ে গেল তা অবর্ণনীয়। খেতুরী পৌঁছিলে সকলের জন্য সুব্যবস্থা করা হল।

ফাল্গুনের শুক্লাপঞ্চমীতে উৎসবের শুভারম্ভ হয়েছে। কয়েকদিন ধরেই নৃত্যগীত কীর্তন চলছে। পূর্ণিমায় বিগ্রহগনের প্রতিষ্ঠা দিবস। চতুর্দশীর সন্ধ্যায় খোল করতালের পূজা হল। অসংখ্য খোল করতাল। পূজা করলেন আচার্য্য প্রভু।

গৌর পূর্ণিমা। শ্রীনিবাস আচার্য প্রভু প্রাতঃস্নান করে সন্তোষ দত্তের দেওয়া নববস্ত্র পরিধান করে সকলের অনুমতি নিয়ে মন্দিরে অভিষেক কার্য আরম্ভ করলেন. নরোত্তম স্বরচিত শ্লোকে ছয় বিগ্রহকে প্রণাম করলেন।

"গৌরাঙ্গ বল্লভী কান্ত শ্রীকৃষ্ণ ব্রজমোহন।
রাধারমণ হে রাধে রাধাকান্ত নমস্তুতে ॥"

মহান্তগণের আদেশ নিয়ে কীর্তন আরম্ভ হল। গায়েন নরোত্তম। দেবীদাস, বল্লভদাস, গৌরাঙ্গদাস, গোকুলদাস প্রমুখ বায়েন ও দোহারগণ নিজ নিজ স্থান অধিকার করলেন। যে কীর্তন পরিবেশিত হল তা সত্যই অদ্ভুত।

"এথা সর্বমহান্ত কহয়ে পরস্পরে।
প্রভুর অদ্ভুত সৃষ্টি নরোত্তম দ্বারে ॥
হেন প্রেমময় বাদ্য কভু না শুনিলুঁ।
এহেন গানের প্রথা কভু না দেখিলু ॥"

তাঁরা দেখতে পেলেন স্বয়ং গৌরসুন্দর গণসহ কীর্তনমণ্ডলীতে বিহার করছেন।

শ্রীচৈতন্য সম্বন্ধীয় কীর্তন গান

গৌড়ীয় বৈষ্ণবগণের দৃষ্টিতে শ্রীচৈতন্য স্বয়ং ভগবান। চৈতন্যদেবের জীবিতকালেই তাঁর বিগ্রহ নির্মাণ করে পূজা আরম্ভ হয়েছিল। চৈতন্যভক্তেরা প্রেমভক্তি লাভের আশায়

চৈতন্যকীর্তন করতেন কৃষ্ণকীর্তনের আদলে। বৃন্দাবন হতে গৌরচন্দ্র নীলাচলে ফিরে এসেছেন, একদিন সমবেত ভক্তদের ডেকে অদ্বৈত আচার্য বললেন—

"শুন ভাই সব এক কর সমবায়।
মুখ ভরি গাই আজি শ্রীচৈতন্য রায় ॥ (চৈ ভা. ৩/১০)।

নিজের নাম কীর্তন চৈতন্যদেব একেবারেই পছন্দ করতেন না। তাই তাঁদের ভয়। অথচ অদ্বৈতআচার্য্যের কথা ফেলা যায় না। তাই অদ্বৈতের সঙ্গে সকলে গেয়ে উঠলেন—

"শ্রীচৈতন্য নারায়ণ করুণাসাগর।
দীন দুঃখিতের বন্ধু মোরে দয়া কর ॥

আরও গাইলেন—

"পুলকে রচিত গায় সুখে গড়াগড়ি যায়
দেখরে চৈতন্য অবতার।
বৈকুণ্ঠনায়ক হরি দ্বিজরূপে অবতরি
সঙ্কীর্তনে করেন বিহার।" ইত্যাদি।

কীর্তনের ধ্বনি শুনে চৈতন্য বেরিয়ে এলেন। নীলাচলে কেউ তাঁকে ঈশ্বর বললে অসন্তুষ্ট হতেন, বলতেন—"মুঞি কৃষ্ণদাস বই না বলয়ে আর।" আজ কিন্তু কাউকেও নিষেধ না করে লজ্জায় উঠে গেলেন। ভক্তেরা আজ কীর্তনানন্দে এমন বিভোর হয়েছিলেন যে চৈতন্যদেবকে উঠে যেতে দেখেও কারও মনে আশঙ্কা হল না। এই সংকীর্তনে শুধু বাঙালী ভক্ত নয়, ত্রিপুরা, শ্রীহট্ট, চট্টগ্রাম হতে আগত ভক্তরা চৈতন্যকীর্তন গাইতে লাগলেন।

"জয় জয় শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য বনমালী।
জয় জয় নিজভক্তি রস কুতূহলী ॥
জয় জয় পরম সন্ন্যাসী রূপধারী।
জয় জয় সঙ্কীর্তন রসিক মুরারী ॥" ইত্যাদি।

গৌরাঙ্গ-বিষয়ক পদের আদি রচয়িতা নরহরি সরকার, মুরারী গুপ্ত, শিবানন্দ সেন, বংশীবদন চট্টোপাধ্যায়, রামানন্দ বসু, গোবিন্দ ঘোষ, বাসুদেব ঘোষ, ও প্রেমদাস।

বাংলার ভক্তরা নীলাচল যাওয়ার পথে চৈতন্যদেবের নাম কীর্তন করতে করতে যেতেন। মহাপ্রভুর নির্দেশে নিত্যানন্দ বাংলায় ফিরে এসে ভাগীরথীর দুই তীরে গ্রামে গ্রামে ঘুরে চৈতন্য-কীর্তন প্রচার করতেন। তিনি গাইতেন—

"চৈতন্য সেব চৈতন্য গাও লও চৈতন্য নাম।
চৈতন্যে যে ভক্তি করে সেই মোর প্রাণ ॥

কীর্তন গানের ঘরানা

কীর্তনগানের উৎসভূমি প্রধানতঃ পাঁচটি এবং এই উৎসভূমির পরিপ্রেক্ষিতে এদের নামকরণ। ১। গড়েরহাটী বা গরাণহাটী, ২। মনোহর শাহী, ৩। রেণেটি, ৪। মান্দারণী ও ৫। ঝাড়খণ্ডী।

১। গড়ানহাটী— শ্রীবৃন্দাবনে তৎকালে সঙ্গীতের যথেষ্ট চর্চা ছিল। সঙ্গীতাচার্য তানসেনের গুরুদেব অদ্বিতীয় সঙ্গীতসাধাক শ্রীহরিদাসস্বামী এই সময়ে বৃন্দাবনে ছিলেন। তাঁর নিকট বা তাঁর কোন শিষ্যের নিকট নরোত্তম ঠাকুর সঙ্গীত শিক্ষা করেন। নরোত্তম বৃন্দাবন থেকে জন্মভূমি খেতুরী দর্শন করতে এসে খুড়তত ভাই সন্তোষের অনুরোধে খেতুরীতে কুটীর বেঁধে বাস করেন। তিনি সংসারাশ্রমে প্রবেশ করে নি। ছয় বিগ্রহ প্রতিষ্ঠা উপলক্ষে তিনি খেতুরীতে একটি বৈষ্ণব মহাসম্মেলনের ব্যবস্থা করেন। এর সম্পূর্ণ ব্যয়ভার গ্রহণ করেন

সন্তোষ দত্ত। এই উৎসবের সভানেত্রী ছিলেন নিত্যানন্দ পত্নী জাহ্নবা দেবী। এই সম্মেলনে নরোত্তম কীর্তনগানের যে পদ্ধতি প্রবর্তন করেন তা সমগ্র বৈষ্ণবমণ্ডলী কর্তৃক অনুমোদিত হয়। এই সম্মেলনেই প্রথম প্রণালীবদ্ধ ভাবে গৌরচন্দ্রিকা গানের পর লীলাকীর্তন গানের প্রথা প্রবর্তিত করেন। নরোত্তম যেসুরে রসকীর্তন গান করেছিলেন, খেতুরী গড়েরহাট পরগনার অন্তর্গত বলে পরগনার নামানুসারে সেই সুরের নাম হয় গড়ের হাটী বা গরানহাটী।

২। **মনোহরশাহী** :— বর্ধমান জেলার শ্রীখণ্ডের বৈষ্ণবগোষ্ঠী কাব্য, সঙ্গীত ও নৃত্যচর্চার জন্য বিখ্যাত ছিলেন। এই গোষ্ঠীর প্রতিষ্ঠাতা ছিলেন নরহরি সরকার ঠাকুর। তিনি চৈতন্যদেবের অন্যতম পরিকর এবং শ্রেষ্ঠপদকর্তা। সংগীতে ও নৃত্যে তাঁর বিশেষ দখল ছিল। শ্রীখণ্ড মনোহর শাহী পরগনার অন্তর্গত বলে এই কীর্তনধারার নাম হয় মনোহরশাহী কীর্তন। কাঁদরা, ময়নাডাল ও শ্রীখণ্ড। মনোহরশাহী কীর্তনের তিনটি প্রধান কেন্দ্র হয়ে উঠেছিল।

৩। **রেণেটি**— শ্রীখণ্ডের মত কুলীন গ্রামেও গানবাজনার চর্চা ছিল। কুলীনগ্রামের নিকটস্থ দেবীপুর গ্রামনিবাসী বিখ্যাত পদকর্তা বিপ্রদাস ঘোষ রেণেটী ধারার কীর্তন প্রবর্তন করেন। দেবীপুর রাণীহাটী পরগণায় অবস্থিত বলে এই নাম। রেণেটি ঢঙের সুর, তাল ও ছন্দ সংক্ষিপ্ত।

৪। **মান্দারাণী**—মান্দারণী ঢঙের কীর্তন রেণেটির চেয়েও সহজ সুরের। হুগলী জেলার আরামবাগ মহকুমায় বিখ্যাত পদকর্তা ও কীর্তনীয়া বংশীবদন এই ধারার প্রবর্তক। এতে তালের সংখ্যা মাত্র নয়টি।

৫। **ঝাড়খণ্ডী**—দক্ষিণ পশ্চিম বাংলার প্রত্যন্তে ঝাড়খণ্ডের মধ্যে অবস্থিত শেরগড়ে (পুরুলিয়া জেলা) ঝাড়খণ্ডী কীর্তনের উদ্ভব। বর্ধমান জেলার কড়ুই গ্রাম নিবাসী গোকুলানন্দ শেরগড়ে বসতি স্থাপন করেন। তিনি এই ঝাড়খণ্ডী-কীর্তনধারার প্রবর্তক, এটিও রাঢ়ের প্রাচীন সুর, লোকসঙ্গীতের সুর।

কীর্তনগানের দল বা সম্প্রদায়

কীর্তনদল বা সম্প্রদায় সাধারণতঃ পাঁচজন নিয়ে গঠিত হয়। মূলগায়ক দলপতি। গানের সময় তিনি থাকেন মাঝখানে। তাঁর ডান দিকে থাকেন শির দোহার বা প্রধান দোহার এবং শির মৃদঙ্গবাদক। বাম দিকে থাকেন কোল দোহার ও কোল মৃদঙ্গবাদক। এই পাঁচজন ছাড়া মূলগায়েনের ডানে ও বামে আরও দোহার বা বাদক থাকতে পারেন।

দোহারগণের কাজ—কীর্তনে গানের সূত্র ধরিয়ে দেওয়া, গানে মূল গায়কের অনুসরণ ও সহায়তা করা এবং আসরে সুরের রেশ জমিয়ে রাখা দোহারগণের কাজ। তবে প্রধান দায়িত্ব শির দোহরের। কোল দোহার শির দোহারের নিকট সুর ধরে গান করেন।

কীর্তন গানের ষড়ঙ্গ : —

কীর্তন গানের ছয়টি অঙ্গ। এই ষড়ঙ্গের মধ্যে পাঁচটি প্রধান। যথা—(১) কথা, (২) দোঁহা, (৩) আখর, (৪) তুক, ও (৫) ছুট। অপরটি প্রয়োজনভিত্তিক (৬) ঝুমুর বা ঝুমরী।

১। **কথা**—কীর্তন গানে কীর্তনীয়াগণ একপদ হতে অন্য পদে যাওয়ার সময় 'কথা' ব্যবহার করেন। শ্রীকৃষ্ণের, শ্রীমতী রাধার, বড়াই-এর ও সখিগণের উক্তি-প্রত্যুক্তি, এক গান থেকে অন্য গানের যোগসূত্র স্থাপন, গানের কোন পংক্তির অর্থ বিশদ করে ব্যাখ্যা করার জন্য কথা ব্যবহার করতে হয়।

২। **দোঁহা**—কীর্তনীয়াগণ পদাবলী গাইতে গাইতে হিন্দী দোঁহা, চোপাই, সংস্কৃত শ্লোক বা বৈষ্ণব শাস্ত্রাদি থেকে দুচার পংক্তি আবৃত্তি করে মূল সুরকে অধিকতর রসসমৃদ্ধ করে তোলেন। এইই দোঁহা নামে পরিচিত।

৩। **আখর**—কীর্তনগানের অর্ন্তনিহিত রস আস্বাদনের জন্য আখরের সাহায্য নেওয়া হয়। এই শব্দটি মূলে আরবী ; অর্থ অপর বা পৃথক বা পরবর্তী। প্রসারিত অর্থে এ কীর্তনগানে ব্যবহৃত হয়। কীর্তন গানের মাধুর্য আস্বাদনের জন্য প্রধান সম্বল আখর। কীর্তনে যা অব্যক্ত থাকে আখর দ্বারা তা প্রকাশ করা হয়। আখর কীর্তনের ব্যঞ্জনা।

৪। **তুক**—'তুক' হল অনুপ্রাস ছন্দোময় গাথা। বিশেষ বিশেষ পদের মাঝখানে তুক গাওয়া হয়। কোন কোন তুকে গানের মত কয়েকটি কলি থাকে। এগুলি তুক বা তুক্ক গান নামে পরিচিত।

৫। **ছুট** — ছুট হল কীর্তন গানের এক রকমের হাল্কা চালের গান। গায়কগণ অনেকসময় গোটা গানটি না গেয়ে ছোট তালে পদের অংশ বিশেষ গেয়ে থাকেন। বড় তালের গান গাইতে গাইতে ছোট তাল বা তাল ফেরতা দেওয়ার নাম ছুট।

৬। **ঝুমুর বা ঝুমরী**— নিয়মানুসারে রাধাকৃষ্ণের যুগলমিলন গেয়ে পালা সমাপ্ত হয়। কিন্তু অনেক সময় একাধিক কীর্তনীয়া একই আসরে একই রসের গান গেয়ে থাকেন। এঁরা পরস্পর কীর্তনটি এগিয়ে নিয়ে যান আর শেষ গায়ক কীর্তনটির মিলন গেয়ে সমাপ্ত করেন। পূর্ববর্তী গায়কগণ যেহেতু মিলন গাইতে পাননা অথচ মিলন না গেয়ে আসর ছাড়াও ঠিক নয়, এরূপ ক্ষেত্রে পূর্ববর্তী গায়করা নিজ নিজ গানের শেষে দু একছত্র গান বা ঝুমুর গেয়ে উঠে যান। এইভাবে আসর রাখা হয়। একটি পালা যদি দু'তিন দল মিলে গাইতে হয় তবে পূর্ববর্তী নিয়মানুযায়ী শেষ গায়ক মিলন গেয়ে পালা সমাপ্ত করেন।

গৌরচন্দ্রিকা

শ্রীকৃষ্ণের লীলাকাহিনী গাওয়া হয় বলে কৃষ্ণলীলা গানকে লীলাকীর্তন বলা হয়। লীলাকীর্তনের প্রচলিত প্রথা অনুসারে কৃষ্ণলীলা গাইবার আগে গৌরাঙ্গ-বিষয়ক কীর্তন গাইতে হয়। এই প্রথা খেতুরীর মহামহোৎসবে নরোত্তম চালু করেন। একে বলে গৌরচন্দ্রিকা। কৃষ্ণলীলার যে বিশেষ রসের গান গাওয়া হবে ঠিক সেই রসে রাধাভাবে ভাবিত গৌরাঙ্গের লীলাবিষয়ক পদ গৌরচন্দ্রিকা হিসাবে গাওয়া হয়। এই কারণে মুখবন্ধে গৌর বিষয়ক পদ গান তদুচিত গৌরচন্দ্রিকা বলে পরিচিত।

কীর্তনের প্রথমেই গৌরচন্দ্রিকা গাইবার কারণ প্রথমত, যাঁর অপার করুণায় কলির মায়াবিকারগ্রস্ত জীব লীলাকীর্তন গাইতে শিখল, প্রেমভক্তির পথ চিনল, শ্রীশ্রীরাধাকৃষ্ণ লীলাকীর্তন ও শ্রবণ করবার আকাঙ্খা জাগল, তাঁকে লীলাকীর্তনের প্রারম্ভে প্রণাম বন্দনা ও কৃতজ্ঞতা প্রদর্শন অবশ্য কর্তব্য। দ্বিতীয়তঃ, গৌরচন্দ্র বাদ দিয়ে শুধু লীলাকীর্তন গাওয়া আর প্রাণপ্রতিষ্ঠা না করে প্রতিমা পূজা একই প্রকার। তৃতীয়তঃ, কোন রসাশ্রিত পদে গৌরচন্দ্রিকা গাওয়া হচ্ছে শুনলেই শ্রোতা বুঝতে পারেন, কোন্ লীলাকীর্তন গাওয়া হবে। এছাড়া গৌরচন্দ্রিকার পিছনে গভীর তাত্ত্বিক যুক্তিও আছে। রাধাকৃষ্ণ প্রেমলীলার যে অপ্রাকৃত অর্থ আছে, একমাত্র চৈতন্যদেবের লীলাতেই তার সার্থক প্রকাশ হয়েছে। রাধা, কৃষ্ণ হতে পৃথক নন, তিনি কৃষ্ণেরই হ্লাদিনী শক্তি। অতএব কৃষ্ণ ও রাধার মিলনে আনন্দস্বরূপ অদ্বয়ে স্থিতিলাভ করে। এই নিগূঢ় প্রেমতত্ত্ব পরিষ্কারভাবে চৈতন্যদেবের মধ্যে পরিস্ফুট। কেননা, তিনি একদেহে যুগপৎ কৃষ্ণও রাধার অবতার। অন্তরে যিনি অদ্বয় কৃষ্ণ, বাহিরেও তিনি রাধাভাবে কৃষ্ণ প্রেম বিহ্বল। সুতরাং চৈতন্যদেবের রাধাভাব অপ্রাকৃত বৃন্দাবনে কৃষ্ণপ্রেম উপলব্ধির সোপানস্বরূপ।

বিভিন্ন প্রকৃতির মানুষের কৃষ্ণ রসাস্বাদনের ধারাও বিভিন্ন। এই প্রকৃতিভেদে রসাস্বাদনও বিভিন্ন। অলংকার শাস্ত্রে নয়'প্রকার রসের উল্লেখ আছে। আদি, বীর, করুণ, অদ্ভুত, হাস্য,

ভয়ানক, বীভৎস, রৌদ্র ও শান্ত। এ ছাড়া বৈষ্ণব শাস্ত্রে পাঁচটি রসের কথা বলা হয়, শান্ত, দাস্য, সখ্য, বাৎসল্য ও মধুর। এর মধ্যে চারিটি রস যথা—দাস্য, সখ্য, বাৎসল্য ও মধুর রসের মাধ্যমে পারমার্থিক আস্বাদনের বিষয় শ্রীকৃষ্ণকে অধিকারীভেদে ভিন্ন ভিন্ন ভাবে আস্বাদন করা হয়। শান্তরসকে রসগণনায় ধরা হয় না। তবে একথা সত্য যে চিত্ত স্থির, প্রশান্ত ও অপ্রমত্ত না হলে অধিকারীর মুখ্য রসে প্রবেশাধিকার লাভ ঘটে না। সংসারের অনিত্যতা সম্বন্ধে বুদ্ধি স্থির হলে এবং অনাসক্তি ও বৈরাগ্য এসে মনকে অধিকার করলে ভক্ত শান্ত রসের অধিকারী হয়ে নিজ অধিকার অনুযায়ী মুখ্য রসে প্রবেশ করতে পারে। গৌরচন্দ্রিকা সম্বন্ধে একই কথা প্রযোজ্য।

দাস্য, সখ্য, বাৎসল্য ও মধুর এই চারিটি রসের মধ্যে মধুর রসই সমধিক আস্বাদ্য।

শ্রীশ্রীরাধাকৃষ্ণের অষ্টকালীন লীলা

সময় নির্ঘণ্ট : ১ দণ্ড = ২৪ মিনিট, সাড়ে ৭ দণ্ডে একপ্রহর বা তিন ঘণ্টা। আট প্রহরে দিবা রাত্র। দুই দণ্ডে এক মুহূর্ত। অষ্টকাল বলতে নিশান্ত, প্রাতঃ, পূর্বাহ্ন, মধ্যাহ্ন, অপরাহ্ন, সায়ং, প্রদোষ ও রাত্রি বোঝায়।

১। নিশান্ত	৭।। দণ্ড	অর্থাৎ ৩ ঘন্টা
২। প্রাতঃ	৫ দণ্ড	অর্থাৎ ২ ঘন্টা
৩। পূর্বাহ্ন	৭।। দণ্ড	অর্থাৎ ৩ ঘন্টা
৪। মধ্যাহ্ন	১০ দণ্ড	অর্থাৎ ৪ ঘন্টা
৫। অপরাহ্ন	৭।। দণ্ড	অর্থাৎ ৩ ঘন্টা
৬। সায়ং	৫ দণ্ড	অর্থাৎ ২ ঘন্টা
৭। প্রদোষ	৭।। দণ্ড	অর্থাৎ ৩ ঘন্টা
৮। রাত্রি	১০ দণ্ড	অর্থাৎ ৪ ঘন্টা
	৬০ দণ্ড =	২৪ ঘন্টা

রাধাকৃষ্ণ লীলারহস্য যদিও অতিগোপনীয় তবুও শ্রীবৃন্দাদূতী মহর্ষি নারদের নিকট ব্যক্ত করলেন।

"রহস্যং ত্বাং প্রবক্ষ্যামি কৃষ্ণভক্তোহসি নারদ !
ন প্রকাশ্যং ত্বয়া হ্যেতদ্ গুহ্যাদ্‌গুহ্য তরং মহৎ ॥"

১। **নিশান্তলীলা**— বৃন্দাবনের অতিশয় রমণীয় কুঞ্জভূষিত কল্পবৃক্ষসম নিকুঞ্জে দিব্যরত্নময় গৃহে শ্রীরাধাকৃষ্ণ পরস্পর নিবিড়ালিঙ্গিত হয়ে শয্যায় নিদ্রিত থাকেন। শ্রীবৃন্দাদেবীর আজ্ঞাবাহী পক্ষিগণের জাগরণ প্রচেষ্টা ব্যর্থ হয়। কেননা, রাধাকৃষ্ণ গাঢ়ালিঙ্গন বন্ধ ছেদ করে শয্যা হতে সমুত্থান করতে মোটেই ইচ্ছা করেন না। পরে শুকসারিকাগণের বিবিধ ধ্বনি শ্রবণে জাগরিত হয়ে রাধাকৃষ্ণ শয্যা হতে সমুত্থিত হয়ে ঐ শয্যায় আনন্দ সহকারে উপবেশন করেন। তখন সখী সকলে কুঞ্জে প্রবেশ করে উভয়ের তৎকালোচিত সেবা করেন। পুনরায় শারিকাগণের রবে চমকিত হয়ে ভীতি ও উৎকণ্ঠাজনিত আকুলিত চিত্তে নিজ নিজ ভবনে গমন করেন।

প্রাতঃলীলা—প্রাতঃকালে মা যশোদা কর্তৃক প্রবোধিত হয়ে শয্যাত্যাগ করে বলরামসহ দন্তমার্জন করেন এবং মায়ের আদেশে গোদোহনের জন্য গোশালায় যান। এদিকে শ্রীরাধাও বৃদ্ধা এবং সখীগণ কর্তৃক জাগরিত হয়ে দন্তমার্জন করেন এবং সুগন্ধি তৈলাদি দ্বারা অঙ্গ মর্দন করে স্নান বেদীতে যান। ললিতাদি সখীরা তাঁকে দিব্যভূষণে এবং দিব্য মাল্যাদি দ্বারা ভূষিত করেন। অনন্তর যশোদা স্বীয় জন দ্বারা শ্রীরাধার শ্বশ্রূকে সৎপ্রার্থনা করে পাকনিমিত্ত

সসখী রাধিকাকে সত্বর আহ্বান করেন। এখন প্রশ্ন উঠতে পারে পাক কর্মে সুনিপুণা শ্রীরোহিণী প্রমুখা রমণীগণ থাকা সত্ত্বেও যশোদা রাধাকে আহ্বান করলেন কেন? এর উত্তরে বলা যায়, দুর্বাসার বরে রাধার পাক করা অন্নব্যঞ্জন স্বাদুতাগুণে অমৃতকেও পরাস্ত করে এবং ভোজনকারী দীর্ঘায়ু হয়। বৎস শ্রীকৃষ্ণের পরমায়ু বৃদ্ধির কামনায় যশোদা রাধাকে পাক করার জন্য আহ্বান করেন। শ্রীকৃষ্ণ নিজে কতিপয় গাভী দোহন করে এবং অবশিষ্ট অন্য সখাদ্বারা দোহন করিয়ে সখাগণ পরিবৃত হয়ে গৃহে ফিরে আসেন। দাসগণ তৈলমর্দন পূর্বক শ্রীকৃষ্ণকে স্নান করিয়ে তাঁর অঙ্গে ধৌত বস্ত্রাদি দেন। এছাড়া কঙ্কণ, কেয়ূড়, কুণ্ডল প্রভৃতি বহুমূল্য রত্নালঙ্কারে কৃষ্ণদেহ সজ্জিত করেন। কপালে চন্দ্রাকারে রচিত তিলক শোভা পায়। বেশাদি সমাপ্ত হলে বলরাম ও অন্যান্য সখাদি সহ ভোজনালয়ে যান এবং সখাগণ সহ হাস্যপরিহাস মধ্যে ভোজন সমাপ্ত করেন। অনন্তর মুখ ধৌত করে অল্প সময় দিব্য খট্টোপরি বিশ্রাম করেন। সেবকদের দেওয়া তাম্বুল সখাদের মধ্যে ভাগ করে দেন এবং নিজেও খান। শ্রীরাধাও শ্রীকৃষ্ণের ভোজন দর্শনে প্রভূত আনন্দ পান। অতঃপর যশোদা কর্তৃক আহূতা হয়ে ললিতাদি সখীগণসহ লজ্জা সহকারে শ্রীরাধা ভোজন করেন।

৩। **পূর্বাহ্নলীলা** : — শ্রীকৃষ্ণ গোপবেশে ধেনুবৃন্দকে আগে করে বনে গোচারণে যান। সমস্ত ব্রজবাসী, ব্রজনারী, পিতামাতা সকলে অনুধাবন করেন। শ্রীকৃষ্ণ সকলকে প্রণাম, নমস্কার, প্রিয়ভাষণ দ্বারা তৃপ্ত করে সকলকে গৃহে পাঠিয়ে বনে গমন করেন। বনে প্রবেশ করে সখাগণের সঙ্গে কিছুক্ষণ ক্রীড়া করে তাদেরকে বঞ্চনা করে দু তিন জন প্রিয়সখা সহ শ্রীরাধার দর্শননির্মিত্ত উৎকণ্ঠিত চিত্তে সঙ্কেত স্থানে গমন করেন। শ্রীরাধাও কৃষ্ণ বনে গমন করলে তাঁকে দেখে গৃহে আগমন করেন এবং সূর্য পূজা ও কুসুমাদি আহরণছলে গুরুজনদের বঞ্চনা করে শ্রীকৃষ্ণসহ মিলনের জন্য বনে গমন করেন।

৪। **মধ্যাহ্নলীলা** : — বহু যত্ন প্রয়াসে রাধাকৃষ্ণ মিলিত হন এবং নিজগণে আবৃত হয়ে আনন্দ সহকারে সেই কুণ্ডারণ্যে বিবিধ বিহারে বিশেষ ক্রীড়া করেন। কখন কখন কোন স্থানে উভয়ে দোলায় সমারূঢ় হলে সখীগণ তাঁদেরকে দোল দেয়। শ্রীকৃষ্ণের হস্তধৃত বেণু রাধা চুরি করলে শ্রীকৃষ্ণ হৃতসর্বস্ব ব্যক্তির ন্যায় অতীব মনোদুঃখে অবস্থান করেন। সখীগণও তাঁকে ঠাট্টা বিদ্রূপ করতে ছাড়ে না। বসন্ত বাতাসে আনন্দিত রাধাকৃষ্ণ ও সখাগণ কুঙ্কুম চন্দনাদি সিক্ত জলসেচনে পরম আনন্দ পান। ক্রীড়ায় শ্রান্ত হয়ে কোন স্থানে বৃক্ষমূলে বসে অতিশয় মধুপান করেন। মধুমত্ত হয়ে নিদ্রায় নিমিলিত নয়নে রমণেচ্ছু হয়ে স্খলিত পদে কুঞ্জে প্রবেশ করেন। সখীগণ মধুমত্ত হয়ে ক্রীড়াকুঞ্জের চতুর্দিকে অবস্থিত কুঞ্জসমূহে লীন হয়ে যান। শ্রীকৃষ্ণ মাধুর্যময়ী লীলাশক্তির প্রভাবে পৃথক পৃথক হয়ে গোপীদের সঙ্গে বিহার করেন। সগণ শ্রীরাধাকৃষ্ণ পরস্পর জল সেচন লীলায় শ্রীরাধাকুণ্ডের সরোবরে ক্রীড়া করেন। তদনন্তর, বসন, মাল্য, চন্দন ও দিব্যভূষণে ভূষিত হন। অনন্তর সেই সরোবরতীরে দিব্য রত্নময় গৃহে বৃন্দাদেবী কর্তৃক সমর্পিত ফলমূলসমূহ ভোজন করেন। শ্রীকৃষ্ণ প্রথমে শ্রীরাধার পরিবেশিত ফলমূল ভোজন করে পুষ্পশোভিত শয্যায় গমন করেন এবং দুই তিন জন সখী কর্তৃক সেবিত হন। শ্রীকৃষ্ণ শয়ন করলে তদনন্তর সগণা শ্রীরাধাও আনন্দ সহকারে কৃষ্ণউচ্ছিষ্ট ভোজন করতে বসেন, কিন্তু কৃষ্ণদর্শনাভিলাষিণী রাধা দ্রুত কিছু ভোজন করে কৃষ্ণ মুখচন্দ্র দর্শন নিমিত্ত অতিবেগে শয়ন মন্দিরে প্রবেশ করে। ঐ শয়ন মন্দিরে অবস্থিত সখীগণ কৃষ্ণের চর্বিত তাম্বুল রাধাকে দেন। তিনিও সখীদের মধ্যে উক্ত চর্বিত তাম্বুল ভাগ করে দিয়ে নিজেও খান। শ্রীকৃষ্ণ সখীদের ও রাধার আলাপ শুনবার জন্য নিদ্রিত ব্যক্তির ন্যায় কপট নিদ্রা আশ্রয় করে নিদ্রিত ব্যক্তির ন্যায় বস্ত্রাবৃত হয়ে থাকেন। কিন্তু কৃষ্ণের কপট নিদ্রা ধরা পড়ে যায় এবং ঠাট্টা তামাসা চলে। তারপর হাব, চুম্বন, আলিঙ্গন ও পরিচ্ছদকে পণ রেখে

চলে পাশা খেলা। খেলায় শ্রীরাধা কৃষ্ণকে পরাজিত করলেও শ্রীকৃষ্ণ স্বীকার করেন না। তখন রাধা কর্ণোৎপল ও লীলাকমল দ্বারা শ্রীকৃষ্ণকে মৃদু প্রহার করেন। তদনন্তর শ্রীরাধাকৃষ্ণ শারী শুকগণের পরস্পর বাগ্‌যুদ্ধ শ্রবণ করে গৃহগমন মানসে সেখান হতে নির্গত হন। শ্রীকৃষ্ণ রাধাকে জানিয়ে গাভীগণের অভিমুখে গমন করেন। শ্রীরাধা কিন্তু সখীগণ সহ সূর্যমন্দিরে সূর্য পূজা করতে যান। মন্দিরে পুরোহিত বেশধারী কৃষ্ণকে রাধা চিনে ফেলেন— চলে কৌতুক তামাসা। এইভাবে সার্দ্ধ দুই যাম কাল বিহার করে শ্রীরাধা সখীসহ গৃহে যান। শ্রীকৃষ্ণও গাভীগণের অভিমুখে গমন করেন।

৫। **অপরাহ্নলীলা** : — অপরাহ্নে শ্রীকৃষ্ণ সখাগণের সঙ্গে মিলিত হয়ে এবং উত্তাল মুরলীরবে গাভীদের আহ্বান করে ব্রজে আনয়ন করেন। আগমনকালে শ্রীকৃষ্ণের বেণুরব শুনে এবং গোধূলি সমূহে ব্যাপ্ত অকোশ দেখে নন্দ ও অপরাপর গোপগণ এবং স্ত্রী বালকাদি সকালেই সর্বকর্ম বিসর্জন দিয়ে শ্রীকৃষ্ণদর্শনে সমুৎকুণ্ঠিত হয়ে তদভিমুখে গমন করেন। শ্রীরাধাও গৃহে এসে স্নান করে সখী সংঘে মিলিত হন। শ্রীরাধা প্রভৃতি কান্তাগণ কান্ত দর্শনার্থ সমুৎকণ্ঠিত হয়ে শ্রীকৃষ্ণসমীপে উপস্থিত হন। শ্রীকৃষ্ণ সমাগত ব্যক্তিগণের প্রতি যথাক্রমে দর্শন, স্পর্শন, ও স্মিতঅবলোকন দ্বারা পরিতুষ্ট করেন। এইভাবে শ্রীকৃষ্ণ ব্রজবাসীগণ কর্তৃক যথাযোগ্য আদৃত হন। তারপর তিনি গোশালায় গাভীদিগকে প্রবেশ করিয়ে মাতা ও পিতার অনুরোধে শ্রীবলরামসহ নিজালয়ে গমন করেন। তথায় স্নান, পান ও কিঞ্চিৎ ভোজন করে জননীর নির্দেশে গোদোহন করতে গোশালায় যান।

৬। **সায়ংলীলা** : — শ্রীকৃষ্ণ সেই সকল গাভীদের দোহন করে এবং অন্যদ্বারা দোহন করিয়ে এবং কতিপয় গাভীকে জলপান করিয়ে পিতার সঙ্গে গৃহে গমন করেন। গৃহে আগমনকালে তাঁর পশ্চাৎ পশ্চাৎ শত শত দুগ্ধভারবাহীরা থাকেন। শ্রীকৃষ্ণ গৃহে এসে মাতৃবৃন্দ, তাঁদের পুত্রবৃন্দ ও বলদেবসহ চর্ব্য চুষ্যাদি বিবিধ অন্ন ভোজন করেন।

৭। **প্রদোষলীলা** : — শ্রীযশোদার প্রার্থনার পূর্বেই শ্রীরাধা শ্রীকৃষ্ণের ভোজন সময়ে সখীদ্বারা পক্কান্নসমূহ শ্রীকৃষ্ণালয়ে প্রেরণ করেন। শ্রীকৃষ্ণ সেই সকল পদার্থকে প্রশংসা করতে করতে ভোজন করেন ও সখাদের সঙ্গে সভাগৃহে গমন করলে বন্দীগণ তাঁর সেবা করেন। রাধার যে সখীরা পক্কান্ন নিয়ে নন্দালয়ে সমাগতা হন, তাঁদের হাতেই শ্রীরাধা প্রভৃতির জন্য শ্রীযশোদা বহু পক্কান্ন দান করেন। ধনিষ্ঠাসখী গোপনভাবে শ্রীকৃষ্ণের অধরামৃত তাঁদের হাতে দেন। তাঁরা তা শ্রীরাধিকাকে নিবেদন করেন। শ্রীরাধাও সখীগণসহ সেই সকল অন্নভোজন করেন। ভোজনান্তে আনন্দ সহকারে অভিসার করতে সমুদ্যত হলে সখীগণ তাঁকে বিভূষিত করেন। তিনি শ্রীকৃষ্ণকে সঙ্কেত দিতে এক সখীকে নন্দালয়ে প্রেরণ করেন। উক্ত সখী শ্রীকৃষ্ণকে সংকেত স্থান জানিয়ে শ্রীরাধাকে যমুনার সমীপে অভিসার করান। শ্রীরাধা শুক্ল কৃষ্ণ নিশাযোগ্য বেশ ধারণ করে সখীসহ এই বৃন্দাবনে কল্পবৃক্ষ নিকুঞ্জে দিব্য রত্নময় গৃহে আগমন করেন। শ্রীকৃষ্ণও সভাগৃহে বিবিধ কৌতুক দেখে এবং মনোজ্ঞ কবিতা ও গীত শ্রবণ করে তাদেরকে যথা বিধানে ধনধ্যান্যাদি দ্বারা আপ্যায়িত করে মাতাকর্তৃক আহূত হয়ে শয়ন গৃহে আগমন করেন। মাতা তাঁকে ভোজন করিয়ে প্রস্থান করলে সেই গৃহ হতে অলক্ষ্যে শ্রীরাধার সঙ্কেত স্থানে গমন করেন।

৮। **রাত্রিলীলা** : — শ্রীরাধাকৃষ্ণ মিলিত হয়ে বনরাজিতে শোভিত কুঞ্জে হাস্য, নৃত্য ও গান পূর্বক বিবিধ বিহারে ক্রীড়া করেন। এইরূপ বিহারবশতঃ রাত্রির সার্ধদ্বয় যাম অতীত হলে তাঁরা শয়ন ইচ্ছায় পাঁচ ছয় জন সখীসঙ্গে অলক্ষিতভাবে কুঞ্জে প্রবেশ করেন। প্রিয় সখীগণ কর্তৃক বৃন্তরহিত কুসুমরাশিতে রচিত কুসুমশয্যায় শ্রীরাধাকৃষ্ণ শয়ন করেন।

তৃতীয় পর্ব

নবম অধ্যায়

বৈষ্ণবীয় ক্রিয়াপদ্ধতি

দীক্ষা ॥ গুরু ॥

১। "গকার : সিদ্ধিদঃ প্রোক্তো রেফঃ পাপস্য দাহকঃ'
উকারঃ শম্ভুরিত্যুক্ত স্ত্রিতয়াত্মা গুরুঃ স্মৃতঃ" (রুদ্রযামল)

অর্থঃ—গ কার সিদ্ধি প্রদান করে থাকে, রেফ পাপাদি দাহ্ করে থাকে এবং উকার শম্ভু বলে উক্ত হয়।

২। 'গ' কারাজজ্ঞান সম্পত্তি রেফঃ পাপস্য দাহকঃ
উ কারাচ্ছিব তাদাত্ম্যং দদ্যাদিতি গুরুস্মৃতঃ" — তন্ত্রার্ণব।

গ কার হতে জ্ঞান সম্পত্তি বৃদ্ধি পায়, রেফ পাপদাহক, এবং 'উ'কার শিবত্ববোধক।

৩। 'গুশব্দস্তন্ধকারঃ স্যাদ্রুশব্দস্তন্নিবোধকঃ।
অন্ধকার নিরোধিত্বাদ্ গুরুরিত্যভিধীয়তে"

'গু' শব্দ অন্ধকার এবং 'রু' শব্দ অন্ধকার নিরোধক। এতে গুরু শব্দ দ্বারা এটাই প্রতিপন্ন হচ্ছে যে যিনি অন্তরের অজ্ঞান বিনাশ করে থাকেন তিনিই গুরুদেব।

৪। 'অজ্ঞান তিমিরান্ধস্য জ্ঞানাঞ্জন শলাকয়া।
চক্ষুরুন্মীলিতং যেন তস্মৈ শ্রীগুরবে নমঃ ॥'

অজ্ঞানরূপ তিমিরকে যিনি জ্ঞানরূপ অঞ্জন দ্বারা চক্ষু উন্মীলিত করে দেন, সেইরূপ গুরুকে নমস্কার কবি।

উপরোক্ত শ্লোকগুলিতে গুরুর মোটামুটিভাবে ব্যাখ্যা করা হল। দীক্ষা গ্রহণ না করলে জীবাত্মার মঙ্গলগ্রন্থি পরিধান করা হয় না। তাই সদ্ গুরুর নিকট দীক্ষা গ্রহণ করা কর্তব্য। এখন সদ্‌গুরু কাকে বলে দেখা যাক।

"শান্তো দান্তঃ কুলীনশ্চ বিনীতঃ শুদ্ধ বেশবান্।
শুদ্ধাচারঃ সুপ্রতিষ্ঠঃ শুচির্দ্দক্ষ সুবুদ্ধিমান ॥"
আশ্রমী ধ্যাননিষ্ঠশ্চ তন্ত্রমন্ত্র বিশারদঃ।
নিগ্রহানুগ্রহে শক্তো গুরু রিত্যাভিধীয়তে ॥
উদ্ধর্ত্তুঞ্চৈব সংহর্ত্তুং সমর্থো ব্রাহ্মণোত্তমঃ।
তপস্বী সত্যবাদী চ গৃহস্থো গুরু রুচ্যতে ॥"

অর্থাৎ যিনি শান্ত, দান্ত (শ্রবণাদি বিষয়াতিরিক্ত বিষয় হতে বাহ্য দশ ইন্দ্রিয়ের নিগ্রহবান, কুলীন (আচার, বিনয়, বিদ্যা, প্রতিষ্ঠা, তীর্থ দর্শন, নিষ্ঠা, শান্তি, তপঃ এই নবলক্ষণ বিশিষ্ট; বিনীত শুদ্ধ বেশসম্পন্ন বিশুদ্ধাচার, সুপ্রতিষ্ঠ (সৎকার্যাদির দ্বারা যশস্বী) পবিত্র স্বভাব, ক্রিয়ানিপুণ, সুবুদ্ধিসম্পন্ন, গৃহস্থাদি আশ্রমস্থিত, ঈশ্বর-ধ্যানপরায়ণ তন্ত্রমন্ত্র বিষয়ে পণ্ডিত এবং মন্ত্রদান ও ক্রিয়া দর্শিয়ে শিক্ষা দিয়ে সংসার ত্রাণ করতে সমর্থ এবং পাপাদি সংহারকরণ

ক্ষম, তাদৃশ ব্যক্তিই গুরুপদের যোগ্য। তপঃসম্পন্ন সত্যবাদী গৃহস্থগণই গুরু বলে অভিহিত। আর

"অভিশপ্তমপুত্রঞ্চ কদর্যং কিতবং তথা।
ত্রিয়াহীনং শঠঞ্চাপি বামনং গুরু নিন্দকম্ ॥"

অর্থাৎ যে ব্যক্তি অভিশাপগ্রস্ত, পুত্রহীন, কুৎসিতাকৃতি, ধূর্ত, সৎক্রিয়াবিহীন, শঠ, বামন, গুরুনিন্দুক, জন্মদোষী, রক্তবিকারী এবং সর্বদা মাৎসর্য্যযুক্ত, তাদৃশ ব্যক্তিকে গুরু করবে না।

শিষ্যের লক্ষণ :— "শান্তো বিনীতঃ শুদ্ধাত্মা শ্রদ্ধাবান্ ধারণ ক্ষমঃ।
সমর্থশ্চ কুলীনশ্চ প্রাজ্ঞঃ সচ্চরিতো যতিঃ ॥"

অর্থাৎ শমাদিগুণযুক্ত, বিনয়ী, শুদ্ধস্বভাব, শ্রদ্ধাবান, ধৈর্যশীল, সর্বকর্ম-সমর্থ, সদ্বংশজাত, অভিজ্ঞ, সচ্চরিত্র এবং যতি আচারযুক্ত ব্যক্তিশিষ্যপদবাচ্য। এর বিপরীত আচারযুক্ত ব্যক্তি শিষ্যপদ বাচ্য নয়।

বৈষ্ণবের লক্ষণ :— "তিলকং তুলসীমাল্যং শিখা কোপিন বহির্বাস।
হরের্নাম সদামুখে বৈষ্ণব-পঞ্চ লক্ষণম্।।"

অর্থাৎ তিলক, তুলসীমালা, শিখা, কৌপিন ও বর্হিবাসধারী এবং সর্বদা মুখে হরিনামকারী ব্যক্তি বৈষ্ণব।

॥ দীক্ষা ॥

দীক্ষা কাকে বলে— "দীয়ন্তে জ্ঞানমত্যন্তং ক্ষীয়তে পাপসঞ্চয়ঃ।
তস্মাদ্ দীক্ষেতি সাপ্রোক্তা মুনিভির্স্তত্ত্ব দর্শিভিঃ ॥
দিব্যজ্ঞানং যতো দদ্যাৎ কৃত্যা পাপস্য সংক্ষয়ম্।
তস্মাদীক্ষেতি সাপ্রোক্তা মুনিভির্স্তত্ত্ব দর্শিভিঃ ॥"—যামল

অর্থাৎ যে কার্য পাপক্ষয় করে, দিব্যজ্ঞান প্রকাশ করে তাই-ই দীক্ষা। প্রকৃতপক্ষে দীক্ষার অর্থ বর্ণ বা শব্দবিশেষ শ্রবণ করা নয়। বর্ণ বা বর্ণগুলি শব্দব্রহ্ম বা নাদব্রহ্ম বলে পরিকীর্তিত। সেই শব্দব্রহ্ম বা নাদব্রহ্মই বর্ণ। সেই বর্ণই ভগবানের নাম। নাম ও নামী অভেদ। যিনি নামকে এবং মন্ত্র ও মন্ত্রের দেবতাকে এক ভাবেন, তিনি প্রকৃত দীক্ষিত। দীক্ষামন্ত্র গ্রহণ করলে শব্দব্রহ্ম এবং নাদব্রহ্ম অভীষ্ট দেবতার জ্যোতির্ময় রূপ অন্তঃকরণে উদিত হয়। যাদের হৃদয়ের অন্ধকার দূর না হয় এবং হৃদয়ে নিজ ইষ্ট দেবতার ভাব উদ্দীপন না হয় তবে সেইরূপ মন্ত্র বা দীক্ষা গ্রহণ করে, দীক্ষা বা মন্ত্রগ্রহণ শব্দ প্রয়োগ না করাই ভাল। দৃঢ়বিশ্বাস বা ভক্তিই মূল।

দীক্ষাগ্রহণের আবশ্যকতা : —"বিনা দীক্ষাং হি পূজায়াং নাধিকারোহস্তি কস্যাচিৎ।"
(হরিভক্তি বিলাস ২/২)

অর্থাৎ দীক্ষা গ্রহণ না করলে কারও পূজায় অধিকার জন্মায় না।

"তেনরাঃ পশবো লোকে কিং তেষাং জীবনে ফলম্।
যেনলব্ধ হরের্দীক্ষা নার্চ্চিতো বা জনার্দ্দনঃ ॥" (স্কন্দ পুরাণ ৩য় শ্লোক।)

অর্থাৎ যারা শ্রীবিষ্ণু-দীক্ষা গ্রহণ করেনি এ জগতে তারাই পশু, তাদের জীবনধারণে কি ফল? তাছাড়া,

"অদীক্ষিতস্য মরণে প্রেতত্বং ন চ মুঞ্চতি।।" (শব্দ কপলদ্রুম)

অর্থাৎ দীক্ষাগ্রহণ না করে মৃত্যু হলে প্রেতযোনিত্ব ঘুচে না।

মালাতত্ত্ব : — মালা শব্দের অর্থ :

'মা "ধাতুরাদ্দিষ্টো 'লা' দানে হরিবল্লভে।
ভক্তেভ্যশ্চ সমস্তেব্যস্তেন মা নিসদ্য গে।।" (স্কন্দপুরাণ)

অর্থাৎ 'মা' শব্দে অভীষ্টফল মুক্তিকে বুঝায়।
'লা' শব্দেতে দান করা দাতা ধরা যায়।।
অতএব মালা অর্থে বুঝহ সন্ধান।
সর্বাভীষ্ট ফলদাতা সেই ভগবান।।"

তুলসীমালা ধারণের আবশ্যকতা : --

"ধারয়ন্তি ন যে মালাং হৈতুকাঃ পাপবুদ্ধয়ঃ।
নরকান্ন নিবর্ত্তন্তে দগ্ধাঃ কোপাগ্নি না হরে ॥"

(হ. ভ বি. ৪/১২০)।

অর্থাৎ যে ব্যক্তি, হেতুনিষ্ঠ হয়ে অর্থাৎ মালা ধারণের প্রয়োজনীয়তা কি ইত্যাদি হেতুবাদের কারণে মালা ধারণ করে না, সেই পাপবুদ্ধিসম্পন্ন ব্যক্তি শ্রীহরির কোপাগ্নিতে দগ্ধ হয় এবং তার নরকভোগ নিবারণ হয় না। অপরপক্ষে

"তুলসীকাষ্ঠ-মালাঞ্চ কণ্ঠস্থাং বহতে তু যঃ।
অপ্যশৌচোহপ্যনাচারো মামেবৈতি ন সংশয়ঃ ॥"

অর্থাৎ যিনি তুলসীকাষ্ঠের মালা কণ্ঠে ধারণ করেন, তিনি অপবিত্র অনাচারী হলেও আমাকে নিশ্চয়ই পাবে, এতে কোন সংশয় নাই।

নাম করি অথচ ফল পাই না কেন?

অনেকে ভাবেন—নাম করি, ফল পাই না। কিন্তু নাম নারিকেল ফলের মত। ভিতরে প্রবেশ করতে না পারলে স্বাদ পাওয়া যায় না। আমের আঁঠি রোপণ করামাত্র ফল পাওয়া যায় না। অনেক পরিচর্যা, জলদান প্রভৃতি করতে হয়। সেইরূপ সুসংযত হয়ে হৃদয়ভূমিতে নামবীজ বপন করে ভক্তিবারি সিঞ্চন করতে পারলে অবশ্যই ফল লাভ হবে। তবে সুসময়ে বীজ বপন করা চাই। সুসময় অর্থে যৌবনের প্রারম্ভে। বৃদ্ধবয়সে বীজ বপন করলে অঙ্কুরিত হয় না। কেননা, সংসারের তাড়নায় জ্বালা যন্ত্রণায়, অভাব অভিযোগে, শোকে দুঃখে হৃদয়ভূমি পুড়ে কঠিন হয়ে যায়। সেই কঠিন পোড়ামাটিতে বীজ বপন করলে গাছ হবে কি? তাই, আমাদের যথাকালে সর্বশক্তিমান শ্রীহরিকে ভজন করা দরকার। শ্রীমদ্ভাগবতে—

"এতে চাংশকলাঃ পুংসঃ কৃষ্ণস্তু ভগবান স্বয়ম্।
ইন্দ্রারি-ব্যাকুলং লোকং মৃড়য়ন্তি যুগে যুগে ॥"

অর্থাৎ, সর্বশক্তি পূর্ণ হেতু নন্দসুতহরি।
একমাত্র ভগবান জেনো দৃঢ় করি ॥
যখন অসুরগণ হইয়া প্রবল।
ভুবন ব্যাকুল করে প্রকাশিয়া বল ॥
সেই কালে অংশ-কলা রূপে ভগবান।
অবতীর্ণ হঞা করে সর্ব্বলোক ত্রাণ।। (চৈ.চ)

গৌরচন্দ্র, কৃষ্ণাবতার, তিনিই,

"অবতীর্ণঃ পুনঃ কৃষ্ণো গৌরচন্দ্র সনাতনঃ।
মগ্নাস্ত্রিভাগ পাপেহস্মিন্ তেষাং ত্রাণস্য হেতবে ॥"

এই পৃথিবী যখন তিন পাদ পাপে পরিপূর্ণ, তখন সংসারের পরিত্রাণের জন্য সনাতন শ্রীকৃষ্ণ গৌররূপে অবতীর্ণ হয়েছেন।

"শত শত পতিতানাং ত্রাণকর্তা প্রভুস্তং
কথমপি কিমুদোষে বঞ্চিতোঽহং প্রপন্নঃ।
কলিভয় কৃতভীতং ত্রাহিসাং দীনবন্ধো
শরণাগত গতিস্ত্বং কিং ব্রুবে গৌরচন্দ্র।

হে গৌরচন্দ্র। তুমি শত শত পতিত জীবের উদ্ধার কর্তা। আমি কি দোষে কেন যে বঞ্চিত রইলাম জানি না। হে দীনবন্ধো! আমি কলির ভয়ে ভীত হয়েছি, আমাকে ত্রাণ কর। আমি আর কি বলব, তুমি তো অশরণের একমাত্র গতি। নামের মহিমা হৃদয়ঙ্গম হয়ে ভজনকারীকে অবশ্যই কৃষ্ণাভিমুখী করে।

ভারতবর্ষে প্রায় প্রতিটি ভাষার মূল সংস্কৃত। এই ভাষার ব্যাকরণ অনুসারে ব্যাখ্যা করলে দেখা যায় যে তারকব্রহ্মনামের প্রত্যেক শব্দ সম্বোধনবাচক। 'হরে' মুনি শব্দের ন্যায় সম্বোধনের রূপ। অর্থ—হে হরি, কৃষ্ণ, নর শব্দের মত সম্বোধনের রূপ। অর্থ—হে কৃষ্ণ! 'রাম'শব্দটির তদ্রূপ অর্থ হে রাম!

হে হরি, হে কৃষ্ণ, হেহরি, হে রাম, অর্থ ভিন্ন সাধারণ জ্ঞানে অন্য অর্থ দেখা যায় না। কিন্তু আধ্যাত্মিক তত্ত্ব দ্বারা বিচার করলে দেখা যায় যে হরি কথার অর্থ "হরত্যবিদ্যামিতি হরিঃ।" অর্থাৎ অবিদ্যা হরণ করেন বলে হরি। এখন প্রশ্ন অবিদ্যা কি? অজ্ঞান, মায়া, মোহ ইত্যাদি অবিদ্যা। 'কৃষ্ণ' শব্দ কৃষ্ ধাতু নক্ প্রত্যয়যোগে গঠিত। কৃষ্ ধাতুর অর্থ কর্ষণ বা আকর্ষণ করা, অতএব কৃষ্ণ কথার অর্থ "ভক্তদুঃখ কর্ষিত্বাৎকৃষ্ণঃ।" অর্থাৎ ভক্তের দুঃখ কর্ষণ করেন বা অপসৃত করেন বলে কৃষ্ণ ; আবার ভক্তকে আকর্ষণ করেন বলেও 'কৃষ্ণ'। এখন আমাদের জানা দরকার দুঃখ কি? জন্ম, মৃত্যু, জরা ব্যাধি জীবের প্রধান দুঃখ। এতদ্‌ভিন্ন জাতব্যক্তির আরও দুঃখ ভোগ হয়। সেগুলি তিনভাগে বিভক্ত। (১) আধ্যাত্মিক (২) আধিদৈবিক, (৩) আধিভৌতিক। এই দুঃখত্রয়ের নাম ত্রিভাগ জ্বালা। রোগ শোক, অভাব অভিযোগ, জ্বালা যন্ত্রণা ইত্যাদি আধ্যাত্মিক দুঃখ। ঝড়, বৃষ্টি, অগ্নি, বজ্র ইত্যাদির আঘাতজনিত দুঃখ ইত্যাদি আধিদৈবিক দুঃখ এবং শৃগাল, কুকুর, ব্যাঘ্র, সর্প প্রভৃতি হিংস্র জন্তুর দংশনজনিত দুঃখ হল আধিভৌতিক দুঃখ।

'রাম' শব্দের অর্থ 'রমতি হৃদয়মিতি রামঃ'। অর্থাৎ হৃদয়কে রমণ করেন বলে রাম। রমণ কি? আনন্দদান। আনন্দস্বরূপ 'হরে কৃষ্ণ' শব্দদ্বয়ের অর্থ একত্রে অবিদ্যা হরণ করে আকর্ষণ করা। সেরূপ 'হরে রাম' শব্দদুটির অর্থ হৃদয়কে সুন্দর করে আনন্দ বিধান করা।

তারকব্রহ্মনাম : —

"হরে কৃষ্ণ হরে কৃষ্ণ কৃষ্ণ কৃষ্ণ হরে হরে।
হরে রাম হরে রাম রাম রাম হরে হরে ॥"

এই ষোল শব্দের ভাব সম্প্রসারণ করে অর্থ করলে দেখা যায় যে "হে ভগবান ! তুমি আমার অবিদ্যারূপ অজ্ঞান মোহাদি হরণপূর্বক আমাকে আকর্ষণ করত সকল দুঃখ কর্ষণ (অপসৃত) কর এবং আমার কলুষতা দূর করে হৃদয়কে সুন্দর করে আনন্দ দান কর। আহা! কি সুন্দর নামের ভাবমাধুর্য, যাকে জীবনের জপমালা করে ভক্তির সঙ্গে সাধনা করলে হৃদয় মাঝে সৃষ্টি হয় মধুর শ্রীবৃন্দাবন, দেহমন্দিরে সংগঠিত হয় রাধাকৃষ্ণের নিত্যলীলা, যা দিব্যজ্ঞানের দ্বারা উপলব্ধি করলে পাওয়া যায় আনন্দ, দিব্যদৃষ্টি দ্বারা অবলোকন করলে লাভ করা যায় শ্রীকৃষ্ণের অভয় চরণ।

শ্রীরাধারাণী যে নামের বলে তোমার অঙ্গে অঙ্গীভূতা, তোমার প্রেমে বিজড়িতা, আমরাও যেন তোমার ঐ মধুর নাম করে শ্রীচরণের সেবায় রত থাকি। যেই তুমি, সেই রাধা, স্বরূপতঃ অভিন্ন। যেখানে ভক্ত, সেখানে তুমি। তুমি ও তোমার প্রিয়ভক্ত আত্মতঃ অভিন্ন।

যেখানে ভক্ত সেখানে তুমি। তুমি ও তোমার ভক্তের কৃপা ছাড়া জীবের কৃষ্ণপ্রাপ্তির উপায় নেই। ভক্তের মধ্য দিয়ে প্রকাশিত হয় তোমার ঐশ্বর্য ও বিভূতি, ভক্তের অঙ্গে মিলিত হয় তোমার অঙ্গ।

"হে কৃষ্ণ করুণাসিন্ধো দীনবন্ধো জগৎপতে।
পোপেশ গোপিকান্ত রাধাকান্ত নমস্তুতে।"

অর্থাৎ হে কৃষ্ণ করুণাসিন্ধু, দীনবন্ধু জগৎপতি, গোপগণের এবং গোপিকাগণের ঈশ্বর এবং রাধিকার প্রাণেশ্বর, তোমাকে নমস্কার করি।

শ্রীহরিনাম দীপিকাতে তারকব্রহ্মনামের তাৎপর্য বিষয়ে বলা হয়েছে—

"অষ্ট হরিনাম আর চারি কৃষ্ণনাম।
চারি রাম নাম যাতে পূর্ণ মনস্কাম ॥"

কৃষ্ণ ব্যাকুলা শ্রীরাধারাণী মনের উদ্বেগে বলতে লাগলেন—

"প্রথম হে 'হরে' সুমাধুর্য দেখাইয়া।
হঠাৎকারে মোর চিত্ত লইলে হরিয়া ॥
প্রথম হে 'কৃষ্ণ' তুমি আনন্দ স্বরূপ।
সর্বচিত্ত আকর্ষহ রমণীয় রূপ ॥
দ্বিতীয় হে 'হরে' ধৈর্য কুললজ্জা ভয়।
সকল হরিলে মোর তুমি মহাশয় ॥
দ্বিতীয় হে 'কৃষ্ণ' গৃহ হৈতে মন কাড়ি।
বনপ্রতি লৈলে আমা আকর্ষণ করি ॥
তৃতীয় হে 'কৃষ্ণ' ! কুঞ্জে প্রবেশ করণে।
হঠাৎ আসি কঞ্চুলিকা কার আকর্ষণে ॥
চতুর্থ হে 'কৃষ্ণ' মোর কুচ আকর্ষিয়া।
নখাঘাত অঙ্গে দিলে মহানিধি পাইয়া ॥
তৃতীয় হে 'হরে' নিজ ভুজেতে বাঁধিয়া।
পুষ্পশয্যা প্রতি মোরে লইলে হরিয়া ॥
পঞ্চম হে 'হরে' বপুহরণ ছল করি।
অন্তরে বিরহ ব্যথা—সব নিলে হরি ॥
প্রথম হে 'রাম'! তুমি স্বচ্ছন্দে রমিলা।
আমার রমণে রাম নাম ধরাইলা ॥
ষষ্ঠ হে 'হরে' অবশিষ্ট যত ছিল।
ব্যায়াম কৌটিল্য মোর সকলি হরিল ॥
দ্বিতীয় হে 'রাম' আমায় রমণ করায়।
প্রকৃতি হইয়া মোর স্বরূপ আচরায় ॥
তৃতীয় হে 'রাম' রমণীয় চূড়ামণি।
প্রত্যেক সর্বাঙ্গ তোমার রমণীয় মানি ॥
চতুর্থ হে 'রাম' কেবল রমণস্বরূপ।
রমণে বিরাজ করে হয়ে কর্ত্তারূপ ॥
সপ্তম হে 'হরে' মোর চিত্ত মৃগী হয়।
তাহারে হরিয়া আনন্দ মূর্চ্ছাকে পাওয়ায় ॥
অষ্টম হে 'হরে' তুমি সিদ্ধপরাক্রম।

রতিকর্ম প্রকট কর অতি প্রবলতম ॥
এমম্বিধ প্রিয় তুমি যেমন নিযুক্তা।
ক্ষণে কোটী কল্প মানি বিরহিনীভীতা ॥

শ্রীচৈতন্যপক্ষে তারকব্রহ্ম নামের ব্যাখ্যা :

একদিন আচার্য গোঁসাই হরিদাসকে জিজ্ঞাসা করেন—তুমি শ্রীচৈতন্যের প্রধান পার্ষদ, অথচ তুমি "শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য ছাড়ি কেন গাও আন॥" তার উত্তরে হরিদাস বলেছিলেন

"মহামন্ত্রে শ্রীচৈতন্যে ভিন্নকভু নয়।
নাম নামীভেদ নাহি সর্বশাস্ত্রে কয় ॥

হরে— ভানুসুতা সেই কৃষ্ণপ্রিয়া শিরোমণি।
শ্রীচৈতন্যরূপে এবে হরে করি মানি ॥

কৃষ্ণ— নন্দসুত বলি যারে ভাগবতে গাই।
সেই কৃষ্ণ এবে এই চৈতন্য গোঁসাই ॥

হরে— ব্রজের সর্বস্ব হরি নদে অবতার।
এই হেতু চৈতন্যের হরে নাম আর ॥

কৃষ্ণ— জীবহৃদি কর্ষিয়া রোপিল ভক্তিবীজ।
অতএব চৈতন্যের কৃষ্ণ নাম নিজ ॥

কৃষ্ণ— কৃষ্ণবর্ণ কৃষ্ণময় যে কৃষ্ণ বরণ।
অতএব তাঁর নাম কৃষ্ণ নিরূপণ ॥

কৃষ্ণ— ন্যাসীবেশে আকর্ষিল পাষণ্ডীর গণ।
এই হেতু কৃষ্ণনাম তাঁহার গণন ॥

হরে— স্বমাধুর্য হরে তিঁহ ভক্তগণ প্রাণ।
হরে নাম চৈতন্যের করয়ে ব্যাখ্যান ॥

হরে— স্বভক্তে হরিতে হয় আপনি হরণ।
শ্রীচৈতন্য হরে নাম করিল গ্রহণ ॥

হরে— স্বপ্রিয়া হরিয়া কৃষ্ণ কৈল অবতার।
শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য হরে কলিযুগে সার ॥

রাম— দোঁহে মিলি নবদ্বীপে রমে অবিরাম।
অতএব শ্রীচৈতন্য কলিযুগে রাম ॥

রাম— হরয়ে চৈতন্য জীবের সর্বঅমঙ্গল।
অতএব হরিনাম সর্ব্বসুমঙ্গল ॥

রাম— স্বভক্ত হৃদয়ে কিবা করয়ে রমণ।
অতএব রাম নাম করয়ে বহন ॥

রাম— আপনা রমিতে নিজ স্বতঃ উঠে কাম।
অতএব শ্রীচৈতন্য ধরে রাম নাম ॥

রাম— কৌশল্যা নন্দন যিনি ত্রেতায় শ্রীরাম।
সার্ব্বভৌমে দেখাইয়া ধরে রাম নাম ॥

হরে— স্বমাধুর্য্যে হরিল মন তেঁই অবতার।
অতএব হরে রাম হইল তাঁহার ॥

হরে— স্বভাবে হরিয়া চিত্ত কূর্মাকৃতি হইল।
অতএব হরে নাম জগতে ঘোষিল ॥
হরে— সাক্ষাৎ শ্রীহরি কলৌ চৈতন্য গোঁসাই।
অতএব হরে এবে তাঁর নাম গাই ॥
রাম— শ্রীনিত্যানন্দ গোঁসাই রাম অবতার।
তেঁই রামনাম তাঁর বিদিত সংসার ॥
কৃষ্ণ— কৃষ্ণ অংশে অবতীর্ণ দ্বিতীয় স্কন্ধ।
তে কারণ কৃষ্ণনাম বুঝ অনুবন্ধ ॥
কৃষ্ণ— স্বয়ং শ্রীকৃষ্ণ হয় চৈতন্য গোঁসাই।
অতএব তাঁর নাম কৃষ্ণ করি গাই ॥
রাম— বলরাম অবতার নিতাই ঠাকুর।
অতএব রাম নাম প্রেমরসপুর ॥
হরে— অদ্বৈত হরিণাদ্বৈত ভক্তি শংসনে।
অতএব হরে নাম তোমার আখ্যানে ॥
হরে— ভানুসুতা অবতার গদাই পণ্ডিত।
হরে নাম তাঁর ইহ জগতে বিদিত॥"

এই ব্যাখ্যার পর হরিদাসকে—

"আচার্য কহয়ে তুমি ভুবন মঙ্গল।
শ্রীচৈতন্য তত্ত্ববেত্তা তুমি সে কেবল ॥
হরিদাস কহে প্রভু তুমি তত্ত্ব সার।
বেত্তা আমি, স্তুতি নহে সেই অনুসার ॥

॥ শ্রীশ্রী হরিদাস ঠাকুর কৃত হরিনামার্থ ॥

॥ বৈষ্ণবগণের নিত্যক্রিয়া পদ্ধতি ॥

১। **নিশান্ত কৃত্য** : চারি দণ্ড রাত্রি থাকতে জাগরিত হয়ে শ্রীসদ্‌গুরুকে স্মরণপূর্বক তাঁর কৃপাপ্রদত্ত নামাবলী উচ্চারণ করতে করতে শয্যাত্যাগ করে কৃষ্ণ বা গৌরযোগে

"কৃষ্ণ কৃষ্ণ কৃষ্ণ কৃষ্ণ কৃষ্ণ কৃষ্ণ হে।
কৃষ্ণ কৃষ্ণ কৃষ্ণ কৃষ্ণ কৃষ্ণ কৃষ্ণ হে।
কৃষ্ণ কৃষ্ণ কৃষ্ণ কৃষ্ণ কৃষ্ণ কৃষ্ণ রক্ষমাম্
কৃষ্ণ কৃষ্ণ কৃষ্ণ কৃষ্ণ কৃষ্ণ কৃষ্ণ পাহিমাম্ ॥

পাঠ করে গুরুগণ, শ্রীপঞ্চতত্ত্ব, শ্রীরাধাকৃষ্ণ ও শ্রীমূলমন্ত্র স্মরণ করতে হয়। অনন্তর শ্রীগুরুদেবের চরণকমল স্মরণপূর্বক দুই হস্তে ভূমি স্পর্শ করে প্রার্থনা করতে হয—

সমুদ্র মেখলে দেবী! পর্বত-স্তন মণ্ডলে।
বিষ্ণুপত্নি : নমস্তুভ্যং পাদস্পর্শং ক্ষমস্যমে ॥"

পরে যথাক্রমে গৃহ হতে বের হয়ে শ্রীমন্দিরে প্রণাম, হস্তপদপ্রক্ষালন, দন্তধাবন, রাত্রিবাস পরিত্যাগ ও আসনে বসে সামান্যাচমন করতে হয়।

আচমনবিধি : — "প্রথমতঃ "ওঁ বিষ্ণুঃ, ওঁ বিষ্ণু, ওঁ বিষ্ণুঃ। ওঁ
তদ্বিষ্ণোঃ পরমং পদং সদা পশ্যন্তি সূরয়োঃ
দিদীব চক্ষুরাততম্"

এই মন্ত্র উচ্চারণ পূর্বক ওষ্ঠদ্বয়, মুখ, নাসিকাদ্বয়, কর্ণদ্বয়, নাভি, হৃদয়, মস্তক ও বাহুমূলদ্বয়, এই দ্বাদশস্থান স্পর্শ করতে হয়। তৎপরে—

ওঁ অপবিত্রঃ পবিত্রোঃ বা সর্ব্বাবস্থাং গতোঽপি বা।
যঃ স্মরেৎ পুন্ডকাক্ষং স বাহ্যাভ্যন্তরঃ শুচিঃ।

এই মন্ত্র পাঠ ও বিষ্ণুস্মরণ করে মস্তকে কিঞ্চিৎ জল ছিটোতে হবে।

আচমন—দক্ষিণহস্তের অঙ্গুলি ঈষৎ বক্র করে করতলে একটু জল নিয়ে ঐ জল কেশবায় নমঃ বলে একবার, নারায়ণায় নমঃ বলে একবার ও মাধবায় নমঃ বলে একবার পান করতে হয়। পরে গোবিন্দায় নমঃ বিষ্ণবে নমঃ বলে দুই হস্ত প্রক্ষালন করতে হয়।

তৎপরে, "মধুসূদনায় নমঃ, ত্রিবিক্রমায় নমঃ বলে অঙ্গুষ্ঠ মূল দ্বারা দক্ষিণ হস্ত থেকে বাম অভিমুখে ওষ্ঠ ও অধর মার্জন, বামনায় নমঃ। শ্রীধরায় নমঃ বলে অঙ্গুষ্ঠ মূলদ্বারা উর্দ্ধদিক হতে নিম্নদিকে দুইবার মুখ মার্জন, হৃষিকেশায় নমঃ, পদ্মনাভায় নমঃ পদদ্বয়ে জল প্রক্ষেপ, দামোদরায় নমঃ বলে তিনবার জল প্রক্ষেপ, বাসুদেবায় নমঃ বলে অনামিকা, মধ্যমা ও তর্জনীদ্বারা মুখ স্পর্শ, সঙ্কর্ষণায় নমঃ "প্রদ্যুম্নায় নমঃ" বলে অঙ্গুষ্ঠ ও তর্জনীর অগ্রভাগ দ্বারা দক্ষিণ ও বাম নাসাস্পর্শ, "অনিরুদ্ধায় নমঃ", পুরুষোত্তমায়া নমঃ বলে অঙ্গুষ্ঠ ও মধ্যমা দ্বারা দক্ষিণ ও বাম নেত্র স্পর্শ, অধোক্ষজয়ায় নম ও নৃসিংহায় নমঃ বলে অঙ্গুষ্ঠ ও অনামিকা দ্বারা দক্ষিণ ও বাম কর্ণ স্পর্শ, অচ্যুতায় নমঃ বলে অঙ্গুষ্ঠ ও কনিষ্ঠার দ্বারা নাভিস্পর্শ, জনার্দ্দনায় নমঃ বলে দক্ষিণ করতল দ্বারা বক্ষঃস্থল স্পর্শ, উপেন্দ্রায় নমঃ বলে অঙ্গুলিসমূহের অগ্রভাগ দ্বারা মস্তক স্পর্শ, 'হরয়ে নমঃ' কৃষ্ণায় নমঃ বলে অঙ্গুলিসমূহের অগ্রভাগ দ্বারা দক্ষিণ ও বাম বাহুমূল স্পর্শ করতে হয়।

স্নানবিধি : — গঙ্গাদি তীর্থ বা নদী, পুষ্করিণী প্রভৃতি জলাশয়ে 'আচমন' করে বিষ্ণু স্মরণ করতে হয়।

"ওঁ অপবিত্রঃ পবিত্রো বা সর্ব্বাবস্থাং গতোঽপিবা।
যঃ স্মরেৎ পুন্ডরীকাক্ষং স বাহ্যাভ্যন্তরঃ শুচিঃ ॥"

অতঃপর প্রসিদ্ধ গঙ্গাদিতীর্থ ভিন্ন অন্য জলাশয়াদিতে

"পাপোঽহং পাপ কর্মাহং পাপাত্মা পাপ-সম্ভবঃ।
ত্রাহি মাং পুণ্ডরীকাক্ষ সর্ব্বপাপহরো হরিঃ ॥
গঙ্গে! চ! যমুনে! 'চৈব গোদাবরি ! সরস্বতি'।
নর্ম্মদে ! সিন্ধু ! কাবেরি ! জলেঽস্মিন সন্নিধিং কুরু।
কুরুক্ষেত্রং গয়া-গঙ্গা-প্রভাস-পুষ্করাণি চ।
তীর্থান্যেতানি পুণ্যানি স্নানকালে ভবন্ত্বিহ ॥"

মন্ত্রাদি উচ্চারণ করে স্নান করার বিধি। স্নানের পর গৃহাগমনপূর্বক শুষ্কবস্ত্র পরিধান করে শিখাবন্ধন করতে হয়। শিখাবন্ধন মন্ত্র—

শিখাবন্ধন : "ব্রহ্মবাণী-সহস্রানি শিববাণী-শতানি চ।
বিষ্ণোর্নাম সহস্রেণ শিখাবন্ধং করোম্যহম্ ॥

তারপর দ্বাদশ অঙ্গে **তিলকধারণ**—ললাটে শ্রীকেশবায় নমঃ, উদরে শ্রীনারায়ণায় নমঃ বক্ষঃস্থলে শ্রীমাধবায় নমঃ, কণ্ঠে শ্রীগোবিন্দায় নমঃ, দক্ষিণপার্শ্বে শ্রীবিষ্ণবে নমঃ, দক্ষিণ বাহুতে শ্রীশ্রীধরায় নমঃ, বাম স্কন্ধে শ্রীহৃষিকেশায় নমঃ, পৃষ্ঠে—শ্রীপদ্মনাভায় নমঃ, কটিতে—শ্রীদামোদরায় নমঃ। তারপর হস্তধৌত জল "শ্রীবাসুদেবায় নমঃ" বলে মস্তকে প্রদান করতে হয়।

শ্রীমূর্ত্তিজাগরণ—ঘণ্টাবাদন করতে করতে শ্রীমূর্তির জাগরণ করাতে হয়। মন্ত্র ঃ—

"উত্তিষ্ঠোত্তিষ্ঠ গৌরাঙ্গ সপার্ষদ জগৎপতে।
ত্বয়া চোত্থীয়মানেন চোত্থিতং ভুবনত্রয়ম ॥
গো-গোপ-গোকুলানন্দ যশোদানন্দ নন্দন।
উত্তিষ্ঠ রাধয়া সার্দ্ধং প্রাতরাসীজ্জগৎপতে ॥"

উক্ত মন্ত্রে শ্রীমূর্তিকে সিংহাসনে বসাতে হয়।

ভোগ লাগাবার নিয়ম : —জলের দ্বারা চতুষ্কোণ অঙ্কিত করে তার উপর নৈবেদ্য রাখতে হয়। পরে 'ওঁ নৈবেদ্যায় নমঃ' মন্ত্রে তুলসী দিয়ে নৈবেদ্যের পূজা করে অবগুণ্ঠন মুদ্রা দ্বারা আচ্ছাদন ও ধেনুমুদ্রা দ্বারা অমৃতবর্ষণ এবং চক্রমুদ্রা দ্বারা রক্ষা করে শঙ্খজলদ্বারা অভিষেচনপূর্বক "এতৎ সতুলসী নৈবেদ্যাং শ্রীগৌরন্দ্রায় শ্রীকৃষ্ণায় নমঃ" বলে নিবেদন করতে হয়।

অবগুণ্ঠন মুদ্রা—মুষ্টিবদ্ধ উভয় হস্তের তর্জনী বের করে অধোমুখে, বামহস্ত দক্ষিণ দিকে ও দক্ষিণ হস্ত বামদিকে চালনা করলে অবগুণ্ঠন মুদ্রা হয়।

ধেনুমুদ্রা—(দক্ষিণ হস্তের তর্জনী ও অনামিকা বাম হস্তের মধ্যমা ও কনিষ্ঠাতে এবং দক্ষিণ হস্তের মধ্যমা ও কনিষ্ঠা বাম হস্তের তর্জনী ও অনামিকাতে সংযোগ করলে ধেনুমুদ্রা হয়।

চক্রমুদ্রা—উভয় হস্ত মুঠো করে উভয় হস্তের বৃদ্ধ অঙ্গুলিদ্বয় হস্তমধ্যে কনিষ্ঠা অঙ্গুলিদ্বয়ের সঙ্গে সংলগ্ন করতে হয়। হস্ত ভগ্ন হবে না। একে চক্রমুদ্রা বলে।

আরতি : —আ অর্থে বিস্তৃতি, রতি অর্থে প্রেম বা ভালবাসা। যে অনুষ্ঠান মাধ্যমে দেবতার স্বকীয় প্রীতিলাভ ঘটে এবং দেবতার প্রতি আমাদেরও প্রেম বা ভালবাসার উদয় হয় তাকে বলে আরতি।

আরতির নিয়ম—ধূপচীতে ধূপ রেখে "এষ ধূপো নমঃ" বলে ধূপের উপর তুলসী দিয়ে মূলমন্ত্র সহকারে "ইদং ধূপং শ্রীগৌর চন্দ্রায় / শ্রীকৃষ্ণায় নিবেদয়ামি নমঃ।" এই মন্ত্রে নিবেদন করে "বনস্পতিরসোৎপন্নো গন্ধ্যঢ্যো গন্ধ উত্তমঃ।
আঘ্রেয়ঃ সর্বদেবানাং ধূপোঽয়ং প্রতিগৃহ্যতাম্ ॥"

এই মন্ত্র পাঠ করতে করতে নাভিদেশ অবধি ভ্রমণ করাতে হয়। তারপর গোঘৃতসিক্ত তূলার সলিতা দ্বারা পঞ্চপ্রদীপ সাজিয়ে প্রজ্বলিত করে আঠারবার মূলমন্ত্র জপ করে ঠাকুরকে তিনবার পুষ্পাঞ্জলি প্রদানপূর্বক শঙ্খজলে অভিষিক্ত করে দীপের উপর একবার পুষ্পাঞ্জলি দিয়ে "ইমাং সতুলসী দীপাবলিং শ্রীগৌরচন্দ্রায় নিবেদয়ামি নমঃ" এই মন্ত্র উচ্চারণ করে ধেনু ও অবগুণ্ঠন মুদ্রা দেখিয়ে "সুপ্রকাশো মহান্ দীপঃ
সর্ব্বতস্তিমিরাপহঃ।
সবাহ্যাভ্যন্ততরং জ্যোতি দীপোঽয়ং
প্রতিগৃহ্যতাম্ ॥"

এই মন্ত্র পাঠ করে মনে মনে মূল মন্ত্র স্মরণ করে বামপদ বসবার আসনে ও দক্ষিণপদ ভূমির উপর রেখে অর্ধোন্মিলিত নয়নে অতি মৃদুভাবে শ্রীশ্রীবিগ্রহের নয়ন পর্যন্ত দীপাবলি উঠাতে হয়। প্রথমতঃ চারবার চরণে, দুইবার নাভিদেশে, তিনবার বদনে ও সাতবার সর্বাঙ্গে —এইরূপে ষোলবার দীপ ভ্রমণ করাতে হয়। পরে জলপূর্ণ শঙ্খ দ্বারা প্রত্যেক তিনবারে একবার কিঞ্চিৎ জলভূমিতে ফেলে তিনবার আরতি করে বস্ত্র, পুষ্পাদি এবং চামর ব্যজন দ্বারা আরতি সমাপন করতে হয়। তারপর সূর্যোদয়ের পূর্বেই নিশান্তলীলার পদাবলি কীর্তন বিধেয়।

প্রাতঃকৃত্য (সূর্যোদয়ের পর)

তুলসীপত্র চয়ন—পূর্ণিমা, অমাবস্যা, দ্বাদশী, সংক্রান্তি, মধ্যাহ্নকালে, সন্ধ্যা ও রাত্রিকাল বাদে অন্য সময় তুলসীপত্র চয়ন বিধেয়। তুলসীপত্র চয়নের মন্ত্র ঃ—

"তুলস্যমৃতজন্মাসি সদা ত্বং কেশবপ্রিয়া।
কেশবার্থে চিনোমি ত্বাং বরদা ভব শোভনে ॥
ত্বদঙ্গসম্ভবৈঃ পত্রৈঃ পূজয়ামি যথা হরিম্ !
তথা কুরু পবিত্রাঙ্গি ! কলৌমল-বিনাশিনি।।"

তুলসী-স্নানমন্ত্র : — "গোবিন্দ বল্লভাং দেবীং জগচ্চৈতন্যকারিণীম্।
স্নাপয়ামি জগদ্ধাত্রীং বিষ্ণুভক্তি প্রদায়িনীম্ ॥"

তুলসী পরিক্রমা মন্ত্র : — "যানি কানি চ পাপানি জন্মান্তর শতানি বৈ।
তানি তানি প্রণশ্যন্তি প্রদক্ষিণাঃ পদে পদে ॥

তুলসী প্রণাম মন্ত্র : — "বৃন্দায়ৈ তুলসীদেব্যৈ প্রিয়ায়ৈ কেশবস্য চ।
কৃষ্ণভক্তি প্রদে দেবি। সত্যবত্যৈ নমো নমঃ ॥"

তুলসী অর্পণের নিয়ম— বিশেষ পরিষ্কার করে তুলসীপত্র ধৌত করে চন্দন ও গন্ধমিশ্রিত করে অনামিকা ও বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠে বৃন্তটি ধারণপূর্বক পত্রের পৃষ্ঠদেশ নিম্নদিকে রেখে অর্পণ করার নিয়ম। গন্ধ, চন্দন ও তুলসী দুইবারের ন্যূন অর্পণ করবে না।

পুষ্প অর্পণের নিয়ম : —সুসংস্কৃত সবৃন্ত পুষ্প সকল গন্ধ ও চন্দন যোগ করে অঙ্গুষ্ঠ ও মধ্যমা অঙ্গুলিদ্বয়ে বৃন্তের দিকে ধারণপূর্বক প্রদান করতে হয়।

চন্দন ঘর্ষণ ও অর্পণ : —শ্বেতচন্দন উভয় হস্তে ধারণপূর্বক উভয় হস্তের তর্জনী স্পর্শ না করে দক্ষিণাবর্তে ঘর্ষণ করার নিয়ম। অঙ্গুষ্ঠ ও অনামিকাঙ্গুলিদ্বয়ে ধারণপূর্বক গন্ধ ও চন্দন অর্পণ করার বিধি।

॥ শ্রীশ্রীপূজাবিধি ॥

আচমন—প্রাতঃকালে গুরুদেবকে প্রণাম জানিয়ে পূজোপকরণাদি যথাস্থানে স্থাপন করে শুদ্ধাসনে উপবেশন পূর্বক আচমন করে বিঘ্নবিনাশের জন্য জোড় হাতে পাঠ করতে হবে—

"ভূত-প্রেত-পিশাচাদ্যা যে সর্ব্বে বিঘ্নকারকা:।
অপসর্পন্তুতে তূর্ণং হরের্নামানুকীর্তনাৎ ॥" এর পর হরে কৃষ্ণ ইত্যাদি নামকীর্তন করা উচিত।

॥ আসনশুদ্ধি ॥

বসবার আসনের দক্ষিণভাগে নিম্নে ত্রিকোণমণ্ডল এঁকে আসনের উপর জল বা গন্ধপুষ্প দিয়ে—এতে গন্ধে পুষ্পে ওঁ আধারশক্তয়ে নমঃ, ওঁ অনন্তায় নমঃ, ওঁ কূর্ম্মায় নমঃ" বলে পূজা করে আসন ধরে "ওঁ আসনমন্ত্রস্য মেরুপৃষ্ঠ ঋষিঃ সুতলং ছন্দঃ কূর্ম্মো দেবতা আসনাভিমন্ত্রেণ বিনিয়োগ: ॥"

"ওঁ পৃথ্বি ত্বয়া ধৃতা লোকা দেবি ত্বং বিষ্ণুনা ধৃতা।
ত্বং চ ধারয় মাং নিত্যং পবিত্রমাসনং কুরু।"

এই মন্ত্রে পাঠান্তে বামপদের গোড়ালি দ্বারা তিনবার মাটিতে আঘাত করে ভূমিষ্ঠ হয়ে

"অপসর্পন্ত তে ভূতা যে ভূতা ভুবি সংস্থিতাঃ।
যে ভূতা বিঘ্নকর্ত্তারস্তে নস্যন্তু শিবাজ্ঞয়া ॥"

এই মন্ত্র বলে চতুর্দিকস্থ বিঘ্নোৎপাদনকারী ভূতবর্গকে তাড়িয়ে দিয়ে ধূপ ও দীপ জ্বালিয়ে মঙ্গলশান্তি পাঠ করতে হয়। যথা—

"ওঁ ভদ্রং কর্ণেভিঃ শৃণুয়াম দেবা ভদ্রং পশ্যেমাক্ষিভির্যজত্রাঃ।
স্থিরৈরঙ্গৈস্তুষ্টুবাংসস্তনূভির্ব্যশেম দেবহিতং যদায়ুঃ ॥"

"স্বস্তি ন ইন্দ্রো বৃদ্ধশ্রবাঃ স্বস্তি ন পূষাঃ বিশ্ববেদাঃ স্বস্তি নস্তার্ক্ষ্যোহরিষ্ট নেমিঃ স্বস্তি নো বৃহস্পতির্দধাতু॥" বলে—ওঁ শান্তিঃ ওঁ শান্তিঃ ওঁ শান্তিঃ পাঠ করতে হবে।

করশুদ্ধি : — গন্ধপুষ্প নিয়ে "এই বং অস্ত্রায় ফট্"—এই মন্ত্রে দুই হস্তে ঘর্ষণ করে আঘ্রাণ নিয়ে বাঁদিকে নিক্ষেপপূর্বক গঙ্গাজলের ছিটা দিতে হয়।

পুষ্পশুদ্ধি :—ওঁ পুষ্পে পুষ্পে মহাপুষ্পে সুপুষ্পে পুষ্প সম্ভবে। পুষ্পচয়াবকীর্ণেহ হুঁফট্ স্বাহা, এই বলে চন্দন দিতে হয়।

ঘণ্টাপূজা : — "সর্ববাদ্যময়ী ঘণ্টা দেবদেবস্য বল্লভা। তস্মাৎ সর্বপ্রযত্নেন ঘণ্টানাদন্তু কারয়েৎ।।" এই মন্ত্রে বাম হস্তে ঘণ্টা বাজাতে হয়।

সামান্যার্ঘ্য স্থাপন— ভূমিতে ত্রিকোণ মণ্ডল এঁকে তদুপরি গন্ধ পুষ্প দিয়ে পূজা করতে হয়। —এতে গন্ধেপুষ্পে "ওঁ আধারশক্তয়ে নমঃ"—"ওঁ প্রকৃত্যৈ নমঃ। ওঁ কূর্ম্মায় নমঃ। ওঁ পৃথিব্যৈ নমঃ।" তারপরে 'ফট্' এই মন্ত্রে কোশা ধুয়ে সেই ত্রিকোণের উপর রেখে নমঃ এই মন্ত্রে জলপূর্ণ করে অগ্রভাগে গন্ধ, পুষ্প, আতপচাল দুধাদি দিতে হয়।

শঙ্খস্থাপন : —ভূমিতে চতুষ্কোণ মধ্যে ত্রিকোণমঙ্গল এঁকে 'হুঁ ফট্' মন্ত্র দ্বারা শঙ্খ ধুয়ে তার উপর "ওঁ নমঃ সুদর্শনায় অস্ত্রায় ফট্' এই মন্ত্রে আধার সহিত শঙ্খ স্থাপন করতে হয়। "ওঁ হৃদয়ায় নমঃ" মন্ত্রে গন্ধ পুষ্প তুলসী দিয়ে "ওঁ সোমমণ্ডলায় ষোড়শকলাত্মনে নমঃ মন্ত্রে জলদ্বারা শঙ্খ পূর্ণ করতে হয়। তার উপর অঙ্কুশ মুদ্রা দ্বারা জলশুদ্ধি করতে হয়।

জলশুদ্ধি : — "গঙ্গে চ যমুনেচৈব গোদাবরি সরস্বতি।
নর্মদে সিন্ধু কাবেরি জলোহস্মিন সন্নিধিং কুরু ॥
কুরুক্ষেত্রংগয়া-গঙ্গা-প্রভাস-পুষ্করাণিচ।
তীর্থান্যেতানি পুণ্যানি শঙ্খপাত্রে ভবন্ত্বিহ ॥"

পাত্রশুদ্ধি—সুসংস্কৃত পাত্রসমূহের উপর মূলমন্ত্র আটবার জপ করে চক্রমুদ্রা দ্বারা পাত্রশুদ্ধি করতে হয়।

আত্মশুদ্ধি—দশবার করে গায়ত্রী, ইষ্টমন্ত্রাদি মহামন্ত্র জপ করে আত্মশুদ্ধি করতে হয়।

ভূতশুদ্ধি—'অস্ত্রায় ফট্' মন্ত্রে গন্ধ পুষ্প দ্বারা করদ্বয় শোধনপূর্বক বামহাত উত্তানভাবে রেখে তন্নিম্নে ডান হাত দিয়ে দিগ্বন্ধন করে 'রং' মন্ত্রে নিজের চতুর্দিকে জলধারা দিয়ে আপনাকে চতুর্দিকস্থ অগ্নিময় প্রাচীর মধ্যস্থিত ভাবনা করে স্বহৃদয়ে ইষ্টদেবের পাদপদ্ম ধ্যান করতে হয়। এইই সংক্ষেপে ভূতশুদ্ধি।

পরে স্নান পাত্রোপরি তুলসী পত্রাসনে শ্রীমূর্তিকে স্থাপন করে ঘণ্টা বাজিয়ে ইষ্ট মন্ত্রোচ্চারণ করতে করতে শঙ্খোদক দ্বারা যথাসম্ভব স্নান করাতে হয়। স্নানমন্ত্র ঃ "ভগবন্ স্নানীয়ং নিবেদয়ামি স্বধাঃ।"

অতঃপর শ্রীঅঙ্গ মার্জন, বস্ত্রালকারাদি পরান, অলকা তিলকাদি রচনা করে ফল মিষ্টান্নাদি নিবেদন করে আরত্রিক করতে হয়।

পূর্বাহ্নকৃত্য

শ্রীশ্রীগুরুপূজা—প্রথমে আসনে বসে শ্রীগুরুভ্যো নমঃ, শ্রীপরম গুরুভ্যো নমঃ, শ্রীপরাপর

গুরোভ্য নমঃ, শ্রীপরমেষ্ঠি গুরুভ্যো নমঃ। এইভাবে শ্রীগুরুবর্গকে প্রণাম করে শ্রীগুরুদেবের পূজা করে শ্রীপঞ্চতত্ত্ব এবং শ্রীরাধাগোবিন্দের ভোগান্তে ঐ মহাপ্রসাদ শ্রীগুরুদেবকে সমর্পণ করা বিধেয়। তৎপরে গুরুদেবকে প্রণাম ও প্রার্থনা করতে হয়। প্রণামমন্ত্র—

"অজ্ঞান তিমিরান্ধস্য জ্ঞানাঞ্জনশলাকয়া
চক্ষুরুন্মীলিতং যেন তস্মৈশ্রীগুরবে নমঃ।"

(গুরু গায়ত্রী শ্রীগুরুদেবায় বিদ্মহে, গৌরপ্রিয়ায় ধীমহি, তন্নো, 'গুরু' প্রচোদয়াৎ)

গুরুপ্রার্থনামন্ত্র— "শ্রীগুরো! পরমানন্দ! প্রেমানন্দ ফলপ্রদ!
নবদ্বীপ পরানন্দ সেবায়াং মাং নিয়োজয় ॥"

তারপর শ্রীনবদ্বীপধাম, পঞ্চতত্ত্ব, বৃন্দাবন, শ্রীকৃষ্ণ, শ্রীরাধিকা প্রভৃতির ধ্যান ও পূজা বিধেয়। নিম্নে বিশেষ বিশেষ ধাম ও শ্রীকৃষ্ণাদির ধ্যান ও পূজা সংক্ষিপ্তাকারে দেওয়া হল।

নবদ্বীপের ধ্যান— "স্বর্ধুন্যাশ্চারুতীরে স্ফুরিতমতিবৃহৎকুর্ম্মপৃষ্ঠাভগাত্রং
রম্যারামাবৃতং সর্ম্মাণিকনক—মহাসদ্মসঙ্ঘৈঃ পরীতম্।
নিত্যং প্রত্যালয়োদ্যৎ-প্রণয়ভর-লসৎ কৃষ্ণ সংকীর্তনাঢ্যং
শ্রীমদ্‌বৃন্দাটব্যভিন্ন ত্রিজগদনুপং শ্রীনবদ্বীপমীড়ে ॥"

(শ্রীধাম নবদ্বীপ, ভাগীরথীর মনোহরতীরে অতি বৃহৎ কূর্মপৃষ্ঠের ন্যায় প্রকাশিত, পরম রমণীয় পুষ্পোদ্যানে ও উৎকৃষ্ট মণিময় ও সুবর্ণময় গৃহাদিতে শোভিত এবং সর্বকাল প্রতিগৃহে প্রণয়ভরোত্থিত শ্রীকৃষ্ণনাম সংকীর্তনযুক্ত শ্রীবৃন্দাবন হতে অভিন্ন ও জগতে অতুলনীয় ; আমি এর স্তুতি করি।

শ্রীশ্রীবৃন্দাবনের ধ্যান : — "শ্রীমদ্‌বৃন্দাবনং রম্যং যমুনায়াঃ প্রদক্ষিণং
শুদ্ধ স্ফটিক-সংস্থানং কল্পবৃক্ষ-সুশোভিতম্।
নানাবর্ণ-প্রসূনানাং রেণুভিঃ পরিপূরিতম্।
ধ্যেয়ং বৃন্দাবনং নিত্যং গোবিন্দ স্থানমব্যয়ম্।"

শ্রীকৃষ্ণের ধ্যান—ক্লীং হৃদয়ায় নমঃ এইরূপে অঙ্গন্যাস ও করন্যাস করে ধ্যান করতে হয়— "ওঁ ফুল্লেন্দীবর—কান্তিমিন্দুবদনং বর্হাবতংস-প্রিয়ং
শ্রীবৎসাঙ্ক মুদার কৌস্তুভধরং পীতাম্বরং সুন্দরম।
গোপীনাং নয়নোৎপলার্চ্চিত-তনুং গোগোপসঙ্ঘাবৃতং
গোবিন্দং কলবেণুবাদনপরং দিব্যাঙ্গভূষং ভজে ॥

"কস্তুরীতিলকং ললাট পটলে বক্ষঃস্থলে কৌস্তুভং
নাসাগ্রে গজমৌক্তিকং করতলে বেণুং করে কঙ্কণম্।
সর্ব্বাঙ্গে হরিচন্দনং সুললিতং কণ্ঠেচ মুক্তাবলিঃ
গোপস্ত্রী-পরিবেষ্টিতো বিজয়তে গোপাল চূড়ামণিঃ ॥

ধ্যান করে ঐ পুষ্প শ্রীকৃষ্ণবিগ্রহ বা চিত্রপটে অর্পণ করতঃ পাদ্য অর্ঘ্য, আচমনীয়, স্নানীয়, গন্ধ, পুষ্প, সচন্দন তুলসীপত্র, ধূপ, দীপ নৈবেদ্য, পানীয়, পুনরাচমনীয় তাম্বুল এবং মাল্য প্রভৃতি এক একটি উপহার সবীজ শ্রীকৃষ্ণায় নমঃ "মন্ত্রে অর্পণ করতে হয়।

॥ শ্রীকৃষ্ণের প্রণাম ॥

"নমোনলিননেত্রায় বেণুবাদ্য বিনোদিনে।
রাধাধর-সুধাপান-শালিনে বমমালিনে ॥"
বর্হাপীড়াভিরামং মৃগমদতিলকং কুণ্ডলাক্রান্তগণ্ডং

কঞ্জাক্ষং কম্বুকণ্ঠং স্মিতসুভগমুখং স্বাধরেন্যস্তবেণুম্।
শ্যামং শান্তং ত্রিভঙ্গং রবিকরবসনং ভূষিতং বৈজয়ন্ত্যা
বন্দে বৃন্দাবনস্থং যুবতি-শতবৃতং ব্রহ্মগোপালবেশম্ ॥"

॥ শ্রীরাধিকার পূজা ॥

"রাং অঙ্গুষ্ঠাভ্যাং নমঃ" এইরূপে অঙ্গন্যাস ও করন্যাস করে ধ্যান কবতে হবে- -

"ওঁ অমলকমলকান্তিং নীলবস্ত্রাং সুকেশীং
শশধর সম-বক্ত্রাং খঞ্জনাক্ষীং মনোজ্ঞাম্।
স্তনযুগগত-মুক্তাদাম-দীপ্তাং কিশোরীং
ব্রজপতিসুত-কান্তাং রাধিকামাশ্রয়েহম্ ॥"

॥ শ্রীরাধিকার প্রণাম ॥

"রাধাং রাসেশ্বরীং রম্যাং স্বর্ণকুণ্ডল-ভূষিতাম্
বৃষভানুসুতাং দেবীং ত্বাং নমামি হরিপ্রিয়াম্ ॥
অনন্তর অন্যান্য সখী-মঞ্জরীদের স্মরণ করতে হয়।

॥ গোপালের গায়ত্রী ॥

কৃষ্ণায় বিদ্মহে দামোদরায় ধীমহি।
তন্নো বিষ্ণুঃ প্রচোদয়াৎ ॥

গোপালের ধ্যান : —"ওঁ নবীন-নীরদ শ্যামং নীলেন্দীবর লোচনম্।
বল্লবীনন্দনং বন্দে কৃষ্ণং গোপালরূপিনম্ ॥

গোপালের প্রণাম ' —"নীলোৎপলদলশ্যামং যশোদানন্দনন্দনম্।
গোপিকানয়নানন্দং গোপালং প্রণমাম্যহম্ ॥

॥ পঞ্চতত্ত্বের ধ্যান ও প্রণাম ॥

গৌরাঙ্গ মহাপ্রভুর . —গাং হৃদয়ায় নমঃ ; ইত্যাদিক্রমে অঙ্গন্যাস ও করন্যাস করে মহাপ্রভুর ধ্যান করতে হয়।

মহাপ্রভুর ধ্যান—শ্রীমন্মৌক্তিকদামবদ্ধ-চিকুরং সুস্মের চন্দ্রাননং
শ্রীখণ্ডাগুরু-চারু-চিত্রবসনং স্রগ্‌বিদ্যভূষাঞ্চিতম্।
নৃত্যাবেশ রসানুমোদ-মধুরং কন্দপবেশোজ্জ্বলং
চৈতন্যং কনকদ্যুতিং নিজজনৈঃ সংসেব্যমানং ভজে ॥

মহাপ্রভুব প্রণাম—আনন্দ লীলাময়-বিগ্রহায় হেমাভদিব্যচ্ছবি সুন্দরায়।
তস্মৈ মহাপ্রেম্‌রসপ্রদায় চৈতন্যচন্দ্রায় নমো নমোস্তে ॥

শ্রীনিত্যানন্দ প্রভুর পূজা

"নাং হৃদয়ায় নমঃ" এইরূপে অঙ্গন্যাস ও করন্যাস করে ধ্যান করার বিধি। ধ্যান---

"বিদ্যুদ্দাম-মদাভিমর্দ্দনরুচিং বিস্তীর্ণবক্ষঃস্থলং
প্রেমোদ্‌ঘূর্ণিত-লোচনাঞ্চল-লসৎ-স্মেরাভিরম্যাননম্।

নানাভূষণভূষিতং সুমধুরং বিভ্রদ্ঘনাভাস্বরং
সর্ব্বানন্দকরং পরং প্রবর-নিত্যানন্দচন্দ্রং ভজে ॥

নিত্যানন্দের প্রণামমন্ত্র—

"নিত্যানন্দমহং বন্দে কর্ণে লম্বিত-কুণ্ডলম্।
চৈতন্যাগ্রজরূপেণ পবিত্রীকৃত-ভূতলম্ ॥"

শ্রীঅদ্বৈতপ্রভুর পূজা

আং হৃদয়ায় নমঃ এইরূপে অঙ্গন্যাস ও করন্যাস কর, ধ্যান—

"সদ্ভক্তালিনিষেতাঙ্ঘ্রি কমলং কুন্দেন্দু-শুক্লাম্বরং
শুদ্ধস্বর্ণরুচিং সুবাহুযুগলং স্মেরাননং সুন্দরম্।
শ্রীচৈতন্যদৃশং বরাভয়করং প্রেমাঙ্গভূষান্বিতমদ্বৈতং
সততং স্মরামি পরমানন্দৈক-কন্দং প্রভুম্ ॥

প্রণামমন্ত্র : — নিস্তারিতাশেষজনং দয়ালুং প্রেমামৃতাব্ধৌ পরিমগ্নচিত্তম্,
চৈতন্যদেবাদৃতমাদরেণ অদ্বৈতচন্দ্রং শিরসা নমামি ॥

॥ শ্রীগদাধর-পণ্ডিতের পূজা ॥

"গাং হৃদয়ায় নমঃ" এইরূপে অঙ্গন্যাস ও করন্যাস করে ধ্যান—

"কারুণ্যৈকমরন্দ-পদ্মচরণং চৈতন্যচন্দ্রদ্যুতিং
তাম্বুলার্পণভঙ্গি দক্ষিণ করং শ্বেতাম্বরং সুন্দরম্
প্রেমানন্দ তনুং সুধাস্মিতমুখং শ্রীগৌরচন্দ্রেক্ষণং
ধ্যায়েচ্ছ্রীলগদাধরং দ্বিজবরং মাধুর্যভূষণোজ্জ্বলম্ ॥

ঐ প্রণামমন্ত্র— "গান্ধর্বিকা-স্বরূপায় গৌরাঙ্গ-প্রেম সম্পদে।
গদাধরায় যে নিত্যং নমোঽস্তু হি কৃপালবে ॥"

॥ শ্রীবাস-পণ্ডিতের পূজা ॥

"শ্রীং হৃদয়ায় নমঃ" এইরূপে অঙ্গন্যাস ও করন্যাস করে ধ্যান—

"শ্রীগৌরাঙ্গ-কৃপাবাসং গৌরমূর্তিরসপ্রদং
শুক্লাম্বরধরং পৃথ্বীদেবং ভক্তজনপ্রিয়ম।
সংকীর্তন রসাবেশং সর্ব্বসৌভাগ্য ভূষিতং।
স্মরামি ভক্তরাজং হি শ্রীশ্রীবাসং হরিপ্রিয়ম ॥

প্রণাম মন্ত্র : "শ্রীবাস-পণ্ডিতং নৌমি গৌরাঙ্গ-প্রিয়পার্ষদম্।
যস্যকৃপালবেনাপি গৌরাঙ্গে জায়তে রতিঃ ॥"

॥ পূজান্তে প্রার্থনা ॥

"মন্ত্রহীনং ক্রিয়াহীনং ভক্তিহীনং জনার্দ্দন।
যৎ পূজিতং ময়া দেব পরিপূর্ণং তদস্তুমে ॥
যদ্দত্তং ভক্তিমাত্রেণ পত্রং পুষ্পং ফলং জলম্।
আবেদিতং নিবেদন্তু তদ্ গৃহাণানুকম্পয়া ॥

অতঃপর শ্রীতুলসীকে যথা নিয়মে পূজা করে প্রণাম করে পূর্বাহ্নলীলা স্মরণ করা বিধেয়।

॥ মধ্যাহ্নকৃত্য ॥

নিত্যপাঠাদি কার্য সমাপনপূর্বক মধ্যাহ্ন স্নান ও পূজাদি করে বিবিধ ব্যঞ্জন সঘৃতশাল্যন্নাদি শ্রীকৃষ্ণ মহাপ্রভু প্রভৃতিকে নিবেদন কবা হয়। অতঃপর বাদ্যাদি সহকারে আরত্রিক, তুলসী পরিক্রমা ও চরণামৃত ও প্রসাদ গ্রহণ বিধেয়। বিগ্রহগণকে প্রণাম—সাষ্টাঙ্গ ও পঞ্চাঙ্গভাবে।

সাষ্টাঙ্গ প্রণাম—দণ্ডের ন্যায় মাটিতে পতিত হয়ে বাহু, দুই পদ, দুই জানু, বক্ষঃ, মস্তক, দর্শন, মনঃ ও বাক্যদ্বারা যে প্রণাম সেটাকে সাষ্টাঙ্গ প্রণাম এবং দুইজানু, দুই বাহু, মস্তক, বাক্য এবং বুদ্ধি—এই পাঁচটি অবয়ব দ্বারা প্রণামকে পঞ্চাঙ্গ প্রণাম বলে।

প্রদক্ষিণের নিয়ম ঃ—শ্রীভগবানকে চারবার প্রদক্ষিণ করতে হয়। অকালে (অর্থাৎ ভগবানের শয়নভোজনাদি কালকে অকাল বলে প্রদক্ষিণ নিষিদ্ধ।)

অপরাহ্ন-কৃত্য

সংখ্যাপূর্বক শ্রীহরিনাম গ্রহণ। শ্রীমদ্ভাগবত ইত্যাদি শাস্ত্রপাঠ।

শ্রীনামমালার ধ্যান— ত্রিভঙ্গভঙ্গিমদ্রূপং বেণুরন্ধ্র-করঞ্চিতম্।
গোপীমণ্ডলমধ্যস্থং শোভিতং নন্দনন্দনম্ ॥

সায়ং কৃত্য—সায়াহ্নে স্নান ও তিলকধারণ করে মন্দিরের দ্বার উদঘাটন করে বিগ্রহের গাত্রোত্থান করিয়ে আচমন দিতে হয়। পরে কিঞ্চিৎ ভোগ সমর্পণ করে আরত্রিক করে আরতি-কীর্তন ও সায়াহ্নলীলা স্মরণ বিধেয় ॥

প্রদোষ কৃত্য—প্রথমতঃ প্রদোষলীলা স্মরণ করে যথাশক্তি ভোগ সমর্পণ পূর্বক আরত্রিক করে বিগ্রহকে শয়ন দিয়া দ্বার বন্ধ করে প্রণাম করতে হয়। অতঃপর সংখ্যাবদ্ধ শ্রীহরিনাম জপ করে প্রসাদ ভোজন করার বিধি।

শয়ন মন্ত্র ঃ—"সুপ্তঃ সুপ্তো জগন্নাথঃ শয়নং কর কেশব।/রাধিকা প্রাণনাথায় নিদ্রা কুরুবে জনার্দ্দন ॥"

নিশা-কৃত্য—নিশাকালে শ্রীহরিনাম-সংখ্যা-জপ পূর্ণ কবে নিশীথকালীন কীর্তনাদি করতঃ নৈশলীলা স্মরণ বিধেয়। তারপর ভগবানের স্মরণ করতে করতে শয়ন করা বিধেয়।

দশম অধ্যায়

চৌরাশি ক্রোশ ব্রজমণ্ডলের দ্বাদশ বন, বৈষ্ণবগণের লুপ্তবৃন্দাবন উদ্ধার ও অন্যান্য বিশেষ দ্রষ্টব্য স্থান

দ্বাদশ বন : — যমুনা নদীর পশ্চিম তীরে ১। বৃন্দাবন ২। মধুবন ৩। তালবন ৪। কুমুদবন ৫। বাহুলাবন ৬। কাম্যবন ও. ৭। খদির বন এবং যমুনানদীর পূর্ব পারে ৮। ভদ্রবন ৯। ভাণ্ডীরবন ১০। বিল্ববন ১১। লৌহবন এবং মহাবন বা গোকুল।

চব্বিশটি উপবন— ১। গোকুল ২। গোবর্ধন ৩। বর্ষাণ ৪। সঙ্কেত ৫। নন্দগ্রাম ৬। পরমাদরা ৭। আড়িং ৮। শেষশায়ী ৯। ঘাটবন ১০। উঁচাগাঁও ১১। খেলনবন ১২। শ্রীরাধাকুণ্ড ১৩। গন্ধর্ববন ১৪। পরাশৌলি ১৫। বিলচ্ছু ১৬। বাচবন ১৭। আদিবদ্রী ১৮। করালা ১৯। আঁজনখ ২০। কোকিলাবন ২১। পিয়াসো ২২। দধিগাঁও ২৩। কোটবন ও ২৪। রাভেল।

ব্রজমণ্ডলের পঞ্চ পর্বত : ১। গোবর্ধন ২। বর্ষাণ ৩। নন্দীশ্বর ৪। বড়চরণ পাহাড়ী এবং ৫। ছোটচরণ পাহাড়ী।

ব্রজমণ্ডলের সপ্ত সরোবর— ১) মানস সরোবর ২) কুসুম সরোবর, ৩) চন্দ্রসরোবর ৪) প্রেম সরোবর ও ৫) নারায়ণ সরোবর। ৬) মান সরোবর ও ৭) পাবন সরোবর।

সপ্তস্থানে শ্রীকৃষ্ণের চরণচিহ্ন— ১। নন্দগ্রামে ২। সুরভি কুণ্ডতটে ৩। শ্রীগোবর্ধন গিরির তলদেশ ৪। গোবর্ধনগিরির শিখরে ৫। হস্তীপদ সমীপে ৬। বড়চরণ পাহাড়ীর উপর ৭। ছোটচরণ পাহাড়ীর উপর।

ছয়টি ঝুলন স্থান— ১। গোবর্ধন পর্বতে ২। সংকেত কুঞ্জে ৩। শ্রীরাধাকুন্যে। ৪। কর-হলাগ্রামে ৫। আঁজনখে ৬। শ্রীবৃন্দাবনে।

ছয়টি দানলীলার স্থান— ১। গোবর্ধনে ২। দানঘাটীতে ৩। করহলাতে ৪। কদম্বখণ্ডীতে ৫। গহ্বর বনে ৬। সকরীখোটে।

বৃন্দাবনের তিনটি বট : ১। বংশী বট ২। অদ্বৈত বট ৩। শৃঙ্গার বট।

বৃন্দাবনের দুইটি পুলিন—১। যমুনা পুলিন—যমুনার দুই ধারার মধ্য-স্থান ২। রাসপুলিন-ধীর সমীর ও রাধাবাগের মধ্যে অবস্থিত।

নয়টি ক্ষেত্রপাল মহাদেব মূর্তি— ১। গোপেশ্বর ২। ভূতেশ্বর ৩। গোকর্ণেশ্বর ৪। বঙ্গেশ্বর ৫। কামেশ্বর ৬। হতরেশ্বর ৭। নন্দীশ্বর ৮। চকলেশ্বর ও ৯। বৃদ্ধেশ্বর বা বুড়ো বাবা।

গোস্বামীগণের সমাধিস্থান—১। শ্রীমদনমোহন মন্দিরের পশ্চাতে সনাতন গোস্বামীর ২। শ্রীরাধাদামোদর মন্দির নিকট শ্রীরূপ ও জীব গোস্বামী ৩। গোপীনাথজীর মন্দির নিকট মধুপণ্ডিতের ৪। রাধারমণ ঘেরায় গোপাল ভট্টের ৫। শ্রীগোকুলানন্দে লোকনাথ গোস্বামীর ৬। চৌষাট্টি মহান্তের সমাজের নিকট ছয় চক্রবর্তী ও অষ্ট কবিরাজের ৭। ধীর সমীরে শ্রীনিবাস ও রামচন্দ্র কবিরাজের ৮। শ্যামসুন্দর মন্দির নিকট 'শ্যামানন্দ প্রভুর ৯। কালীয়দহে প্রবোধানন্দ সরস্বতীর সমাধি বিদ্যমান।

• দ্বাদশ বন পরিচিতি

১। বৃন্দাবন : শ্রীকৃষ্ণ লীলা সম্বরণ করার অনেক পরে তাঁর প্রপৌত্র বজ্রনাভ মথুরার

রাজা হন। তাঁর মাতা রোচনাদেবী সাক্ষাৎ শ্রীকৃষ্ণকে চোখে দেখেছিলেন। শ্রীকৃষ্ণ কি বস্তু ছিলেন আগে রোচনা দেবী তা বুঝতে পারেন নি। পরবর্তীকালে লোক ব্যবহার দেখে ও তাদের মুখে কৃষ্ণ কথা শুনে তাঁর কৃষ্ণ পূজা করবার আকাঙক্ষা জাগল। তখন তিনি নিজ পুত্র বজ্রনাভকে আদেশ করলেন শ্রীকৃষ্ণমূর্তি নির্মাণ করার জন্য।

বজ্রনাভ খ্যাতনামা কারিগর দ্বারা পর পর তিনটি মূর্তি প্রস্তুত করিয়ে মাকে দেখালেন। প্রথমটি দর্শনে মা বলেছিলেন 'মুখ ঠিক হয়েছে', দ্বিতীয়টির বেলায় বললেন 'বুকটা ঠিক হয়েছে' আর তৃতীয়টির বেলায় বললেন 'চরণ ঠিক হয়েছে।' মাতা আর মূর্তি তৈরি করতে নিষেধ করলেন। জননী রোচনা দেবী এই তিন মূর্তিরই পূজা করতে লাগলেন। পরপর নাম দিলেন 'গোবিন্দ', 'গোপীনাথ' আর মদনমোহন।

কালক্রমে যুগের পরিবর্তনে এই সব মূর্তি লুকিয়ে যায় এবং বৃন্দাবন বনজঙ্গলে পূর্ণ হয়ে ওঠে। মুসলমান রাজত্বকালেই চরম বিনষ্টি ঘটে। কিন্তু সবই ঘটে তাঁর ইচ্ছায়। এখন হতে পঞ্চশতাধিক বৎসর পূর্বে শ্রীকৃষ্ণ আবির্ভূত হলেন শ্রীগৌরাঙ্গরূপে শ্রীধাম নবদ্বীপে। তাঁর প্রধান পরিকর রূপ ও সনাতন মহাপ্রভুর আদেশে অন্যান্য বহু শিষ্যসহ বৃন্দাবনে গিয়ে বাস করেন। মহাপ্রভুর কৃপায় এই সমস্ত ভক্তগণ দ্বারা লুপ্ত শ্রীমূর্তি ও কৃষ্ণের লুপ্ত লীলাস্থল আবিষ্কৃত হয়।

গোবিন্দদেব :— শ্রীপাদরূপ গোস্বামী দ্বারা প্রকটিত হন। গোমাটিলায় যোগপীঠে ভূগর্ভস্থ ছিলেন। রূপ গোস্বামীর ব্যাকুলতায় প্রকট হন। শ্রীরূপ গোস্বামী সমস্ত যোগপীঠে ও ব্রজবাসীর ঘরে ঘরে বনে বনে ভ্রমণ করে যখন গোবিন্দের সন্ধান পেলেন না, তখন নিরাশ হয়ে ব্যাকুলচিত্তে যমুনার তটে পড়ে রইলেন। ভক্তবৎসল শ্রীকৃষ্ণ ব্রজবাসীরূপে দর্শন দিয়ে শ্রীরূপ গোস্বামীর অভিলাষ পূর্ণ করলেন।

"ব্রজবাসী কহে চিন্তা না করিহ মনে।
গোমাটিল্লা খ্যাতি যোগপীঠ বৃন্দাবনে ॥"
তথা কোন গাভীশ্রেষ্ঠ পূর্ব্বাহ্ন সময়।
দুগ্ধ দেন প্রতিদিন উল্লাস হিয়ায় ॥
শ্রীগোবিন্দ দেব তথা আছেন গোপনে।
এত কহি রূপে লৈয়া গেলা সেই স্থানে ॥
স্থান জানাইয়া তিঁহ অদর্শন হৈতে।
মুর্চ্ছিত হইয়া রূপ পড়িলা ভূমিতে ॥" (ভক্তি রত্নাকর ২য় তরঙ্গ)

এইভাবে জানতে পেরে শ্রীরূপ গোস্বামী ভূগর্ভ হতে উদ্ধার করে সেবা প্রকট করেন। পরে শ্রীরঘুনাথ ভট্টগোস্বামী স্বীয় ভক্তের দ্বারা শ্রীগোবিন্দের মন্দির নির্মাণ করিয়ে মকর কুণ্ডলাদি অর্পণ করেন।

"নিজ শিষ্যে কহি গোবিন্দের মন্দির করাইল।
বংশী মকর কুণ্ডলাদি ভূষণ করি দিল।" (চৈ. চরি-অন্ত্যখণ্ড)

গদাধর গোস্বামীর শিষ্য শ্রীহরিদাস গোস্বামী কর্তৃক শ্রীগোবিন্দের প্রেয়সী স্থাপিত হয়।

ঔরঙ্গজেবের অত্যাচারে গোবিন্দদেব জয়পুর অভিমুখে রওনা হন। ১৬৬৬ খৃষ্টাব্দে কাম্যবনে, ১৭০৭ খৃষ্টাব্দে গোবিন্দপুরায়, ১৭১৪ খৃষ্টাব্দে অম্বরে এবং ১৭১৬ খৃষ্টাব্দে জয়পুর বিজয় করেন। অদ্যাবধি জয়পুরে সেবিত হচ্ছেন।

মদনমোহন : — শ্রীপাদ সনাতন গোস্বামী শ্রীরাধা মদনমোহন দেবের সেবা প্রকাশ করেন। শ্রীঅদ্বৈত আচার্য তীর্থভ্রমণকালে যখন বৃন্দাবনে আসেন সেই সময় কুব্জার সেবিত শ্রীমদনমোহন দেব স্বপ্নাদেশ প্রদানে প্রকট হন।

যখন কৃষ্ণ কংস বধ করে কুব্জার মন্দিরে গিয়ে সেখান হতে বিদায় নিতে চান তখন কুব্জা ছাড়তে রাজি নন। অগত্যা কৃষ্ণ বলেন "কৃষ্ণ কহে কুব্জা তুমি মুদহ নয়ন। এথায় থাকিব নাহি যাব অন্যস্থান। কিন্তু কুব্জা যেই নয়নমুদিত করলেন কৃষ্ণ গেলেন অদৃশ্য হয়ে আপন দ্বিতীয় মুর্তি রেখে। এই মূর্তিরই কুব্জা পূজা করতে থাকেন। কুব্জা অপ্রকট হলে একজন ব্রাহ্মণ সেবাপ্রাপ্ত হন। কিন্তু পরবর্তী কালে যবনরাজার অত্যাচারে ব্রাহ্মণ গেলেন পালিয়ে মদনগোপালকে রেখে দিয়ে। পরে অদ্বৈত আচার্য উক্ত বিগ্রহ উদ্ধার করেন। 'তৎপর সনাতন গোস্বামী যমুনার সূর্যঘাটে সুরমা টিলায় কুটীর নির্মাণ করে সেবা স্থাপন করেন। কতদিনে প্রভু মদনমোহন অপ্রাকৃত লীলাপ্রকাশের দ্বারা শ্রীমন্দিরাদি নির্মাণ করান। ঘটনাটি এইরূপ :

অদ্বৈত আচার্য বহুদিন সেবা পূজার পর নবদ্বীপ চলে গেলে সেবার ভার পড়ল এক বিধবা ব্রাহ্মণীর উপর। পূজা ভোগ শেষ করে ব্রাহ্মণী অন্যত্র চলে গেলে মদনগোপাল বালক বেশে পাড়ার ছেলেদের সঙ্গে খেলা করেন, কেউ নাম জিজ্ঞাসা করলে বলেন আমার নাম মদন। দুষ্টু মদন সঙ্গীদের মারামারি করত। তাদের মা বাপকে জানাত মদনের অত্যাচারের কথা।

এই সময় সনাতন গোস্বামী মহাপ্রভুর আদেশে বৃন্দাবনে আসেন। তিনি প্রায়ই মথুরা যান। মথুরার লোকেরা সনাতন গোস্বামীকে দেখিয়ে মদনকে ভয় দেখাতেন। গোঁসাইও বলতেন, মদন তোমাকে ধরে নিয়ে যাব, ভয় করা দূরে থাক একদিন মদন বলল, আমি তোমার সঙ্গে যাব। গোঁসাই বললেন, আমার ঘর নাই, গাছতলাতে থাকি, খাবার প্রায়ই থাকে না। পোড়া রুটি খাই, লবণও জুটে না। তুমি কি সহ্য করতে পারবে? মদন ঐভাবেই থাকতে রাজি হল। বাসায় ভিক্ষা শেষে ফিরে এসে দেখেন মদন গোঁসাই এর কুটীরে প্রস্তরময় মূর্তিতে শোভা পাচ্ছে, গোঁসাই আনন্দে পূজা করেন আর পোড়া রুটির ভোগ দেন। এদিকে ব্রাহ্মণী মদনের খোঁজ করতে করতে সনাতনের কুটীরে এসে হাজির হন। স্বপ্নে ব্রাহ্মণীকে বলেন, তিনি আর যাবেন না। যতদিন ব্রাহ্মণী বেঁচে ছিলেন, প্রতিদিন তিনি মদন গোপালকে দেখে যেতেন। একদিন গোঁসাইকে স্বপ্নে বললেন—'রুটির সঙ্গে একটু লবণ হলে ভাল হত। 'গোঁসাই'-এর উত্তর 'ঠাকুর, আমি তো আগেই জানিয়েছি, যে যা দিচ্ছে, তার বেশী কিছুই দিতে পারবো না।' আজ তুমি লবণ চাইচো, কাল ক্ষীর সর চাইবে। ভিক্ষায় আমি ঐসব জিনিস চাইলে লোকে আমাকে অভক্তি করবে এবং লোভী বলবে।"

এর কিছুদিন পর "হেন কালে মুলতানদেশীয় একজন
অতিশয় ধনাঢ্য সর্ব্বাংশে বিচক্ষণ
কর্পূর ক্ষত্রিয়শ্রেষ্ঠ নাম কৃষ্ণদাস।
নৌকা হইতে নামি আইলা গোস্বামীর পাশ।

কেননা, লবণসহ বোঝাই করা নৌকাগুলি যমুনার সূর্যঘাটে আটকিয়ে গিয়েছে। কয়েকদিন চেষ্টা করা সত্ত্বেও নৌকাগুলি নড়েনি। তাই কোন দেবদেবীর ঘটনা মনে করে ধুম লক্ষ্য করে বনমধ্যে অগ্রসর হয়ে সনাতনের নিকট এসেছিলেন বিপদ উদ্ধারের আশায়। জিজ্ঞাসা করে যখন সনাতন জানতে পারলেন নৌকায় লবণ আছে তখন তিনি মনে মনে হাসলেন, এবং মদনগোপালের নিকট প্রার্থনা জানাতে বললেন। সেখানে গিয়ে প্রার্থনা করলেন, 'প্রভু উদ্ধার কর। এবারকার সমস্ত লাভ আপনার চরণে অর্পণ করব। প্রভুর ইচ্ছায় নৌকা চলল এবং লাভ হল আটগুণ।' বণিক ঐ টাকা নিয়ে সনাতনকে দিতে এলে তিনি মন্দির তৈরি ও সেবা প্রজা করার পরামর্শ দিলেন। বণিক তাই করলেন। আজও ঐ মন্দির রয়েছেন। মদন মোহনের পুরাতন মন্দির নামে খ্যাত। ঔরঙ্গজেবের অত্যাচারের সময় প্রথমে জয়পুরে, পরে করোলীতে স্থানান্তরিত হন। বর্তমানে করোলীতে সেবিত হচ্ছেন।

শ্রীশ্রীগোপীনাথ দেব : রাসস্থলীতে যখন রাসের রচনা হয়, তখন গোপীগণ রাসস্থলীর মধ্যস্থলে গোপীনাথকে স্থাপন করেছিলেন। ঐ গোপীনাথ মূর্তি পূজিত হতে থাকেন। কিন্তু পরবর্তীকালে বিধর্মীদের আক্রমণে বিগ্রহটি কোথায় অদৃশ্য হয়ে যায়।

পরে শ্রীমধুপণ্ডিত ব্রজে গিয়ে ভাবাবেশে বৃন্দাবন পরিভ্রমণ করে শ্রীকৃষ্ণ দর্শন অনুরাগে বংশীবটতলে এসে অনাহারে ক্ষিতিতলে পড়ে রইলেন। ভক্তবৎসল প্রভু প্রতিমারূপে তাঁকে দর্শন দিলে তিনি কেশী ঘাটের নিকটে, ঐ প্রতিমা স্থাপন করেন। পরে রাজপুতনার ভাগ্যবান শাসনজী মন্দির নির্মাণ করেন। শ্রীগোপীনাথ দেব প্রেয়সীর সহিত প্রকট হন। ভক্তিরত্না করে :

"শ্রীরাধিকাসহ গোপীনাথের প্রকট।
পূর্ব্বে জানাইলা বংশীবটের নিকট ॥"

শ্রীগোপীনাথ দেবের প্রেয়সী স্থাপনে বহু অলৌকিক লীলা সংঘটিত হয়, শ্রীজাহ্নবা দেবী ব্রজধামে গিয়ে শ্রীগোপীনাথ দেবের বামে শ্রীরাধিকামূর্তি দর্শন করে চিন্তা করলেন, যদি শ্রীরাধিকা কিঞ্চিৎ উচ্চ হত তাহলে গোপীনাথকে অধিকতর সুন্দর দেখাত। বাসায় এসে শয়নকালে গোপীনাথ স্বপ্নে বললেন, "তোমার পছন্দমত প্রেয়সী তৈরি করে স্থাপন কর। শ্রীজাহ্নবা দেবী গৌড়ে এসে নয়ন ভাস্করের দ্বারা শ্রীমূর্তি নির্মাণ করিয়ে পরমেশ্বর দাসের মাধ্যমে নৌকাযোগে বৃন্দাবনে প্রেরণ করেন এবং তা গোপীনাথের বামে স্থাপিত হয়।

অনুরাগবল্লী— "অভিষেক করি বাম দিগে বসাইলা।
পূর্ব ঠাকুরানী দক্ষিণ দিগেতে রাখিলা ॥"

শ্রীরাধারমণ দেব : — শ্রীরাধারমণ দেব শ্রীলগোপাল ভট্ট গোস্বামী কর্ত্তৃক প্রতিষ্ঠিত,

ভক্তিরত্নাকর— "শ্রীগৌরাঙ্গদেব আজ্ঞা দিল গোস্বামীরে।
শালগ্রাম হৈতে তুমি দেখিবে হরিরে।।"

একদিন কোন ধনী লোক বৃন্দাবনের সমস্ত বিগ্রহকে দামী ও সুন্দর পোষাক দেন। কিন্তু শালগ্রাম শিলা মূর্তিবিহীন বলে কোন পোষাক পান নি। ব্যথিত হল গোপাল ভট্ট গোস্বামীর হৃদয়—আমার ঠাকুর যদি রাধারমণ বিগ্রহ হতেন, তবে নিশ্চয়ই পোষাক পেতেন। কামনা পূর্ণ হল সঙ্গে সঙ্গে, সকালে উঠে দেখেন শালগ্রাম শিলা নেই, আছেন রাধারমণ। বৈশাখী পূর্ণিমায় শ্রীরাধারমণ সিংহাসনে উপবেশন করেন। শ্রীগোপীনাথ পূজারী সর্বপ্রথম শ্রীরাধারমণের সেবক নিযুক্ত হন। পরে তাঁর ভাই দামোদর গোঁসাই ও ভ্রাতুষ্পুত্র হরনাথ, হরিরাম ও মথুরাদাস সেবায় নিযুক্ত হন। অদ্যাপি তাঁদের বংশধরগণই শ্রীরাধারমণের সেবক।

শ্রীরাধাদামোদর দেব : — বন্দি জীব গোস্বামীর রাধাদামোদর।
যার দরশনে তৃপ্ত ভক্তের অন্তর ॥

শ্রীরাধাদামোদরদেব-শ্রী জীব গোস্বামী কর্ত্তৃক সেবিত।

"স্বপ্নাদেশে শ্রীরূপ শ্রীরাধা দামোদরে।
স্বহস্তে নির্মাণ করি দিল শ্রীজীবের ॥" (ভক্তিরত্নাকর)

এইভাবে শ্রীরাধাদামোদর প্রকট হন। শ্রীরাধাদামোদরের মন্দিরে শ্রীভৃগুপাদ শিলা আছেন

"গোস্বামীরে কৃষ্ণচন্দ্র করুণা করিয়া।
নিজ পদচিহ্ন দিলা শিলাতে ধরিয়া ॥
অদ্যাপি তাহার সেবা শ্রীমন্দিরে হয়।
ভাগ্যবান লোক সব যাইয়া দেখয় ॥ "

বর্তমানে শ্রীজীবগোস্বামীসেবিত শ্রীরাধাদামোদর দেব ও শ্রীভৃগুপাদশিলা জয়পুরের ত্রিপোলিয়া বাজারের নিকট বিদ্যামান। ১৭০৩ খৃষ্টাব্দে ভাদ্রমাসের শুক্লাষ্টমীতে বুধবারে শ্রীভৃগুপাদশিলা বৃন্দাবন হতে জয়পুরে আসেন। ১৭৬০ খৃষ্টাব্দে মাঘী কৃষ্ণানবমীতে মাধব

সিংহের রাজত্বকালে শ্রীরাধাদামোদর দেব বৃন্দাবন হতে জয়পুরে আসেন। ১৭৯৬ খৃষ্টাব্দে পুনরায় সকলবিগ্রহ বৃন্দাবনে যান। ১৮২১ খৃষ্টাব্দের জ্যৈষ্ঠমাসের শুক্লা নবমীতে পুনরায় জয়পুরে নীত হন।

শ্রীরাধাবিনোদ দেব : — প্রভু লোকনাথ কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত, ছত্রবন পার্শ্বে-উমরাও গ্রামে কিশোরী কুণ্ডতীরে প্রভু লোকনাথ নির্জনে ভজনরত ছিলেন। সে সময় শ্রীকৃষ্ণ ব্রাহ্মণ বেশে এক বিগ্রহ নিয়ে সেখানে আসেন। এসে লোকনাথের হাতে বিগ্রহ দিয়ে বলেন, তুমি রাধাবিনোদ নামে এঁর সেবা কর। এই কথা বলে বিপ্রবেশধারী শ্রীকৃষ্ণ অন্তর্ধান করলেন।

"লোকনাথ গোসাঞি চিন্তয়ে মনে মনে।
কে হেন বিগ্রহ দিয়া গেল কোনখানে ॥"

এইভাবে প্রকট হয়ে প্রভু বললেন, "আমি খুবই ক্ষুধার্ত হয়েছি, এখন আমায় কিছু খেতে দাও।" তখন লোকনাথ পাক করে প্রভুকে ভোজন করালেন। তারপর পুষ্পশয্যায় শয়ন করিয়ে পল্লবদ্বারা বাতাস করে পাদ সংবাহন করলেন। তিনি একটি ঝোলার মধ্যে বৃক্ষের কোটরে রাখতেন। আর নিজে বৃক্ষতলে থাকতেন। কতদিন পর বৃন্দাবনে এসে থাকেন। তাঁর সেবিত শ্রীরাধাবিনোদ বিগ্রহ বর্তমানে জয়পুরে ত্রিপোলিয়া বাজারের সম্মুখে বিরাজ করছেন।

শ্রীগোকুলানন্দ দেব : শ্রীলবিশ্বনাথ চক্রবর্তী কর্তৃক সেবিত। শ্রীগোকুলানন্দ সেবাপ্রাপ্তি সম্বন্ধে শ্রীনরহরি দাস রচিত গ্রন্থে

"পরম সুশান্ত বিজ্ঞ এক ব্রহ্মচারী।
মথুরা আইলা তীর্থ প্রদক্ষিণ করি ॥
শ্রীগোকুলানন্দের সেবায় সদারত।
তাঁর যৈছে ক্রিয়া তা কহিবে কেবা কত।
একদিন স্বপ্নচ্ছলে শ্রীগোকুলানন্দ।
ব্রহ্মচারী প্রতি কহে হাসি মন্দমন্দ ॥
বৃন্দাবনে বিশ্বনাথ ব্রহ্মচারী যথা।
তারে সমর্পিহ মোরে লৈয়া যাহ তথা ॥
রজনী প্রভাতে ব্রহ্মচারী মহানন্দে।
বিশ্বনাথে সমর্পয়ে শ্রীগোকুলানন্দে ॥"

এইভাবে ব্রহ্মচারী স্বপ্নাদিষ্ট হয়ে শ্রীগোকুলানন্দকে এনে শ্রীবিশ্বনাথ চক্রবর্তীর হস্তে সমর্পণ করেন। এখানে শ্রীরঘুনাথ দাস গোস্বামীর শ্রীগিরিধারী বিরাজমান।

শ্রীগিরিধারীদেব : — শ্রীরঘুনাথদাস গোস্বামী কর্তৃক সেবিত শ্রীমহাপ্রভু স্বহস্তে শ্রীদাস গোস্বামীকে অর্পণ করেন। তথাহি চৈ, চরিতামৃতে

"শঙ্করানন্দ সরস্বতী হৈতে আইলা।
তেঁহ সেই শিলা গুঞ্জামালা লঞা গেলা ॥
পার্শ্ব গাঁথা গুঞ্জামালা গোবর্ধনের শিলা।
দুই বস্তু মহাপ্রভুর আগে আনি দিলা ॥
দুই অপূর্ব বস্তু পায়া প্রভু তুষ্ট হৈলা।
স্মরণের কালে গলে পরে গুঞ্জমালা।
গোবর্ধনের শিলা প্রভু হৃদয়ে নেত্রে ধরে।
কভু নাসায় ঘ্রাণ লয় কভু শিরে করে ॥
নেত্রজলে সেই শিলা ভিজে নিরন্তর।
শিলাকে কহেন প্রভু কৃষ্ণ কলেবর ॥

এইমত তিন বৎসর শিলা-মালা ধরিল।
তুষ্ট হঞা শিলা মালা রঘুনাথে দিল ॥"

শ্রীশ্রীগোপালদেব : শ্রীমাধবেন্দ্রপুরী কর্তৃক প্রকটিত। শ্রীমাধবেন্দ্র পুরী ভ্রমণ করতে করতে বৃন্দাবনে আসেন। গোবর্ধন পরিক্রমা করে গোবিন্দকুঞ্জে স্নান করে বৃক্ষমূলে উপবেশন করলে গোপালদেব গোপশিশু বেশে দর্শন দিয়ে দুগ্ধ প্রদান করেন। তারপর নিশাভাগে স্বপ্নযোগে দর্শন দিয়ে বলেন,

"শ্রীগোপাল নাম মোর গোবর্ধনধারী
ব্রজের স্থাপিত আমি ইঁহা আধকারী ॥
শৈলের উপর হৈতে আমা কুঞ্জে লুকাইয়া।
ম্লেচ্ছ ভয়ে সেবক মোর গেল পলাইয়া ॥
সেই হৈতে রহি আমি এই কুঞ্জস্থানে।
ভাল আইলা আমাকার সন্নিধানে ॥"

তখন মাধবেন্দ্র পুরী প্রভুর আজ্ঞা পালনের জন্য প্রভাতে গ্রামমধ্যে গিয়ে ব্রজবাসীগণকে সমস্ত বললেন। সকলে মহানন্দে কুঞ্জ হতে শ্রীগোপালদেবকে প্রকট করে গোবর্ধন পর্বতোপরি স্থাপন করলেন।

কতদিন পরে ঔরঙ্গজেবের অত্যাচারের আশঙ্কায় উদয়পুরের রাণা বীরকেশরী বাজসিংহ গোপালদেবকে মেবারে আনতে ইচ্ছা করেন কোটা রামপুরিয়ার পথ দিয়ে। সিহাড় গ্রামে রথচক্র বসে গেলে সেখানে জায়গীরগণের অত্যুৎসাহে শ্রীগোপালদেবকে তথায় স্থাপন করেন। সেবকগণ গোপালজীকে নাথজী বলেন। সিহাড় গ্রাম পরবর্তী শ্রীনাথদ্বার নামে প্রসিদ্ধ হয়। শ্রীবল্লভভট্টের পুত্র বিটলেশ্বরের পঞ্চম অধস্তন বড় দাউজী মহারাজের সময়ে গোপালদেব মথুরা হতে মেবারের পথে গমন করেন। শ্রীল রঘুনাথ গোস্বামীর সময়েই শ্রীবল্লভভট্টের পুত্র শ্রীবিঠবলেশ্বর গোপালদেবের সেবাধিকারী হন। তথাহি ভক্তিরত্নাকরে 'মাধবেন্দ্রকৃপাতে গৌড়ীয়া বিপ্রদ্বয় বৈরাগ্য প্রবল, প্রেমভক্তি রসময়॥ কহিতে কি সেই বিপ্রের অদর্শনে। কথোদিন সেবে কোন ভাগ্যবন্ত জনে।" শ্রীদাস গোস্বামী আদি পরামর্শ করি। শ্রীবিঠলেশ্বরে কৈলা সেবা অধিকারী।

সম্ভবত ১৩৯২ শকের শেষভাগে শ্রীগোপালদেব প্রকট হন। কারণ ১৩৯৫ শকে মাঘমাসে প্রভু নিত্যানন্দের জন্মদিনে শান্তিপুরে শ্রীমদ্বৈত আচার্যের সঙ্গে শ্রীপাদ মাধবেন্দ্র পুরীর মিলন ঘটে। দুই বৎসর সেবা করে চন্দনোদ্দেশে ক্ষেত্রপথে গৌড়ে এসে অদ্বৈত প্রভুর সহিত মিলিত হন।

শ্রীবৃন্দাজী : শ্রীরূপ গোস্বামী স্বপ্নাদিষ্ট হয়ে ব্রহ্মকুণ্ডতট হতে শ্রীবৃন্দাজীকে প্রকট করেন। ভক্তিরত্নাকারে

"শ্রীরূপে শ্রীবৃন্দা স্বপ্নচ্ছলে জানাইলা।
ব্রহ্মকুণ্ড তট হৈতে তাঁরে প্রকাশিল ॥"

শ্রীবৃন্দাজী এখন কাম্য বনে বিরাজিত। কাম্যবনে বৃন্দাজীর অবস্থিতি সম্পর্কে 'ভক্তমাল' গ্রন্থে

"ব্রহ্মকুণ্ড হইতে শ্রীবৃন্দাজী উঠিলা। / এবে কাম্যবনে যেহ যাইয়া রহিল ॥
রাজা জয়সিংহ জয়পুরে লয়া যায়। / কাম্যবনে যাই তথা বিশ্রাম করয় ॥
রাত্রি রহি প্রাতঃকালে গমন উদ্যোগে / লইয়া যাইতে চাহে রথের সংযোগে ॥
উঠাইতে না পারিল দশজনে ধরি। / যাইতে বাসনা নাহি হইলেন ভারি ॥
আশয় বুঝিয়া রাজা নিরস্ত হইল। / তথায় মন্দিরাদি বনাইয়া দিল ॥
সেই হতে বৃন্দাজীর্ড রহে কাম্য বনে ॥"

শ্রীগোবর্ধন শিলা : শ্রীপাদ সনাতন গোস্বামী যখন বৃন্দাবনের চক্রতীর্থে অবস্থান করেন, সেই সময় তিনি প্রতিদিন গোবর্ধন প্রদক্ষিণ করতেন। বার্ধক্যের কষ্ট দেখে ভজবৎসল প্রভু প্রকট হয়ে কৃপা-প্রকাশ করলেন।

"বৃদ্ধকালে মহাশ্রম দেখি গোপীনাথ।
গোপ বালকের ছলে হইলা সাক্ষাৎ ॥"

গোপবালক বললেন, এই বয়সে তোমার এত শ্রম সহ্য হবে না। বালক গোবর্ধন পর্বতে উঠে কৃষ্ণপদ চিহ্ন যুক্ত একটি শিলা এনে বললেন, আজ হতে তুমি এই শিলা পরিক্রমা করবে তাহলেই গোবর্ধন পরিক্রমার ফল পাবে। এই শিলা দিয়ে বালক অদৃশ্য হয়ে গেল। এইভাবে কৃষ্ণপদ চিহ্নযুক্ত গোবর্ধন শিলা প্রকট হলেন।

বঙ্কবিহারী মন্দির : সঙ্গীত সম্রাট তানসেনের গুরুদেব হরিদাস গোস্বামীর প্রতিষ্ঠিত এই মন্দির। বৃন্দাবনের সমস্ত মন্দিরের মধ্যে এখানেই সর্বাধিক ভিড় হয়। বিশাখা সখীর হাতে এই বিগ্রহের নির্মাণ হয়েছে। ইনি নিধুবনে প্রকট হন। বাৎসল্যভাবে পূজা হয়, আরতির সময়ে শঙ্খ ঘন্টা ইত্যাদি কোনও বাদ্যযন্ত্র বাজানো হয় না, শিশুরূপে পূজিত ঠাকুর ভয় পাবেন বলে। শিশুর সুরক্ষার প্রশ্নে এখানে ঝঁকি দর্শন হয়, যেহেতু এক দৃষ্টিতে তাকালে নজর লেগে যাবে, সেই কারণে ঝঁকির ব্যবস্থা।

শেঠের মন্দির : বিরাট মন্দির, এতবড় মন্দির বৃন্দাবনে আর নেই। ভিতরে সোনার স্তম্ভ আছে। সোনার স্তম্ভ ছাড়া সোনার পালকী, সোনার বাহন, সোনার গড়ুর মূর্তি ইত্যাদি। উৎসব-অনুষ্ঠানে এগুলি বের করা হয়। বিগ্রহ রঙ্গজী। সবচেয়ে বড় পর্ব চৈত্রমাসে রথের মেলা। রথ এবং বাজী পোড়ান দেখতে লক্ষ লক্ষ লোকের সমাগম হয়। মন্দির নির্মাণ করিয়েছিলেন শেঠ লক্ষ্মীনারায়ণ।

লালাবাবুর মন্দিরে : মুর্শিদাবাদের কান্দীর বিরাট ধনী লালাবাবু। এক ভিখারিণীর 'বেলা যায়' ডাকে সংসার বাসনায় জলাঞ্জলি দিয়ে বৃন্দাবনে চলে আসেন এবং কৃষ্ণচন্দ্রের বিরাট মন্দির নির্মাণ করে কৃষ্ণসেবায় জীবন অতিবাহিত করেন।

শাহজীর মন্দির : লক্ষ্ণৌর শেঠ কুন্দনলাল শাহের নির্মিত এই মন্দির অত্যন্ত দর্শনায় সমগ্র মন্দিরটি ইটালিয়ান মার্বেল দ্বারা নির্মিত। এক একটি বিরাট শ্বেত প্রস্তর খণ্ড হতে নির্মিত আঁকাবাঁকা স্তম্ভ আশ্চর্যান্বিত করে দেয়। মন্দিরের দেওয়ালে কারুকার্য করা একাধিক চিত্র মনকে মুগ্ধ করে দেয়। সময়ে সময়ে উন্মুক্ত 'বাসন্তী' কামরা অতীব মনোরম ও মনমুগ্ধকর। এখানকার বিগ্রহ 'শ্রীরাধারমণ'।

জামাই বিনোদ মন্দির : তাড়াস স্টেটের কন্যা বিনোদিনী তাঁর পিতার কাছে ইচ্ছা প্রকাশ করেন যে তিনি শ্রীকৃষ্ণ বিগ্রহকে বিবাহ করবেন। ভক্ত রাজা কন্যার ইচ্ছা পূর্ণ করেন। সুতরাং বিগ্রহের নাম জামাই বিনোদ। এখানে জামাইরূপে পূজিত শ্যামসুন্দরকে তামাক ইত্যাদি জামাই-এর প্রিয় সমস্ত বস্তুই দেওয়া হয়।

জয়পুর রাজার মন্দির : রাজা মানসিংহের বংশধর মাধো সিংহ এই বিরাট মন্দির নির্মাণ করেন। কোটি কোটি টাকা এই মন্দিরে খরচ করা হয়েছে। মন্দিরের প্রবেশদ্বারের কারুকার্য চমৎকৃত করে দেয়। এই মন্দিরের নির্মাণ সামগ্রী বহন করে আনার জন্যই বৃন্দাবনে প্রথম রেলগাড়ী বসান হয়।

উপরোক্ত মন্দিরগুলি ছাড়াও বৃন্দাবনে অষ্টসখার মন্দির, মীরাবাঈ-এর মন্দির প্রভৃতি বিদ্যমান।

নিকুঞ্জবন : শারদীয় রাসের স্মৃতি ছড়িয়ে আছে বংশীবটে। কিন্তু নিত্য রাসের সাক্ষাৎধাম হচ্ছে নিকুঞ্জবন। বৃন্দাবনের মধ্যস্থলে অবস্থিত নিকুঞ্জবন দ্বাপরের স্মৃতি এনে দেয়। এখানকার তমালবৃক্ষ মনে করিয়ে দেয়—

না পুড়াইও রাধা অঙ্গ না ভাসাইও জলে,
মরিলে তুলিয়া রেখো তমালের ড়ালে ॥

মুক্তালতা যেখানকার মুক্তা (পুষ্প) নিয়ে গোপীগণ সাজসজ্জা করত সেই নিবিড় বৃক্ষলতা, বন উপবন, সরোবর, সবকিছুই আছে। কেবল বনজঙ্গল কেটে রাস্তাঘাট তৈরি হয়েছে। এখানে হাত দেওয়া হয় নি। যেমন ছিল, তেমনি আছে। নিকুঞ্জবনের মধ্যস্থলে শ্বেতপ্রস্তর নির্মিত ক্ষুদ্র অথচ সৌম্য মন্দিরে বিগ্রহ নেই, পূজা হয় একটি ছবির। রাধিকার চরণসেবা করছেন স্বয়ং মাধব।

নিধুবন : নিকুঞ্জবন হতে কিছুদূরে নিধুবন। ঠিক নিকুঞ্জবনের মত। সেই তমাল বীথি, কেলীকদম্ব, মুক্তালতা সবকিছুতে মিলে দ্বাপরের সেই বৃন্দাবনকে স্মরণ করিয়ে দেয। এখানেই রাই রাজা সেজেছিলেন। রাধিকা কৃষ্ণের বাঁশী চুরি করেছিলেন। এই বাঁশীই তো নষ্টের মূল। সুতরাং বাঁশী ভেঙে মুচড়িয়ে যমুনার জলে ফেলে দাও।

কালীয়দমন ঘাট : এখানে যমুনায় জল নাই শুধু ঘাট পড়ে আছে। জরাজীর্ণ ঘাট। এখানেই "কালিন্দীর তীরে কেলিকদম্বে চড়িয়া'
কালিন্দীর জলে পড়িলেন ঝাঁপ দিয়া।
কালীয় দমন করে কালিন্দীর জলে
কালি-সর্পফণে নাচে দেখয়ে সকলে ॥"

সূর্যঘাট : শ্রীকৃষ্ণ কালীয় দমন করে দ্বাদশ আদিত্যটিলা নামে উচ্চস্থানে সূর্যের উত্তাপে 'শীত নিবারণ করেছিলেন বলে এ ঘাটের নাম সূর্যঘাট।

পুষ্পন্দন ঘাট : কালীয় দমনঘাটের পর পুষ্পন্দন ঘাট। শ্রীকৃষ্ণ যমুনাতে নামলে ঐ ঘর্মবিন্দু হতে পদ্মপুষ্প উৎপন্ন হয়। তাই পুষ্পন্দন ঘাট।

যুগলঘাট : রাধামাধব মিলনের স্মৃতিস্বরূপ যুগল ঘাট।

বিহার ঘাট : তারপর বিহার ঘাট। মিলনের পরেই রাধাকৃষ্ণের বিহারভূমি।।

তেঁতুলঘাট : শ্যামের বাঁশী শুনে রাধিকা ছুটলেন মিলনের জন্য। কিন্তু গাছ হতে পাকা তেঁতুল জড়িয়ে গেল অধীরপ্রাণা প্রেয়সীর চরণে। রাধিকার অভিসম্পাত নেমে এল— "তেঁতুল পাকবেনা বৃন্দাবনে। সেই থেকে বৃন্দাবনে তেঁতুল পাকে না।"

শৃঙ্গার ঘাট : একে শৃঙ্গার বটও বলে। এখানে মাধব শ্রীরাধিকাকে সাজিয়েছিলেন। চক্ষুতে এঁকে ছিলেন কাজল, মস্তকে কুমকুম, অঙ্গ-প্রত্যঙ্গে পরাগরেণু, আর দীর্ঘ কুন্তলকে বেণীরূপে রচনা করে কবরীবন্ধন করে দিয়েছিলেন।

গোপাল ঘাট : গোপাল, গোপালকে নিয়ে—চরাতে যেতেন এই ঘাট পার হয়ে। গোপালক বলেই তিনি গোপাল। তাঁর অগ্রে, পশ্চাতে, চতুর্দিকে গাইবাছুর 'গবাং মধ্যে রসাম্যহম্।

বস্ত্রহরণ ঘাট : 'এক দিন রাধাকৃষ্ণ সখীগন সনে।
রাসাদিবিলাস অন্তে এথা আইলা স্নানে।'

বেশ কিছুক্ষণ স্নান এবং জলকেলী হল। বস্ত্রগুলি রেখেছিলেন গোপীরা নীপবৃক্ষ তলে।

তখন 'কৃষ্ণ কোন ছলেতে আসিয়া বৃক্ষতলে।
হরি বস্ত্র গোপনে প্রবেশে পুনঃজলে॥" পরে বস্ত্র না দেখে গোপীরা ব্যাকুলভাবে কৃষ্ণকে বস্ত্র প্রার্থনা করলে 'দিলেন সবারে বস্ত্র পরিহাস করি ॥ 'বস্ত্রহরণ নিয়ে অনেক জল্পনা কল্পনা, অনেক অনুমান। কেউলীলা বলেই সব কিছুকে ঢেকে দিতে চান। কেউ আবার কৃষ্ণ চরিত্রে কলঙ্ক স্থাপিত করবার চেষ্টা করেন। কিন্তু শ্রীকৃষ্ণ চরিত্র নির্দোষ, নিষ্কলঙ্ক। তাই পাঠকগণ একটু গভীরভাবে ভেবে দেখবেন এ কি বসন চুরি না বাসনা চুরি?

ভ্রমর ঘাট : এর পরেই ভ্রমরঘাট। ভ্রমর রূপ ধারণ করে শ্রীকৃষ্ণ রাধিকার আননের চুতর্দিকে গুঞ্জন করেছেন, আতঙ্কিতা বৃষভানু নন্দিনী। কিন্তু যতই আতঙ্ক ভ্রমরের ততই আনন্দ।

কেশীঘাট : বৃন্দাবনের সকল ঘাটই এখন যমুনাশূন্য, কেবল মাত্র কেশীঘাটই ব্যতিক্রম। এইঘাটেই কেশী দৈত্যকে বধ করেছিলেন শ্যামসুন্দর।

পারঘাট বা রাজঘাট : যমুনা শূন্য ঘাট। বহুদূরে প্রবাহিতা যমুনা, বৃন্দাবন হতে গোকুলে যাওয়ার জন্য এ ঘাটে পার হয়ে যেতে হত। কিন্তু সে ঘাট আর নেই। যমুনার স্থলে আছে বিস্তৃত বালুকারাশি। এবার দ্বাপরযুগের লীলা স্মরণ করুন। নৌকা নিয়ে দাঁড়িয়ে আছে কাণ্ডারী। নৌকা দেখে ভ্রূকুঞ্চিত করলেন গোপীগণ। এ যে জীর্ণ শীর্ণ তরী। ডুবিয়ে মারবে না তো নাবিক। গোপীরা বললেন,

"কোথায় রাখি দধি দুগ্ধ, কোথায় রাখি পা।
জীর্ণ তরীটি দেখে ভয়ে কাঁপে গা ॥"

তা শুনে নাবিক বলল, "দেবতা গন্ধর্ব যত পার করেছি কতশত,
যুবতীর যৌবন কত ভার ॥"

আর তোমরা যদি পার হও তবে

"আর সখীকে পার করিতে নেব আনা আনা।
শ্রীমতীকে পার করিতে নেবো কানের সোনা ॥"

তার কানে যে সোনা আছে! ওযে বৃন্দাবনের ধনীর ধনী ॥

ইমলীতলা বা তেঁতুলতলা : "একদিন কৃষ্ণচন্দ্র গোপীগণ সঙ্গে।"
বৃন্দাবন মাঝে রাস-লীলা করে রঙ্গে ॥

শ্রীকৃষ্ণকে সকল ব্রজবধূগণের সঙ্গে একই ভাবে রাস করতে দেখে শ্রীরাধিকা হলেন ক্ষুব্ধা। তাই

আপনার উৎকর্ষতা কিছু না দেখিল।
রাইর হৃদয়ে বাম্য আসি উপজিল।"

তখন, 'মান করি রাসনৃত্য মণ্ডল ছাড়িয়া।
লুকাইয়া রহিল দূরে নিজ সখী লৈয়া।

কৃষ্ণচন্দ্র রাধিকাকে রাস মণ্ডলীতে দেখতে না পেয়ে,

"অন্বেষণে গেলা গোপীগণেরে ছাড়িয়া ॥'

কেননা, "তার সঙ্গে কৃষ্ণসুখ বিলাস যেমন।
শতকোটী গোপীসহ না হয় তেমন ॥
কুঞ্জে কুঞ্জে ফিরে অতি বিকল হইয়া।
শরবাণে বিদ্ধ, ডাকে রাধা নাম লৈয়া ॥

আর, আমলীর তলে বসি কুঞ্জের ভিতরে।
রাধানাম মন্ত্র জপে--বিহ্বল অন্তরে ॥

রাধামন্ত্র ও রাধা নাম জপ করতে করতে তন্ময় হয়ে রাধাভাবদ্যুতি সুবলিত শ্রীগৌরাঙ্গ মুর্তিধারণপূর্বক বিপ্রলম্ভ ভাবে কোন এক সমুজ্জ্বল উন্নত রসের আস্বাদন করে মহানন্দে সমাধিস্থ হয়েছিলেন। এমন সময় শ্রীরাধিকা তাঁর সখীগণসহ ইমলিতলায় উপাস্থিত হয়ে অতি মনোরম গৌরাঙ্গরূপে দর্শন করে আশ্চর্যান্বিত হয়েছিলেন। শ্রীরাধার অঙ্গস্পর্শে শ্রীকৃষ্ণ প্রকৃতস্থ হলে প্রেমবিহ্বল চিত্তে সখীগণসহ শ্রীরাধাকে দর্শন করেছিলেন এবং বলেছিলেন, "অপূর্ব রসের আস্বাদন নিমিত্ত কলিযুগে নবদ্বীপে গৌরাঙ্গরূপে অবতীর্ণ হব। বস্তুতঃ,

ইমলিওলাতেই শ্রীকৃষ্ণের গৌরাঙ্গলীলার প্রথম সূচনা। সখীগণ সহ শ্রীরাধরাণীর সঙ্গে উপরোক্ত কথোপকথনের পর প্রেমালাপ করতে করতে পুনরায় রাস আরম্ভ করেছিলেন।

এই ইমলিতলাতে মহাপ্রভু বৃন্দাবন ভ্রমণকালে এসে বিশ্রাম করেছিলেন।

"মহাপ্রভু শ্রী গৌরাঙ্গ পাদমূলে যার।
ভাবে গদ গদ হয়ে ফেলে অশ্রুধার ॥"

মধুবন : বর্তমান নম মহোলি। ধ্রুবের তপস্যাস্থল। এখানে শ্রীকৃষ্ণ মধুদৈত্যকে বধ করেছিলেন। এখানে শ্রীমধুবনবিহারীজী, শ্রীবলরামজী ও ধ্রুবের মন্দির আছে। মহোলির কিছুদূরে মধুদৈত্যের বাসভূমি ও বধ্যস্থান গোফা।

তালবন : মহোলি হতে ৪ কি.মি দক্ষিণ পশ্চিমে। বর্তমান নাম তারসী। ধেনুকাসুর বধের স্থান। নিম্নস্থানে বলভদ্র কুণ্ড। শ্রীবলদেব, শ্রীরেবতীজী ও বংশীধারীর মন্দির। কৃষ্ণবলরামের গোচারণ স্থল।

কুমুদবন : তালবন হতে ৩ কি.মি পশ্চিমে। এখানে সখীগণ কুমুদ পুষ্পদ্বারা শ্রীরাধা গোবিন্দকে সজ্জিত করেছিলেন। এ শ্রীকৃষ্ণের জলশয্যা বিহারস্থান।

বহুলা বন : এখানে বহুলাকুণ্ড, বহুলা গাভীর স্থান, শ্রীবলরাম কুণ্ড ও শ্রীলক্ষ্মীনারায়ণ মন্দির বিরাজমান।

কাম্যবন : প্রবাদ, মা যশোদার পিত্রালয়। বজ্রনাথের প্রতিষ্ঠিত কামেশ্বর শিব বর্তমান। এখানে বিমলাকুণ্ড, শ্রীগোবিন্দজী, শ্রীবৃন্দাদেবী, চরণ পাহাড়ী, ধর্মকূপ, পাণ্ডবগণের বনবাস স্থান অবস্থিত।

খদির বন : "দেখহ খদির বন বিদিত জগতে।
বিষ্ণুলোক প্রাপ্তি হেথা গমন মাত্রেতে ॥"

খোয়ার (গোবর্দ্ধনস্থলীর খয়েড়া হতে খদির বনের নামান্তর।) এখানে লোকনাথ গোস্বামীর ভজনস্থলী বিদ্যমান। সঙ্গমকুণ্ড, গোচারণ স্থান, এবং বকাসর বধ্যভূমি আছে। এখানে শ্রীকৃষ্ণ ভোজন বিলাস করেছিলেন।

যমুনার পূর্বপারে :

ভদ্রবন : যমুনার তীরে অবস্থিত। শ্রীকৃষ্ণবলরাম সখাগণের সঙ্গে বিবিধলীলা ও গোচারণ করেছিলেন।

ভাণ্ডীর বন : সখ্যরসের স্থান। সখাগণসহ শ্রীকৃষ্ণের গোচাবণ ও মল্লক্রীড়া স্থল ॥

বিল্ববন : "রামকৃষ্ণ সখাসহ এ বিল্ব বনেতে।
পক্ক বিল্বফল ভুঞ্জে মহাকৌতুকেতে ॥

শ্রীলক্ষ্মী দেবীর তপস্যাস্থল। লক্ষ্মীদেবী শ্রীরাসমণ্ডলীতে প্রবেশ করতে না পারায় সর্বভোগ পরিহার করে এইস্থানে শ্রীকৃষ্ণের আরাধনা করেছিলেন। ব্রজগোপীগণের আনুগত্য রাসে যোগদানের অধিকার হতে পারে না। এই কথা মানতে রাজী না হয়ে লক্ষ্মীদেবী আরও কঠোর তপস্যা আরম্ভ করেন। তখন শ্রীকৃষ্ণ-বক্ষে স্বর্ণরেখার ন্যায় তিনি স্থানলাভ করেন।

লৌহবন : শ্রীকৃষ্ণবলরামের গোচারণস্থল। এখানে শ্রীকৃষ্ণ শ্রীমতী রাধিকা ও অন্যান্য সখীসহ নৌকা বিলাস করেছিলেন। এটি লৌহজঙ্ঘ অসুর বধের স্থান।

মহাবন বা গোকুল : এখানে আছে শ্রীনন্দ মহারাজের প্রাচীন ভবন। যোগমায়া দেবীর মন্দির চৌরাশি খাম্বা দর্শনীয়। ভগবান শ্রীকৃষ্ণের অনুপমা শক্তিস্বরূপা অশেষ দুর্ঘটন পটীয়সী ভগবতী যোগমায়া ভগবৎ প্রেরিতা হয়ে অলক্ষ্য শরীরধারণপূর্বক গোকুল অবতীর্ণ

হয়েছিলেন। শ্রীনন্দরাজের পিতা পর্জ্জন্য কেশীদৈত্য ভয়ে নন্দীশ্বরে বাস করতে অসমর্থ হয়ে এই মহাবনের গোকুলে বাস করেন। তথায় ভগবান অবতীর্ণ হওয়ার পূর্বেই শ্রীনন্দ যশোদা প্রভৃতি অবতীর্ণ হয়েছিলেন। তারপর এল ভাদ্র কৃষ্ণাষ্টমীর মহারাত্রি। শ্রীভগবান জন্মলীলা প্রকাশ করলেন।

"এই দেখ শ্রীকৃষ্ণচন্দ্রের জন্মস্থল।
পুত্র মুখ দেখি হেথা নন্দাদি বিহ্বল ॥
ব্রজগোপী ধাই আইলে এ অঙ্গনে।
পুত্র জন্ম মহোৎসব হৈল এইখানে ॥

আর আনন্দে "নন্দ নাচেরে থেইয়া থেইয়া।
যশোদার কোলে নীলমণি প্যায়া
শিব নাচে ব্রহ্মা নাচে আর নাচে ইন্দ্র।
গোকুলে গোয়ালা নাচে পাইয়ে গোবিন্দ।"

এই গোকুলে পুতনাবধ, যমলার্জ্জুন ভঞ্জন প্রভৃতি লীলা অনুষ্ঠিত হয়েছিল।

অন্যান্য দর্শনীয় স্থান

১। মথুরা : মথুরা বৈকুণ্ঠ অপেক্ষাও শ্রেষ্ঠ স্থান। কেননা, সাক্ষাৎ ভগবান এখানে আবির্ভূত হয়েছিলেন। বিভিন্ন পুরাণাদিতে মথুরা মাহাত্ম্য বর্ণিত আছে। পদ্মাপুরাণে আছে 'ক্ষুদ্র স্ফুলিঙ্গ সকল তৃণরাশিকে যেমন দগ্ধ করে, তদ্রূপ মথুরাপুরী মহাপাতকরাশিকে দহন করে।"

মথুরায় বিশ্রামঘাট বর্তমান। প্রথমেই বিশ্রামঘাটে স্নানের বিধি। পার্থিব সকল প্রকার সাধন চেষ্টায় শ্রান্ত হয়ে, কোথাও আশ্রয় না পেয়ে একমাত্র বিশ্রামের স্থান এই মহাতীর্থে অবগাহনের ব্যবস্থা। বিশ্রামতীর্থের উত্তরে দ্বাদশঘাট ও দক্ষিণে দ্বাদশঘাট বিদ্যমান। এখানে ভূতেশ্বর শিব, শ্রীকৃষ্ণের জন্মস্থান। শ্রীকেশব দেব, পোতরাকুণ্ড, বরাহদেব, রঙ্গেশ্বর শিব, বাংসটিলা, ধ্রুবতীর্থ বলিটিলা প্রভৃতি। এ ছাড়া আছে মঞ্চস্থান—যেখানে চানুর ও মুষ্টিকের শ্রীকৃষ্ণ ও বলরামের সঙ্গে মল্লযুদ্ধকালে মঞ্চোপরি কংস উপবিষ্ট ছিলেন। চানুর ও মুষ্টিক বিনষ্ট হওয়ার পর কংস রণবাদ্য করে দেন এবং উপবিষ্ট বসুদেব প্রভৃতির উপর নির্যাতন আরম্ভ করলে শ্রীকৃষ্ণ উল্লফনে কংসের নিকট উপস্থিত হয়ে কংসের কেশাকর্ষণপূর্বক তাকে মঞ্চ হতে ভূমিতে নিক্ষেপ করে স্বয়ং তদুপরি পতিত হলেন, তাতেই কংসের প্রাণবিয়োগ ঘটে। কংসের মৃত্যুর স্থানটিকে বলা হয় কংসটিলা।

২। ব্রহ্মাণ্ডঘাট : —এখানে মা যশোদাকে মৃত্তিকাভক্ষণ ছলে শ্রীকৃষ্ণ মুখগহ্বরে ব্রহ্মাণ্ড দেখিয়েছিলেন। এখানে নবনীতলালজী মন্দির বিদ্যমান।

৩। রাভেল—শ্রীরাধারানীর জন্মস্থান, শ্রীবৃষভানু রাজার প্রাচীন ভবন ও শ্রীরাধারানীর মন্দির আছে।

৪। গিরিরাজ গোবর্ধন—সামর্থপক্ষে পরিক্রমা করা অবশ্য কর্তব্য। পরিক্রমাকালে দর্শন— শ্রীগোবর্ধন আশ্রম, শ্রীহরিদেব, মানসীগঙ্গা, শ্রীগিরিধারীজীউ, চাকলেশ্বর শিব, শ্রীগোবিন্দ কুণ্ড।

৫। ভোজনস্থলী—শ্রীকৃষ্ণ এখানে ভোজনলীলা করেছিলেন।

৬। চরণ পাহাড়ী—এখানে ধেনুবৎস, হরিণ, হাতী ও শ্রীকৃষ্ণবলরামের চরণচিহ্ন দর্শন।

৭। নন্দগ্রাম—নন্দবাবার মন্দির, পাবন সরোবর, শ্রীরাধাপাবনবিহারী জীউ মন্দির।

৮। সঙ্কেতকুঞ্জ—শ্রীকৃষ্ণ ও শ্রীরাধিকার প্রথম মিলনস্থান। শ্রীরাসবিহারী জীউ ও রাসমঞ্চ।

৯। **বর্ষাণা**—শ্রীকৃষ্ণভানু রাজার রাজধানী। দর্শনীয়—ভানুকুণ্ড, ও কিশোরী জীউ মন্দির।

১০। **যাবট**—আয়ানঘোষ ও জটিলা কুটিলার বাড়ি। কিশোরীকুণ্ড, পিয়ালকুণ্ড ও শ্রীরাধাকান্ত মন্দির।

॥ শ্রীশ্রীরাধাকুণ্ড শ্যামকুণ্ড ॥

শ্রীশ্রীশ্যামকুণ্ড ও শ্রীরাধাকুণ্ড : —গোবর্ধন থেকে প্রায় তিন মাইল উত্তর-পূর্বকোণে 'আরিট' গ্রাম বা শ্রীরাধাকুণ্ড অবস্থিত। বৃন্দাবন হতে রাধাকুণ্ড, ১৪ মাইল বা ২২/২৩ কিলোমিটার দক্ষিণ-পশ্চিম দিকে অবস্থিত। 'আরিট' গ্রামের নাম ও শ্রীশ্যামকুণ্ড ও শ্রীরাধাকুণ্ডের আবির্ভাব সম্বন্ধে আখ্যায়িকাটি নিম্নরূপ ঃ—

একদা শ্রীকৃষ্ণ চিদ্‌বিলাসময়ী কান্তলীলামাধুরী প্রকাশার্থ এইস্থানে কৃষ্ণরূপধারী অরিষ্টাসুরকে বধ করেন, এবং কৌতুকে শ্রীরাধার অঙ্গ স্পর্শ করতে উদ্যত হলে শ্রীমতী বাধা প্রদান করে বলেন, যদিও অরিষ্টাসুর দৈত্যবিশেষ, তথাপি সে বৃষাকৃতি। বৃষবধহেতু শ্রীকৃষ্ণে গোবধের অপবিত্রতা স্পর্শ করেছে। সুতরাং সর্বতীর্থে স্নান করে পবিত্র না হওয়া পর্যন্ত শ্রীকৃষ্ণকে শ্রীমতী কিছুতেই স্পর্শ করতে দিবেন না। শ্রীকৃষ্ণ এই কথা শুনে তৎক্ষণাৎ পদাঘাত করামাত্র সর্বতীর্থের জলপূর্ণ একটি কুণ্ড প্রকটিত হল। শ্রীমতী ও তাঁর সখীগণের বিশ্বাসের জন্য তীর্থসমূহ তাদের স্ব স্ব পরিচয় প্রদানপূর্বক শ্রীকৃষ্ণের স্তব করতে লাগলেন। তখন শ্রীকৃষ্ণ ঐ কুণ্ডে স্নান করলেন। কার্তিকমাসের কৃষ্ণপক্ষীয় অষ্টমীতিথির অর্ধরাত্রে এই ব্যাপার সংঘটিত হয়েছিল। এইরূপে শ্যামকুণ্ডের প্রকাশ ঘটে।

রাধাকুণ্ড : —এদিকে শ্রীমতী রাধিকা শ্রীকৃষ্ণের প্রগল্‌ভ বাক্য শ্রবণে অতি শীঘ্র সখীগণের সঙ্গে মিলিত হয়ে শ্রীশ্যামকুণ্ডের পশ্চিমদিকে আর একটি কুণ্ড খনন করেন। কিন্তু তাতে জল হল না বা কোন তীর্থের আগমন হল না। তখন তাঁরা চিন্তিত হলে শ্রীকৃষ্ণ শ্যামকুণ্ডের জলদ্বারা তা পূর্ণ করতে বলেন। তখন তাঁরা অভিমানভর লীলা প্রকাশ করে বললেন যে শ্রীশ্যামকুণ্ডের জল বৃষাসুরের স্পর্শজনিত পাপধৌতিহেতু পাতকযুক্ত হয়েছে, সুতরাং ঐ জল নিলে শ্রীরাধাকুণ্ডও পাতকযুক্ত হবে। তখন শ্রীমতী রাধিকা সখীগণসহ সর্বতীর্থময়ী মানসী গঙ্গার জলদ্বারা শ্রীরাধাকুণ্ড পূর্ণ করতে আরম্ভ করলেন। শ্রীকৃষ্ণ তীর্থগণকে ইঙ্গিত করামাত্র তীর্থসমূহ শ্রীরাধার স্তব করতে আরম্ভ করল। শ্রীমতী তীর্থগণের স্তবে সন্তুষ্ট হয়ে তাঁদেরকে নিজ নিজ কুণ্ডে প্রবেশ করবার আদেশ দিলে শ্রীশ্যামকুণ্ডের জলবেগ তীর ভেদ করে রাধাকুণ্ডে প্রবেশ করে পরিপূর্ণ করলেন। এইরূপে শ্রীরাধাকুণ্ডের প্রকট হল।

কালের প্রভাবে শ্রীশ্যামকুণ্ড ও শ্রীরাধাকুণ্ড লুপ্ত হয়ে দুটি ধান্য ক্ষেত্রে পরিণত হয়। শ্রীগৌরাঙ্গ বৃন্দাবন ভ্রমণ কালে আরিট্‌ গ্রামে এসে লুপ্ত কুণ্ডদ্বয়কে প্রকট করেন। কেউ লুপ্ত তীর্থদ্বয়ের সন্ধান দিতে না পারায়

> "লুপ্ততীর্থ জানি প্রভু সর্বজ্ঞ ভগবান।
> দুই ধান্য ক্ষেত্রে অল্পজলে কৈল স্নান ॥
> দেখি সব গ্রাম্যলোকের বিস্ময় হৈল মন।
> প্রেমে প্রভু করে রাধাকুণ্ডের স্তবন।" (চৈ, চ)

এইভাবে ধান্যক্ষেত্রে স্নান করে মহাপ্রভু লুপ্ত তীর্থদ্বয়কে চিহ্নিত করে স্তব সহকারে স্নান মাহাত্ম্য প্রকাশ করেন। পরবর্তীকালে এই স্থান শ্রীগৌরাঙ্গ পার্ষদগণের সাধনার অনন্যস্থলরূপে পরিণত হয়। শ্রীরঘুনাথ দাস গোস্বামী শেষজীবনে এইস্থানে অবস্থান করেন এবং তাঁর জীবনকালেই এই কুণ্ডদ্বয়ের সংস্কার হয়েছিল। ভক্তিরত্নাকরে আছে—

এক ধনী বদরিকাশ্রমে গিয়ে "প্রভুকে দর্শন কৈল বহু মুদ্রা দিয়া।"

তখন নারায়ণ তাঁরে আজ্ঞা করিল স্বপ্নেতে।
মুদ্রা লইয়া যাহ ব্রজে আরিট্ গ্রামেতে।
তথা রঘুনাথ দাস বৈষ্ণব প্রধান।
তাঁর আগে দিবা মুদ্রা লৈয়া মোর নাম।"

ধনী ধন নিয়ে এসে রঘুনাথ গোস্বামীকে সমস্ত কাহিনী বলে ঐ মুদ্রাগুলি দেন। রঘুনাথ দাস গোস্বামী ইহাদ্বারা শ্রীরাধাকুণ্ড ও শ্যামকুণ্ড সংস্কার করেন।

শ্রীরাধাকুণ্ডে শ্রীরাধাকৃষ্ণের জলক্রীড়া, পাশাখেলা, হিন্দোল লীলা, বংশীহৃতি ইত্যাদি অপ্রাকৃত লীলারস নিত্য প্রকটিত হচ্ছে। শ্রীশ্যামকুণ্ড ও শ্রীরাধাকুণ্ডতীরে বহু কুঞ্জ মন্দিরাদি এবং শ্রীলভূগর্ভ গোস্বামী, শ্রীলদাস গোস্বামী ও শ্রীল কবিরাজ গোস্বামী প্রভুর সমাজত্রয় একই কুটির মধ্যে অবস্থিত। শ্রীল রঘুনাথদাস গোস্বামীর ভজন কুটিরের উত্তরে শ্রীল কবিরাজ গোস্বামী প্রভুর ভজন কুটীর। এর পূর্ব-উত্তরে লেখকের পূর্বপুরুষ প্রিয় হরিদাস মহারাজের সেবিত শ্রীগদাধর চৈতন্যের মন্দির। এইরূপ বহু মন্দির কুণ্ডদ্বয়ের তীরে অবস্থিত।

অনেক কুঞ্জ ও গোষ্ঠবাটী শ্রীরাধাকুণ্ডতটে বিরাজিত। তথায় নিত্যসিদ্ধ রাধানুগাগণ নিত্যকাল শ্রীরাধাকৃষ্ণের বিচিত্র সেবার পারিপাট্য বিধান করছেন। তথায় শ্রীরাধাকৃষ্ণের নিত্যরাসক্রীড়া সংঘটিত হচ্ছে। অখিল রসামৃতসিন্ধু শ্রীকৃষ্ণ তাঁর সর্বরস ও ভাবাধারাস্বরূপা সগন শ্রীরাধা তথা তৎকুণ্ডে সর্বক্ষণ পরিপূর্ণ ও সুনির্মলভাবে আস্বাদনে পরিতৃপ্ত হচ্ছেন। অনন্তর সখীগণ ও মঞ্জরীগণ নিজ নিজ যুথেশ্বরীগণের আনুগত্য তথায় অবস্থান করে বিভাগানুযায়ী নিজ নিজ সেবায় সুষ্ঠুতা সম্পাদনে তৎপরা। সখীগণের কুঞ্জে শ্রীরাধাকৃষ্ণ সর্বদা বিলাসপরায়ণ।

ব্রজের চুরাশি ক্রোশ পরিক্রমার ভ্রমণ-সূচী পাঠকগণের সুবিধার্থে সংযোজিত হল

ভক্তের সঙ্গে ব্রজের পথে

"নিতাইয়ের করুণা হবে ব্রজে রাধাকৃষ্ণ পাবে।
না ভ্রমিলে বন, তার কিসের বৃন্দাবন ॥"

বৈষ্ণব শাস্ত্র অনুসারে একবার ব্রজ চুরাশি ক্রোশ পরিক্রমা করলে সবতীর্থ ভ্রমণ করার ফল পাওয়া যায়।

		দর্শনীয় স্থান
১ম দিন	— বৃন্দাবন হতে ভূতেশ্বর	— অক্রুরঘাট, শ্রীকৃষ্ণের জন্মস্থান
২য় দিন	— ভূতেশ্বর হতে মধুবন	— তালবন, বলভদ্রকুণ্ড
৩য় দিন	— মধুবন হতে শান্তনুকুণ্ড	— বেহুলা বন।
৪র্থ দিন	— শান্তনুকুণ্ড হতে রাধাকুণ্ড	— মথুরাই রাধারানীর দিদিমার বাড়ি
৫ম দিন	— রাধাকুণ্ড হতে গিরিগোবর্ধন	— কুসুম সরোবর, মানসী গঙ্গা, চন্দ্রাবলী কুঞ্জ, গোবিন্দ কুণ্ড, জ্যোতিপুরা।
৬ষ্ঠ দিন	— গিরিগোবর্ধন থেকে ডীগ	— গাঠোলী, বলভদ্রকুণ্ড।
৭ম দিন	— ডীগ হতে থোহো	— সুদামাপুরী, বুড়ো বদ্রী, অলকানন্দা।
৮ম দিন	— থেহো হতে পশোলা	— বদ্রীনারায়ণ, তপ্তকুণ্ড,

৯ম দিন—	পশোলা হতে কামবন	—	কেদারনাথ, গৌরীকুণ্ড, চরণপাহাড়ী গয়াকুণ্ড। কামবন পরিক্রমা ভোজন-স্থলী, পঞ্চপাণ্ডব কেল্লা, বৃন্দাদেবী, বিমলা দেবী, বিমল কুণ্ড।
১০ম দিন	— কামবন হতে বর্ষাণা	—	কর্ণছেদন কুণ্ড, কদমখণ্ডী, আলতা পাহাড়, দেহকুণ্ড, বর্শানা পরিক্রমা, গহ্বরবন। ময়ূরকুঠী, শাকরী খো।
১১শ দিন	— বর্ষাণা হতে নন্দগ্রাম	—	প্রেম সরোবর, সঙ্কেতবন, ঝাউবনেব হাউ, যাবট।
১২শ দিন	— নন্দগ্রাম হতে কোশী	—	কোকিলা বন, বঠেন গ্রাম, চরণ পাহাড়, শেষশায়ী, ক্ষীরসাগর।
১৩শ দিন	— কোশী হতে খেলন বন	—	প্রহ্লাদকুণ্ড, প্রহ্লাদ মন্দির।
১৪শ দিন	— খেলন বন হতে চীরঘাট	—	রামঘাট, বিহার বন, অক্ষয়বট, তপোবন।
১৫শ দিন	— চীরঘাট হতে রায়া	—	নন্দঘাট, ভাণ্ডাবীবন, শ্রীদাম বন, বংশীবট, মাঠবন, বেলবন, মান সরোবর।
১৬শ দিন	— রায়া হতে ব্রহ্মাণ্ডঘাট	—	আনন্দি বনন্দি দেবী, দাউজী, ক্ষীবসাগর।
১৭শ দিন	— ব্রহ্মাণ্ডঘাট হতে বৃন্দাবন	—	মহাবন (পূর্বগোকুল), রমণরেতী, রাবল (রাধারানীর জন্মস্থান) মথুবা, দ্বারকানাথ, বিশ্রামঘাট।

বি. দ্র. ঃ— যাত্রীগণ অন্যভাবেও পরিক্রমা করতে পারেন।

চতুর্থ পর্ব

একাদশ অধ্যায়

বৈষ্ণবদের জ্ঞাতব্য কয়েকটি আখ্যান

সাক্ষীগোপাল

বিদ্যানগরের দুই ব্রাহ্মণ ছোট বিপ্র ও বড় বিপ্র তীর্থভ্রমণ করতে বের হয়েছেন। একজন বৃদ্ধ অপরজন যুবক। দু'জনেই পরম কৃষ্ণভক্ত। তাঁরা গয়াকাশী প্রভৃতি দর্শন করে শেষে বৃন্দাবনে এসে শ্রীগোপালের কুঞ্জে বিশ্রাম করতে লাগলেন। জীবের সেবায় ভগবান তুষ্ট হন বলে যুবক প্রাণপণে বৃদ্ধ ব্রাহ্মণের সেবা করতে লাগলেন। বৃদ্ধ ব্রাহ্মণ তার সেবায় পরম তুষ্ট। সেখানে প্রতিদান করবার মত কিছু না থাকায় গোপালের সম্মুখে তাঁর একমাত্র কন্যা যুবককে সম্প্রদানের অঙ্গীকার করলেন।

যুবক বিস্মিত হয়ে বললেন, "আমি কোন প্রতিদান পাওয়ার আশায় আপনার সেবা করি নাই। আপনি ধনে, মানে, বংশগৌরবে সকল বিষয়ে আমার চাইতে বড়। সুতরাং আপনার কন্যার উপযুক্ত বর আমি কিছুতেই হতে পারি না। আর আপনি আমাকে কন্যাদানে সম্মত হলেও আপনার স্ত্রীপুত্র আমার মত দরিদ্রকে কন্যাদান করতে কিছুতেই সম্মত হবেন না। গোপালের সম্মুখে এইরূপ কথা বলা আপনার উচিত হয় নি।

বৃদ্ধ ব্রাহ্মণ তখন জেদ করে বললেন, "গোপালের সম্মুখে যে কথা আমি বলেছি তার কখনও অন্যথা হবে না। আমি তোমাকেই আমার কন্যাদান করব।"

তখন যুবক গোপালের নিকট হাত জোড় করে বললেন, "প্রভু, এই বৃদ্ধ ব্রাহ্মণ তোমাকে সাক্ষী রেখে আমাকে তাঁর কন্যাদান করার কথা বললেন। যদি তিনি পরে আমায় কন্যাদান না করেন, তবে সেজন্য তোমাকে সাক্ষ্য দিতে হবে।"

বাড়ি ফিরে এসে বৃদ্ধ ব্রাহ্মণ নিজের স্ত্রীপুত্রের নিকট কন্যার বিয়ের কথা বললে তারা তো রেগে আগুন। এমন দরিদ্র ব্রাহ্মণের সঙ্গে বিয়ে কিছুতেই সম্ভব নয়। বৃদ্ধ ব্রাহ্মণ বললেন, "আমি গোপালকে সাক্ষী রেখে কথা দিয়েছি।" তাঁর পুত্র হেসে বলল, "সে তো পাথরের ঠাকুর। সে কথাও বলবে না, সাক্ষ্যও দিবে না। অন্য কোন মানুষ তো ছিল না।" তখন বৃদ্ধ ব্রাহ্মণ বললেন, "না, অন্য কোন লোক না থাকলেও গোপালের সামনে যে কথা দিয়েছি, আমি কিছুতেই তার অন্যথা করতে পারব না। তাঁর স্ত্রীপুত্র দু'জনেই একবাক্যে বলল, "যদি তুমি তাকে কন্যাদান কর তবে আমরা দু'জনেই আত্মহত্যা করব।" ব্রাহ্মণ তো ভয়ানক বিপদে পড়লেন। তিনি কেবল বিপদতাবণ গোপালকে মনে মনে ডাকেন আর বলেন,

"ধর্ম রক্ষা পায়, না মরে নিজ জন।
দুই রক্ষা কর গোপাল, লইনু শরণ।"

কিছুদিন অতিবাহিত হলে বৃদ্ধ ব্রাহ্মণ প্রতিজ্ঞাভঙ্গের পাপে অনন্ত নরকগামী হবে এই আশঙ্কায় পুর্বকথা স্মরণ করিয়ে দিতে যুবক ব্রাহ্মণ তাঁর বাড়ি এলে বৃদ্ধ ব্রাহ্মণের পুত্র যুবককে লাঠি নিয়ে মারতে উদ্যত হয়ে বলল,

"ওরে অধম, মোর ভগিনী চাহ বিবাহিতে।
বামন হয়ে চাহে যেন চাঁদেরে ধরিতে ॥"

বিতাড়িত যুবক গ্রামের মোড়লদের নিকট এসে বৃদ্ধ ব্রাহ্মণের অঙ্গীকারের কথা জানিয়ে বিচারপ্রার্থী হলে তারা সাক্ষীর কথা তুলল। গোপাল ভিন্ন আর কেহ উপস্থিত ছিল না। যুবক এই কথা বললে তারা সাক্ষীর অভাবে বিচার করতে অসম্মত হল। এতে বৃদ্ধ ব্রাহ্মণের পুত্র উৎসাহিত হয়ে বলল, 'যদি গোপাল এসে সাক্ষ্য দেয় তবে নিশ্চয়ই তোমাকে ভগ্নীদান করব।

যুবক নিরুপায় হয়ে ছুটলেন বৃন্দাবনে, গোপালের কাছে। কাতর প্রার্থনা, 'হে প্রভু, তুমি যদি বিদ্যানগরে মোড়লদের নিকট উপস্থিত হয়ে সাক্ষ্য না দাও, তবে বৃদ্ধ ব্রাহ্মণ প্রতিজ্ঞা ভঙ্গের পাপে অনন্ত নরকগামী হবে। তুমি কি তোমার ভক্তকে নরকগামী করবে? 'ভক্তের আকুল প্রার্থনা ভগবানের প্রাণে লাগল। তিনি যুবকের সঙ্গে যেতে রাজি হলেন, তবে একটা শর্তে,—

"হাসিয়া গোপাল কহে শুনহে ব্রাহ্মণ।
তোমার পাছে পাছে আমি করিব গমন ॥
উলটি আমারে তুমি দেখিবে যেখানে।
গতিবন্ধ করি আমি থাকিব সেখানে।
নূপুরের ধ্বনিমাত্র আমার শুনিবে।
সেই শব্দে গমন মোর বুঝিতে পারিবে।"

যুবক ব্রাহ্মণ গোপালকে নিয়ে আগে আগে চলতে লাগলেন, কিন্তু গ্রামের নিকটে এসে নূপুরে বালি প্রবেশ করায় শব্দ বন্ধ হয়ে গেল। যুবকের মনে হল সন্দেহ। পশ্চাতে চাহিবামাত্র গোপাল অচল হয়ে বললেন, "আমি এখানেই থাকলাম। তোমার গ্রামের লোককে ডেকে আন। যুবক ব্রাহ্মণ গ্রামে সংবাদ দেওয়ায় সকলে সমবেত হল। গোপাল সর্বসমক্ষে সাক্ষ্য দিয়ে বৃদ্ধ ব্রাহ্মণকে প্রতিজ্ঞাভঙ্গের দায় হতে মুক্ত করলেন। মহাসমারোহে বৃদ্ধ ব্রাহ্মণেব কন্যার সঙ্গে যুবকের বিয়ে হল। গোপাল সাক্ষ্য দিয়ে পাষাণে পবিণত হলেন। সকলে মন্দির নির্মাণ করে গোপালের পূজার্চনা ও ভোগের ব্যবস্থা করল। গোপাল এখানে সাক্ষীগোপাল নামে পরিচিত হলেন।

পুরীর জগন্নাথ দর্শন করার পর এই "সাক্ষীগোপাল" দর্শন না করলে তীর্থদর্শনের ফল পাওয়া যায় না।

এবার আসি সাক্ষীগোপালের ঐতিহাসিক তথ্য বিষয়ে। গোপালজীর এই মূর্তিটি রাজা পুরুষোত্তমদেব কাঞ্চী রাজ্য থেকে নিয়ে আসেন। কাঞ্চিরাজ নরসিংহ সালফাকে কাঞ্চি-কাবেরী যুদ্ধে পরাজিত করে গোপালজীর সঙ্গে আরও কয়েকটি সুন্দর বিগ্রহ ওড়িশায় আনেন। সেগুলি বিভিন্ন মন্দিরে প্রতিষ্ঠা করেন এবং গোপালজীকে প্রতিষ্ঠা করেন জগন্নাথ মন্দিরে। পরবর্তীকালে বর্তমান মন্দিরটি নির্মাণ করা হয় এবং এখানে শ্রীবিগ্রহটি প্রতিষ্ঠা করা হয়। মন্দিরটির কাছেই রয়েছে চন্দন-সরোবর। মন্দিরের পাশেই আছে শ্রীরাধিকা মন্দির। মন্দির গাত্রে কারুকার্য অতীবসুন্দর।

ক্ষীরচোরা গোপীনাথ

শ্রীগৌরাঙ্গের গুরু ঈশ্বরীপুরী, আর ঈশ্বরপুরীর গুরু মাধবেন্দ্রপুরী। মাধবেন্দ্রপুরী বৃন্দাবনে এসে ভ্রমণ করতে করতে গিরি গোবর্ধনে উপনীত হলেন। গিরিগোবর্ধন শৈল পরিক্রমা করে

গোবিন্দকুণ্ডে স্নান সেরে অত্যন্ত ক্লান্ত হয়ে মাধবেন্দ্র বসে আছেন এক বৃক্ষতলে অনাহারে। তখন এক গোপবালক দুগ্ধভাণ্ড নিয়ে হেসে হেসে বললেন, পুরী, তুমি এই দুগ্ধ পান কর, আর কেনই বা তুমি কাউকে কিছু না চেয়ে খাওনা এবং কারই বা তুমি ধ্যান কর? পুরী বিস্ময়বিমূঢ় হয়ে ভাবলেন, কি করে এই বালক জানল আমি উপবাসী আছি?

"পুরী কহে কে তুমি কাঁহা তোমার বাস।
কেমনে জানিলে তুমি করি উপবাস।" (চৈ. চ.)?

তখন বালক বলল, 'আমি এই গ্রামেই থাকি, আমার গ্রামে কেউ উপবাসী থাকতে পায় না। গ্রামের মেয়েরা জল নিতে এসে তোমাকে দেখে আমাকে দুগ্ধ দিয়ে পাঠিয়েছেন—আমি গো দোহন করে এসেই ভাণ্ডটি নিয়ে যাব।' মাধবেন্দ্র পথ পানে চেয়ে থাকেন, কই ভাণ্ডটি তো নিয়ে গেল না। রাত্রে স্বপ্নে দেখেন সেই বালক বলছে—'আমি এই কুঞ্জে ঝড়বৃষ্টি সহ্য করে থাকি, বড় কষ্ট পাই। তুমি গ্রামের লোকদের এনে আমাকে পর্বতের উপরে মন্দির নির্মাণ করে রাখ। আমি বৃন্দাবনের গোপাল, ম্লেচ্ছভয়ে আমার সেবক আমাকে এই জঙ্গলে রেখে পালিয়ে গিয়েছে।' মাধবেন্দ্রপুরী গ্রামবাসীদের এনে দেখলেন সত্য সত্যই গোপাল মূর্তি জঙ্গ লে মাটি ঢাকা হয়ে পড়ে আছে। মূর্তিটি তুলে মন্দির নির্মাণ করে মাধবেন্দ্র পুত্রজ্ঞানে গোপালের পূজা করতে লাগলেন। গোপালকে ছেড়ে কোথাও যেতে পারেন না। একদিন গোপাল স্বপ্নে আদেশ দিয়ে বললেন, "মাধব, দারুণ গ্রীষ্মে আমার শরীরে দারুণ জ্বালা। তুমি যদি নীলাচল থেকে মলয়জ চন্দন এনে আমার দেহে লেপন করতে পার তবে দেহের জ্বালা নিবারিত হয়।' স্বপ্ন যেন মাধবের মাথায় বজ্রাঘাত করল। এতদিন গোপালকে ছেড়ে থাকবেন কি করে! আবার ভাবলেন গোপালের আদেশ না মানলেও নয়। অবশেষে স্থির করলেন, পুরী গেলে চন্দন আনাও হবে, জগন্নাথ দর্শনও হবে। রওনা হলেন নীলাচলের দিকে, পথে শান্তিপুর। সেখানে অদ্বৈত আচার্য তাঁর নিকট কৃষ্ণমন্ত্রে দীক্ষিত হলেন। এখানেই বাঙ্গালার বৈষ্ণবধর্মেব বীজ রোপিত হল। তার ফল নবদ্বীপে গৌরাঙ্গ অবতার। শান্তিপুর থেকে পুরী যাওয়ার পথে পড়ল রেমুণা। রেমুণায় গোপীনাথের পূজার জাঁকজমক দেখে মোহিত হলেন। পূজারীর নিকট জানতে পারলেন নানাবিধ ভোগের মধ্যে শয্যাভোগে যে বারটি পাত্রে 'অমৃতকেলি' নামে ক্ষীর ভোগ দেওয়া হয় তা ভুবন বিখ্যাত। ভুবন বিখ্যাত ক্ষীরের কথা শুনে মাধবেন্দ্রের ক্ষীরের আস্বাদ গ্রহণ করার ইচ্ছা হল। যাতে তিনি ঐরকম ক্ষীর তৈরি করে গোপালকে নিবেদন করতে পারেন। কিন্তু তিনি লজ্জায় ঐ কথা প্রকাশ কবতে পারলেন না। মন্দিরের অনতিদূরে এক হাটতলায় এসে রাত্রে ভগবানের নাম করতে লাগলেন। এদিকে শয্যাভোগ আরতি শেষ হলে গোপীনাথ একপাত্র ক্ষীর নিজের আঁচলে লুকিয়ে রাখলেন। গভীর রাত্রে সকলে যখন নিদ্রামগ্ন তখন গোপীনাথ স্বপ্নে দেখা দিয়ে পূজারীকে বললেন,

"উঠহে পূজারী দ্বার করহ মোচন।
ক্ষীর এক রাখিয়াছি সন্ন্যাসী কারণ ॥
ধরার অঞ্চলে ঢাকা এক ক্ষীর রয়।
তোমরা না জান তাহা আমার মায়ায়॥
মাধব সন্ন্যাসী আছে হাটেতে বসিয়া।
তাকে এই ক্ষীর শীঘ্র দেওহে লইয়া ॥"

স্বপ্ন ভঙ্গ হলে দ্বার মোচন করে পূজারী দেখেন সত্য সত্যই গোপীনাথেব আঁচলে এক ক্ষীর পাত্র বাঁধা। ক্ষীর পাত্র নিয়ে পূজারী হাটে গিয়ে—

"কোথায় আছহে তুমি মাধবেন্দ্র পুরী।
তোমার জন্যে গোপীনাথ ক্ষীর করেছে চুরি ॥"

বলে ডাকতে লাগলেন। মাধবেন্দ্র পরিচয় দিলে পূজারী বললেন, "গোপীনাথের আদেশেই আপনাকে এই ক্ষীর দিচ্ছি।' গোপীনাথের দয়ায় মুগ্ধ হয়ে মাধবেন্দ্র ভূমিতে লুটিয়ে পড়ে বললেন, "প্রভু, এই হতভাগার জন্য তোমাকে চোর অপবাদ গ্রহণ করতে হল?" তখন পূজারী বললেন, "আপনি মহাপুরুষ, ভক্তের জন্য ভগবানের চুরি অপবাদ আর বেশি কি?" মাধবেন্দ্র ভক্তিপূর্বক প্রসাদ গ্রহণ করে ধন্য হলেন।"

পরদিন যখন পূজারীর মুখে গোপীনাথের ক্ষীর চুরির কথা প্রকাশ পেল, তখন দলে দলে লোক সেই ভক্তের সন্ধানে হাটের দিকে ধাবিত হল। কিন্তু আত্মপ্রকাশের ভয়ে সেই রাত্রেই মাধবেন্দ্র পুরীর দিকে রওনা হয়েছিলেন। সেই থেকে রেমুণার এই গোপীনাথ, ক্ষীরচোরা গোপীনাথ নামে পরিচিত হলেন।

॥ ভক্তজীবনী ॥

শাণ্ডিল্যকৃত্য ভক্তি সূত্র বলছেন—ভগবদ্ ভক্তিতে চণ্ডালাদিরও অধিকার আছে কেননা, পারম্পর্যানুসারে সকলেই সমান।

ভক্তিমার্গে বর্ণ বা জাতির বিচার নেই, বাল বৃদ্ধ যুবা স্ত্রী বা পুরুষের বিচার নেই, পুণ্যাত্মা বা পাপী, যোগী-ভোগী বা ত্যাগীর বিচার নেই, উচ্চনীচ, শ্রেষ্ঠ নিকৃষ্টের বিচার নেই, মানুষের কথা দূরে থাকুক গজ গৃধ্র, বানর প্রভৃতিও ভক্তির অধিকার পেয়েছে। বস্তুতঃ ভক্তিই জগজ্জননীর ন্যায় জীবমাত্রকেই পূর্ণানন্দের অধিকার দান করে। ভক্তি পথানুগামী অনেক ভক্তের পূতচরিত্র আমাদের শাস্ত্রে বর্ণিত আছে। তাঁদের মধ্যে এখানে দুইজন ভক্ত চরিত্রের উল্লেখ করব তাঁরা হলেন (১) দাক্ষিণাত্য প্রদেশের খাণ্ডল নামক গ্রামের করমেতি বাঈ (২) গোবর্ধন গ্রামের পরমভক্ত গোবিন্দদাস।

সাধারণ লোকের ধারণা ও বিশ্বাস—স্ত্রীজাতি মূর্তিমতী মায়া। স্ত্রী জীবনের সঙ্গে যেন পবিত্র ধর্মভাবের কোন সম্বন্ধই নেই। এ বিশ্বাস নিতান্ত অলীক। বিশ্বাস, শ্রদ্ধা, ভক্তি ও নিষ্ঠা স্ত্রীজাতির স্বাভাবিক ধর্ম। এ প্রবন্ধের অধিনায়িকা করমেতিবাঈ এর জাজ্জ্বল্যমান দৃষ্টান্ত।

করমেতিবাঈ

দাক্ষিণাত্য প্রদেশে খাঞ্জন নামক গ্রামে পরশুরাম নামে জনৈক রাজ পুরোহিত বাস করতেন। তাঁর কন্যার নাম করমেতিবাঈ। রাজা এবং রাজপুরোহিত উভয়েই পরম বৈষ্ণব ছিলেন। তখনকার দিনেও বৈষ্ণবগণের স্ত্রী ও কন্যাদের বিদ্যাভ্যাস করবার রীতি ছিল। ধর্মশাস্ত্র ভাল করে বুঝতে পারবে এটাই বিদ্যাভ্যাসের মুখ্য উদ্দেশ্য ছিল। করমেতিবাঈ শৈশবাবস্থাতেই বিদ্যাবতী হয়েছিলেন। বিদ্যাশিক্ষার সঙ্গে সঙ্গে বৈষ্ণবধর্মে ভক্তি জন্মেছিল। পণ্ডিত পরশুরাম কন্যা বিবাহযোগ্যা হলে পাত্রস্থ করলেন। করমেতিবাঈ পিতার অনুরোধে বাধ্য হয়ে নিতান্ত অনিচ্ছাসত্ত্বেও বিবাহ করলেন বটে কিন্তু শ্বশুরালয়ে গিয়ে গৃহস্থালি করতে অসম্মত হলেন।

তিনি একাকিনী নির্জনস্থানে বসে সর্বদা অভীষ্টদেবের সুচারুচরণ চিন্তা করতেন। কৃষ্ণ প্রেমরূপ প্রফুল্ল কমলে তাঁর মনমধুকর মত্ত ছিল। তিনি কৃষ্ণপ্রেমরূপ সুধাসিন্ধুতে ডুবে গিয়েছিলেন। সংসারের প্রলোভন তাঁকে আকর্ষণ করতে পারল না। এভাবে দিন গত হয়ে যায়। তাঁকে শ্বশুরালয়ে নিয়ে যাবার জন্য আবার সকলে সচেষ্ট হলেন কিন্তু করমেতিবাঈ স্বামীগৃহ বিষবৎ জ্ঞান করতেন। কেননা, তিনি পূর্বেই অবগত হয়েছিলেন যে তাঁর স্বামী অবৈষ্ণব ও ঘোর বিষয়ী। এইজন্য তিনি স্বামিসমাগম অতি ভয়াবহ মনে করতেন। শোক ও দুঃখে তাঁর হৃদয় অস্থির হয়ে উঠল। তিনি ভূলুণ্ঠিত হয়ে রোদন করতে লাগলেন।

অবশেষে স্থির করলেন যে কাকেও কিছু না বলে গোপনে বৃন্দাবন পলায়ন করবেন। এইরূপ চিন্তা করে করমেতিবাঈ মনের অনুরাগে রাত্রিতে নিজ প্রকোষ্ঠ হতে বহির্গত হলেন এবং গৃহের চতুর্দিকে দ্বার রুদ্ধ দেখে উপরতলা হতে নীচে লম্ফ প্রদান করলেন। প্রহ্লাদ যেমন পর্বতশিখর থেকে ভূমিতলে পড়ে যাঁর কৃপাগুণে কিছুমাত্র আঘাতপ্রাপ্ত হননি, সেই ভক্তবৎসল কৃপানিধানের অনন্ত মহিমার কথা কে বুঝবে ! করমেতিবাঈ ভূমিতে যেন তাঁরই কমনীয় অঙ্কে নিপতিত হলেন। অঙ্গে কিছুমাত্র আঘাত লাগল না। কুলবালা একাকিনী কখনও কোন পথে গমন করেন নি, প্রেমের আবেশে উর্ধ্বশ্বাসে বৃন্দাবনের উদ্দেশ্যে কাঙ্গালিনীর বেশে যাত্রা করলেন। এদিকে রাত্রি প্রভাত হল। পণ্ডিত পরশুরাম শয্যাত্যাগ করে দেখলেন কন্যার গৃহশূন্য। তাঁর শরীর কম্পিত হয়ে উঠল। মনে কত পাপ কথা উঠতে লাগল। অনন্যোপায় হয়ে পরশুরাম রাজসমীপে এসে কন্যার অন্তর্ধানের কথা জানিয়ে ক্রন্দন করতে লাগলেন। রাজা এ কথা শ্রবণ করে নিতান্ত দুঃখিত হলেন এবং পরশুরামের কন্যার অন্বেষণের জন্য চারিদিকে লোক পাঠালেন।

ভক্তিমতী করমেতিবাঈ যখন একটি প্রকাণ্ড প্রান্তর অতিক্রম করছিলেন তখন দেখতে পেলেন তাঁর অন্বেষণার্থে প্রচুর লোক আসছে। সেই কান্তারে কোথাও লুক্কায়িত হওয়ার মত স্থান নাই। কি করেন, সম্মুখে একটি মৃত উষ্ট্রের দেহ দেখতে পেলেন। শৃগাল কুকুরে তার মাংসাদি প্রায় ভোজন করেছে। তার বিশাল উদর গহ্বরে সাধ্বী লুক্কায়িত হলেন। দুর্গন্ধে তার নিকটে যায় কার সাধ্য! অন্বেষণকারীরা অন্যদিক দিয়ে চলে গেল। যাঁর হৃদয়ে ভগবৎ প্রেমের উদয় হয়েছে তাঁর কি আর বিষ্ঠা চন্দনে প্রভেদ থাকে? করমেতিবাঈ সেই দুর্গন্ধপূর্ণ উষ্ট্রের উদর কুটিরে তিনদিন অনাহারে কেবল কৃষ্ণনাম সুধারস পান করে অতিবাহিত করলেন। চতুর্থ দিবসে তথা হতে বহির্গত হয়ে নদীতে অবগাহনপূর্বক শরীর নির্মল করলেন। এইরূপ পথে অনেক দুঃসহ ক্লেশ সহ্য করে সুমতি করমেতিবাঈ বৃন্দাবনে গিয়ে পৌঁছলেন। মধুবৃন্দাবন দর্শনে তাঁর বহুদিনের মনোবাঞ্ছা পূর্ণ হল। ব্রহ্মকুণ্ডের তীরে অরণ্যানী মধ্যে প্রেমবিবশ হৃদয়ে কৃষ্ণদর্শনাশায় ধ্যান যোগারাধনায় উপবিষ্ট হলেন।

পণ্ডিত পরশুরাম কন্যার বিচ্ছেদে নিতান্ত শোকার্ত হৃদয়ে দেশ-দেশান্তরে অন্বেষণ করতে করতে বৃন্দাবনে গিয়ে উপনীত হলেন। সেখানে বহু অন্বেষণ করে অবশেষে অকস্মাৎ একদিন ব্রহ্মকুণ্ডতীরে কন্যাকে দেখতে পেলেন। দেখলেন করমেতিবাঈ-এর মুখশ্রীর পরিবর্তন হয়েছে, তপঃ প্রভাবে মুখমণ্ডল উদ্ভাসিত। প্রেমময়ের আশ্চর্যজ্যোতিতে তাঁর মুখমণ্ডলে একটি পবিত্র তেজ দেখা দিয়াছে। প্রেমাবেশে দুটি চক্ষু বেয়ে দরদর ধারে অশ্রু ঝরে পড়ছে। ধ্যানভঙ্গ হলে করমেতিবাঈ সম্মুখে পিতাকে দর্শন করে প্রণামপূর্বক উপবিষ্ট রইলেন। মুখে কথা নেই, জিজ্ঞাসা নেই, যেন তাঁর সঙ্গে কোন সম্পর্কই নেই। পরশুরাম বিনম্র বচনে বললেন 'বৎসে! বনবাসিনী হলে কেন? গৃহে চল তথায় কৃষ্ণকে আরাধনা করিও। তুমি আমার গৃহের সাক্ষাৎ ভগবতী লক্ষ্মী, করমেতিবাঈ বললেন, 'পিতঃ, আপনি আমাকে এত স্তুতি মিনতি করছেন কেন? প্রেমময়ের প্রেমসিন্ধুতে আমার মন ডুবে গেছে। দেহমাত্রকে নিয়ে গিয়ে কি ফল হবে? আমার আশায় জলাঞ্জলি দিয়ে গমন করুন। পরশুরাম অনন্যোপায়। রোদন করতে করতে গৃহে ফিরে রাজাকে সব বৃত্তান্ত শোনালেন। পরম বৈষ্ণব রাজা অবিলম্বে কৃষ্ণবিহ্বলা অচঞ্চলা নির্মলা করমেতিবাঈকে দর্শন মানসে বৃন্দাবনের যমুনাপুলিনে গিয়ে তাঁর দর্শন লাভ করলেন। রাজা সসম্ভ্রমে করমেতিবাঈকে সাষ্টাঙ্গ প্রণিপাত করলেন। করমেতিবাঈও রাজাকে দেখে প্রণত শিরে অভিবাদন করলেন। করমেতিবাঈ-এর অবস্থিতির জন্য একটি কুটির নির্মাণার্থ রাজা অনুমতি চাইলে, তাতে প্রয়োজন নেই, ভূমি খনন করতে গেলেই অনেক জীব বিনষ্ট হবে এই

প্রকার বলে অস্বীকার করেন। তথাচ রাজা অনেক স্তুতি মিনতি করে একটি কুটির নির্মাণ করে দিলেন। এক্ষণে উক্ত কুটিরের ধ্বংসাবশেষ বিদ্যমান আছে।

এই প্রকারে ভক্তিমতী করমেতিবাঈ ফলমূলাশন করে বহুদিন জগৎপতির তপস্যায় মগ্ন থেকে কৃষ্ণনাম সুধারসে নিমগ্ন হয়ে ভবধাম পরিত্যাগপূর্বক শাশ্বত চিদানন্দময়ধামে প্রবেশ করলেন।

ভারতবর্ষের কত গুপ্ত সরোবরে এমন কত প্রফুল্ল কমল প্রস্ফুটিত হয়, তা কে জানে?

ভক্ত গোবিন্দদাস

গ্রামের নাম গোবর্ধন---প্রকৃতির সৌন্দর্যে ভরপুর। গ্রামের চতুর্দিকস্থ প্রান্তরভূমি কুঞ্জবনে বেষ্টিত। গ্রামের ঠিক মধ্যস্থানে একটি মনোরম দেবালয়। তাতে নাথজী-শ্রীকৃষ্ণের বিচিত্রলীলা বিগ্রহ বিরাজমান। সরোবর মধ্যে প্রফুল্ল কমলের মত মন্দিরের শোভায় গ্রামটি আলোকিত। প্রতিমাখানির শোভাও অতিশয় মনোরম। যে দর্শন করে তারই মন ভক্তি ও ভালবাসায় উদ্বেল হয়ে উঠে। ত্রিজগতের নাথ নাথজীর শ্রীচরণে সুগঠিত নূপুর, বক্ষঃস্থলে আপাদ বিলম্বিত বিমল বনমালার অপূর্ব শোভা, হাস্য-বিকাশযুক্ত সুললিত বিম্বাধরের অপূর্ব সুষমা, প্রেমাবেশপূরিত নয়নযুগল, নাসায় নোলক, মস্তকে সুচারু চিকুররাজি, পরিধানে পীতবাস। অধরে মৃদুমন্দ হাসিরেখায় সুবর্ণখচিত মুরলী—এই অপরূপ রূপ দেখলে নরনারী, বালক বৃদ্ধ, যুবক যুবতী সকলেরই মন ভুলে যায়।

নাথজীর মন্দির থেকে কিছুদূরে একজন দরিদ্র ব্রাহ্মণের বাস। দরিদ্র হলে কি হয়, ব্রাহ্মণটি অতিশয় ভক্তিপরায়ণ, ব্রাহ্মণীও নিজ পতি ও ত্রিজগৎপতির একান্ত অনুগতা। কেউ কখনও ব্রাহ্মণীর মুখে কর্কশবাক্য শোনেনি। তাদের সংসারে আর কেউই নেই, কেবল গোবিন্দদাস নামে একটি দশ বৎসরের পুত্র। পুত্রের দেহপ্রভায় গৃহ আলোকিত, এরূপ অঙ্গ সৌষ্ঠব ও রূপলাবণ্য যে, হঠাৎ দেখলে মনে হয় যেন সাক্ষাৎ কার্তিকেয় পুত্ররূপে জন্মগ্রহণ করেছেন।

গোবিন্দ গ্রামের চতুর্দিকস্থ বিমল বায়ুসেবিত প্রান্তরে ক্রীড়া করে বেড়ায়। তার সমবয়স্ক সঙ্গীরাও বেড়াতে আসে। একদিন গোবিন্দ মাঠে খেলা করতে এসেছে, সূর্যদেব তখন অস্তাচলে ; তপনতাপের তীব্রতা হ্রাস হওয়াতে লোকের অন্তঃকরণ আনন্দে প্রফুল্ল হয়েছে। গৃহে গৃহে গৃহদেবতার আরতি আরম্ভ হল। শঙ্খঘণ্টার ধ্বনি ও প্রতিধ্বনি হতে লাগল, কিন্তু সঙ্গীরা কেউ এলো না। সে কখনও একা থাকতে ভালবাসতো না। ক্রমে ক্রমে সে বড়ই বিরক্ত হল ; কিন্তু কি করবে? কেউ আসল না দেখে নাথজীর আরতি দেখে আসি বলে মন্দিরে গমন করল। মন্দিরে গিয়ে নাথজীর মৃদুমন্দমধুর হাস্য বিকশিত মুখখানির দিকে চেয়ে আরতি দেখতে দেখতে গোবিন্দের জন্ম-জন্মান্তর সঞ্চিত প্রেমানুরাগ বশত মনপ্রাণ প্রভুর ত্রিভুবনমোহন হাবভাব কটাক্ষে, মহাসিন্ধুতে পতিত শিলাখণ্ডের ন্যায় ডুবে গেল। গোবিন্দ অমনি প্রভুর জড়মূর্তি জন্মের মত ভুলে গেল। তার মনে হল যেন সম্মুখে একটি প্রিয়দর্শন জীবন্তবালক মনভুলানো বেশে দাঁড়িয়ে আছে। গোবিন্দ বিবশচিত্তে ঐ বালককে মনপ্রাণে ভালবাসল, আর ভাবল, আজ হতে এই শ্যামলসুন্দর বালকটির সঙ্গে খেলা করব। এই ভাবাবেশে গোবিন্দ মন্দিরের দ্বারে প্রতীক্ষা করতে লাগল। আরতি দেখার পর লোকসকল চলে গেল। মন্দির হল জনশূন্য, পূজারীও প্রস্থান করল। সকলেই গেল, থাকল কেবল গোবিন্দ। গোবিন্দ নাথজীকে নির্জনে পেয়ে আত্মহারা ও প্রেমে অবশ হয়ে বলল, 'নাথজী! তুমি ভাই আমার সঙ্গে খেলা করবে? চল, আমরা দু'জনে রাত্রিতে এই প্রান্তরে খেলা করি।'

গোলকধামের সৌরভে আমোদিত, ব্রজবালকগণের চেতনা-সঞ্চারী-অদ্ভুত প্রেমের বাতাস গোবিন্দের গায়ে লাগল, গভীর প্রেমে বিভোর ব্রাহ্মণবালক তাই আজ ত্রিভুবনপতি ভগবানকে নিজের সঙ্গে খেলা করতে ডাকছে ; কিন্তু ভক্তবাঞ্ছাকল্পতরু ভক্তের প্রাণধন নাথজী ভক্তের প্রেমাবেশ দেখে থাকতে পারলেন না। মন্দিরের ভিতর থেকে কে যেন বলল, "হ্যাঁ ভাই ! চল আমরা দুইজনে মনের আনন্দে খেলা করব।"

প্রভু, তুমি বালকের অকপট প্রেম বড় ভালবাস ! তুমিই তো ধ্রুবের প্রাণের ডাকে বৈকুণ্ঠ ত্যাগ করে বনমাঝে মোহন সাজে তাকে দেখা দিয়েছিলে. তুমিই তো প্রহ্লাদ-প্রেমে বশীভূত হয়ে তাকে আত্মসাৎ করেছিল, তুমিই না প্রভু, ব্রজবালকগণের ভালবাসায় প্রতিদিন গোষ্ঠলীলা করতে যেতে? আজ আবার গোবিন্দ পিতামাতা ও জগৎ ভুলে তোমার প্রেমে ডুবে তোমাকে খেলা করতে ডাকল, আর থাকতে পারলে না, প্রেমের ডাক তোমাকে বড় মধুর লাগে।

নাথজী মোহনবেশে হাস্য করতে করতে বহির্গত হলেন। এমন সময়ে নিশানাথ গগন মণ্ডলে উদিত হলেন। তারাগণ উজ্জ্বল কিরণ বিস্তার করতে লাগল। চন্দ্রের সুধাধারাবাহিনী সুস্নিগ্ধ জোৎস্না, ধরাকে অমরাবতী করে তুলল। দুইজনে বিজন প্রান্তরে উপস্থিত হয়ে নানাবিধ ক্রীড়া করতে লাগল। গোবিন্দ বলেছিল যে, সে নাথজীকে মারবে না, তা সে ভুলে গেল। কথায় কথায় খেলা নিয়ে বিরোধ উপস্থিত হল, আর যোগেশ্বরের যোগমায়ায় বিমোহিত গোবিন্দ নাথজীর গালে এক চড় মেরে বলল, "আর. কখন আমায় রাগাবি, তাহলে এক চাপড়ে তোর পিঠ ফাটিয়ে দেব।'

"ভয়াদস্যাগ্নিস্তপতি ভয়াত্তপতি সূর্যঃ।
ভয়াদিন্দ্রশ্চ বায়ুশ্চ মৃত্যুর্ধাবতি পঞ্চমঃ ॥

যাঁর ভয়ে অগ্নি জ্বালামালা সহ প্রজ্বলিত হয়, তপন যার ভয়ে উত্তাপ দানে ব্যস্ত, ইন্দ্র যাঁর ভয়ে সদা ত্রস্ত থেকে বারিধারা বর্ষণ করে, বায়ু যাঁর ভয়ে গন্ধ শব্দাদি বহনপূর্বক প্রবাহিত হয়, এবং মহাভয়দাতা যমও যাঁর ভয়ে চমকিত ও ভীত হয়ে নিজ কার্যার্থে সদা প্রধাবিত হয়ে বেড়ায়, আজ সেই ভক্তবৎসল ত্রিজগতের প্রভু বালস্বভাব ভক্তের দ্বারা শাসিত ও তিরস্কৃত হয়েও কোপ করলেন না, দীনদয়াল প্রভু, তুমি ধন্য।

ত্রিজগতের নাথ নাথজী কাঁদতে লাগলেন, বললেন, 'তুমি তো বলেছিলে আমাকে মারবে না, তবে মারলে কেন?' তাঁকে কাঁদতে দেখে গোবিন্দের হৃদয় গলে গেল, বলল, ভাই রাগ করিস না। তোকে আমি বড়ই ভালবাসি।' একত্রে খেলা শুরু হল। খেলা শেষে উভয়ে উভয়ের নিকট বিদায় নিয়ে প্রত্যাবর্তন করলেন।

ভক্ত আর ভক্তের ঠাকুর এইরূপে প্রতিদিন ক্রীড়া করেন। একদিন প্রাতে সূর্যোদয় হলে কুমুদ মুকুলিত ও কমল বিকশিত হতে লাগল। পল্লবের অগ্রভাগ হতে শিশিররাশি মুক্তার ন্যায় পড়তে আরম্ভ করল। প্রভাত সমীরণ মালতী পুষ্পের সৌরভ বহন করে সুপ্তোত্থিত মানবগণের মনে আনন্দ বিতরণপূর্বক ইতস্তত বইতে লাগল। এমন সময়ে গোবিন্দ ও নন্দ-প্রাণ গোবিন্দ খেলার জন্য এসে উপস্থিত। ঠিক হল, আজ দাণ্ডাগুলি (দেশীয় খেলা) খেলা হবে। ক্রমে গোবিন্দ দাণ্ডার অধিকার পেল। নাথজী খাটবার ভয়ে দৌড়ে পলায়ন করতে লাগলেন। যেদিকে নাথজী যান গোবিন্দও সেই দিকে ধাবিত হয়। অবশেষে. নাথজী নিজ মন্দিরে প্রবেশ করে সিংহাসনে ত্রিভঙ্গভঙ্গিম মূর্তিতে দণ্ডায়মান হলেন। মন্দিরে প্রবেশ করতে না পেরে গোবিন্দ দ্বারদেশে তর্জন গর্জন করতে লাগল। কিয়ৎক্ষণ পরে পূজারী মন্দিরের দ্বার উদঘাটন করলে গোবিন্দ কাষ্ঠের গুলি সজোরে নাথজীর দিকে নিক্ষেপ করে বলতে লাগল 'আর কখন পালিয়ে আসবি।' পূজক ঠাকুরেরা "কি করলি, কি করলি' বলে

গোবিন্দকে উত্তমমধ্যম দিয়ে মন্দির হতে বহিস্কৃত করে দিলেন। এদিকে গোবিন্দ নাথজীকে সম্বোধন করে বলতে লাগল—'তুমি মন্দিরে লুকিয়ে আছ, আর লোকের দ্বারা আমার নিগ্রহ করলে। ভাল, কাল এর প্রতিশোধ নিব। তোমাকে উপযুক্ত প্রতিফল না দিয়ে আমি জল গ্রহণ করব না।' এই বলে বাড়ি না গিয়ে একটি কুণ্ডের তীরে বসে রইল।

এদিকে পূজারীগণ নাথজীর নানাপ্রকার ভোগ প্রস্তুত করে নিবেদন করতে গেলে মূল পূজারীর প্রতি প্রত্যাদেশ হল, "গোবিন্দ নামে যে বালকটি আমার সঙ্গে খেলতে এসেছিল, তুমি কেন তাকে নিগ্রহ করে বের করে দিয়েছ। তুমি যত তাকে প্রহার করেছ সে সকল আঘাতই আমার অঙ্গে লেগেছে। সে যে আমার পরম ভক্ত, সে অভিমানে বাড়ি যায় নেই। উপবাস করে আছে, তাকে নিয়ে এস, সে যদি এখানে না আসে তাহলে আমি অন্নজল কিছুই গ্রহণ করব না।" এই প্রত্যাদেশে সকলে চমকিত হল। বলতে লাগল কি কুকর্মই না করেছি! পূজারী তো জানতেন না যে ভক্ত ও ভক্তবৎসল অভিন্ন-একাত্মা। ভক্ত কাঁদলে প্রভু কাঁদেন, ভক্ত নাচলে প্রভু নাচেন, ভক্তের আশীর্বাদই প্রভুর আশীর্বাণী, ভক্তের সেবা করলে প্রভুর সেবা সিদ্ধ হয়, ভক্তকে নিন্দা ও নির্যাতন করলে প্রভুকেই নিন্দা নির্যাতন করা হয়, ভক্ত না খেলে প্রভুর সেবা হয় না, ভক্তকে আদর না করলে প্রভুর অনাদর করা হয়।

তৎপরে সকলে মহাব্যস্ত হয়ে গোবিন্দের অনুসন্ধানে চললেন। ঘরে, বনে, মাঠে নানা স্থানে খুঁজে অবশেষে গোবিন্দকুণ্ডের তীরে সন্ধান পেলেন। দেখলেন, গোবিন্দ একটি বেত্রহস্তে বসে আছে। তখন সকলে বিনয়পূর্বক বলতে লাগলেন, "নাথজী তোমাকে নিয়ে যাওয়ার জন্য আমাদের পাঠিয়েছেন। তোমায় না দেখে তিনি কিছুই ভোজন করবেন না উপবাসী আছেন। আর নাথজী তোমার নিকট হার মেনেছেন।' গোবিন্দ তাঁদের এইসব কথা শুনে আহ্লাদিত হয়ে বলল, "যদি নাথজী হার মেনে থাকে তবে যাব।' মন্দিরে এসে নাথজীর শ্রীমুখ মলিন দেখে গোবিন্দ বড়ই বেদনা পেল। বলল, "ভাই, তুমি খাও নাই কেন?' এস দুজনে একত্রে খাই। মন্দিরের কপাট অবরোধ করে দুইজনে একত্রে ভোজন করতে বসলেন। তখন দু'জনের আর হাস্য ধরে না। আনন্দের ধ্বনিতে মন্দির প্রতিধ্বনিত হতে লাগল। আজ সাধের সোহাগে দুইজনে মাখামাখি, আজ শ্রীগোবিন্দের শ্রীচরণে গোবিন্দ বিকিয়ে গেল। প্রভু ও ভক্তের গুহ্য রহস্য বুঝবে কে? অকস্মাৎ দ্বার উদঘাটিত হল। গোবিন্দ মন্দির হতে বেরিয়ে এল নাথজী আবার শ্রীমূর্তিতে মিশে গেলেন। সত্যই, ভক্তিই সাধকের জীবনামৃত।

শ্রীশ্রীবৈষ্ণব গ্রন্থ চুরি

শ্রীমন্মহাপ্রভুর আদেশে ও কৃপাশক্তি বলে শ্রীরূপ ও শ্রীসনাতন গোস্বামী মহাপ্রভুর অভিলষিত গূঢ়ভাব শাস্ত্রাকারে লিপিবদ্ধ করেন। শ্রীরূপ গোস্বামীর অভিলাষ পূরণের জন্য শ্রীজীব গোস্বামী শ্রীনিবাস, নরোত্তম ও শ্যামানন্দের দ্বারা গ্রন্থাবলী গৌড় দেশে প্রেরণ করার ইচ্ছা প্রকাশ করলেন। যাতে গৌড়দেশে সকলে অমূল্য গ্রন্থরাজির বিষয় অবগত হতে পারে। শ্রীজীব কার্তিক ব্রত সমাপন কালে বৈষ্ণবগণকে একত্রিত করে নিজ অভিলাষ জ্ঞাপন করলেন। সকল মহান্তই গ্রন্থ প্রেরণের প্রস্তাব অনুমোদন করলেন। একাজের জন্য শ্রীনিবাস, নরোত্তম ও শ্যামানন্দ দায়িত্ব পেলেন। শ্রীজীব গোস্বামী মথুরাবাসী এক মহাজন সেবককে পত্রদ্বারা ডেকে এনে গৌড়দেশে ভক্তিগ্রন্থ প্রেরণের সমস্ত দায়িত্ব অর্পণ করলেন। মহাজন গোস্বামী পাদের নির্দেশ মত দুইটি গাড়ী, চারিটি বলিষ্ঠ বলদ ও দশজন বলিষ্ঠ লোকসহ দশদিনের মধ্যে সমস্ত প্রস্তুতপর্ব শেষ করলেন। শ্রীজীব গোস্বামী সমস্ত গ্রন্থ নিয়ে গাড়ীতে ভরলেন। ১২১ খানি ভক্তিগ্রন্থ তন্মধ্যে সনাতনের হরিভক্তি বিলাস, হরিভক্তি রসামৃত সিন্ধু,

চৈতন্য চরিতামৃত, উজ্জ্বল নীলমণি, ললিত মাধব, দানকেলী কৌমুদী প্রভৃতি গৌড়ীয় বৈষ্ণবগণের সর্বপ্রধান রত্নভাণ্ডার ছিল।

"শ্রীরূপের গ্রন্থ যত নিজ গ্রন্থ আর, / থরে থরে বসাইলা ভিতরে তাহার"
বহুলোক লৈয়া সিন্দুক আনিল ধরিয়া। / গাড়ির উপরে সব চড়াইল লঞা ॥
সর্বলোকের সাক্ষাতে কুলুপ দিল তায়। / মোমজামায় ঘেরাইল সর্বাঙ্গে লেপটায়।"

শ্রীনিবাস, নরোত্তম ও শ্যামানন্দ সবার নিকট বিদায় নিয়ে অগ্রাণ মাসের শুক্লপক্ষের পঞ্চম দিবসে গ্রন্থভর্তি গাড়ি নিয়ে গৌড় দেশ অভিমুখে রওনা হলেন। দশজন অস্ত্রধারী, দুই গাড়োয়ান সহ মোট পনের জন চললেন। শ্রীজীব গোস্বামী মথুরা পর্যন্ত এসে তথায় রাত্রিবাস করে প্রভাতে সকলকে বিদায় দিলেন এবং মহাজন পাঠিয়ে 'রাজপত্র' এনে শ্রীনিবাসকে অর্পণ করলেন। তাঁরা স্থানে স্থানে ঐ রাজপত্র দেখিয়ে নির্বিঘ্নে চলতে লাগলেন। আগ্রায় একরাত্রি অবস্থান করে কতদুর রাজপথে গমন করলেন। তারপর ঝাড়িখণ্ডের বনপথে মহাপ্রভুর লীলাস্থল দর্শন করতে করতে চলতে মনস্থ করলেন। মগধদেশ (পাটনা) বামে রেখে ঝাড়িখণ্ড পথে চললেন। তারপর পঞ্চকুটির মধ্য দিয়ে তমলুকে এলেন। সেখান থেকে পঞ্চবটী গ্রাম বামে রেখে এলেন রঘুনাথপুরে। তখন বিষ্ণুপুরের রাজা বীবহাম্বীর। কিন্তু "দস্যু বৃত্তি করে তাহে অত্যন্ত দুঃশীল।" তাঁর অধীনে "ফাঁসিয়ারা মানুষমারা আছে শত শত।" রাজজ্যোতিষীগণে রাজাকে বললেন, এই রাস্তা দিয়ে বহুরত্নপূর্ণ শকট যাবে। রাজার দস্যুরা বিষ্ণুপুরের সন্নিকটে সুযোগ বুঝে গোপালপুরে উপনীত হল এবং রাত্রে দুই শত দস্যু রাহাজানি করে শকটসহ সিন্দুক নিয়ে রাজভবনে উপস্থিত হল। হাম্বীর প্রীত হয়ে দস্যুদের পারিশ্রমিক ও পুরস্কার দিয়ে বিদায় করলেন। রাজা সিন্দুকে খুলে দেখলেন রত্ন কোথায়? সবই যে গ্রন্থ।

এদিকে তিনজন সাধু বৈষ্ণবের যে শোক হল তা বর্ণনীয় নয়। গ্রন্থগুলির আর নকল ছিল না। বাংলাদেশ হতে গ্রন্থগুলি নকল কবে ভারতবর্ষের নানা স্থানে প্রেরিত হবে এই ছিল ব্যবস্থা। সংবাদ বৃন্দাবনে পৌছিল। বৃদ্ধ কৃষ্ণদাস কবিরাজ এই শোক সংবাদ সহ্য করতে না পেরে রাধাকুণ্ডে ঝাঁপ দিয়ে প্রাণত্যাগ করলেন। এদিকে শ্রীনিবাস নরোত্তম ও শ্যামানন্দকে দেশে পাঠিয়ে দিয়ে গ্রন্থের সন্ধানে থেকে গেলেন। নয় দিন অনুসন্ধানের পর শ্রীনিবাস জানতে পারলেন যে দেশের রাজা স্বয়ং একজন দস্যু, সুতরাং অপহৃত গ্রন্থগুলির সন্ধান পাওয়া সহজ নয়। দশমদিনে তিনি দেউলি নামক গ্রামে পৌছিলেন। গ্রামটি যশোদা নদীর তীরে এবং বিষ্ণুপুর হতে এক মাইল দূরে। সেখানে কৃষ্ণবল্লভ নামক এক তরুণ ব্রাহ্মণ যুবকের সঙ্গে তাঁর দেখা হয়। যুবকটি শ্রীনিবাসের পাণ্ডিত্যে মুগ্ধ হয়ে পড়েন এবং তাঁর কাছে পাঠগ্রহণ করতে লাগলেন। যুবকটি প্রত্যহ রাজসভায় ব্যাসাচার্যের ভাগবত ব্যাখ্যা শুনিতে যেতেন।

বীর হাম্বীর দস্যু সর্দার হলেও তাঁর সভা পণ্ডিত ব্যাসাচার্যের নিকট সেই দেশের চিরাগত রীতি অনুসারে অপরাহ্নে শাস্ত্রপাঠ শুনতেন। শ্রীনিবাসের অনুরোধে কৃষ্ণবল্লভ তাঁকে সেই শাস্ত্রব্যাখ্যা শুনতে রাজবাড়ী নিয়ে গেলেন। প্রথমদিন তিনি নির্বাক হয়ে থাকলেন। দ্বিতীয় দিন আর থাকতে পারলেন না, বললেন 'আপনি প্রশস্ত পথ ছেড়ে একি ব্যাখ্যা করছেন? 'ব্যাসাচার্য কোন উত্তর করলেন না। তৃতীয় দিনেও শ্রীনিবাস বললেন, "আপনি ভাগবত ব্যাখ্যা করছেন অথচ শ্রীধরের টীকা ছেড়ে আপনি রাস পঞ্চাধ্যায় বুঝতেই পারছেন না।' পাঠক ক্রুদ্ধ হলেন। রাজাকে বললেন, "এই গৈরিকধারী যুবকের আস্পর্ধা দেখুন।' আমার ব্যাখ্যায় ভুল ধরতে পারে এমন পণ্ডিত কে আছে। তখন রাজার নির্দেশে শ্রীনিবাস পাঠ করলেন। শ্রীনিবাসের পাঠে রাজাসহ সকলেই মুগ্ধ হয়ে গেল। রাজা বললেন, "যেই মত গাড়ী সব তেমত আছয়।" রাজা সপরিবারে দীক্ষা গ্রহণ করলেন। ব্যাসাচার্যর বাদ গেলেন না। 'বিষ্ণুপুরে হরিনামের রোল উঠল। বিষ্ণুপুর হল নব বৃন্দাবন।

পঞ্চম পর্ব

দ্বাদশ অধ্যায়

বৈষ্ণব তীর্থ পরিক্রমা

॥ শ্রীপাট নির্ণয় ॥

"ক্ষণার্দ্ধং নিমিষার্দ্ধং বা যত্র তিষ্ঠন্তি সাধকাঃ
স্থানসিদ্ধমিদং জ্ঞেয়ং তত্তীর্থং তত্তপোবনম্ ॥"
"যেখানে বৈষ্ণব থাকেন কৃষ্ণকথা পানে।
গঙ্গাদি তীর্থ তাঁহা হয়েন অধিষ্ঠানে"
"এক দুই মহান্ত যাহা পাট কহিয়ে।
অনেক বৈষ্ণব যাহা মহাপাট লিখিয়ে ॥"

বৈষ্ণবগণের সমগ্র দেশব্যাপী অনেক পাট রয়েছে। সবগুলির বর্ণনা দিতে গেলে গ্রন্থকলেবর বৃদ্ধি পাবে। তাই দ্বাদশ গোপালের পাট সম্বন্ধেই আলোচনা সীমাবদ্ধ রাখলাম।

১। **শ্রীঅভিরাম গোস্বামী** শ্রীপাট খানাকুল। হুগলী জেলার তারকেশ্বর স্টেশন থেকে বাসে যাওয়া যায়। শ্রীপাট নির্ণয়ে—

"খানাকুল কৃষ্ণনগরে ঠাকুর অভিরাম।
তাহার ঘরণী মালিনী যার নাম ॥"

এখানে অভিরাম গোস্বামী অনেক অপ্রাকৃত 'লীলা করেন। ঠাকুর অভিরামের পূর্বেই মালিনী দেহ রাখেন। একদিন, এক ভাস্কর সেখানে এলে অভিরাম তাঁকে মালিনীর মূর্তি নির্মাণ করতে বলেন।

শিষ্যকে বিগ্রহ সেবার ভার দিয়ে তিনি পরলোক গমন করেন। এইভাবে ব্রজের শ্রীদাম, অভিরাম গোপাল নাম ধারণ করে কৃষ্ণনগরে শ্রীপাট স্থাপন করেন।

শ্রীনিবাস আচার্য গৌড়দেশে ভ্রমণ কালে ঠাকুর অভিরামের সঙ্গে মিলিত হন। মহাপ্রভুর অন্তর্ধানের পর অভিরাম যোগ্যপাত্রে চাবুক মেরে প্রেমদান করতেন।

"ঘোড়ার চাবুক নাম জয়মঙ্গল।
তাহা মারি করে লোকে প্রেমায় বিহ্বল ॥"

২। **ধনঞ্জয় পণ্ডিত** : শ্রীপাট শীতল গ্রাম।

কাটোয়া হতে নয় মাইল দূরে অবস্থিত শ্রীধনঞ্জয় পণ্ডিতের শ্রীপাট, প্রভু নিত্যানন্দের আদেশে ঠাকুর ধনঞ্জয় প্রেম উদ্দেশ্যে এখানে এসে সেবা স্থাপন করেন।

ধনঞ্জয় গোপালের সূচক :

"পাই নিত্যানন্দ রাম / ধনঞ্জয় গুণধাম / প্রেমাবেশে নিমগ্ন সদাই।
আজ্ঞা হৈলা তাঁর প্রতি / ভাসাইতে রাঢ়ক্ষিতি / সঙ্কীর্তন প্রেমের বন্যায়"
শ্রীউগ্রক্ষত্রিয়গণে / প্রেম দিলা হৃষ্ট মনে / বর্দ্ধমান শীতল গ্রামেতে।
শ্রীগৌরাঙ্গ গোপীনাথ / সেবা স্থাপি অচিরাৎ আকর্ষিল সর্বজনচিতে ॥

৩। **কমলাকান্ত পিপ্পিলাই** : শ্রীপাট (আকনা) মাহেশ।

শ্রীরামপুর স্টেশন হতে একক্রোশ দক্ষিণে। এখানে শ্রীজগন্নাথ মন্দির বিরাজিত। এখানে

দ্বাদশ গোপালের অন্যতম কমলা কর পিপ্পলাই এবং নিত্যানন্দ তনয় বীরভদ্রের শ্বশুর ও কমলাকর পিপ্পলাই-এর জামাতা শ্রীসুধাময়ের শ্রীপাট। মাহেশের রাথযাত্রা ও স্নানযাত্রা সর্বজন প্রসিদ্ধ। "সুধাময় নাম পিপ্পলাইর জামাতা।

বিদ্যুন্মালা নামে হয় তাহার বণিতা ॥"

তিনি নীলাচল যাত্রীদের সঙ্গে নীলাচলে যান এবং তথায় সমুদ্র প্রদত্ত এক কন্যারত্ন লাভ করেন। এই কন্যার সঙ্গেই বীরভদ্রের বিবাহ হয়।

৪। মহেশ পণ্ডিত : শ্রীপাট পালপাড়া।

নদীয়া জেলায। রানাঘাটের লাইনে পালপাড়া স্টেশনে নামতে হয়। এখানে দ্বাদশ গোপালের অন্যতম শ্রীমহেশ পণ্ডিতের শ্রীপাট। বংশী শিক্ষায়

"মহেশ পণ্ডিত বন্দ শ্রী সুবাহু নাম।
পালপাড়া গ্রামে যার হইল বিশ্রাম ॥"

৫। পুরুষোত্তম ঠাকুর : শ্রীপাট সুখসাগর ॥

নদীয়া জেলার শিমুরালী স্টেশনে নেমে কালীগঞ্জ। কালীগঞ্জ থেকে এক মাইল দূরে সুখসাগর শ্রীপাট। পুরুষোত্তমের পত্নী শ্রীজাহ্নবাদেবী। একদিন নিত্যানন্দ মহাপ্রভু নিশাভাগে পুরুষোত্তমের বহিঃপ্রাঙ্গণে মুচুকুন্দ ফুলের বৃক্ষতলে অবস্থান করেন। পুরুষোত্তম মুচুকুন্দ তলায় প্রভুকে দেখে আনন্দিত হয়ে ঘরে আনেন। দ্বাদশ দিন পূর্বে জাহ্নবা একটি শিশু পুত্রকে রেখে পরলোক গমন করেছিলেন। নিত্যানন্দ পুরুষোত্তমকে সান্ত্বনা দিয়ে ঐ শিশুকে নিয়ে খড়দহ চলে যান। শিশু বড় হয়ে ঠাকুর নামে জগতে প্রসিদ্ধ হন। এই শ্রীপাট এখন গঙ্গাগর্ভে। তাই শ্রীবিগ্রহ শিমুরালী স্টেশনের নিকট গঙ্গার ধারে চান্দুর নামক স্থানে বিরাজিত।

৬। কানাই ঠাকুর : শ্রীপাট বোধখানা —(বাংলাদেশ)

যশোর জেলায়, শ্রী কানাই ঠাকুরের শ্রীপাট। বোধখানায় শ্রীপ্রাণবল্লভের সেবা। পঞ্চম দোলের দিন মহাসমারোহে মহোৎসব হয়। বোধখানায় একটি অত্যাশ্চর্য বৃক্ষ আছে। পঞ্চম দোলের পূর্বদিনে ঐ বৃক্ষে একটিও পুষ্প থাকে না। উৎসব দিবসে প্রত্যূষে কয়েকটি কদম্ব পুষ্প প্রস্ফুটিত দেখা যায়। প্রভু এই কদম্বপুষ্প কর্ণে ধারণ করে দোলযাত্রা নির্বাহ করেন। তথাহি কানুতত্ত্ব নির্ণয়ে—

"একদা জাহ্নবা দেবী সহ বৃন্দাবন।/ ঠাকুর কানাই প্রভু করেন গমন ॥
তথায় কীর্তনানন্দে বিহ্বল হইয়া। / পুনঃপুনঃ নানা রঙ্গে নাচিতে লাগিল।
পায়ের নূপুর খসি কোথায পড়িল। / প্রেমোন্মাদ ভরে তাহা জানিতে নারিল ॥
কীর্তনের অবসানে বাহ্য স্ফূর্তি পেয়ে। / দেখেন নূপুর নাই দক্ষিণের পায়ে ॥
তখন কহেন যথানূপুর পড়িল। / তথায় করিব বাস প্রতিজ্ঞা করিল ॥
অন্তরে জানিল বঙ্গভূমে অবস্থিত।/ বোধখানা নামে গ্রাম আছায়ে বিদিত ॥
এই গ্রামে ছুটি গিয়া নূপুর পড়িল। / সেই হেতু প্রভু সেথা বসতি করিল।
এইভাবে শ্রীকানুঠাকুর বোধ খানায় শ্রপাট স্থাপন করেন ॥

৭। সুন্দরানন্দ ঠাকুর : শ্রীপাট (হলদা) মহেশপুর—(বাংলাদেশ)

যশোহর জেলায়। মাজদা স্টেশন হতে ২৪ মাইল পূর্বে অবস্থিত। বেত্রবতী নদীর তীরে বাস্তুভিটার চিহ্ন বর্তমান। এখানে দ্বাদশ গোপালের অন্যতম শ্রীসুন্দরানন্দঠাকুরের শ্রীপাট। তথাহি শ্রীপাট পর্যটনে ।

"হলদা মহেশপুরে সুন্দরানন্দের বাস"। তথাহি চৈতন্য গণোদ্দেশে "সুদাম" বলিয়া যার পূর্বনাম ছিল।'/ গঙ্গাপার মহিশপুর উদয় করিল ॥ / তথাহি শ্রীপাট পর্যটনে/

"হলদা মহেশপুর আর বোধখানা।
একদেশে দুই গ্রাম একুই গণনা ॥
ঠাকুর সুন্দরের সেবা সেই গ্রামে হয়।
সদাশিব কবিরাজের বোধখানাতে নির্ণয ॥"

৮। **গৌরদাস পণ্ডিত** : শ্রীপাট অম্বিকা কালনা।

গৌরীদাস পণ্ডিত জ্যেষ্ঠভ্রাতা সূর্যদাস পণ্ডিতেব আজ্ঞা নিয়ে শালিগ্রাম হতে কালনায় এসে নির্জনে বাস করেন। সেখানে গৌরীদাসেব প্রাণধন 'নিতাই গৌবাঙ্গ' বিবাজিত। গৌরীদাসের প্রীতিবদ্ধ নিতাই গৌরাঙ্গ নিজ প্রতিমূর্তি নির্মাণ করিয়ে তাতে নিজ অভিন্নতা প্রকাশ করে শ্রীমূর্তিস্বরূপে গৌরীদাস ভবনে থাকলেন। শ্রীগৌবাঙ্গ গৌবীদাসকে নিয়ে নবদ্বীপে কীর্তনবিলাস করেন।

গৌবীদাসের বিগ্রহ স্থাপন লীলা পরম ঐতিহ্যপূর্ণ। মহাপ্রভু তাঁব ভবনে এলে গৌবীদাস বললেন, "প্রভু আমি তোমাকে ছাড়া থাকতে পারব না। তোমাদেব দুভাইকে আমাব ভবনে থাকতেই হবে।" প্রভু বললেন, "তা কি সম্ভব? তাহলে আমার লীলাকার্য করবে কে?" গৌরীদাস ছাড়তে একান্তভবে নারাজ। তখন প্রভু প্রতিমূর্তি নির্মাণ কবতে বললেন। গৌবাঙ্গেব আদেশ মত—

"গৌবীদাস পণ্ডিতেরে প্রভু আজ্ঞা কৈলা।
তেঁহো সেই বৃক্ষে দুই মূর্তি প্রকাশিলা ॥"

এইভাবে দুই দারু মূর্তি ও দুই সচল মূর্তি
চারিজনে দাঁড়াইল পণ্ডিত বিস্মষ ভেল
ভাবে অশ্রু বহয়ে নয়ান।
পুনঃ প্রভু কহে তাবে তোব ইচ্ছা হয যারে।
সেই দুই রাখ নিজ ঘবে' (পদকল্পতরু)
তারপর, নানা মতে পরতীত করাইয়া ফিরাইল চিত
দোঁহারে রাখিল নিজ ঘরে।
পণ্ডিতেব প্রেমলাপি দুই ভাই খায় মাগি
দোঁহে গেলা নীলাচলপুরে ॥ (ঐ)

এইভাবে ভক্তাধীন প্রভু বিগ্রহস্বরূপ পরিগ্রহ করে ভক্তগৃহে বিরাজ করছেন।

বৈষ্ণব গ্রন্থানুসাবে এই কালনায় প্রভু নিত্যানন্দ শ্রীসূর্যদাস পণ্ডিতেব কন্যা শ্রীবসুধা ও শ্রীজাহ্নবা দেবীকে বিবাহ কবেন।

৯। **শ্রীউদ্ধারণ দত্ত** : শ্রীপাট উদ্ধাবণপুর।

উদ্ধারণপুব বর্ধমান জেলায়। বর্তমানে কাটোয়ার সন্নিকট পাঁচুন্দী স্টেশনেব একক্রোশ দূরে বনয়াবীবাদের রাজবাড়িতে পাট দেবতার পূজা হয়। এইটি নিত্যানন্দ পার্ষদ দ্বাদশ গোপালের অন্যতম উদ্ধারণ দত্তের শ্রীপাট।

১০। **শ্রীপরমেশ্বর ঠাকুর** : শ্রীপাট ভরা আঁটপুর।

ধর্মতলা থেকে স্টেট বাসে আঁটপুর যাওয়া যায়। এখানে শ্রীনিত্যানন্দ পার্ষদ দ্বাদশ গোপালেব অন্যতম শ্রীপরমেশ্বব দাসের শ্রীপাট।

শ্রীজাহ্নবা দেবীর আদেশে শ্রীনয়ন ভাস্কর-নির্মিত শ্রীরাধারানীব শ্রীমূর্তি নিয়ে বৃন্দাবন গমন করে শ্রীগোপীনাথ দেবের বামে স্থাপন করে খড়দহ এলে জাহ্নবা দেবী বলেন, 'তুমি ভরা আঁটপুরে গিয়ে শ্রীরাধা গোপীনাথ মূর্তি স্থাপন কর।' তখন শ্রীজাহ্নবাদেবীব আদেশে পরমেশ্বর ভরা আঁটপুরে সেবার প্রকাশ করেন। স্বয়ং জাহ্নবাদেবী ঐ বিগ্রহ স্থাপন করেন

এবং সেখানে মহামহোৎসব অনুষ্ঠান অনুষ্ঠিত হয়।

১১। শ্রীধর পণ্ডিত : শ্রীপাট নবদ্বীপ

শ্রীধর পণ্ডিতের ভবন নবদ্বীপে একটি বিশিষ্ট লীলাস্থলী। শ্রীগৌরাঙ্গ কাজী উদ্ধাব করে শঙ্খবণিক নগর, তন্তুবায় নগর হয়ে শ্রীধর ভবনে আসেন। ভাঙ্গা একঘর মাত্র শ্রীধবের বাসস্থল। উত্তরিলা গিয়া প্রভু তাহার দুয়াবে। সেখানে গিয়ে দেখেন

"সবে একলৌহ পাত্র আছয়ে দুয়ারে।
কত ঠাঁই তালি তাহা চোবে না হরে ॥
নৃত্য করে মহাপ্রভু শ্রীধব অঙ্গনে।
জলপূর্ণ পাত্র প্রভু দেখিলা আপনে ॥
জল পিযে মহাপ্রভু মুখে আপনার।
পবম আদরে পান কৈলেন সকল ॥"--

কি অপূর্ব শ্রীগৌরাঙ্গ লীলা।

১২। শ্রীনাগর পুরুষোত্তম : শ্রীপাট নাগরদেশ।

ত্রয়োদশ অধ্যায়

জেলাভিত্তিক গৌড়ীয় বৈষ্ণবতীর্থ

পশ্চিমবঙ্গ : ২৪ পরগণা জেলায় :

১। **অম্বুলিঙ্গ ঘাট** : ২৪ পরগনা জেলায়। মথুরাপুর স্টেশনে নেমে বাস... যাওয়া যায়। ছত্রভোগ গ্রামের একটি গঙ্গাঘাটের নাম অম্বুলিঙ্গঘাট, চৈত্রমাসের শুক্লা... মন্দিরে বিরাট মেলা বসে। জায়গাটি ছত্রভোগ চক্রতীর্থ নামে পরিচিত. দর্শ... স্থান।

১৪৩১ শকে মহাপ্রভু সন্ন্যাস গ্রহণ করে নীলাচল যাত্রাপথে ছত্রভো... আসেন ... সেখানে শতমুখী গঙ্গায় স্নান করেন। ছত্রভোগের অধিপতি শ্রীরামচন্দ্র খাঁ... কৃপা করে। সেখানে এক ব্রাহ্মণগৃহে রাত্রি তৃতীয় প্রহর সপার্ষদ কীর্তন করে ... করেন রামচন্দ্র খাঁ প্রদত্ত নৌকায় চেপে উক্ত ঘাট হতে নীলাচল রওনা হন।

২। **আঠিসারা** : বারুইপুরের নিকটে আঠিসারা। নীলাচল যাত্রাপ... মহাপ্রভু ...নে অনন্ত আচার্যের গৃহে সপার্ষদ আতিথ্য গ্রহণ করেন এবং প্রভাতে ... থেকে ...ভোগ রওনা হন।

৩। **আড়িয়াদহ** : শ্যামবাজার হতে বাসে কামারহাটি কিংবা দক্ষিণেশ্বর। ...ক্ষিণেশ্বর কামারহাটির সন্নিকট আড়িয়াদহ।

"খড়দহের দক্ষিণে আড়িয়াদহ গ্রাম।
গদাধর দাস ঠাকুরের যাঁহা নিজধাম ॥"

শ্রীনিত্যানন্দ প্রেমপ্রচারে এখানে আসেন এবং গদাধর দা... ঠাকুরের গৃহে ...বস্থান করেন। এই গ্রামবাসী চরণ হিন্দুবিদ্বেষী কাজীকে দমন করে কৃষ্ণ - কীর্তনে ... করেন।

৪। **সুখচর** : ব্যারাকপুর - শ্যামবাজার গামী বাসে মধ্যবর্তী স্থান। ... শ্রীগৌরাঙ্গদেবের কীর্তনীয়া, শ্রীগোবিন্দ দত্তের শ্রীপাট। গোবিন্দ দত্ত শ্রীনিতাইগৌরমূর্তি ...াপন করেন।

৫। **কুমার হট্ট** : (হালিশহর) নৈহাটী জংশনের নিকট। এখানে ...গৌরাঙ্গদেবের দীক্ষাগুরু শ্রীপাদ ঈশ্বর পুরীর জন্মস্থান। এখানে শ্রীবাস পণ্ডিত, গোবিন্দানন্দ ঠাকুর, নয়ন ভাস্কর ও বৃন্দাবন দাস ঠাকুর, গৌরাঙ্গ পার্ষদগণের শ্রীপাট। ১৫১... খৃষ্টাব্দে ...রাম বৃন্দাবন গমনোদ্দেশে মহাপ্রভু গৌড়দেশে আগমন করে পানিহাটী গ্রাম হতে নৌকাযোগে কুমারহট্টে আসেন। প্রভু গঙ্গাতীর থেকে শ্রীবাসভবন পর্যন্ত গমনকালে ভক্তগণ পদধূলি গ্রহণ করায় সমস্ত পথ গর্তময় হয়েছিল। মহাপ্রভু রাত্রি শেষে নৌকারোহণে শিবানন্দের বাড়ি গিয়েছিলেন।

৬। **খড়দহ** : শ্রীনিত্যানন্দ মহাপ্রভু এবং তার পরিবার ...দের প্রকট ভূমি। এখানে শ্রীপুরন্দর পণ্ডিত, বীরচন্দ্র ও গঙ্গাদেবী, বীরচন্দ্রের পুত্র গোপীজন ...ল্লভ, রামকৃষ্ণ ও রামচন্দ্র প্রভুর প্রকটভূমি। প্রভু নিত্যনন্দ নীলাচল হতে প্রেম প্রচারের জন্য এসে এখানে পুরন্দর পণ্ডিতের গৃহে পদার্পণ করেন। পরে শ্রীনিত্যানন্দ বসুধা ও জাহ্নবা দেবীকে বিবাহ করে খড়দহে এসে শ্রীপাট স্থাপন করেন। প্রভু বীরচন্দ্র এখানে শ্রীশ্যামসুন্দর মূর্তি স্থাপন করেন।

৭। **পানিহাটী** : সোদপুর স্টেশনের ১ মাইল পশ্চিমে পানিহাটী রাঘবপণ্ডিত ও তদীয় ভগ্নী দময়ন্তীর লীলাভূমি। বৈষ্ণব শাস্ত্রে রাঘবের ঝালি সমাধিক প্রসিদ্ধ। গৌড়ীয় বৈষ্ণবগণ চাতুর্মাস্য ব্রত করতেন নীলাচলে। তাই নীলাচল যাওয়ার সময় রাঘব পণ্ডিত নানাবিধ খাদ্যে তিনটি ঝালি পূর্ণ করে মহাপ্রভুর জন্য নিয়ে যেতেন। ঐ ঝালির দ্রব্য মহাপ্রভু সারাবৎসর ভক্ষণ করতেন। ঐ ঝালি বহন করতেন সেবক মকরধ্বজ কর। নিত্যানন্দ যখন প্রেমপ্রচারে

আদিষ্ট হয়ে নীলাচল হতে গৌড়ে আসেন, তখন তিনি সর্বপ্রথম রাঘবের বাড়িতে ওঠেন। এখানে নিত্যানন্দ নানা অপ্রাকৃত লীলাবিলাস করেন। তিনি এখানে তিন মাস ছিলেন। মহাপ্রভু শ্রীচৈতন্য বৃন্দাবনযাত্রা উদ্দেশ্যে ১৫১৫ খৃষ্টাব্দে নৌকাযোগে পানিহাটী গ্রামে আসেন এবং কানাই-এর নাটশালা থেকে ফেরার পথেও এখানে আসেন। সপ্তগ্রামের রঘুনাথ দাস এখানে এলে নিত্যানন্দ সস্নেহে তাঁকে বলেন, "চোরা, এতদিন পরে ধরা পড়েছ--তোমাকে দণ্ড দিব।" দণ্ডটি হল নিত্যানন্দকে সপার্ষদ ফলার করান। রঘুনাথও মহাধূমধামে মহোৎসব করেন। এখান হতেই "দণ্ডমহোৎসব" সৃষ্টি হয়। অদ্যাপি জ্যৈষ্ঠমাসে এখানে চিড়া দধির মহোৎসব হয়। এটা রাঘব পণ্ডিতের সেবক মকরধ্বজের শ্রীপাট।

৮। **বরাহনগর** : এখানে পণ্ডিত গদাধরের শিষ্য শ্রীরঘুনাথ ভাগবতাচার্যের শ্রীপাট। মহাপ্রভু বৃন্দাবন গমন উদ্দেশে রামকেলী হতে কানাই-এর নাটশালা পর্যন্ত গিয়ে ফিরে আসেন। বৃন্দাবন যাত্রা অসমাপ্ত থেকে যায়। প্রত্যাবর্তন পথে মহাপ্রভু বরাহনগরে এসে এক ব্রাহ্মণের গৃহে আশ্রয় নেন এবং এখানে রঘুনাথ বিপ্রের মুখে ভাগবত পাঠ শুনে মুগ্ধ হয়ে যান এবং রঘুনাথকে ভাগবতাচার্য উপাধিতে ভূষিত করেন। রঘুনাথাচার্য শ্রীকৃষ্ণ প্রেম—তঙ্গিনী নামক গ্রন্থ রচনা করেন। চৈতন্য ভাগবতের অন্ত খণ্ডে প্রভু বোলে ভাগবত এমত পড়িতে। / কভু নাহি, শুনি, আর কাহার মুখেতে ॥ প্রতেক তোমার নাম ভাগবত আচার্য। / ইহা বই আর কোন না করিহ কার্য ॥ বিপ্র প্রতি প্রভুর পদবী যোগ্য শুনি। / সবে করিলেন মহাজয় হরিধ্বনি ॥

৯। **সাঁইবোনা** : ব্যারাকপুর বারাসত রেলাইনে সাঁইবোনা। এখানে শ্রীনন্দদুলালের মন্দির আছে। প্রভু বীরচন্দ্র গৌড় থেকে বাদশার নিকট হতে উপঢৌকনপ্রাপ্ত যে শিলাখণ্ড আনেন, সেই শিলাখণ্ড থেকেই শ্রীনন্দদুলাল প্রকট হন। খড়দহের শ্যামসুন্দর বিগ্রহও ঐ প্রস্তরখণ্ডে নির্মিত।

"শ্যামসুন্দর গড়ি অবশিষ্ট যে পাথর।
তাহা দিয়া গড়িল দুই মূর্তি মনোহর ॥"
শ্রীনন্দদুলাল মূর্তি রহে স্বামীবন।
বল্লভপুরে বল্লভজী প্রতিষ্ঠিত হন ॥"

মাঘী পূর্ণিমায় তিন ঠাকুর দর্শন উপলক্ষে এখানে মেলা হয় ॥

১০। **বেনাপোল** : বনগাঁ থানার অন্তর্গত বেনাপোল গ্রাম এখন হরিদাসপুর গ্রামে রূপান্তরিত। এখানে ঠাকুর হরিদাস কিছুকাল অবস্থান করেছিলেন। এখানে নির্জন কাননে কুটীর নির্মাণ করে দিনে তিন লক্ষ নাম জপ করতেন। তিনি নামসংকীর্তন করে ভিক্ষা নির্বাহন করে জীবন ধারণ করতেন। সকলেই হরিদাসের মহিমা গান করতে লাগল। এতে চরম বৈষ্ণব-বিদ্বেষী স্থানীয় অধিপতি রামচন্দ্র খানের বড়ই অসহ্য হল। তিনি হরিদাসকে হেয় প্রতিপন্ন করার জন্য পরম রূপসী এক বেশ্যাকে তার কাছে পাঠালেন। হরিদাস ঠাকুর স্বপ্রভাবে তৃতীয় দিবসে সেই বেশ্যার ভাবান্তর ঘটিয়ে কৃষ্ণনাম উপদেশ করলেন। তখন বেশ্যা গুরুদেবের আদেশে নিজের সকল সম্পদ বিতরণ করে এক বস্ত্রে, মুণ্ডিত মস্তকে হরিদাস সমক্ষে এসে দীক্ষা গ্রহণ করলেন। দীক্ষান্তে তার নাম হল কৃষ্ণদাসী। কৃষ্ণদাসীকে নিজ গোফায় স্থাপন করে নিজে চাঁদপুর গমন করেন। কৃষ্ণদাসী তখন হলেন পরমবৈষ্ণবী। তিনলক্ষ নাম জপ করেন। তারপর মহাবৈষ্ণবগণও তাঁকে দেখতে আসেন।

এদিকে রামচন্দ্রের দুর্বুদ্ধি হরিদাসকে চক্রান্ত করে ক্ষান্ত হল না। বরং উত্তরোত্তর বেড়ে যেতে লাগল। নিত্যানন্দ পাষণ্ডদলনলীলা করতে করতে রামচন্দ্র খাঁনের গৃহে এসে সপার্ষদ তাঁর চণ্ডীমণ্ডপে আশ্রয় নিলেন। রামচন্দ্র সেবক পাঠিয়ে অবিলম্বে দুর্গামণ্ডপ ছেড়ে গোশালায়

আশ্রয় নিতে আদেশ দিলেন। এতে প্রভু নিত্যানন্দ গ্রাম ছেড়ে চলে যান। পাপের ফল ফলতে আরম্ভ করল। রাজকর না দেওয়ার অপবাধে ম্লেচ্ছারাজ পরিজনসহ তাঁকে বন্দী করে দুর্গামণ্ডপ অপবিত্র করে গ্রাম লুঠ করলেন। গ্রাম উজার হয়ে গেল। হরিদাস ঠাকুরের ভজন স্থান হিসাবে এর নাম এখন হরিদাসপুর। বৈষ্ণবের তীর্থভূমি ॥

নদীয়া জেলা

১। কাঁচড়াপাড়া : "ত্রিবেণীর পার হয় কাঁচরাপাড়া গ্রাম।
কৃষ্ণরায় ঠাকুর যাহা শ্রবণে অনুপম ॥ (পাট নির্ণয়)

কুমারহট্ট থেকে এক মাইল উত্তরে কাঁচড়াপাড়া। এখানে আছে শ্রীশ্রীকৃষ্ণ রায়জীর মন্দির। এখানে শ্রীনাথ পণ্ডিত, শিবানন্দ সেন, তাঁর তিন পুত্র—(১) চৈতন্য দাস (২) রামদাস (৩) কবি কর্ণপুর এবং ধনঞ্জয় পণ্ডিত প্রভৃতির শ্রীপাট। মহাপ্রভু বৃন্দাবনযাত্রা উপলক্ষে গৌড়দেশ এসে কুমারহট্ট শ্রীবাস ভবনে আসেন। সেখান হতে নৌকাযোগে শিবানন্দের গৃহাভিমুখে চললেন। ইতিমধ্যে জগদানন্দ গঙ্গাতীর হতে শিবানন্দ সেন ও বাসুদেব দত্তের বাড়ি পর্যন্ত পথ সাজিয়েছিলেন।

কবি কর্ণপুরের বিদ্যাগুরু ও অদ্বৈত-শিষ্য শ্রীনাথ পণ্ডিত শ্রীকৃষ্ণরায়জীর সেবা স্থাপন করেন।

সেন শিবানন্দ তাঁর তিন পুত্রসহ কাঁচরাপাড়াতেই থাকতেন। শ্রীনাথ পণ্ডিতের শ্রীকৃষ্ণরায়ের সেবা কবি কর্ণপুর প্রাপ্ত হন।

২। চাকুন্দি : অগ্রদ্বীপ স্টেশনের তিন মাইল উত্তরে গঙ্গাতীরে চাকুন্দি গ্রাম। এখানেই শ্রীনিবাস আচার্য জন্মগ্রহণ করেন। শ্রীনিবাস আচার্যের পিতার নাম গঙ্গাধর ভট্টাচার্য ও মাতা লক্ষ্মীপ্রিয়া। গঙ্গাধর মহাপ্রভুর সন্নাস গ্রহণোত্তর মূর্তি দেখে উন্মত্তবৎ চৈতন্য চৈতন্য বলতে বলতে চাকুন্দী গ্রামে আসেন। গ্রামবাসীরা গঙ্গাধরের চৈতন্যনিষ্ঠা দেখে তাঁর নাম দেন চৈতন্যদাস। অনেকদিন অপুত্রক থাকায় পুত্র কামনায় তাঁরা নীলাচল যান এবং মহাপ্রভুর নিকট পুত্রলাভের বর আদায় করে চাকুন্দি আসেন। তারপর গৌরাঙ্গ কৃপায় শ্রীনিবাসের জন্ম হয়।

৩। দোগাছিয়া : দোগাছিয়া মুড়াগাছা স্টেশন হতে দুমাইল দূরে। এখানে নিত্যানন্দ পার্ষদ পদকর্তা দ্বিজ বলরামদাসের শ্রীপাট। এখানে নিত্যানন্দ প্রেম প্রচারে এসে বহু লীলা প্রকাশ করেন।

(ক) সুলতানপুর নদীয়া জেলায়, সুখসাগরের নিকটে, দ্বাদশ গোপালের অন্যতম শ্রীমহেশ পণ্ডিতের শ্রীপাট।

৪। নবদ্বীপ :

'সীমন্ত গোদ্রুম মধ্য আর কোলদ্বীপ।
ঋতু, জহ্নু মোদদ্রুম রুদ্র অন্তরদ্বীপ ॥
এই নয়দ্বীপ নবদ্বীপে যথাক্রমে।
ষোল ক্রোশ পরিধি সেই নব ভক্তি ধামে'

উপরোক্ত নয়টি দ্বীপ লয়ে নবদ্বীপ। নবদ্বীপ গৌরাঙ্গের লীলাভূমি। মহাপ্রভুর ৪৮ বৎসর জীবনকালের মধ্যে অর্ধেক কেটেছে নবদ্বীপে। এইখানে মহাপ্রভু জগন্নাথ শচীদেবীর দুলাল রূপে অবতীর্ণ হন ১৪৮৫/৮৬ খৃষ্টাব্দে। চৈতন্য-জীবনীতে এ সম্বন্ধে আলোচিত হয়েছে।

৫। **শ্রীবাস অঙ্গনে** :

"শচীর মন্দিরে আর নিত্যানন্দ নর্তনে।
শ্রীবাস কীর্তনে আর রাঘব ভবনে ॥
এই চারি ঠাঞি প্রভুর সদা আবির্ভাব।
প্রেমাবিষ্ট হয়ে 'প্রভুর' সহজ স্বভাব ॥" (চৈ. চ. অন্ত.খ)

মহাপ্রভু শ্রীবাস গৃহে এক বৎসরকাল নামসংকীর্তন লীলা প্রকট করে স্বীয় পার্ষদবৃন্দকে আকর্ষণ ও শক্তিসঞ্চার করেন। নবদ্বীপে অন্যান্যগুলির মধ্যে নিম্নোক্তগুলি সবিশেষ উল্লেখযোগ্য।

৬। **চন্দ্রশেখর ভবন** : এখানকার মহাপ্রভুর অভিনয় সকলকে মুগ্ধ করেছিল। অভিনয়ের ভূমিকায়—গদাধর রুক্মিনী, ব্রহ্মানন্দ বুড়ী, নিত্যানন্দ বড়াই, হরিদাস কোতোয়াল, শ্রীবাস নারদ, শ্রীরাম পণ্ডিত স্নাতক, শ্রীমান পণ্ডিত দেউড়িয়া এবং স্বয়ং চৈতন্যদেব লক্ষ্মীদেবী সেজেছিলেন।

৭। **শ্রীমুরারী গুপ্তের ভবন** : শ্রীবাস অঙ্গনে বরাহভাবের প্রকাশ করে সেখান থেকে বরাহভাবের শ্লোক পড়তে পড়তে মুরারী গুপ্তের গৃহে যান। এবং অপ্রাকৃত লীলা প্রকাশ করেন।

৮। **অদ্বৈত আচার্যের ভবন** : নবদ্বীপে অদ্বৈত আচার্যের ভবন ছিল। গৌরাঙ্গ জন্মের পূর্বে অদ্বৈত আচার্য টোল খুলেছিলেন এবং

"সেই নদীয়ায় যত পণ্ডিত সজ্জন।
প্রভুরে প্রধান বলি করিলা গনন ॥" (অদ্বৈত প্রকাশ।)

তাঁর টোলে গৌরাঙ্গ-অগ্রজ বিশ্বরূপ শাস্ত্রালোচনা করতেন। অদ্বৈত ভবনেই অদ্বৈত প্রভুর সঙ্গে ঈশ্বরপুরীর মিলন হয়।

৯। **গোপীনাথ আচার্য ভবন** : গোপীনাথ, সার্বভৌম ভট্টাচার্যের ভগ্নীপতি, নবদ্বীপে বাড়ি। শ্রীপাদ ঈশ্বরপুরী গৌরাঙ্গ ও অদ্বৈতের সঙ্গে মিলনের পর কিছুদিন গোপীনাথ আচার্যের গৃহে ছিলেন। ঈশ্বরপুরী তাঁর রচিত শ্রীকৃষ্ণ লীলামৃত গদাধরকে দিয়া পাঠ করাতেন। গৌরাঙ্গদেব প্রত্যহ সন্ধ্যায় শ্রবণ করতেন।

১০। **শ্রীনন্দন আচার্যগৃহ** : নবদ্বীপবাসী। নিত্যানন্দ নবদ্বীপে এসে এই নন্দন আচার্যের ঘরেই উঠেছিলেন। এখানেই সপার্ষদ গৌরাঙ্গ-নিত্যানন্দ মিলন ঘটে।

১১। **মুকুন্দ সঞ্জয়ের ভবন** : মহাপ্রভু মুকুন্দ ভবনে টোল খুলে অধ্যাপনা করতেন।

"মুকুন্দ সঞ্জয় পুণ্যবন্তের মন্দিরে।
পড়ায়েন প্রভু চণ্ডীমণ্ডপ ভিতরে ॥"

১২। **শুক্লাম্বর চক্রবর্তীভবন** : মহাপ্রভু গয়া হতে ফিরে এসে সর্বপ্রথম শুক্লাম্বরের হস্তে ভোজন বাসনা করলে শুক্লাম্বর সপার্ষদ গৌরাঙ্গকে ভোজন করান।

১৩। **চাঁদ কাজীর ভবন** : চাঁদকাজী ছিলেন তদানীন্তন নবদ্বীপের শাসনকর্তা। কিছুলোক শ্রীবাস অঙ্গনে দিবারাত্র কীর্তনের রোল শুনে ক্রোধান্বিত হয়ে কাজীর কাছে অভিযোগ করেন। এর ফলে কাজী কীর্তন বন্ধের আদেশ দেন এবং কীর্তনরত সংকীর্তনের খোল ভঙ্গ করে দেন। এতে মহাপ্রভু অতিশয় ক্রুদ্ধ হয়ে প্রতিবাদস্বরূপ সদলবলে চাঁদ কাজীর বাড়ি আক্রমণ করেন।

"গঙ্গাতীরে তীরে পথ আছে নদীয়ায়।
আগে সেই পথে নাচি যায় গোরা রায় ॥
আপনার ঘাটে আগে বহু নৃত্য করি।
তবে মাধাই ঘাটে গেলা গৌরহরি ॥

বারকোনা ঘাটে নগরিয়া ঘাটে গিয়া।
গঙ্গানগর দিয়া গেলা সিমুলিয়া ॥"

এইভাবে বামনপুকুরে কাজীর বাড়িতে সদলবলে উপনীত হলে ভীত কাজী মৌলানা সিরাজুদ্দিন ভীত হয়ে গৌরাঙ্গকে 'ভাগিনা' সম্বোধন করে তাঁর ক্রোধ নিবারণ করেন এবং নবদ্বীপে কীর্তনের নিষেধাজ্ঞা উঠিয়ে নেন ॥

১৪। শ্রীধর পণ্ডিতের ভবন কাজী উদ্ধারের পর মহাপ্রভু শঙ্খবণিক নগর, তন্তুবায় নগর হয়ে এলেন অতিদরিদ্র শ্রীধর ভবনে। 'ভাঙ্গা একঘর মাত্র শ্রীধরের সার।' আর দেখলেন সবে এক লৌহ পাত্র আছয়ে দুয়ারে। কত ঠাঁই তালি তাহা চোরে না হরে ॥ 'কীর্তন ক্লান্ত মহাপ্রভু ঐ পাত্র হতে "জল পিয়ে মহাপ্রভু সুখে আপনার।
পরম আদরে পান কৈলেন সকল ॥"

হে পরম করুণাময় ভগবান। এ তোমার কোন্ লীলা? সত্যই তুমি দরিদ্র নারায়ণ।

১৫। জগাই মাধাই উদ্ধারস্থান :

"সেই দুই মদ্যপ বেড়ায় স্থানে স্থানে।
আইল যে ঘাটে প্রভু করে গঙ্গাস্নানে ॥
প্রভুর বাড়ির কাছে থাকে নিশাভাগে।
সর্বরাত্রি প্রভুর কীর্তন শুনি জাগে ॥
মৃদঙ্গ মন্দিরা বাজে কীর্তনের সঙ্গে।
মদ্যের বিক্ষেপে তারা শুনি নাচে রঙ্গে ॥"

এইভাবে মদ্যপদ্বয় অবস্থান করছে। এমন সময় নিত্যানন্দ নগর ভ্রমণ করে প্রভুর বাড়ি আসছেন । তখন—

'অবধূত নাম শুনি মাধাই কুপিয়া।
মারিল প্রভুর শিরে মুটকি তুলিয়া ॥'

তাতে, "ফুটিল মুটকী শিরে রক্ত পড়ে ধারে"। 'নিতাই'-এর ভ্রূক্ষেপ নেই, মাধাইকে জড়িয়ে ধরে হরিবলার জন্য কত কাকুতি। মহাপ্রভু এ সংবাদ শুনে ক্রুদ্ধ হয়ে ঘটনাস্থলে এলেন। নিতাই-এর বিশেষ অনুরোধে জগাই মাধাই উদ্ধার পেল। পরম বৈষ্ণব হয়ে নাম জপ করতে লাগল। এর জন্যই নিতাইকে বলা হয় অক্রোধ পরমানন্দ নিত্যানন্দ রায় ॥

নবদ্বীপের দ্বীপ সংস্থান

নয়টি দ্বীপ নিয়ে নবদ্বীপ। নয়টি দ্বীপের চারিটি দ্বীপ ভাগীরথীর পূর্বপারে আর পাঁচটি পশ্চিমপারে।

পূর্বপারের চারিটি দ্বীপ

১) অন্তর্দ্বীপ ২) সীমন্তদ্বীপ ৩) গোদ্রুমদ্বীপ ৪) মধ্যদ্বীপ

পশ্চিম পারের পাঁচটি দ্বীপ ১) কোলদ্বীপ ২) ঋতুদ্বীপ ৩) জহ্নুদ্বীপ ৪) মোদদ্রুমদ্বীপ ৫) রুদ্রদ্বীপ।

"গঙ্গার পূর্ব-পশ্চিম তীরেতে নয় ॥
পূর্বে অন্তর্দ্বীপ শ্রীসীমন্ত দ্বীপ হয়।
গোদ্রুমদ্বীপ, শ্রীমধ্যদ্বীপ চতুষ্টয় ॥
কোলদ্বীপ, ঋতু, জহ্নু, মোদদ্রুম আর,
রুদ্র দ্বীপ, এই পঞ্চ পশ্চিমে প্রচার ॥" (ভক্তি রত্নাকর ১২ তরঙ্গে)

শ্রীনিবাস আচার্য যখন পরিক্রমায় আসেন তখন তাঁব সঙ্গী হয়েছিলেন, মহাপ্রভুর গৃহভৃত্য ঈশান।

শচীদেবীর সেবক ঈশানের সঙ্গে শ্রীনিবাস, নরোত্তম ও রামচন্দ্রের নবদ্বীপ পরিক্রমা

নিম্নে উক্ত বৈষ্ণবগণের ভ্রমণ বৃত্তান্তে নয়টি দ্বীপের পরিচয় পাওয়া যাবে।

নবদ্বীপ পরিক্রমার উদ্দেশ্যে শ্রীনিবাস, নরোত্তম ও রামচন্দ্র শ্রীখণ্ডে রঘুনন্দন ঠাকুরের আজ্ঞা নিয়ে নবদ্বীপে আসেন। গৌর জন্মস্থান মায়াপুরে ঢুকেই এক বৃদ্ধ ব্রাহ্মণের সঙ্গে দেখা। তাঁর কাছে শচীদেবীর সেবক ঈশানের খবর পেয়ে তাঁর কাছে গেলেন। তখন ঈশান নির্জনে বসে বিরহে অশ্রু বিসর্জন করছেন।

শ্রীনিবাস নরোত্তম রামচন্দ্র তিনে
নিবারিতে নারে অশ্রু প্রণমি ঈশানে।

তাঁর সঙ্গে নবদ্বীপ পরিক্রমার ইচ্ছা প্রকাশ করলে ঈশান বললেন,

"ভাল হইল শীঘ্র আইলা আর কি কহিতে।
নদীয়া ভ্রমণে কালি যাইব প্রভাতে।"

প্রথমেই গেলেন আতোপুরে। ঈশান বললেন "এখানে অন্তরের কথা বলে ব্রহ্মা গৌর লীলায় নীচকুলে জন্মলাভের বর পেয়েছিলেন।

'কহি অন্তরের কথা হৈল অন্তর্ধান।
এই হেতু লোকে ব্যক্ত অন্তর্দ্বীপ নাম' (ভক্তিরত্নাকর।)

আতোপুর থেকে সিমলিয়া। পার্বতীদেবী তপস্যা করে এখানে শচীনন্দনের দেখা পেয়ে ভূলুণ্ঠিত প্রণাম করেন।

'প্রভুর চরণধূলি সীমন্তে ধরিল।
এ হেতু সীমন্তদ্বীপ নাম ব্যক্ত হৈল।' (ভ.ব)

সিমলিয়া থেকে গাদি গাছা। এখানে এক অশ্বত্থতলায় সুরভি ও ইন্দ্র গৌরসুন্দরের বর পান।

'শ্রীসুরভি গাভী দ্রুমতলে বিলসয়।
এ হেতু গোদ্রুমদ্বীপ পূর্ব বিজ্ঞে কয় ॥

গাদি গাছা থেকে মাজিত। এখানে গৌরসুন্দর সপ্ত ঋষিকে দেখা দেন।

'মধ্যাহ্ন সূর্য সম মধ্যাহ্ন সময়।
দেখা দিল প্রভু তেঞি মধ্যদ্বীপ কয় ॥' (ঐ)

মাজিত হতে বামন পৌখেরা। এখানে কোন প্রাচীন ব্রাহ্মণের আর্তিতে তীর্থরাজ পুষ্কর আবির্ভূত হন।

'ব্রাহ্মণে পুষ্কর কৃপা কৈল অতিশয়।
এ হেতু ব্রাহ্মণ পুষ্কর নাম কয় ॥' (ঐ)

ঈশান বললেন, "এই দেখ, পুষ্কর তীর্থের চিহ্ন এখনো আছে। বামন পৌখেরা থেকে হাটডাঙ্গা। গৌরসুন্দরের আবির্ভাব প্রার্থনা করে ইন্দ্রাদি দেবগণ এখানে উচ্চ সংকীর্তনের হাট বসিয়েছিলেন। তাই এ স্থানের নাম উচ্চ হট্ট ছিল। হাটডাঙ্গা থেকে কুলিয়া পাহাড়পুর, গৌরসুন্দর কোল দেবের কোন ভক্তকে পর্বত প্রমাণ কোলরূপে দেখা দেন।

"পর্বত প্রমাণ কোল রূপে দেখা দিল।

এই হেতু কোলদ্বীপ পার্বতাখ্য হৈলা ॥" (ঐ)

কুলিয়া পাহাড়পুর হতে সমুদ্র গড়ি।

"গঙ্গাসহ গতিতে সমুদ্রগতি নাম।

এবে লোকে কহয়ে সমুদ্রগাড়ি নাম ॥"

সমুদ্রগড়ি থেকে চাঁপাহাটি এখানে চাঁপাফুলের হাট বসতো। কোন কৃষ্ণভক্ত ব্রাহ্মণ এখানে চম্পকবর্ণ গৌররূপ দর্শন করেন।

'চম্পক প্রশংসাবাক্য ঘটা হট্ট মতে।

চম্পক হট্টাখ্য হৈল প্রসিদ্ধ লোকেতে ॥' (ঐ)

চাঁপাহাটি থেকে রাতুপুর— গৌররূপ দর্শনাশায় এখানে বসন্তাদি ঋতুগণ আরাধনা করেন।

"ঋতুগণ বহু অভিলাষে আরাধয়।

এহেতু ঋতুদ্বীপ নাম পূর্বে কয় ॥" (ভ. ব)

রাতুপুর হতে বিদ্যানগর—দেবগুরু বৃহস্পতির আরাধনার স্থান।

"প্রভু ক্রীড়া লাগি এথা বিদ্যা প্রচারিল।

এই হেতু বিদ্যানগর নাম হৈল।" (ঐ)

বিদ্যানগর থেকে জান্নগর—জহ্নুমুনি এখানে আরাধনা করে গৌরসুন্দরের দেখা পান।

"জহ্নুমণি মহানন্দে রহে এইখানে।

এই হেতু জহ্নুদ্বীপ কহে বিজ্ঞ গণে ॥" (ঐ)

জান্নগর থেকে মাঠগাছি—এখানে এক বটবৃক্ষতলে রামচন্দ্র সীতাদেবীকে কলিযুগে গৌরাবতারের কথা বলেন। তাতে সকলের আনন্দ হয়,

'এখানে সকলের মোদ অতিশয়।

এই হেতু মোদদ্রুম দ্বীপ পূর্বে কয় ॥' (ঐ)

ঈশান বললেন, "আমি স্বচক্ষে দেখেছি এখানে গৌরসুন্দর নিজগণের সঙ্গে রামলীলা করেছেন।"

মাঠগাছি থেকে বৈকুণ্ঠপুর। "বৈকুণ্ঠের ঐশ্বর্য প্রকাশ এইখানে,

তেঞি শ্রীবৈকুণ্ঠপুর বিখ্যাত ভুবনে" (ঐ)

ঈশান বললেন, 'এখানে লক্ষ্মীনারায়ণ উপাসক এক ব্রাহ্মণ থাকতেন। তিনি গৌরসুন্দরের লক্ষ্মীদেবীর সঙ্গে বিয়ের সময় লক্ষ্মীনারায়ণ মিলন দেখত পান।'

বৈকুণ্ঠপুর হতে মাতাপুর—রাঢ় দেশের একচক্রা গ্রামে বাস করার পর পাণ্ডবেরা এখানে আসেন। স্বপ্নযোগে যুধিষ্ঠির এখানে গৌরসুন্দরের দেখা পান।

"মহতের শ্রেষ্ঠ যুধিষ্ঠির মহাশয়।

তাঁর বাসস্থানহেতু মহৎপুর কয় ॥"(ঐ)

ঈশান বললেন, এখান থেকে পুরীধামে গিয়ে পাণ্ডবেরা যে মাধব সেবা, রাক্ষসের হাত হতে উদ্ধার করেন তা এখনও চলছে।

মাতাপুর থেকে রাজুপুর বা রুদ্রপুর। এখানে গৌরসুন্দর রুদ্রদেবকে দর্শন দেন। 'শ্রীরুদ্র বিলাসে তেঞি রুদ্রদ্বীপ নাম ॥' (ঐ)

রাদুপুর থেকে বেল পৌখেরা। এখানে পঞ্চমুখ মহাদেব ছিলেন।

"একপক্ষ বিল্ব দলে পূজিল ব্রাহ্মণ।

এই হেতু বিল্বপক্ষ নাম বিজ্ঞে কন ॥" (ঐ)

বেল পৌখেরা থেকে ভারইডাঙ্গা— চক্রদহ বা চাকদা থেকে এসে ভবদ্বাজ মুনি এখানে গৌরসুন্দরের আরাধনা করেন।

"এই উচ্চ স্থানে ভরদ্বাজ বিলসিল।
এই হেতু ভরদ্বাজটিলা নাম হৈল ॥" (ভ র)

ভারইডাঙ্গা থেকে সুবর্ণবিহার। কৃষ্ণভক্ত কোন রাজা এখানে স্বপ্নযোগে সুবর্ণ বিগ্রহ গৌরসুন্দরের নদীয়া বিহার দেখতে পান।

'সুবর্ণ বিগ্রহের বিহার হৈল ধ্যান,
এই হেতু সুবর্ণ বিহার নাম স্থান ॥'

এখান থেকে ঈশানের সঙ্গে শ্রীনিবাস, নরোত্তম ও রামচন্দ্র ফিরে এলেন মায়াপুরের জগন্নাথ মিশ্র গৃহে।

ঈশান লীলাগুলির প্রত্যক্ষদর্শী। তাঁর মুখে সত্যই অমৃত বর্ষিত হলো। তাঁরা তিনজনে চললেন শ্রীখণ্ড অভিমুখে। পথেই খবর পেলেন ঈশান অপ্রকট হয়েছেন। শ্রীখণ্ডে গিয়ে রঘুনন্দনকে এই খবর দিলে দুঃখের তরঙ্গ উঠল।

১। **পালপাড়া**: রাণাঘাট রেলওয়ের পালপাড়া স্টেশনে নামতে হয়। এখানে দ্বাদশ গোপালের অন্যতম শ্রীমহেশ পণ্ডিতের শ্রীপাট।

২। **ফুলিয়া** : নদীয়া জেলায়। শ্রীহরিদাস ঠাকুরের শ্রীপাট, অদ্বৈত প্রভু দ্বাদশ বর্ষ বয়সে শ্রীহট্ট থেকে শান্তিপুর আসেন। তখন তিনি গৌর আগমনের তপস্যার জন্য ফুল্লবাটী থেকে ফুল আনতেন। ফুল্লবাটী হতে ফুলিয়া। এই ফুলিয়াতে বীরচন্দ্র জামাতা পবিত্র মুখোপাধ্যায়ের শ্রীপাটও এখানে। বীরচন্দ্রের কন্যা ভুবনমোহিনী।

৩। **বড়গাছি** : নদীয়া জেলায়। মুড়াগাছা স্টেশনের নিকট, নিত্যানন্দ শিষ্য বিহারী কৃষ্ণদাসের শ্রীপাট। নিত্যানন্দপ্রভু শালিগ্রাম থেকে বিবাহযাত্রার সময়ে এখানে বিহারী কৃষ্ণদাস ভবনে অধিবাস কার্য সম্পন্ন করেন। নিত্যানন্দ গৌরাদেশে প্রেম প্রচারের নিমিত্ত যখন গৌড় দেশে আসেন তখন তিনি বড়গাছিতে উঠেছিলেন।

৪। **বিল্বগ্রাম** : রাণাঘাট লাইনে বেথুয়াডহরী স্টেশন হতে ৬ কি মি দক্ষিণ পশ্চিমে। এখানে অভিরাম গোপালের শিষ্য শ্রীবলরাম ঠাকুরের শ্রীপাট। এখানে শ্রীরাধামদনমোহনের মন্দির আছে।

৫। **বিষ্ণুপুর (নদীয়া)** : চাকদহ (E.R) স্টেশন হতে ৬ মাইল পূর্বে। এখানে মহাপ্রভুর পরমগুরু শ্রীমাধবেন্দ্রপুরী বাস করেছিলেন, তিনি শ্রীহট্টের পূর্ণিপাট গ্রাম হতে এখানে আসেন। এখানেই ঈশ্বরপুরী ও অদ্বৈত আচার্যের মিলন হয়। এখানে ঈশ্বরপুরী পুত্র বিষ্ণুদাসকে অদ্বৈত আচার্যের নিকট-রেখে সন্ন্যাস গ্রহণ করেন।

৬। **যশোড়া** : চাকদহ স্টেশনের এক মাইল পশ্চিমে গৌরাঙ্গ পার্ষদ শ্রীজগদীশ পণ্ডিতের শ্রীপাট, জগদীশ পণ্ডিত নবদ্বীপে বাস করতেন। গৌরাঙ্গ বিরহে তিনি নবদ্বীপ ছেড়ে যশোড়ায় এসে বসবাস করেন। সেখানে জগন্নাথ ও গৌরগোপালের সেবা অব্যাহত আছে।

৭। **শান্তিপুর** : ভগবানকে গৌরাঙ্গরূপে অবতরণকারী আচার্য অদ্বৈতপ্রভুর লীলাভূমি শান্তিপুর। প্রেমবিলাস অনুযায়ী---

"প্রভাকরের পুত্র নরসিংহ আড়িয়াল। / গণেশ রাজার মন্ত্রীলোকে ঘোষে সর্বকাল।"

নরসিংহের বাস ছিল শান্তিপুরে। তিনি শ্রীহট্টের লাউড়ে চলে যান, কিন্তু মাঝে মাঝে শান্তিপুরে আসতেন। নরসিংহের পুত্র কুবের পণ্ডিত, তাঁর পুত্রই অদ্বৈত আচার্য। অদ্বৈত আচার্যের জন্ম হয় লাউড়ে। তাঁর বয়স যখন বার বৎসর তখন তিনি মাতা লাভাদেবীসহ শান্তিপুর আসেন। শান্তিপুরে অদ্বৈতের পিতামাতা পরলোক গমন করলে তিনি পিতৃমাতৃ শ্রাদ্ধাদি সমাপন করে তীর্থভ্রমণে যান। তিনি বৃন্দাবনের নিকুঞ্জবন হতে বিশাখার নির্মিত চিত্রপট ও গণ্ডকীনদী হতে শালগ্রাম শিলা নিয়ে শান্তিপুর আসেন। মাধবেন্দ্রপুরী নীলাচল

যাওয়ার পথে শান্তিপুর এলে তাঁর কাছে দীক্ষাগ্রহণ করেন এবং গুরুর আদেশে শ্রীরাধিকার চিত্রপট নির্মাণ করে জগতে গোপী অনুগত যুগলকিশোরের সেবা প্রবর্তন করেন। তারপর শান্তিপুর হতে এক মাইল দূরে বাবলা নামক স্থানে বসে গঙ্গাজল তুলসীযোগে গোলাক বিহারী কৃষ্ণের আরাধনা করতে থাকেন। কিছু দিন গত হলে--

"তবে পুনঃ আইলা প্রভু শ্রীশান্তিপুর
তুলসী পিণ্ডি বাঁধি তপস্যা প্রচুর" ৷৷—অদ্বৈতমঙ্গল.

শ্রীগৌরাঙ্গ সুন্দর সন্ন্যাস গ্রহণের পর বৃন্দাবন যাত্রাকালে এখানে কয়েকদিন অবস্থান করেন। বৃন্দাবন যাত্রাকালে গৌড়ে আগমন কালে এবং প্রত্যাবর্তন কালে শান্তিপুর অদ্বৈত ভবনে অবস্থান করে অনেক অপ্রাকৃত লীলা প্রকাশ করেন।

শান্তিপুরে অদ্বৈত আচার্য্য শ্রী ও সীতা, পত্নীদ্বয়, হরিদাস ঠাকুর, যদুনন্দন আচার্য শ্যামদাস প্রভৃতির সঙ্গে প্রকট-লীলা করেন। এখানেই অদ্বৈতপুত্র অচ্যুতানন্দ প্রভৃতিরও প্রকটভূমি। অদ্বৈতাচার্যের অপ্রকট-সম্বন্ধে-- (অদ্বৈত প্রকাশে)

"শ্রীঅচ্যুত কৃষ্ণমিশ্র, গোপাল ঠাকুর
প্রভু বীরচন্দ্র নরহরি রসপুর ৷৷
গৌরীদাস পণ্ডিত আর পণ্ডিত দামোদর।
সাতজন নৃত্য করে অতি মনোহর ৷৷
গৌরগুণ শুনি প্রভুর প্রেম উথলিল।
সংকীর্তন মধ্যে আসি নাচিতে লাগিল ৷৷"
তবে "প্রভু কহে এই পাইনু গৌরাঙ্গ।
কদম্ব কুসুম সম হৈল তান অঙ্গ ৷৷"

হঠাৎ শ্রীমদন গোপালের শ্রীমন্দিরে গেলা। প্রাকৃতজনের প্রভু অগোচর হৈলা।।

৮। শালিগ্রাম : নবদ্বীপ হতে অল্প দূরে শালিগ্রাম। প্রভু নিত্যানন্দের শ্বশুর শ্রীসূর্যদাস পণ্ডিতের শ্রীপাট। গৌরাঙ্গ মহাপ্রভুর আদেশক্রমে নিত্যানন্দ গৌড়দেশে আসেন এবং সূর্যদাস পণ্ডিতের দুই কন্যা বসুধা ও জাহ্নবাকে বিবাহ করেন। নিত্যানন্দ চরিতামৃতাদি গ্রন্থ অনুসারে এই বিবাহ কালনায় অনুষ্ঠিত হয়েছিল। গৌরীদাস পণ্ডিত সূর্যদাস পণ্ডিতের অনুজ। তিনি অগ্রজ সূর্যদাসের আজ্ঞা নিয়ে কালনায় বসবাস করেন।

উদ্ধারণ দত্তকে সঙ্গে নিয়ে প্রভু বিবাহ মানসে সূর্যদাস আলয়ে যান এবং উদ্ধারণকে গৃহমধ্যে পাঠিয়ে বিবাহ প্রস্তাব দেন। কিন্তু সূর্যদাস নিত্যানন্দের বাহ্য পোষাক পরিচ্ছদ দেখে বিবাহে অসম্মতি জ্ঞাপন করেন। তখন নিত্যানন্দ নিরাশ হয়ে গঙ্গাতীরে গিয়ে এক বটবৃক্ষতলে বসে থাকেন। এদিকে নিত্যানন্দের প্রত্যাবর্তন কাহিনী শুনে বসুধা মৃতপ্রায় হয়ে ওঠে। তখন সূর্যদাস বলেন, নিত্যানন্দ কন্যাকে জীবিত করতে পারলে তাঁকে কন্যাদান করব। তখন গৌরীদাস স্বজনসহ নিত্যানন্দকে ফিরিয়ে আনেন এবং বিবাহ নিষ্পন্ন হয়। যাবতীয় খরচ বহন করেছিলেন বড়গাছির রাজা হরিহরের পুত্র কৃষ্ণদাস। যৌতুকস্বরূপ লাভ করেন জাহ্নবা দেবীকে। বিবাহান্তে নিত্যানন্দ বসুধা ও জাহ্নবাসহ খড়দহ এসে শ্রীপাট স্থাপন করেন। বসুধার গর্ভে জন্মগ্রহণ করেন বীরচন্দ্র ও গঙ্গাদেবী।

৯। সুখসাগর : শিমুরালী স্টেশনে নেমে কালীগঞ্জ। কালীগঞ্জের এক মাইল দূরে সুখ সাগর। এখানে শ্রীপুরুষোত্তম দাসের পুত্র শ্রীকানাই ঠাকুরের শ্রীপাট। সুখসাগর দ্বাদশ গোপালের অন্যতম শ্রীপুরুষোত্তম দাসেরও শ্রীপাট।

১০। সরডাঙা সুলতানপুর : শান্তিপুর হতে দুক্রোশ দূরে হরিনদী গ্রাম। মহাপ্রভু নিত্যানন্দকে সঙ্গে নিয়ে হরিনদী গ্রামে আসেন। সেখান থেকে নৌকাযোগে কালনা যান। এখানে হরিদাস ঠাকুরকে এক ব্রাহ্মণ অপমান করলে, সেই ব্রাহ্মণ অপরাধযোগ্য শাস্তি পেয়েছিলেন।

'হরিনদী গ্রামে এক দুর্জন ব্রাহ্মণ। হরিদাসে দেখি ক্রোধে বলয়ে বচন ॥

ওহে হরিদাস এ কি ব্যাভার তোমার। ডাকিয়া সে নাম লহ কিহেতু ইহার। 'হরিদাস উচ্চৈস্বরে নাম করার মহিমা বর্ণনা করলেও ব্রাহ্মণ তাঁকে কটুবাক্য বলেন। ফলে বসন্ত রোগে ব্রাহ্মণের নাক খসে পড়ে' ॥

হুগলী জেলা
বৈষ্ণবতীর্থ

১। **অনন্তনগর** : খানাকুল হতে বাসে অনন্তনগর যাওয়া যায়। সেখানে শ্রীঅভিরাম গোস্বামীর শিষ্য শ্রীহীরামাধবের পাট।

"হীরামাধব দাস স্থিতি অনন্তনগর"

২। **আকনা মাহেশ** : শ্রীরামপুর স্টেশন থেকে আকনা মাহেশ দুই মাইল দক্ষিণে। এখানে দ্বাদশ গোপালের অন্যতম কমলাকর পিপ্পিলাই ও তাঁর জামাতা শ্রীসুধাময়ের শ্রীপাট। মাহেশের রথযাত্রা ও স্নানযাত্রা বিশেষ বিখ্যাত।

"সুধাময় নাম, পিপ্পলাইর জামাতা।
বিদ্যুন্মালা নামে হয় তাহার বণিতা ॥

তিনি নীলাচল যান এবং সমুদ্র প্রদত্ত এক কন্যারত্ন লাভ করেন। এই কন্যার সঙ্গেই বীরচন্দ্রের বিবাহ হয় ॥

৩। **খানাকুল** : দ্বাদশ গোপালের অন্যতম শ্রীঅভিরাম ঠাকুরের শ্রীপাট। গৌরাঙ্গদেবের আদেশে লীলা প্রকাশ কারণে অভিরাম এক কন্যা সৃষ্টি করে সিন্দুকে ভরে নদীজলে ভাসিয়ে দেন। সেটা ভাসতে ভাসতে কাজীপুরের নদী তটে এলে একজন মালী তা দেখে মূর্চ্ছিত হয়ে যায়। অন্যান্য মালীরা এসে তার জ্ঞান ফেরায় এবং মেয়েটিকে সযত্নে পালন করে। পরে সেখানকার কাজীর আদেশে তাঁর বাড়ীতে মালীগণের তত্ত্বাবধানে থাকে। ঘটনাক্রমে কন্যাটি স্নান করতে গেলে নদীপারে অভিরাম ঠাকুরকে দেখে সাঁতার কেটে গিয়ে মিলিত হন। এইভাবে মালিনীদেবী অপ্রাকৃত লীলা প্রকাশ করে খানাকুলকে ধন্য করেন। ঐমালিনী দেবীই কাজীপুরের নাম রাখেন খানা কুল।

৪। **গোপাল নগর** : হুগলী জেলার কৃষ্ণনগর ও খানাকুল মধ্যবর্তী স্থান। এখানে অভিরাম- শিষ্য শ্রীহরিদাসের শ্রীপাট। গুরুর আদেশে তিনি রামকানাই বিগ্রহের প্রতিষ্ঠা করেন। এখানকার প্রভাব এত বৃদ্ধি পেল যে লোকে খানাকুল না এসে গোপালনগরে ক্ষীর ছানা ননী ঠাকুরকে নিবেদন করার জন্য যেতে লাগল। এতে অভিরাম অন্তরে আনন্দিত হলেও তাঁকে গৌরাঙ্গপুরে যেতে নির্দ্দেশ দেন। হরিদাস গৌরাঙ্গপুর গিয়ে রামকানাই এর সেবা করতে থাকেন।

৫। **গৌরাঙ্গপুর** : তারকেশ্বর হতে বাসে যাওয়া যায়, গৌরাঙ্গ কীর্তনীয়া বাসুদেব ঘোষের শ্রীপাট। গৌরাঙ্গ লীলাকালে যাদব সিংহ এ-অঞ্চলের রাজা ছিলেন। অভিরামের অভিশাপে গুরুদেবসহ যাদব সিংহের অপমৃত্যু হয়। অভিরামশিষ্য কমলাকরের শ্রীপাট। পূর্বেই বলা হয়েছে 'রামকানাই' সেবা নিয়ে হরিদাস এখানে আসেন। পরে গৌরহাটীতে সেবা স্থাপন করেন।

৬। **গৌরহাটী** : হুগলী জেলার আরামবাগের সন্নিকট। গ্রামবাসীদের উৎসাহে এখানে হরিদাস গৌরাঙ্গপুর হতে রামকানাই সেবা এখানে প্রতিষ্ঠিত করেন। প্রতিষ্ঠা উপলক্ষে অভিরাম এসে মহা মহোৎসবের আয়োজন করেন। এখনও এখানে রামকানাইসেবা চলছে।

৭। **গুপ্তিপাড়া** : ব্যাণ্ডেল-বারহারোয়া লাইনে গুপ্তিপাড়া স্টেশন থেকে একক্রোশ পূর্বে অবস্থিত। এখানে শ্রীবৃন্দাবনচন্দ্রের মন্দির বিদ্যমান। গৌরাঙ্গ পার্ষদ শ্রীসত্যানন্দ সরস্বতী শ্রীবৃন্দাবনচন্দ্রের সেবা প্রতিষ্ঠা করেন।

৮। **চাতরা বল্লভপুর** : শ্রীরামপুর স্টেশন হতে দেড় মাইল পূর্বে। এখানে গৌরাঙ্গ পার্ষদ কাশীশ্বর পণ্ডিত, শ্রীনাথ পণ্ডিত ও রুদ্র পণ্ডিতের শ্রীপাট। শ্রী রুদ্র পণ্ডিত সেবিত শ্রীরাধাবল্লভ। মাহেশের বিখ্যাত রথ রাধাবল্লভের রথযাত্রা। প্রভু বীরচন্দ্র গৌড়রাজ প্রাসাদ হতে আনীত তেলুয়া প্রস্তর খণ্ডে শ্রীরাধাবল্লভ বিগ্রহ নির্মিত।

৯। **জিরাট** : নিত্যানন্দের কন্যা গঙ্গাদেবীর শ্রীপাট। নন্যাপুর নিবাসী শ্রীমাধব আচার্য্যের সঙ্গে গঙ্গাদেবীর বিয়ে হয়।

"শুভ দিনে শুভক্ষণে জামাতা কন্যার সনে
বসুধা জাহ্নবা মাতা আইল।
হয়ে স্নেহ বশীভূত নিজ সেবা গোপীনাথ
কন্যাস্থানে সমর্পণ কৈল ॥"

১০। **তরা আঁটপুর** ধর্মতলা থেকে আঁটপুর স্টেট বাসে যাওয়া যায়। এখানে দ্বাদশ গোপালের অন্যতম শ্রীপরমেশ্বর দাসের শ্রীপাট। জাহ্নবা দেবীর আদেশ প্রাপ্ত হয়ে পরমেশ্বর দাস শ্রীরাধা গোপীনাথ বিগ্রহ প্রতিষ্ঠা করেন। জাহ্নবা দেবী প্রতিষ্ঠা মহোৎসবে উপস্থিত ছিলেন।

১১। **দ্বীপাগ্রাম বা দ্বারহাটা** : কলকাতা বিষ্ণুপুর বাসে যাওয়া যায়। ঠাকুর অভিরামের শিষ্য কৃষ্ণানন্দ অবধূতের শ্রীপাট। কৃষ্ণানন্দ গোপালসেবা স্থাপন করেন। দোলের পর দ্বিতীয়াতে দোল হয় এবং অপ্রাকৃত ভাবে কদম্ব পুষ্প প্রস্ফুটিত হয়।

১২। **বিক্রমপুর** : আরামবাগের নিকট। অভিরাম ঠাকুরের লীলাভূমি। কথিত আছে তিনি যখন বিগ্রহ প্রণাম করে ভ্রমণ করছেন এমন সময় বাসুলী দেবীর সঙ্গে তাঁর সাক্ষাৎ হয়। বিষ্ণুপুর হতে খানাকুল আসার পথে এই ঘটনা ঘটে।

১৩। **ভেঁদো** : হুগলী জেলায় সপ্তগ্রামের পাঁচ কি. মি. দূরে গৌরাঙ্গ-পার্ষদ ঝড়ু ঠাকুরের শ্রীপাট। রঘুনাথ গোস্বামীর জ্ঞাতিখুড়া শ্রীকালিদাস, বৈষ্ণব উচ্ছিষ্ট গ্রহণের জন্য বিভিন্ন বৈষ্ণবাশ্রমে গমন করতেন। এই বাসনায় তিনি ভেঁদো-নিবাসী ঝড়ু বৈষ্ণবের নিকট আম্রভেট নিয়ে যান। কিন্তু তিনি গ্রহণে আপত্তি জানালে আম্রফলটি ভেট দিয়ে কালিদাস কিছুদূরে লুকিয়ে রইলেন। কালিদাসকে বিদায় দিয়ে ঝড়ু—

"ঝড়ু ঠাকুর ঘর যাঞা দেখি আম্রফল।
মানসেই কৃষ্ণচন্দ্রে অর্পিলা সকল "

এবং স্বামীস্ত্রীতে উক্ত ফল ভক্ষণ করে "আটি চোকা সেই পাতুয়া খোলাতে ভরিযা।
বাহিরে উচ্ছিষ্ট গর্তে ফেলাইল লয়া ॥
সেই খোলার আঁটি চোকা চুষে কালিদাস
চুষিতে চুষিতে হয় প্রেমের প্রকাশ ॥"

সেই আঁটি হতে যে বৃক্ষ হয় তা নষ্ট হলে পুনরায় সেখানে একটি আমবৃক্ষ স্মরণীয় হিসাবে বক্ষা কবা হচ্ছে। শ্রীপাটে ঝড়ুঠাকুরের সেবিত শ্রীমদনগোপাল সেবা বিরাজিত। পঞ্চম দোলে এখানে উৎসব হয়।

১৪। **ভঙ্গমোড়া** : তারকেশ্বর হতে বাসে চৌতারায় নেমে দামোদব নদীর পারে অভিরাম ঠাকুরের শিষ্য সুন্দবানন্দের শ্রীপাট।

১৫। **ভাঙ্গামঠ** : শ্রীধাম নবদ্বীপের সন্নিকট বলে অনুমান। এখানে অদ্বৈত প্রভুর শিষ্য

ঈশানদাসের শ্রীপাট। এই ঈশান দাস অদ্বৈতাদেশে শচীদেবী ও বিষ্ণুপ্রিয়ার জীবিতকাল পর্যন্ত নবদ্বীপে থেকে শান্তিপুর চলে যান। একদিন অদ্বৈতপত্নী সীতাদেবী নীলাম্বর চক্রবর্তী ভবনের মহোৎসবে দোলাতে গমনকালে ভানু রায় নামক শিষ্যের দুর্বুদ্ধিতায় দোলা হতে নেমে ঈশান ও জানু রায়কে গৃহাশ্রমী হতে আদেশ দেন। এতে ঈশানের মিনতি দেখে দেবী বলেন তোমার কোন দোষ নাই।

"সীতা দেবী কহে ঈশান তুমি সাধুজন।
তোমার গৃহে জগন্নাথ করিবে গমন।"

আর তোমার তিনটি পরম বৈষ্ণব পুত্র জন্মিবে। এই বলে ভাঙ্গামঠে তাঁকে স্থাপন করলেন।

১৬। **মালীপাড়া** : চুঁচুড়া হতে সেনেটি হয়ে মালীপাড়ায় বাস যায়। এখানে গৌরাঙ্গ পার্ষদ ভগবান আচার্যের শ্রীপাট। এখানে শ্রীরাধাগোবিন্দের সেবা আছে।

১৭। **সপ্তগ্রাম** : আদি সপ্তগ্রাম স্টেশনের নিকট শ্রীউদ্ধারণ দত্তের পাটবাড়ী। সপ্তগ্রাম এবং তার কিছুদূরে শ্রীরঘুনাথ গোস্বামীর শ্রীপাট। এখানে কমলাকর পিপ্পলাই, বলরাম আচার্য, কমলাকান্ত পণ্ডিত প্রভৃতিরও শ্রীপাট।

সপ্তগ্রাম নামকরণ সম্বন্ধে কবিকঙ্কণ চণ্ডীতে

"তীর্থমধ্যে পুণ্যতীর্থ ক্ষিতি অনুপম। সপ্তঋষির শাসনে বলায় সপ্তগ্রাম"

প্রিয়ব্রত রাজার অগ্নিদ, মেধাতিথি, বপুষ্মান, জ্যোতিষ্মান, দ্যুতিমান, সর্বন ও ভব্য— এই সাতজন পুত্র সর্বত্যাগী হয়ে এইস্থানে আগমন করে সাধন করেন। তাঁদের তপস্যার স্থান বলে এর নাম সপ্তগ্রাম। এ স্থান সম্বন্ধে চৈতন্য ভাগবতে "সপ্তগ্রামে মহাতীর্থ ত্রিবেণীর ঘাটে" মহাতীর্থ ত্রিবেণী সপ্তগ্রামের অন্তর্গত। মহাপ্রভুর সময়ে সপ্তগ্রামের রাজা ছিলেন হিরণ্য ও গোবর্ধন দাস। গোবর্ধন দামের পুত্র রঘুনাথ দাস অতুল ঐশ্বর্য ত্যাগ করে শ্রীগৌরাঙ্গের অভয়চরণে আশ্রয় গ্রহণ করেন।

১৮। **হেলান গ্রাম** : তারকেশ্বর হতে বাসে গিয়ে দীঘরুই ঘাট পার হয়ে হেলাল গ্রাম, এখানে অভিরাম ঠাকুরের শিষ্য পাখিরা গোপালের শ্রীপাট। বর্তমানে কোন স্মৃতি নেই।

১৯। **খোভলু** : তারকেশ্বর হতে বাসে চৌতারায় নেমে দামোদর পার হয়ে এক মাইল দূরে খোভালু। এখানে অভিরাম ঠাকুরের শিষ্য বাঙ্গাল কৃষ্ণদাসের শ্রীপাট। তিনি গোপীনাথ সেবা প্রকাশ করেন।

২০। **বিল্লোক** : তারকেশ্বর হতে বাসে যাওয়া যায়। ঠাকুর অভিরামের জন্মস্থান। এখানে অপ্রাকৃত লীলাকাহিনী শোনা যায়। অভিরাম ঠাকুর মালীন দেবীকে খানাকুল হতে বিল্লোকে আনলে কাজীর সৈন্যদল ও গ্রামবাসী ভীষণ ক্রুদ্ধ হয়ে পড়ে। পরিশেষে অলৌকিকভাবে তারা প্রতিনিবৃত্ত হয়।

"এতেক শুনিয়া কন্যা বলেন বচন
খানাকুল হৈল নাম কাজীপুর এখন ॥"

এই গ্রামে ঠাকুর অভিরাম বহু অলৌকিকলীলা প্রকাশ করেছিলেন।

২১। **খানাকুল কৃষ্ণনগর** : দ্বাদশ গোপালের অন্যতম শ্রীঅভিরাম ঠাকুরের শ্রীপাট। এখানে অভিরাম গোস্বামী অনেক অপ্রাকৃত লীলা করেন। বকুল বৃক্ষ সৃষ্টি, এবং ভস্মীভূত বৃক্ষকে পুনরায় সঞ্জীবিত করা প্রভৃতি।

"বর্ধমান জেলার বৈষ্ণবতীর্থ"

১। অগ্রদ্বীপ : শ্রীগৌরাঙ্গ দেবের কীর্তনীয়া তিন ভাই গোবিন্দ ঘোষ, বাসুদেব ঘোষ ও মাধবঘোষের জন্মস্থান অগ্রদ্বীপ। এখান গোবিন্দ ঘোষের সমাধি আছে। গোবিন্দ ঘোষের বাৎসল্য রসে বশীভূত হয়ে অগ্রদ্বীপের গোপীনাথ অদ্যাপি চৈত্র কৃষ্ণা একাদশী তিথিতে পুত্ররূপ পরিগ্রহ করে তাঁর শ্রাদ্ধাদি কার্য নির্বাহ করেন বলে কথিত।

২। আকাই হাট : দাঁইহাট থেকে এক মাইল দুরে মাধাইতলা- সেখান হতে আধমাইল দূরে আকাইহাট কালাকৃষ্ণদাসের শ্রীপাট। তিনি গৌরাঙ্গ মহাপ্রভুর দক্ষিণ দেশেব ভ্রমণ সঙ্গী ছিলেন একথা কোন কোন বৈষ্ণব গ্রন্থে উল্লেখ আছে।

৩। আমাইপুরা : বর্ধমানের নিকটস্থ গ্রাম। শ্রীচৈতন্য মঙ্গল রচয়িতা পণ্ডিত গদাধরের শিষ্য জয়ানন্দের জন্মভূমি। মহাপ্রভু দক্ষিণদেশ ভ্রমণ শেষে জয়ানন্দের পিতা সুবুদ্ধি মিশ্রের গৃহে আসেন। জয়ানন্দ খুব ছোট। তার নাম ছিল গুয়া। মহাপ্রভু নাম বদলে রাখেন জযানন্দ।

৪। আন্তুয়া মুলুক : অম্বিকা কালনার নিকট। কর্তমান নাম প্যারীগঞ্জ। শ্রীনকুল ব্রহ্মচারীর শ্রীপাট।

৫। উদ্ধারণপুর : বর্ধমান জেলায়। উদ্ধারণ দত্তের শ্রীপাট। এখন পাঁচুন্দী স্টেশনের একক্রোশ দূরে বনয়ারীবাদের রাজবাড়িতে পাট দেবতার পূজা হয।

৬। কালনা : অম্বিকা কালনা স্টেশনের নিকটবর্তী গৌরীদাস পণ্ডিতের শ্রীপাট। গৌরীদাসের প্রীতিবদ্ধ হয়ে নিতাইগৌর নিজ প্রতিমূর্তি নির্মাণ করিয়ে তাতে নিজ অভিন্নতা প্রকাশ করে শ্রীমূর্তিস্বরূপে গৌরীদাস ভবনে বিবাজ করছেন। এখানে মহাপ্রভুর স্বহস্ত লিখিত গীতা ও দাঁড় আছে। গৌরীদাসের বিগ্রহ স্থাপন লীলা বৈষ্ণব জগতে একটি বিশেষ স্থান অধিকার করে আছে।

৭। কাটোয়া : শ্রীকেশব ভারতীর শ্রীপাট। এখানে গৌরাঙ্গ ১৪৩১ শকে মাঘ মাসে শুক্লপক্ষে কেশব ভারতীর নিকট সন্ন্যাস গ্রহণ করেন। এই স্থানে দাস গদাধর শেষ জীবন অতিবাহিত করেন এবং নিতাইগৌরাঙ্গ বিগ্রহ স্থাপন করে সেবাব প্রকাশ করেন।

খেতুরী উৎসব গমনকালে গৌড়ীয় বৈষ্ণবগণ কাটোয়ায় শ্রীপাট দর্শন করে গিয়েছিলেন। তাই কাটোয়া গৌড়ীয় বৈষ্ণবগণের মহাতীর্থ। এখানে মহাপ্রভুর কেশের সমাধি, শ্রীকেশব ভারতীর সমাধি, শ্রীমধু নাপিতের সমাধি, শ্রীগদাধর দাসের সমাধি আছে।

৮। কুলীনগ্রাম : বর্ধমান কর্ডলাইনে জৌগ্রাম স্টেশন হতে তিন মাইল দূরে। কুলীনগ্রামে অগণিত গৌরাঙ্গ-পার্ষদ জন্মগ্রহণ করেন। চৈতন্য চরিতামৃত গ্রন্থে—

"প্রভু কহে কুলীনগ্রামের যে হয় কুকুর।
সেই মোর প্রিয়, অন্যজন বহুদূর।
কুলীন গ্রামের ভাগ্য কহনে না যায়।
শূকর চড়ায় ডোম সেহ কৃষ্ণ গায়।"

এখানকার বৈষ্ণবগণ যথা—গুণরাজ খান, সত্যরাজ খান, রামানন্দ বসু, যদুনাথ, পুরুষোত্তম, শংকর, বিদ্যানন্দ, বাণীনাথ বসু প্রমুখ।

রামানন্দ বসু বৈষ্ণব সঙ্গীত রচয়িতা। গুণরাজ খান শ্রীকৃষ্ণ বিজয় গ্রন্থ রচনা করেন।

৯। কুলাই : কাটোয়া হতে ১০ মাইল উত্তর-পশ্চিমে অজয় নদীর ধারে,

"কুলাই গ্রামেতে ছিলা কবিরাজ যাদব।
দৈত্যারি, কংসারি ঘোষ কায়স্থ এসব।"

মহাপ্রভুর আদেশে যাদব কবিরাজ তিন মূর্তি বিগ্রহ নরহরিব হাতে দেন। প্রথম ছোট ঠাকুর শ্রীখণ্ডে, মধ্যম গঙ্গানগরে এবং বড়ঠাকুর কুলাই গ্রামে সেবিত হচ্ছেন।

১০। কেতুগ্রাম : কাটোয়া আমোদপুর লাইনে জ্ঞানদাস কাঁদরা স্টেশনের নিকট। এখানে শ্রীখণ্ডনিবাসী রামগোপাল দাস "শ্রীরাধাকৃষ্ণ রসকল্পবল্লী" গ্রন্থ রচনা আরম্ভ করেন এবং বৈদ্যখণ্ডে শেষ করেন।

১১। কাঁদরা : এখানে শ্রীমঙ্গল বৈষ্ণব ও পদাবলী রচয়িতা জ্ঞানদাসের শ্রীপাট।

১২। কাঞ্চননগর : বর্ধমান হতে তিন ক্রোশ দূরে দামোদর নদের নিকট শ্রীগোবিন্দ কর্মকারের জন্মস্থান। ইনি গৌরাঙ্গদেবের দক্ষিণ ভ্রমণ বৃত্তান্ত কড়চা আকারে লেখেন।

"বর্ধমানে কাঞ্চননগরে মোর ধাম।
শ্যামদাস পিতৃনাম, গোবিন্দ মোর নাম ॥" (কড়চা)

১৩। কোগ্রাম : বধর্মান-কাটোয়া লাইনে বলগোনা স্টেশন হতে নয় মাইল দূরে নূতনহাট। নূতনহাট হতে ১ মাইল দূরে কোগ্রাম। এর প্রাচীন নাম উজানী। চৈতন্যমঙ্গল রচয়িতা লোচনদাসের শ্রীপাট।

১৪। শ্রীখণ্ড : কাটোয়ার নিকটবর্তী। শ্রীপাট শ্রীখণ্ড বৈষ্ণব কবি ও সাহিত্যিকদের দেশ। শ্রীখণ্ডে গৌরাঙ্গ পার্ষদ শ্রীচিরঞ্জীব সেন বিবাহ করে কুমারনগরে এসে বাস করেন। এই শ্রীখণ্ডে মাতামহ শ্রীদামোদর কবিরাজের গৃহে বিখ্যাত পদকর্তা শ্রীগোবিন্দদাস কবিরাজের জন্মস্থান। এখানে গৌরাঙ্গ-পার্ষদ নরহরি সরকার, মধুসূদন, রঘুনন্দন প্রভৃতি বৈষ্ণবগণের জন্মস্থান। এখানে শ্রীবৃন্দাবন চন্দ্র সেবা বিদ্যমান। গৌরাঙ্গ আদেশে ঠাকুর নরহরির শিষ্য চক্রপাণি মজুমদার নীলাচল হতে ঠাকুর এনে শ্রীখণ্ডে সেবা প্রতিষ্ঠা করেন। এখনও শ্রীখণ্ডে শ্রীচক্রপাণির বংশধরেরা পালাক্রমে পূজা চালাচ্ছেন।

রসকল্পবল্লীতে আছে—

"খণ্ড সুদপুর আর যাজিগ্রাম।
বৈষ্ণবতলা মেলা বৈষ্ণবের ধাম ॥"

অগণিত বৈষ্ণবের মহিমায় মহিমান্বিত মহাপাট শ্রীখণ্ড।

১৫। গোপালপুর : বর্ধমান জেলায় অবস্থিত। শ্রীনিবাস আচার্যের দ্বিতীয় পত্নী শ্রীগৌরাঙ্গ প্রিয়ার জন্মভূমি।

১৬। ঘোরাঘাট : বর্ধমান জেলায় অবস্থিত। শ্রীরঘুনন্দনের শিষ্য শ্রীবনমালী কবিরাজের শ্রীপাট।

১৭। ঝামটপুর : কাটোয়া হতে ঝামটপুর-রহরাণ রেল স্টেশন। সেখান থেকে দেড় মাইল দূরে শ্রীচৈতন্য চরিতামৃতের রচয়িতা শ্রীকৃষ্ণদাস কবিরাজের শ্রীপাট। একদা শ্রীকৃষ্ণদাস কবিরাজের গৃহে অহোরাত্র সংকীর্তনে মীনকেতন রামদাস এলে তিনি নিত্যানন্দ সম্প্রদায়ভুক্ত বলে কবিরাজের ভ্রাতা সম্মান না করায় মীনকেতন ক্রোধে বংশী ভেঙ্গে দিয়ে চলে যান। এতে কবিরাজ ভ্রাতার সর্বনাশ হয়। নিত্যানন্দ স্বপ্নাদেশে কৃষ্ণদাসকে বৃন্দাবনে যেতে বললে কৃষ্ণদাস বৃন্দাবন গিয়ে রাধাকুণ্ডতীরে শ্রীরঘুনাথ দাস গোস্বামীর নিকট অবস্থান করেন। এখনও ঝামটপুরে হস্তলিখিত চৈতন্য চরিতামৃত কৃষ্ণদাস কবিরাজের অমর কীর্তি ঘোষণা করছে।

১৮। টৈঁয়া বৈদ্যপুর . উপরোক্ত ঝামটপুর হতে ছয় মাইল দূরে পদকর্তা বৈষ্ণবদাসের শ্রীপাট।

১৯। তকিপুর : কাটোয়া ও বেলগ্রামের সমীপবর্তী। এখানে নরহরি ঠাকুরের শিষ্য গোপাল দাসের শ্রীপাট। তাঁর বাড়ি ছিল শ্রীখণ্ডে। তিনি তকিপুর গিয়ে একটি বাড়িতে ওঠেন। বাড়িটাতে ব্রহ্মদৈত্যের ভয়ে কেউ বাস করতে পারত না। তিনি দৈত্যকে উদ্ধার করেন। গ্রামবাসীরা এ প্রত্যক্ষ করেন। এখানে গোপালদেবের সেবা আছে।

২০। দেনুড় : বর্ধমান পুরসুড়া বাসে যাওয়া যায়। এখানে ব্যাসাবতার বৃন্দাবন দাসের শ্রীপাট। এখানে বসেই বৃন্দাবন দাস চৈতন্য ভাগবত রচনা করেন।

২১। ধামাশ : বর্ধমান জেলার বড়শূল হতে ৫/৬ কিলোমিটার দূরে। এখানে শ্রীরামাই পণ্ডিতের শিষ্য শ্রীরামচন্দ্রের শ্রীপাট।

২২। নন্যাপুর : (E. R.) রেলওয়ের সালার স্টেশনের নিকট। এখানে প্রভু নিত্যানন্দের জামাতা শ্রীমাধব আচার্যের জন্মস্থান।

২৩। নৈহাটী : এটিও সালার স্টেশনের কাছে। শ্রীপাদ সনাতন গোস্বামীর পিতৃপুরুষের বাস ছিল। জ্ঞাতি বিরোধে সনাতন গোস্বামীর পিতা এ স্থান ত্যাগ করে বাকলা চন্দ্রদ্বীপে বাস করেন।

২৪। পাতাগ্রাম : শ্রীপাট দেনুড় হতে সিকি মাইল দূরে। ঠাকুর অভিরামের শিষ্য শ্রীবিদুর ব্রহ্মচারীর শ্রীপাট। এখানে গোপীনাথদেবের সেবা বিদ্যমান।

২৫। বাঘনাপাড়া : ব্যাণ্ডেল কাটোয়া লাইনে বাঘনাপাড়া স্টেশন। সেখান থেকে তিন মাইল পশ্চিমে বাঘনাপাড়া। রামাই পণ্ডিতের শ্রীপাট। গৌরাঙ্গ পার্ষদ চৈতন্যদাস। চৈতন্য দাসের পুত্র রামাই পণ্ডিত। বৃন্দাবনে শ্রীগোপীনাথ দেবের মন্দিরে শ্রীজাহ্নবা দেবীর অন্তর্ধান হলে রামাই পণ্ডিত বিহ্বল হয়ে পড়েন। তখন রামকৃষ্ণ স্বপ্নাদেশ দেন। ফলে

"স্নানকালে কৃষ্ণরাম শ্রীমূর্তিযুগল।
প্রভু রামচন্দ্র কোলে ভাসিয়া লাগিল।"

'রামকৃষ্ণ' বিগ্রহ নিয়ে রামাই পণ্ডিত অম্বিকার পশ্চিমপাড়ে তিন মাইল দূরে এক অরণ্যে এসে সেবাকার্য চালান। একদিন একটা বাঘ এসে রামাই পণ্ডিতের কাছে দুটি বর প্রার্থনা করে। একটি বরে জীবনান্তকাল পর্যন্ত সে যেন রামকৃষ্ণের প্রসাদ পায় আর দ্বিতীয় বর তার নামে যাতে গ্রামের নামকরণ হয়। রামাই পণ্ডিত সম্মত হন। এর ফলে অরণ্যস্থিত সেবাস্থলের নাম হয় বাঘনাপাড়া। ব্যাঘ্রপ্রসাদ ভক্ষণ করে ব্যাঘ্র-দেহ ত্যাগ করে মুক্তিপ্রাপ্ত হয়।

২৬। বাইগনকোলা : কাটোয়ার নিকট। শ্রীনিবাস আচার্যের শিষ্য ও শ্যালক শ্রীরামচরণ চক্রবর্তী। শ্রীরামচরণের পুত্র শ্রীরামশরণ চট্টরাজেব শ্রীপাট। অনুবাগবল্লীর লেখক শ্রীমনোহর দাস তাঁর গুরু রামশরণের নিকট এখানে কিছুকাল বাস করেছিলেন।

২৭। বেলুন : কাটোয়া থেকে ছোটলাইনে ভাতার স্টেশনে নেমে তিন মাইল দূরে শ্রীঅনন্তপুরীর শ্রীপাট। "বেলুনে অনন্তপুরীর মহিমা প্রচুর।"

২৮। মঙ্গলকোট : কাটোয়া হতে ছোট লাইনে কৈচর স্টেশনের সন্নিকট। এখানে শ্রীনিত্যানন্দ শিষ্য চন্দন মণ্ডলের শ্রীপাট। শ্রীজাহ্নবা দেবী অন্তর্ধান উদ্দেশ্যে বৃন্দাবন যাত্রাকালে বীরচন্দ্রপুত্র গোপীজনবল্লভসহ একচক্রা গমনপথে এখানে নামেন। শ্রীজাহ্নবা দেবীর জন্য একখানা দিব্যরথ তৈরি করে রেখেছিলেন চন্দন মণ্ডল। জাহ্নবা দেবী রথে না চড়ে বীরচন্দ্রকে রথে চড়ার আদেশ দেন। তখন বীরচন্দ্র—

"রথেতে চড়িয়া নিজ শক্তি প্রকাশিল। বনমালা পীতবস্ত্র চতুর্ভুজ হইল।
রথ টানে মণ্ডল সগনে সঙ্গে লইয়া। আর সব লোক টানে কাছিতে ধরিয়া।" (নিত্যানন্দ বংশ বিস্তার)।

২৯। যাজিগ্রাম : কাটোয়া হতে দেড় মাইল দূরে যাজিগ্রাম শ্রীশ্রীনিবাস আচার্যের শ্রীপাট। এখানে শ্রীনিবাস আচার্য্যের মাতামহর বাস ছিল। শ্রীনিবাসের জন্ম হয় চাখন্দীতে। পিতার মৃত্যুর পর এখানে এসে বাস করেন। তিনি যাজিগ্রামে মাতাকে রেখে শ্রীখণ্ডে নরহরি সরকারের নিকট যান এবং তাঁর আদেশে নীলাচল গমন করেন। সেখান থেকে ফিরে এসে

গৌড় মণ্ডল পরিক্রমা করে বৃন্দাবন যান। সেখান থেকে ভক্তিগ্রন্থসমূহ নিয়ে গৌড়দেশ আসেন। তখন বিষ্ণুপুরে ঐ গ্রন্থরাজি চুরি হয়। গ্রন্থ উদ্ধারান্তে যাজিগ্রামে এসে লীলা প্রকাশ করেন। এখানে বিষ্ণুপুররাজ বীর হাম্বীরও এসেছিলেন।

৩০। **শীতলগ্রাম** : কাটোয়া হতে ৯ মাইল দূরে। দ্বাদশ গোপালের অন্যতম শ্রীধনঞ্জয় পণ্ডিতের শ্রীপাট। এখানে শ্রীগৌরাঙ্গ-গোপীনাথ সেবা আছে।

৩১। **সাঁচরা-পাচরা** : মেমারী স্টেশনের নিকট। দ্বাদশ-গোপালের অন্যতম শ্রীধনঞ্জয় পণ্ডিতের এও শ্রীপাট।

"সাঁচরা-পাচরা-করন্দা-শীতলগ্রাম।

ধনঞ্জয় পণ্ডিতের সেবা অনেক বিধান।" (শ্রীপাট নির্ণয়)

৩২। **কৈয়ড়** : বাঁকুড়া-রাইনা ছোট লাইনে একটি স্টেশন। ঠাকুর অভিরামের শিষ্য বেদগর্ভের শ্রীপাট।

৩৩। **চম্পহট্ট** : ব্যাণ্ডেল কাটোয়া লাইনে সমুদ্রগড় স্টেশনে নেমে যেতে হয়। এখানে গৌরাঙ্গ পার্ষদ দ্বিজ বাণীনাথের শ্রীপাট।

৩৪। **মামগাছি** ব্যাণ্ডেল কাটোয়া লাইনে ভাণ্ডারটিকুড়ি স্টেশনে নেমে যেতে হয়। এখানে গৌরাঙ্গ পার্ষদ শ্রীবাসুদেব দত্তের শ্রীপাট। চৈতন্যভাগবত রচয়িতা বৃন্দাবন দাস এখানে কিছুকাল ছিলেন।

৩৫। **পানাগড়** : বর্ধমান জেলায়। রামাই পণ্ডিতের শিষ্য শ্রীহরিদাসের শ্রীপাট।

॥ মুর্শিদাবাদ জেলায় বৈষ্ণবতীর্থ ॥

১। **কুমারপুর বা কুমারনগর** : মুর্শিদাবাদ শহর থেকে ৩ মাইল দূরে কুমারনগর শ্রীপাট। এখানে শ্রীজীব গোস্বামীর প্রশিষ্য বংশীবদন গোস্বামীর বাসস্থান। তিনি এখানে "রাধামাধব" বিগ্রহ স্থাপন করেন।

"ভাগরথী তীরে নাম কুমারনগর।
অনেক বৈষ্ণব তথা বসতি সুন্দর ॥" ভক্তি রত্নাকর ॥

খেতুরী হতে চার ক্রোশ দূরে এই কুমারনগরে চিরঞ্জীব, শ্রীরামচন্দ্র কবিরাজ, শ্রীগোবিন্দ কবিরাজ শ্রীবিষ্ণুদাস কবিরাজ, শ্রীগোপাল চক্রবর্তী প্রমুখ শ্রীগৌরাঙ্গ পার্ষদগণের বিহারভূমি।

২। **গামভীলা** : গামভীলার বর্তমান নাম জিয়াগঞ্জ। ভাগীরথীকূলে অবস্থিত। ঠাকুর নরোত্তমের লীলাভূমি। নরোত্তমের প্রভাবে বিপ্রাদি সর্বশ্রেণীর লোক তাঁর চরণাশ্রয় করছে দেখে বিপ্রসমাজ ঈর্ষান্বিত হয়ে উঠল। এদের উদ্ধারের জন্য নরোত্তম বিলাসে—

'প্রভুর সেবাতে সভে সাবধান করি।/ কথোজন সঙ্গে তবে আইলা বুধরী॥
তথা হতে আইলা গামভীলা গঙ্গাতীরে। / অকস্মাৎ জ্বর আসি ব্যাপিল শরীরে ॥
চিতা সজ্জা কর শীঘ্র এই আজ্ঞা দিয়া। / রহিলেন মহাশয় নীরব হইয়া ॥
ঐছে মহাশয় তিনদিন গোঙাইলা। / লোকদৃষ্টে দেহ হৈতে পৃথক হইল ॥
মহাশয়ে স্নান করাইয়া সেইক্ষণে। / চিতার উপরে রাখিলেন দিব্যাসনে ॥
পরস্পর কহে সুখে ব্রাহ্মণ সকল। / বিপ্রশিষ্য কৈল যৈছে হৈল তার ফল ॥
গঙ্গানারায়ণ ব্রহ্ম কিছু না কহিল। / বাক্যরোধ হৈয়া নরোত্তম দাস মৈল ॥
গঙ্গানারায়ণ ঐছে পণ্ডিত হইয়া। / হইলেন শিষ্য নিজ ধর্ম তেয়াগিয়া ॥
দেখিল গুরুর দশা হইল যেমন। / না জানি ইহার দশা হইবে কেমন ॥

গঙ্গানারায়ণ চিতা পাশে গিয়ে এদের উদ্ধার প্রার্থনা করলে নরোত্তম "নিজ দেহে মহাশয়

আইলা সেইক্ষণে ॥" "উঠিলেন চিতা হৈতে যেন সূর্যসম। আর অকস্মাৎ পুষ্প বরিষযে দেবগণে।" নিন্দুক ব্রাহ্মণগণ সবিনয়ে ননোত্তমে শিষ্যত্ব গ্রহণ করল। কিছুদিন পর নবোত্তম ঠাকুর এই গামভীলার গঙ্গাঘাটে স্নানে এসে অলৌকিকভাবে অন্তর্ধান করেন।

৩। **কাঞ্চন গড়িয়া** : ব্যাণ্ডেল রারহারোয়া লাইনে বাজারশহু স্টেশন হতে এক মাইলের মধ্যে। গৌরাঙ্গদেবের কীর্তনীয়া দ্বিজ হরিদাসের শ্রীপাট। দ্বিজহরিদাসের দুই পুত্র (১) শ্রীদাস (২) গোকুলানন্দ চক্রবর্তী। মাঘ মাসে কৃষ্ণ একাদশীতে বৃন্দাবনে দ্বিজ হরিদাস অপ্রকট হলে তাঁর পুত্রদ্বয় কাঞ্চনগড়িয়ায় যে মহামহোৎসব করেছিলেন তাতে শ্রীনিবাস আচার্যসহ বহু গৌরাঙ্গ পার্ষদ যোগ দেন।

৪। **গোয়াস** : শিয়ালদহ লাইনে লালগোলা স্টেশন হতে পতিবোনা। সেখান থেকে পদ্মার পশ্চিমপারে। শিবাই আচার্যের পুত্র ও শ্রীনিবাসের শিষ্য হরিরাম আচার্য আর নরোত্তম-শিষ্য রামকৃষ্ণের শ্রীপাট। রামকৃষ্ণ আচার্য মোহন রায়ও হরিরাম 'কৃষ্ণরায়ের' সেবা প্রতিষ্ঠা করেন।

৫। **গোঁসাঞি** : মুর্শিদাবাদ জেলায়। এখানে শ্রীনিবাস আচার্যের কন্যা হেমলতার শিষ্য শ্রীবল্লভদাসের শ্রীপাট।

৬। **দেবগ্রাম** : আজিমগঞ্জ নলহাটী লাইনে সাগরদিঘী স্টেশনে নেমে হিয়লা-যাজিগ্রামের সন্নিকট দেবগ্রাম। এখানে শ্রীল বিশ্বনাথ চক্রবর্তীর জন্মস্থান। নরোত্তম বিলাসে

তাঁর প্রিয় শিষ্য বিশ্বনাথ দয়াময়।/ যাঁর জন্মকালে হৈল সবার বিস্ময় ॥
জন্মঘরে তেজঃ পুঞ্জ অগ্নির সমান। / ক্ষণেক থাকিয়া তাহ হল অন্তর্ধান ॥
বালক দেখিয়া সুখ বাড়িল সবার। / মধ্যে মধ্যে বালকের দেখে চমৎকার ॥
দেবগ্রামবাসী লোক সতত আসিয়া।/ বক্ষে করি রাখে কেহ না দেয় ছাড়িয়া ॥"

বিশ্বনাথ চক্রবীর ক্ষণদাগীত চিন্তামণি?

৭। **বুধরী** : শিয়ালহ-লালগোলা লাইনে ভগবানগোলা স্টেশনের নিকট। এখানে শ্রীনিবাস আচার্যের শিষ্য শ্রীরামচন্দ্র কবিরাজ, তদীয় ভ্রাতা শ্রীগোবিন্দদাস কবিরাজ, জগন্নাথ আচার্য এবং গৌরীদাস পণ্ডিতের শিষ্য বড়ুগঙ্গাদাস, আর ঠাকুর নরোত্তমের শিষ্য রবি বায় প্রমুখের শ্রীপাট। শ্রীরামচন্দ্র কবিরাজ ও শ্রীগোবিন্দ কবিরাজ অষ্ট কবিরাজের অন্তর্ভুক্ত। গোবিন্দ কবিরাজ বৈষ্ণব পদাবলীর বিশিষ্ট লেখক। জ্যেষ্ঠ রামচন্দ্র কবিরাজ ভ্রাতা গোবিন্দ কবিরাজকে বৃন্দাবন যাওয়ার পূর্বেই কুমারনগর হতে তেলিয়া বুধরীতে বাস করার নির্দেশ দেন। গোবিন্দ কবিরাজ এই স্থলেই শ্রীনিবাস আচার্যের কৃপাপ্রাপ্ত হন।

৮। **বোরাকুলি** : মুর্শিদাবাদ জেলার গোয়াস শ্রীপাটের সন্নিকটে। শ্রীনিবাস আচার্য শিষ্য শ্রীগোবিন্দ চক্রবর্তীর শ্রীপাট। শ্রীনিবাস আচার্য সপার্ষদ শ্রীগোবিন্দ চক্রবর্তীর ভবনে শ্রীরাধাবিনোদ বিগ্রহ প্রতিষ্ঠা দিবসে আসেন এবং মহোৎসবে যোগ দেন।

৯। **বাহাদুরপুর** : শ্রীপাট বুধরীর সন্নিকট। ভক্তিরত্নাকবে—

"বুধরী নিকট বাহাদুরপুর গ্রাম।/তথা বৈসে বিপ্রশ্রেষ্ঠ শ্যামদাস নাম ॥ 'এখানে শ্রীনিবাস আচার্য শিষ্য কর্ণপুর কবিরাজ, শ্যামদাস ও বংশীদাস চক্রবর্তীর শ্রীপাট। বংশীদাস গোপীরমণ জীউর সেবা প্রকাশ করেন।

১০। **বুঁধইপাড়া** : মুর্শিদাবাদ জেলায় : বহরমপুরের গঙ্গার পশ্চিম তীরে। প্রাচীন বুঁধইপাড়া গঙ্গাগর্ভে লীন হওয়ায় শ্রীপাট নেয়াল্লিশ পাড়ায় স্থানান্তরিত হয়। এখানে শ্রীনিবাস আচার্যের শিষ্য শ্রীরামকৃষ্ণ চট্টরাজ, তদীয় ভ্রাতা কুমুদ চট্টরাজ এবং তাঁর বংশধর রাধাবল্লভ, গোপীজনবল্লভ, গোবিন্দ রায়, গৌরাঙ্গবল্লভ, চৈতন্যদাস, বৃন্দাবন দাস. কৃষ্ণদাস প্রমুখের বিহারভূমি। রামকৃষ্ণ চট্টরাজের পুত্র গোপীজনবল্লভের সঙ্গে শ্রীনিবাস আচার্যের জ্যেষ্ঠা কন্যা

শ্রীমতী হেমলতা ঠাকুরানীর বিবাহ হয়। হেমলতা ঠাকুরানী শ্রীরাধারমণ বিগ্রহ সেবা স্থাপন করেন।

১১। **ভরতপুর** : মুর্শিদাবাদ জেলার কান্দী মহকুমায় অবস্থিত। পণ্ডিত গদাধরের ভ্রাতুষ্পুত্র শ্রীনয়নানন্দের শ্রীপাট। নীলাচলে শ্রীগদাধর পণ্ডিত অন্তর্ধান করলে নয়নানন্দ ক্ষেত্র হতে গৌড়দেশ আসেন। আসার সময় মহাপ্রভুর শ্রীহস্ত লিখিত একটি শ্লোকসহ গীতা ও গদাধরের গলদেশে বিরাজিত কৃষ্ণবিগ্রহ নিয়ে এসে ভরতপুর শ্রীপাটে স্থাপন করেন। প্রেমবিলাসে।

"পণ্ডিত গোঁসাই প্রভুর অপ্রকট্য সময়। / নয়নান্দেরে ডাকি এই কথা কয়
মোর গলদেশে থাকিত এ কৃষ্ণমূর্তি / সেবন করিহ সদা করি অতি প্রীতি ॥
তোমায় অর্পিলা এ গোপীনাথের সেবা। ভক্তিভাবে সেবিবে না পূজিবে অন্য দেবীদেবা।"
এখনও ভরতপুরে উক্ত গ্রন্থ ও রাধাগোপীনাথের সেবা বিদ্যমান।

১২। **মালীহাটী** : কাটোয়ার সন্নিকট। শ্রীনিবাস আচার্যের কন্যা শ্রীমতী হেমলতা ঠাকুরানীর শিষ্য কর্ণানন্দ আদি গ্রন্থের লেখক শ্রীযদুনন্দন দাসের শ্রীপাট।

১৩। **মহুলা** : শ্রীনিবাস আচার্যের শিষ্য শ্রীগোবিন্দ চক্রবর্তীর বাসস্থান। তিনি ভাবক চক্রবর্তী নামে প্রসিদ্ধ। তিনি মহুলা গ্রাম হতে বোরাকুলি গ্রামে এসে বাস করেন।

১৪। **মীর্জাপুর** : ব্যাণ্ডেল বারহাবোয়া লাইনে গনকর স্টেশন হতে সামান্য দূরে। এখানে শ্রীনিবাস আচার্যের শিষ্য শ্রীগোপীমোহনের শ্রীপাট। 'তথাহি কর্ণানন্দে শ্রীগোপীমোহন দাস মীর্জাপুরালয়।'

১৫। **রায়পুর** : গোয়াস পরগণা (মুর্শিদাবাদ)। শ্রীনিবাস আচার্যের শিষ্য শ্রীনারায়ণ চৌধুরীর শ্রীপাট। এখানে গোবিন্দসেবা বর্তমান। বিগ্রহের অভিষেক করেন স্বয়ং শ্রীনিবাস আচার্য।

১৬। **রেঞাপুর** : মুর্শিদাবাদ জেলার জঙ্গীপুর মহকুমায়। ভাগীরথী তীরে। এখানে ভক্তিরত্নাকর গ্রন্থের রচয়িতা শ্রীনরহরি দাসের শ্রীপাট। তাঁর পিতা জগন্নাথ চক্রবর্তী শ্রীবিশ্বনাথ চক্রবর্তীর শিষ্য ছিলেন।

১৭। **সৈদাবাদ** : মুর্শিদাবাদ জেলার বহরমপুরের উপকণ্ঠে। এখানকার শ্রীপাটে শ্রীমোহন রায়ের সেবা। ১২৪১ সালে (বঙ্গাব্দ) মণিপুরের রাজা এই মন্দির নির্মাণ করেন। এখানে শ্রীনরোত্তম ঠাকুরের শিষ্য শ্রীরামকৃষ্ণ আচার্যের সেবিত শ্রীমোহন রায়ের সেবা আছে। শ্রীল বিশ্বনাথ চক্রবর্তী মহাশয় এখানে স্বীয় গুরু শ্রীরামচরণ চক্রবর্তীর সমীপে কিছুদিন ছিলেন। কবিকর্ণপুর কৃত "অলংকার কৌস্তুভ" গ্রন্থের শেষে শ্রীল বিশ্বনাথ চক্রবর্তীর বচন :

"সৈয়াদাবাদ বাসি শ্রীবিশ্বনাথাখ্য শর্ম্মণ।
চক্রবর্তীতি নাম্নেয়ং কৃতা টীকা সুবোধিনী ॥

॥ মেদিনীপুর জেলায় বৈষ্ণবতীর্থ ॥

১। **আলমগঞ্জ** : শ্যামানন্দ বড়কোলা গ্রামে মহোৎসব করছিলেন। সে সময় হরিবোলা নামক যবন রাজা মহোৎসবে শ্যামানন্দের অলৌকিক মহিমা দেখে প্রেমাবিষ্ট হন। তিনি ঐ যবনরাজার অনুরোধে তাঁর গৃহে রসিকানন্দকে নিয়ে তিন দিন মহোৎসব করেন।

২। **কাশীয়ারী** : খড়গপুর স্টেশন হতে ২৬ কি.মি দূরে। এখানে শ্যামানন্দ শিষ্য রসিকানন্দসহ বহু অলৌকিক লীলা করেন। শ্যামানন্দের দ্বাদশটি পাটের মধ্যে কাশীবাড়িতে শ্রীকিশোরদেব, শ্রীপুরুষোত্তম শ্রীদামোদর এবং শ্রীউদ্ধরের শ্রীপাট। চৈত্র পূর্ণিমায় শ্রীকিশোরদেব গোস্বামী সেবিত শ্রীগোপীনাথের রথারোহণ উৎসব হয়।

৩। **গোপীবল্লভপুর** : খড়গপুর হতে বাসে কুটিঘাট। সেখানে সুবর্ণরেখা নদী পার হয়ে

গোপীবল্লভপুরের শ্রীগোবিন্দ দেবের মন্দির। শ্রীপাট গোপীবল্লভপুর গুপ্ত বৃন্দাবন নামে খ্যাত। শ্যামানন্দ শিষ্য রসিকানন্দ। রসিকানন্দের ভ্রাতা কাশীনাথ 'কাশীপুর' নামে রাজ্য স্থাপন করেন। কাশীরাজ অচ্যুতানন্দের তিরোধামে গৃহবিবাদ শুরু হওয়ায় রসিকানন্দ বিষয় সম্পত্তি ছেড়ে নীলাচলে চলে যান। জগন্নাথদেব তাঁকে স্বপ্নে বললেন,

"আমার প্রকাশ তুমি করহ তথায়।
ত্রিভঙ্গ ললিতরূপ শ্রীগোবিন্দ রায়।"

যথাকালে মূর্তি নির্মিত হয়। রসিকানন্দ তাঁর তিন পুত্রের মধ্যে রাধানন্দের হস্তে গোপীবল্লভপুর শ্রীপাট অর্পণ করেন। বর্তমানে প্রভু শ্যামানন্দ সেবিত শ্রীশ্যাম রায় এই পাটে আছেন। তথায় শ্যামানন্দ পঠিত ভাগবত, শ্যামানন্দ ব্যবহৃত কন্থা ও আসন প্রভৃতি রক্ষিত আছে।

৪। **গড়বেতা** : এখানে নিত্যানন্দ পার্ষদ সদাশিব কবিরাজের পৌত্র ও পুরুষোত্তম পণ্ডিতের পুত্র ঠাকুর কানাই বোধখানা থেকে সন্ন্যাসীবেশে এখানে আসেন। সঙ্গে ছিল ৬/৭টি শালগ্রাম মূর্তি। একদিন তিনি শিলাবতী নদীতে স্নান করতে নামলে তাঁর পায়ে মৃতদেহ ঠেকে। তিনি জীবনদান করেন। খবর পেয়ে পিতামাতা যান কিন্তু সে না ফিরে কানাই ঠাকুরের সেবক হয়। কানাই ঠাকুর একবার রাস পূর্ণিমায় মহোৎসব করেন। আগত বৈষ্ণবগণ অসময়ে আম কাঁঠাল খেতে চাইলে তিনি অলৌকিকভাবে সংগ্রহ করে ভোজন করান। শ্রীপাটে এখনও শিলাগুলি আছে।

৫। **দণ্ডেশ্বর** : সুবর্ণরেখা নদীর তীরে ধারেন্দার নিকটবর্তী গ্রাম। ভক্তিগ্রন্থ নিয়ে গৌড়দেশ আগমনকালে শ্যামানন্দ দণ্ডেশ্বর গ্রামে আসেন। গৃহত্যাগকালে প্রভু শ্যামানন্দ গঙ্গাস্নান যাত্রীদের সঙ্গে দণ্ডেশ্বর হতে অম্বিকাকালনা আসেন।

৬। **ধারেন্দা বাহাদুরপুর** : খড়গপুর হতে বাসে কলাইকুণ্ডা। সেখান হতে ৪ মাইল দূরে ধারেন্দা বাহাদুরপুর। শ্যামানন্দের জন্মভূমি। শ্যামানন্দ ও তাঁর শিষ্যবর্গের লীলাভূমি। শ্যামানন্দের আদেশে রসিকানন্দ প্রেম প্রচারে এসে চার মাস ধারেন্দার রসময়ের গৃহে থেকে অনেককে বৈষ্ণব করেন। সেখানে প্রভু শ্যামানন্দের সেবিত শ্রীশ্যামারায়ের সেবা আছে।

৭। **নারায়ণগড়** : কাশীয়াড়ী হতে ১৫ মাইল দূরে নারায়ণগড়। মহাপ্রভু নীলাচল যাওয়াব পথে নারায়ণগড়ে পদার্পণ করেন। সঙ্গে ছিলেন গোবিন্দ কর্মকার।

"নারায়ণগড় পানে চল মোরা যাই।
সেইখানে গেলে যদি কোন সুখ পাই ॥" (কড়চা)

সন্ধ্যায় সেখানে পৌঁছে গ্রাম্যদেবতা ধনেশ্বর শিবকে দেখে প্রভুর চোখে অশ্রুধারা।

"হর হর বলি প্রভু উচ্চারণ করি।
আছাড় খাইয়া পড়ে ধরণী উপরি।
প্রেমে গদগদ হয়ে গড়াগড়ি যায়।
বসন করঙ্গ গিয়া পড়িল কোথায়।" (ঐ)

বহুলোক প্রভুর দর্শনে কৃষ্ণপ্রেমে উদ্বুদ্ধ হল।

৮। **নৃসিংহপুর** : শ্যামানন্দের লীলাভূমি। এখানে শ্যামানন্দের শিষ্য উদ্দন্ড রায়ের শ্রীপাট। তিনি প্রথমে বৈষ্ণব বিদ্বেষী ও মহাদস্যু ছিলেন। পরে শ্যামানন্দের কৃপা প্রভাবে পরম বৈষ্ণব হন।

৯। **নৈহাটী** : মেদিনীপুর জেলায়। শ্যামানন্দের লীলাভূমি।

১০। **পাকম্যালাটি** : মেদিনীপুরের 'জাড়া' গ্রামের নিকট। এখানে অভিরামের শিষ্য শ্রীগুলফ্যা নারায়ণের শ্রীপাট।

১১। **বানপুর** : মেদিনীপুর জেলায়। এটি শ্যামানন্দের লীলাভূমি। রসিকানন্দ রাজা বৈদ্যনাথ রাজার বাড়িতে থেকে দুষ্ট যবন রাজা আহম্মদ বেগ সুবাকে কৃপা করেন। রাধানগর

গ্রামে যবন অত্যাচারের কাহিনী শুনে শ্যামানন্দ রসিকানন্দকে সুবার নিকট যেতে আদেশ করেন এবং তাঁর সঙ্গে দিলেন বংশীদাসকে। রসিকানন্দ সপার্ষদে বাণপুরে বৈদ্যনাথ রাজার বাড়িতে অবস্থান করে ঐশ্বর্য প্রকাশ করতে লাগলেন। লক্ষ লক্ষ লোক দর্শনে আসতে লাগল এবং লক্ষ লক্ষ হিন্দু মুসলমান তাঁর শিষ্য হতে লাগল। সুবা যবনগণের কাছে এ সংবাদ শুনে তাঁকে নিয়ে আসতে বললেন। তিনি হিন্দুকে শিষ্য করতে পারেন কিন্তু মুসলমানকে শিষ্য করেন কোন্ অধিকারে? তিনি লোক মারফত বলে পাঠালেন, 'তিনি কিছু কেরামতি দেখতে চান।' সে সময় মত্ত হস্তীর অত্যাচারে জনপদ এমন কি সুবা পর্যন্ত সন্ত্রস্ত। সুবা বললেন, 'রসিক যদি মত্ত হস্তীকে নাম দিতে পারেন তবে তাকে নারায়ণ বলে মানব।' কিন্তু তাই ঘটল। রসিকানন্দ পার্ষদগণের নিষেধসত্ত্বেও সুবার ভবনে চললেন। রসিকানন্দ স্বপ্রভাবে হস্তীর ভাবান্তর ঘটিয়ে হরিনাম প্রদান করে "গোপালদাস" নাম রাখলেন। এই অলৌকিক কার্যের সংবাদ শুনে সুবা ঘটনাস্থলে উপনীত হলেন এবং রসিকানন্দের চরণে লুণ্ঠিত হলেন।

১২। **বড়কোলা** : মেদিনীপুর জেলায়। প্রভু শ্যামানন্দের লীলাভূমি। তিনি এখানে দোলযাত্রা উপলক্ষ্যে মহোৎসব করেন। এই উৎসবে মেদিনীপুরের সুবা আসেন। এখানে বিশ্বনাথ ভুঞাকে শিষ্য করে তাঁর নাম রাখেন শ্যাম মনোহর। শ্যাম মনোহর সর্বস্ব ত্যাগ করে প্রেম প্রচারে আত্মনিয়োগ করেন।

১৩। **বলরামপুর** : খড়গপুর থানায়। রসিকানন্দের লীলাভূমি। একদিন বিশজন বৈষ্ণব তাঁর গৃহে আসেন। রসিকানন্দ তাঁদের রন্ধনসামগ্রী দিয়ে ঘৃতের সন্ধানে বের হয়ে অন্ধকারে পথ ভুলে এক ধনী যবনগৃহে প্রবেশ করেন। তখন যবন সস্ত্রীক পালঙ্কের উপর উপবিষ্ট। রসিককে দেখে প্রচণ্ড প্রহার। এতে রসিকানন্দ সহাস্যে বললেন, 'আপনি আমাকে মারছেন কেন? আমার কোন দোষ নাই। আমার কঠোর অঙ্গে আঘাতে আপনার কোমল অঙ্গই ব্যথিত হবে।' এই কথা শুনে যবন চরণে পড়ল। অন্যস্থান হতে ঘৃত সংগ্রহ করে বৈষ্ণবদের দিলেন। এদিকে দু-তিন দিন পরেই যবনের হাতী, ঘোড়া, সম্পদ নষ্ট হল এবং পত্নী বিয়োগও ঘটল। তখন আতঙ্কে যবন রসিকানন্দের চরণে আশ্রয় নিলেন। রসিকের কৃপা প্রভাবে যবন পরম বৈষ্ণব হল এবং পুনরায় সব ফিরে পেল।

১৪। **বড় বলরামপুর** : প্রভু শ্যামানন্দের লীলাভূমি। তিনি আলমগঞ্জের উৎসব শেষ করে ধারেন্দায় এলে রসময়, বংশী, ভীম প্রভৃতি শিষ্যগণ বললেন, 'আপনি সারা জীবন তীর্থ ভ্রমণ করে বেড়ালেন। এখন সংসার করুন। তাঁদের অনুরোধে তিনি দারপরিগ্রহ করে বড়বলরামপুরে আসেন। রসিকমঙ্গলে :—

"তথায় আছেন জগন্নাথ ভাগ্যবান। / তার কন্যা শ্যামানন্দে করিল প্রদান।
নাম শ্যামপ্রিয়া অতি বড় সুরূপিণী।/ রূপেগুণে লক্ষ্মীঅংশে ভুবনমোহিনী।

১৫। **বসন্তপুর** : প্রভু রসিকানন্দ ধারেন্দা হতে বড়কোলা গ্রামে গমনপথে বসন্তপুরে আসেন। তথায় মাধব, হরিদাস ও মদনমোহন নামক প্রভু শ্যামানন্দের তিনজন শিষ্য অবস্থান করতেন। রসিকানন্দ তাদের ভবনে ২/৩ দিন থেকে বহু শিষ্য করেন।

১৬। **মথুরাগ্রাম** : প্রভু শ্যামানন্দ শিষ্য রসিকানন্দকে নিয়ে ঝাটিয়াড়া হতে মথুরাগ্রামে প্রবেশ করেন। সেখানে ভীমধন নামক এক ব্যক্তিকে কৃপা করেন। শ্যামানন্দ পত্নীও সেখান যান।

১৭। **রাধানগর** : প্রভু শ্যামানন্দের লীলাভূমি। তিনি বিবাহান্তে সস্ত্রীক কিছুদিন রাধানগরে বাস করেন।

১৮। **রোহিনী** : গোপীবল্লভপুর থানায়। শ্যামানন্দ শিষ্য রসিকানন্দের শ্রীপাট।

"রুহিনী নিকটে বিরাজিত মহাস্থান।

যাতে সীতারামলক্ষ্মণ করিলা বিশ্রাম ॥"

এই রোহিনীনগরের রাজা অচ্যুত

১৯। রাজগড় : প্রভু রসিকানন্দের লীলাভূমি। প্রভু শ্যামানন্দ রসিকানন্দকে প্রেমদান করার আদেশ দিলে রসিকানন্দ প্রথমে রাজগড়ে আসেন এবং প্রেমধর্ম প্রচার করেন।

২০। শ্রীজংহ : মেদিনীপুর জেলায়। এখানে রসিকানন্দের শিষ্য শ্রীরামদাস ও তৎপুত্র দীন শ্যামদাসের শ্রীপাট।

২১। শ্যামানন্দপুর : মেদিনীপুর জেলায় প্রভু শ্যামানন্দের লীলাভূমি। শ্যামানন্দ স্বীয় অভীষ্টদেব হৃদয়ানন্দ ঠাকুরের অন্তর্ধান, বাক্য শুনে শ্যামানন্দপুরে ফাল্গুন মাসে মহোৎসব করেন।

২২। হিজলী : খড়গপুর ও জলেশ্বরের মধ্যবর্তী স্টেশন। এখানে রসিকানন্দের পত্নী ইচ্ছাদেবীর জন্মভূমি। হিজলীর অধিপতি বলভদ্র দাসের কন্যাকে রসিকানন্দ বিবাহ করেন।

২৩। বগড়ী : পাঁশকুড়া ঘাটাল বগড়ী বাস চলে। অভিরাম গোপালের লীলাভূমি। বিষ্ণুপুর হতে এখানে এসে কৃষ্ণরায়কে প্রণাম করলে তার সর্বাঙ্গে রক্ত পড়তে থাকে। বিগ্রহ এতে অভিরামকে বললেন—তুমি এরূপ করলে কেন? অভিরাম বললেন—এ রক্ত নয়, ঘাম ঝরছে। এর দ্বারা তোমার মহিমা বর্ধিত হল। তারপরে অভিরাম পুলিন ভোজন লীলানুক্রমে শ্রীকৃষ্ণ রায়ের সঙ্গে বিহার করতে করতে ভ্রমণ শেষে খানাকুল আসেন। এখানে মালিনীদেবীর সঙ্গে মিলন হয়।

২৪। কেন্দুবুড়ি ঃ এখানে রসিকানন্দের শিষ্য শ্রীগোকুল দাসের শ্রীপাট।

২৫। তমলুক : পাঁশকুড়া থেকে বাসযোগে তমলুক। এখানে গৌরাঙ্গ দেবের কীর্তনীয়া ও পদকর্তা শ্রীমাধব ঘোষের শ্রীপাট। মহাপ্রভু সন্ন্যাস গ্রহণ করে নীলাচল যাতাযাত পথে তমলুকে পদার্পণ করেছিলেন।

"তবে সেই মহাপ্রভু চলি যায় পথে।
তমোলুকে উত্তরিলা মহাপুণ্য ক্ষেত্রে ॥
ব্রহ্মকুণ্ডে স্নান, দেখি শ্রীমধুসূদন।
প্রেমায় অবশ প্রভু আনন্দিত মন ॥

তমলুক শহরে অদ্যাপি শ্রীমাধব ঘোষের দেবালয় বিদ্যমান।

২৬। পিছলদা : মহাপ্রভু সন্ন্যাস গ্রহণের পর নীলাচলে বর্ষপঞ্চক যাপনের পর শ্রীবৃন্দাবন যাওয়ার অভিপ্রায়ে বিজয়া দশমীর দিন গৌড়ের পথে যাত্রা করেন। তৎকালে উৎকল দেশ হতে বৃন্দাবন গমনের পথ সুগম ছিল না অথচ অধিকাংশ দেশ হিংস্র জন্তু ও দস্যুতস্করে পরিব্যাপ্ত ছিল। মহাপ্রভু জননী ও জাহ্নবীকে দর্শনান্তে বৃন্দাবন গমনের অভিপ্রায়ে বালেশ্বরের নিকটবর্তী রেমুণা হতে রায় রামানন্দকে বিদায় দিয়ে ওড়িশা প্রদেশের সীমায় উপস্থিত হলেন। তৎপরবর্তী স্থানগুলি যবন রাজার করতলগত ছিল। যবনরাজের অধিকারের সীমা ছিল পিছলদা পর্যন্ত। সেই যবনের এক বিশ্বাসী ওড়িয়া মহাপাত্রের সঙ্গে সন্ধিবন্ধন করে ওড়িশ্যার তৎকালিক সীমায় অবস্থিত মহাপ্রভুর গণের নিকট যবনরাজকে আনা হলে সে মহাপ্রভুর কৃপালাভ করে এবং একটি মনোহর গৃহ-সমন্বিত সগণ মহাপ্রভুকে স্থাপন করে দশ নৌকায় অসংখ্য সৈন্য পূর্ণ করে জলদস্যু-সঙ্কুল মন্ত্রেশ্বর নদ উত্তীর্ণ করে দিল। অতঃপর তার অধিকারের সীমান্ত পিছলদা পর্যন্ত এসে বিদায় গ্রহণ করল। অনন্তর মহাপ্রভু পার্ষদগণের সঙ্গে গঙ্গাতীরে গমনার্থ সমুদ্রের সঙ্গে গঙ্গার মিলনক্ষেত্র শতমুখী নামক স্থানে এসে নৌকাযোগে পাণিহাটস্থ রাঘব ভবনে উপস্থিত হলেন।

মেদিনীপুর জেলার অন্তর্গত তমলুক মহকুমার নন্দীগ্রাম থানার পশ্চিম সীমায় পিছলদা

নামে একটি গ্রাম আছে। এই পিছলদাই মহাপ্রভুর চরণস্পর্শে ধন্য হয়েছিল বলে বৈষ্ণবগণের অধিকাংশের ধারণা। এখানে বর্তমানে গৌড়ীয় মঠ প্রতিষ্ঠিত হয়েছে এর স্মরণে।

বীরভূম জেলার বৈষ্ণবতীর্থ

১। **একচক্রা** : রামপুরহাট স্টেশন হতে ৪/৫ কি.মি. দূরে। প্রভু নিত্যানন্দের পুণ্যজন্মভূমি। একচক্রা গ্রামে গৌড়েশ্বর শঙ্কর মন্দির আছে। একচক্রাধামই বীরচন্দ্রপুর নামে প্রসিদ্ধ। আর নিত্যানন্দ জন্মভূমি গর্ভবাস নামে খ্যাত। এখান হতে পাঁচ মাইল দূরে নিত্যানন্দ প্রভুর কুণ্ডলীদলন লীলাভূমি কুণ্ডলীতলা।

'একচক্রা গ্রাম নাম বহুকাল হৈতে।
বনবাসে পাণ্ডবাদি ছিলেন এথাতে ॥
এ দেশে ছিল দুষ্ট রাক্ষস অসুর।
সে সভে পাণ্ডব পাঠাইলা যমপুর' ॥

১৩৯৫ শকাব্দে নিত্যানন্দ প্রভু জন্মগ্রহণ করেন। পিতা হাড়াই পণ্ডিতও মাতা পদ্মাবতী। হাড়াই পণ্ডিতের সাত পুত্র মধ্যে নিত্যানন্দ জ্যেষ্ঠ।

নিত্যানন্দ-পত্নী জাহ্নবা দেবী বৃন্দাবন গমনকালে একচক্রাগ্রাম দর্শনে গিয়েছিলেন। নিত্যানন্দ তনয় বীরচন্দ্র মালদহ হতে পিতৃ জন্মস্থান দর্শনে আসেন এবং শ্রীবঙ্কিমদেব বিগ্রহ দর্শন করেন। তিনি এই স্থানের নাম রাখেন বাঁকারায় বীরচন্দ্রপুর। এখানে সূতিকাগৃহ, ষষ্ঠীপূজার স্থান, পদ্মা-নামক পুষ্করিণী, মালাতলা, সন্ন্যাসীতলা, বিশ্বরূপতলা, সিদ্ধবকুল, হাঁটুগাড়া প্রভৃতি দর্শনীয় স্থান আছে। (নিত্যানন্দ জীবনী দ্রষ্টব্য)।

২। **বীরচন্দ্রপুর** : নিত্যানন্দ প্রভুর জন্মস্থানের সন্নিকট। নিত্যানন্দসেবিত শ্রীবঙ্কিমদেব সেখানে পূজিত। বীরচন্দ্র মালদহ থেকে পিতৃজন্মভূমি দর্শনে এসে শ্রীবঙ্কিমদেবকে দর্শন করেন। এখানে একদিন উপবাস করে পরদিন মহোৎসব করেন। স্বহস্তে বঙ্কিমদেবকে ভোজন করিয়ে ভক্তগণকে পরিবেশন করেন। তারপর এই স্থানের নাম বীরচন্দ্রপুর রাখেন।

"এইমত মহোৎসব করিয়া সম্পন্ন।
আত্মবর্গ মিলিয়া পাইল প্রসাদান্ন ॥
সেই গ্রামে তিন দিন করিয়া বিশ্রাম।
বীরচন্দ্রপুর বলি খুইলা তার নাম ॥"

৩। **কুণ্ডলীতলা** : সাঁইথিয়া স্টেশন হতে ৫ কি.মি দূরে। নিত্যানন্দ প্রভু অবধূতশ্রমে ভ্রমণ করতে করতে জন্মভূমি দর্শনে আসেন। এখানে এসে দেখেন গ্রামবাসী সর্পভয়ে পলায়ন করছে। তা দেখে নিত্যানন্দ "কোথা সর্প প্রভু করেন দৃষ্টিপাত। সর্প তথায় এলে

"প্রভু তার ফণা ধরিলেন নিজ করে।
অস্পষ্ট করিয়া কিবা মন্ত্র দিলা তারে।
চরণে পড়িয়া সর্প গর্তে প্রবেশিল।
কর্ণের কুণ্ডল দিয়া দ্বার রুদ্ধ কৈল ॥" (নিত্যানন্দ বংশ বিস্তার)।

তারপর গ্রামবাসীগণ গ্রামে ফিরে এল।

৪। **জলুন্দী** : বোলপুর স্টেশনে নেমে পালিতপুরগামী বাসে বেঙচাতরায় নেমে দু কি.মি দূরে। এখানে দ্বাদশ গোপালের অন্যতম ধনঞ্জয় গোপালের শ্রীপাট। শ্রীনিত্যানন্দ পাণিহাটিতে দণ্ডমহোৎসবের সময় ধনঞ্জয় পণ্ডিতকে শালগ্রাম শিলা প্রদান করেন। ধনঞ্জয় পণ্ডিত জলুন্দীতে রাধাবিনোদ সেবা স্থাপন করেন এবং পুত্র যদুচৈতন্য ঠাকুরকে শিলাসেবা অর্পণ করেন। পরে

এই শালগ্রাম শিলা শ্রীস্বরূপ চাঁদ ঠাকুর পুরুলিয়ার বেগুন কেদারে নিয়ে যান। এখন সেখানেই সেবিত হচ্ছেন।

• **৫। মঙ্গলডিহি** : বোলপুর-সিউড়ি বাসে পাড়ই-এ নেমে ৩/৪ কি. মি। দ্বাদশ গোপালের অন্যতম সুন্দরানন্দের শিষ্য শ্রীপানুয়া গোপালের শ্রীপাট। তাঁর সেবিত শ্যামচাঁদ বিগ্রহ।

"গ্রামের নৈঋতে, পর্ণলতা গাড়ি বাড়ই আনিয়া সোঁপে।
পনের দিবসে বরজ হইল, দেখি সর্বলোক কাঁপে ॥
সেই বরজের এক বোঝা করি পান নিতি নিতি লঞা।
সেবার কারণে ঠাকুর গোপাল বিদেশে বেচেন যাঞা ॥
সেইদিন হতে, পানুয়া নামটি লোকেতে বলে।
শ্যামচাঁদ তাঁর বোঝাটি বহেন, তেঞি আলগোছে চলে ॥"

বাঁকুড়া জেলায় বৈষ্ণবতীর্থ

১। দেউলি : বনবিষ্ণুপুরের অন্তর্গত দ্বারকেশ্বর নদীর দক্ষিণতীরে অবস্থিত। শ্রীনিবাস আচার্যের শিষ্য শ্রীকৃষ্ণবল্লভের শ্রীপাট। শ্রীনিবাস আচার্য নরোত্তম শ্যামানন্দ সহ ব্রজধাম হতে বৈষ্ণব গ্রন্থ নিয়ে গৌড়যাত্রাপথে বনবিষ্ণুপুরে পৌঁছিলে রাজা বীরহাম্বীরের দস্যু অনুচরগণ ঐ গ্রন্থসমূহ অপহরণ করে। আচার্য অতিশয় ব্যাকুল হয়ে দশ দিন ধরে বিভিন্ন জায়গায় অন্বেষণ করেন। একদিন অবসন্ন হয়ে এক বৃক্ষতলে উববিষ্ট আছেন সেই সময় এক ব্রাহ্মণ কুমারের সঙ্গে তাঁর সাক্ষাৎ হয়। আচার্য তাঁর পরিচয় জানতে চাইলে—

"দেউলি বলিয়া গ্রাম অতিদূর নয়।
নদীপারে অর্ধক্রোশ মোর বাস হয় ॥

আমার নাম কৃষ্ণবল্লভ। কৃষ্ণবল্লভ রাজকর্মচারী ছিলেন। আচার্য তাঁর মুখে গ্রন্থের সন্ধান পেয়ে তাঁর আহ্বানে তাঁর ভবনে যান। শ্রীনিবাস আচার্য কৃষ্ণবল্লভকে শিষ্যত্বে বরণ করেন এবং তাঁর বাড়িতে অবস্থান করে ভক্তিগ্রন্থ উদ্ধার করেন।

২। বিষ্ণুপুর : শ্রীনিবাস আচার্যের লীলাভূমি। শ্রীনিবাস, নরোত্তম ও শ্যামানন্দ বৃন্দাবন হতে বৈষ্ণব গ্রন্থ গৌড়ে আনার পথে বনবিষ্ণুপুরে রাজা বীরহাম্বীরের অনুচরগণ অপহরণ করে। শ্রীনিবাস আচার্যের প্রভাবে বীর হাম্বীর পরম বৈষ্ণবে পরিণত হন। তিনি আচার্যের বসবাসের জন্য অর্ধেক ভবন অর্পণ করেন। অদ্যাবধি সেখানকার গোস্বামী পাড়ায় শ্রীনিবাস আচার্য সেবিত শ্রীবংশীবদন শিলা ও শ্রীরাধামাধব বিগ্রহ বিরাজিত। বীরহাম্বীর স্বপ্নাদিষ্ট হয়ে শ্রীকালাচাঁদ বিগ্রহের প্রকাশ করেন। রাজা নিঃসন্তান থাকায় শ্রীনিবাস আচার্য রাজার পুত্রপ্রাপ্তির জন্য ঠাকুর অভিরামকে অনুরোধ করেন। অভিরাম রাজার সাতজন রাণীর সমীপে মিষ্টান্ন ভোজন করে পুত্র বর দেন। ছোট রাণী অভিরামের পছন্দমত খাদ্য দিয়েছিলেন ; তাই ছোট রাণীর গর্ভে 'ধাড়ীহাম্বীর' নামে এক পুত্র জন্মগ্রহণ করেন। এখানকার রাসমঞ্চ, রাধামাধব মন্দির প্রভৃতি অপূর্ব কারুকার্যের নিদর্শন। সত্যই, বিষ্ণুপুর শিল্প, সাহিত্য ও সঙ্গীতের ত্রিবেণী সঙ্গম।

৩। মহিমামুড়ি : শ্রীঅভিরাম গোপালের শিষ্য শ্রীসত্যরাঘবের শ্রীপাট।

মালদহ জেলায় বৈষ্ণবতীর্থ

১। জঙ্গলীকোটা : মালদহ হতে ছয় মাইল দূরে জঙ্গলীকোটা শ্রীপাট। অদ্বৈত আচার্যের পত্নী সীতা ঠাকুরানীর শিষ্য যোগেশ্বর পণ্ডিত স্ত্রীবেশ ধারণ করেন। তখন তিনি জঙ্গলী

নামে খ্যাত হন। তিনি শান্তিপুরে কিছুদিন থাকার পর জঙ্গলে গিয়ে চৈতন্যনাম জপ করতে থাকেন। স্ত্রীবেশে জঙ্গলীকে দেখে গ্রামবাসীসহ বাদশাহ স্ত্রীলোক এনে বসন উন্মোচন করে দেখেন তিনি ঋতুমতী। পরে তৎক্ষণাৎ পুরুষ হয়ে যান। বাদশাহ তাঁর মাহাত্ম্যে মুগ্ধ হয়ে সেই গ্রাম তাঁকে দান করে জঙ্গল কেটে রাজপুরী নির্মাণ করে দেন। নাম হয় জঙ্গলীকোটা।

২। **রামকেলী** : মালদহের ৮ কি. মি. দূরে রামকেলী গ্রাম। রামকেলী রূপ-সনাতন বল্লভ শ্রীজীব কেশবছত্রী ও তৎপুত্র দুর্লভ ছত্রীর শ্রীপাট। রূপ-সনাতনবল্লভ গৌড়রাজ হোসেন শাহের অমাত্য ছিলেন এবং রামকেলীতে বাস করতেন। একদিন স্বপ্নে সনাতন দেখলেন এক ব্রাহ্মণ তাঁকে একখানা শ্রীমদ্ভাগবত অর্পণ করেন। পরদিন প্রাতে সেই বিপ্র সাক্ষাতে এসে শ্রীমদ্ভাগবত অর্পণ করলেন। তখন থেকে সনাতনের ভাবোচ্ছ্বাস ঘটল।

'তদবধি সনাতন প্রেমযুক্ত মন। /শাস্ত্রচর্চা আরম্ভিল করিয়া যতন। মদন মোহন বিগ্রহ করয়ে সেবন। /হেরিতে গৌরাঙ্গলীলা উৎকণ্ঠিত মন ॥' (ভ. ব.) এমন সময় সপার্ষদ শ্রীগৌরাঙ্গ রামকেলীতে উপস্থিত হলে রূপও সনাতন হিন্দুবেশে তাঁর নিকট উপস্থিত হয়ে অন্তরের অভিপ্রায় নিবেদন করলেন। প্রভু কৃপা ইঙ্গিত করলেন। কিছুদিন বাদে রূপ ও বল্লভ প্রভুর সঙ্গে মিলিত হলেন কিন্তু বাদশাহ সনাতনকে ছাড়লেন না। কারারুদ্ধ করে রাখলেন। বাদশাহ বিদেশ অভিযানে গেলে সনাতন প্রচুর উৎকোচ দিয়ে কারামুক্ত হয়ে মহাপ্রভুর নিকট পৌঁছিলেন। পরে বয়ঃপ্রাপ্ত হলে শ্রীজীবও রাজধানী ত্যাগ করে চলে যান। অদ্যাপি তাঁদের বহু কীর্তি রামকেলী গ্রামে বিদ্যমান।

৩। **মালদহ** : মালদহে নিত্যানন্দপুত্র বীরভদ্রের লীলাভূমি। গৌড়ের সুলতান হোসেন শাহের অমাত্য শ্রীকেশব ছত্রীর পুত্র দুর্লভ ছত্রীকে কৃপা করার জন্য বীরচন্দ্র এক অলৌকিক লীলা প্রকাশ করেন। বীরচন্দ্র ঢাকার নবাবকে উদ্ধার করে সপার্ষদ মহানন্দা তীরে মালদহ গ্রামে আসেন। সেখানে এক ভাগ্যবন্তের গৃহে অবস্থান করে মহাসংকীর্তন করেন। কীর্তন কালে আকাশ মেঘাবৃত হলে তিনি স্বপ্রভাবে নিবারণ করেন। সেই সময় দুর্লভ ছত্রী স্বপ্নাবিষ্ট হয়ে হস্তী গজ সৈন্যসহ প্রভুর দর্শনে আসেন। প্রভুর আদেশ নিয়ে দুর্লভ ছত্রী সেখানে মহা-মহোৎসবের আয়োজন করেন। দুর্লভ ছত্রী সবংশে প্রভুর ভুক্তাবশেষ গ্রহণ করেন। দুর্লভ ছত্রী প্রভুকে কীর্তনস্থল দান করেন।

প্রভু বীরচন্দ্রের মধ্যমপুত্র শ্রীরামকৃষ্ণ শ্রীপাট মালদহে অবস্থান করেন। এই মালদহে ঠাকুর অভিরামের শিষ্য মুরারী দাসের শ্রীপাট।

হাওড়া জেলায় বৈষ্ণবতীর্থ

১। **সোনাতলা** : হাওড়া হতে আমতা। সেখানে গাড়ি করে সোনাতলা যাওয়া যায়। এখানে শ্রীঅভিরাম গোপালের শিষ্য শ্রীকৃষ্ণদাসের শ্রীপাট। অভিবাম গোস্বামীর শিষ্য শ্রীমুকুন্দ পণ্ডিতেরও শ্রীপাট। তিনি শ্রীগুরুর আদেশে সোনাতলা গ্রামে শ্রীশ্যামরায় সেবা স্থাপন করেন।

২। **পিছলদা** : হাওড়া জেলার দক্ষিণাংশে শ্যামপুর থানায় রূপনারায়ণ নদীর তীরে পিছলদা নামে একটি ক্ষুদ্র গ্রাম আছে। কেহ কেহ এই পিছলদাকে মহাপ্রভুর চরণস্পর্শে ধন্য বলে মনে করেন।

ওড়িশার বৈষ্ণবতীর্থ

১। **পুরী** : নীলাচল নিবাসায় নিত্যায় পরমাত্মনে।
বলভদ্র সুভদ্রাভ্যাং জগন্নাথায় তে নম ঃ ॥

শ্রীজগন্নাথ মন্দির প্রাচীন ভারতীয় সংস্কৃতি, ধর্ম, দর্শন, অধ্যাত্ম ও প্রজ্ঞার পুরাতন এক চিরোজ্জ্বল স্মৃতিস্তম্ভ। মহাপ্রভু অষ্টাদশ বর্ষ পুরীধামে রাজগুরু কাশীমিশ্রের গৃহে অবস্থান করেছিলেন। মহাপ্রভু সন্ন্যাস গ্রহণ করে মাতার আদেশ গ্রহণ করে নীলাচল আসেন এবং ভাবাবেশে সার্বভৌম ভট্টাচার্যসহ মিলন ঘটলে প্রভু তাঁর ভবনে অবস্থান করে তাঁকে ভক্তিপথে আনয়ন করে বিভিন্ন লীলা প্রকাশ করেন। এগুলির মধ্যে উল্লেখযোগ্য রাজা প্রতাপ রুদ্রের গৌরকৃপাপ্রাপ্তি, সার্বভৌম গৃহে ভোজন বিলাস, গোপীনাথের জীবন রক্ষা, রথাগ্রে কীর্তন বিলাস, গুণ্ডিচামার্জন, হরিদাস ঠাকুরের মহিমা জ্ঞাপন, ছোট হরিদাস বর্জন, গৌড়ীয় বৈষ্ণবসহ চাতুর্মাস্য পালন, নরেন্দ্র সরোবরে জলকেলি, পরিমুণ্ডা নৃত্য, জালিয়াকে প্রেমদান, টোটা গোপীনাথে গদাধরসহ লীলা, শ্রীমহাপ্রভুর অন্তর্ধান প্রভৃতি।

২। **গম্ভীরা** : সার্বভৌম ভট্টাচার্য মহাপ্রভুর অবস্থানের জন্য নির্জন কক্ষ রূপে কাশী মিশ্রের গৃহ পছন্দ করলে—

"কাশী মিশ্র কহে আমি বড় ভাগ্যবান।
মোর গৃহে প্রভুপাদের হৈব অধিষ্ঠান ॥

এই গৃহে মহাপ্রভু অষ্টাদশ বৎসর যাপন করেন। এর মধ্যে দ্বাদশ বৎসর

"শেষ যে রহিল প্রভুর দ্বাদশ বৎসর
কৃষ্ণের বিয়োগ স্ফূর্তি হয় নিরন্তর ॥"

এখানে শ্রীচৈতন্য ব্যবহৃত কমণ্ডুল, কাষ্ঠ পাদুকা এবং কাঁথা প্রভৃতি সুরক্ষিত আছে। সব সময় নাম কীর্তন হয়।

৩। **শ্রীসার্বভৌম আলয়** : নীলাচল এসে ভাবাবেগে জগন্নাথদেবের শ্রীমন্দিরে মূর্চ্ছিত হলে সার্বভৌম নিজে গৃহে আনয়ন করেন। সপ্তাহব্যাপী তাঁর নিকট বেদান্ত শ্রবণ শেষে ঐশ্বর্য প্রকাশ করে সার্বভৌমকে ভক্তি পথে আনয়ন করেন।

৪। **টোটা গোপীনাথ** : শ্রীগদাধর পণ্ডিত যমেশ্বর টোটায় শ্রীগোপীনাথদেবের সেবা স্থাপন করেন। এই স্থানে মহাপ্রভু কর্তৃক গদাধর মুখে ভগবত শ্রবণ, নিত্যানন্দের ভোজন বিলাস, গদাধর কর্তৃক লিখিত গীতাগ্রন্থে প্রভুর স্বহস্তে একটি শ্লোক লিখন, প্রভুর গোপীনাথ দেহে অন্তর্ধান প্রভৃতি অপ্রাকৃত প্রেমলীলা অনুষ্ঠিত হয়েছিল।

৫। **হরিদাস ঠাকুরের স্থান** : হরিদাস ঠাকুর নীলাচল এসে মহাপ্রভুকে বললেন----

"হরিদাস কহে আমি নীচজাতি ছার।
মন্দির নিকট যাইতে মোর নাহি অধিকার।
নিভৃতে টোটা মধ্যে স্থান যদি পাঙ।
তাঁহা পড়ি রহো একলে কাল গোয়াঙ ॥"

তখন মহাপ্রভু গোপীনাথের নিকট নির্জন স্থানটি চেয়ে নিয়ে হরিদাসকে দেন এবং হরিদাসকে বলেন—

"এই স্থানে রহ কর নাম সংকীর্তন।
প্রতিদিন আসি আমি করিব মিলন।"

হরিদাসের অন্তিম ইচ্ছা

"জিহ্বায় উচ্চারিব তোমার কৃষ্ণচৈতন্য নাম।
এইমত মোর ইচ্ছা ছাড়িব পরাণ ॥"

হরিদাসের ইচ্ছা পূরণ হয়েছিল। শ্রীচৈতন্য নিজ স্কন্ধে নিয়ে সমুদ্রতীরে বালুকার্পণ

করলেন এবং ভিক্ষাব্রতী হয়ে হরিদাস ঠাকুরের বিরহ উৎসব পালন করেন। সেই সমাধি মঠ অদ্যাপি বিদ্যমান।

৬। **শ্রীগুণ্ডিচা মন্দির** : রাজা ইন্দ্রদ্যুম্ন পত্নী রাণী গুণ্ডিচার নামে এই মন্দির। একে মাসীর বাড়িও বলে। রথযাত্রার সময় জগন্নাথ নন্দীঘোষ নামক রথে, বলরাম তালধ্বজ নামক রথে এবং সুভদ্রা দেবদলন নামক রথে আরোহণ করে গুণ্ডিচা বাড়িতে আসেন। এখানে সাতদিন অবস্থান করে পুনরায় মূল মন্দিরে প্রত্যাগমন করেন।

৭। **আলালনাথ** : পুরী হতে প্রায় ১৪ মাইল পশ্চিমে আলালনাথ। এখানে চতুর্ভুজ বাসুদেব বিগ্রহ বিরাজমান। একটি বৃহৎ প্রস্তরখণ্ডে মহাপ্রভুর ষাষ্টাঙ্গ প্রণামের চিহ্ন বর্তমান। দক্ষিণ ভ্রমণ শেষে এখানে প্রত্যাবর্তনের পর

"আলালনাথে আসি কৃষ্ণদাসে পাঠাইল।
নিত্যানন্দ আদি নিজগণ বোলাইল ॥ (চৈ. চ.)

৮। **ভুবনেশ্বর** : সন্ন্যাস গ্রহণের পর মহাপ্রভু নীলাচলে আগমনকালে সাক্ষীগোপাল হতে ভুবনেশ্বরে আসেন।

"তবে প্রভু আইলেন ভুবনেশ্বর। / গুপ্তকাশী বাস যথা করেন শংকর ॥
সর্বতীর্থ জল যথা বিন্দু বিন্দু আনি।/ বিন্দু সরোবর শিব সৃজিলা আপনি ॥
শিবপ্রিয় সরোবর জানি শ্রীচৈতন্য। / স্নান করি বিশেষে করিলা অতিধন্য ॥"

শ্রীমন্মাহাপ্রভু সপার্ষদে শ্রীভুবনেশ্বর দেবের অর্চনা করে তথায় বিরাজিত সমস্ত দেবালয় দর্শন করেন।

৯। **যাজপুর** : শ্রীচৈতন্য সন্ন্যাস গ্রহণান্তর নীলাচল আসার পথে রেমুণা হতে যাজপুর গমন করেন। তথায় আদিবরাহদেবকে দর্শন করেন। দশাশ্বমেধ ঘাটে স্নান করে আদিবরাহ দর্শন করে পারিষদগণকে ছেড়ে পলায়ন করলে নিত্যানন্দ ব্যাকুল পারিষদগণে সান্ত্বনা দেন। পর দিবস মিলিত হলে সকলে স্বস্তির নিশ্বাস ফেলে।

১০। **কটক** : সন্ন্যাস গ্রহণ করে নীলাচল আসার পথে এবং প্রথমবার বৃন্দাবন যাত্রা পথে সপার্ষদে কটকে পদার্পণ করেন। তিনি সাক্ষী গোপাল দর্শন করেন। কটকে সপার্ষদ বিশ্রাম ও প্রসাদ গ্রহণ করেন।

"কটক আসিয়া কৈল গোপাল দর্শন।
স্বপ্নেশ্বর বিপ্র কৈল প্রভুর নিমন্ত্রণ"
রামানন্দ রায় সবগণ নিমন্ত্রিল।
বাহির উদ্যানে আসি প্রভু বাসা কৈল ॥"

॥ বিহারে বৈষ্ণবতীর্থ ॥

১। **কানাইর নাটশালা** : বিহারের বারহাবোয়া জংশনের তিন স্টেশন বাদে তালঝারি স্টেশন। সেখান হতে দু কি.মি.। শ্রীচৈতন্য গয়াতে পিতৃপিণ্ডদান করে ফিরবার পথে এখানে শ্রীকৃষ্ণদর্শন করেন। আবার যখন প্রথমবার নীলাচল হতে বৃন্দাবন যাত্রা করেন তখনও এখানে আসেন ও সনাতন গোস্বামীর সতর্কবাণী শুনে কানাই-এর নাটশালা হতে নীলাচল ফিরে যান। ফিরবার পথে পুনরায় শান্তিপুরে ওঠেন। কানাই-এর নাটশালার কৃষ্ণবিগ্রহ অতিশয় মনোরম।

২। **গয়া** : বিহারে। পিতৃপিণ্ডদান উপলক্ষ্যে শ্রীচৈতন্য শ্রীচন্দ্রশেখর আচার্যাদি সহ গয়া যান। তখন পৌষমাস।

"ব্রহ্মাকুণ্ডে আসি প্রভু করিলেন স্নান।
যথোচিত কৈলা পিতৃদেবের সম্মান।

তবে আইলেন চক্রবেড়ের ভিতরে।
পাদপদ্ম দেখিবারে চলিলা সত্বরে ॥"

বিষ্ণুপাদপদ্মের মহিমা শুনে মহাপ্রভুর প্রেমোদয় হল। ঈশ্বরপুরী স্বপ্নাদিষ্ট হয়ে সেখানে উপস্থিত হলে শ্রীচৈতন্য তাঁর নিকট দীক্ষা গ্রহণ করেন এবং নদীয়ায় প্রত্যাবর্তন করেন।

উত্তরপ্রদেশে বৈষ্ণবতীর্থ

১। **কাশীধাম** : শ্রীচৈতন্যদেব বৃন্দাবন যাত্রাকালে এবং ফিরবার সময় কাশীধামে অবস্থান করেন। কাশীধামস্থ শ্রীগৌরাঙ্গ পার্ষদগণের মধ্যে শ্রীতপন মিশ্র, তাঁর পুত্র শ্রীরঘুনাথ ভট্ট, চন্দ্রশেখর, পরমানন্দ কীর্তনীয়া, প্রকাশানন্দ সরস্বতী প্রভৃতি প্রধান।

প্রভু যখন বৃন্দাবন যাত্রাকালে কাশীতে অবস্থান করছিলেন, তখন মায়াবাদী প্রকাশানন্দাদি সন্ন্যাসীগণ গৌরাঙ্গ নিন্দায় মুখর। প্রকাশানন্দ প্রকাশ্যে ঘোষণা করলেন, 'গৌরাঙ্গের ভাবকালি কাশীতে চলবে না। 'কাশীতে প্রভু চন্দ্রশেখরের ঘরে বাস ও তপন মিশ্রের গৃহে ভিক্ষা গ্রহণ করতেন। এখানে দশদিন থেকে বৃন্দাবন যাত্রা করেন।

প্রভু শ্রীচৈতন্য বৃন্দাবন হতে নীলাচল ফিরবার পথে দুই মাস কাশীধামে ছিলেন। এই সময়ে মায়াবাদী সন্ন্যাসীদের উদ্ধার করেন। মহারাষ্ট্রী বিপ্রভবনে নিমন্ত্রিত হয়ে সর্বশেষে গিয়ে পদধৌত স্থানে উপবেশন করলে সন্ন্যাসীগণের নেতা প্রকাশানন্দ সরস্বতী প্রভু শ্রীচৈতন্যকে সভামধ্যে বসান এবং বিভিন্ন প্রসঙ্গ উত্থাপন করেন। মহাপ্রভুর আলোচনায় মুগ্ধ হয়ে কাশীপুরের মায়াবাদী সন্ন্যাসীগণ প্রকাশানন্দসহ গৌরপ্রেমে উদ্বুদ্ধ হলেন। সেই সময় সনাতন গোস্বামী প্রভুর সহিত মিলিত হন। দুই মাস প্রভু তাঁকে নিকটে রেখে শক্তিসঞ্চার করতঃ বৈষ্ণব স্মৃতিশাস্ত্রাদি রচনা করবার আদেশ দান করেন। সনাতন অতঃপব বৃন্দাবন এসে মহামূল্যবান বৈষ্ণব গ্রন্থাদি রচনা করেন।

২। **প্রয়াগ** : মহাপ্রভু বৃন্দাবন গমন ও প্রত্যাবর্তন কালে প্রয়াগেও পদার্পণ করেন। যাত্রাকালে প্রয়াগে তিনদিন অবস্থান করে বিন্দুমাধব দর্শন করেন। ফিরবার সময় প্রয়াগে দাক্ষিণাত্য ব্রাহ্মণগৃহে অবস্থান করেন। সেখানে শ্রীরূপ গোস্বামী ভ্রাতা অনুপমসহ শ্রীচৈতন্যের দর্শনলাভ করেন। তথায় "লোক ভীড় ভয়ে প্রভু দশাশ্বমেধ যাএগ্রা।
রূপ গোস্বামীকে শিক্ষা করান শক্তি সঞ্চারিয়া॥"
এই মত দশদিন প্রয়াগে রহিয়া
শ্রীরূপে শিক্ষা দিল শক্তি সঞ্চারিয়া ॥ (চৈ. চ.)

প্রভু এখান হতে শ্রীরূপ গোস্বামীকে বৃন্দাবনে প্রেরণ করেন।

চতুর্দশ অধ্যায়

বাংলাদেশে বৈষ্ণবতীর্থাদি

১। রাজসাহী জেলায়—আরোড়া, প্রেমতলী, খেতুরী, পাছপাড়া ইত্যাদি।
২। যশোহর জেলায়—তালখণ্ডি, হালদা মহেশপুর, বোধখানা, ফতেয়াবাদ।
৩। চট্টগ্রাম জেলায়—চক্রশাল, বেলেটি।
৪। ঢাকা জেলায়—স্বর্ণগ্রাম, বেতুল্যা, কাষ্ঠকাটা।
৫। শ্রীহট্ট জেলায়—নবগ্রাম, পনাতীর্থ, বড় গঙ্গা, ভিটাদিয়া, শ্রীহট্ট।
৬। খুলনা জেলায়—বুঢ়ন।
৭। বগুড়া জেলায়—গোপীনাথপুর।
৮। ফরিদপুর জেলায়—ফরিদপুর।

পঞ্চদশ অধ্যায়
বিশ্বে কৃষ্ণনাম

আজ হতে প্রায় পাঁচশত বৎসর পূর্বে শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু বলেছিলেন

"পৃথিবীতে আছে যত নগরাদি গ্রাম।
সর্বত্র প্রচার হইবে মোর নাম ॥"

তাঁর বাণীর প্রতিফলন আজ আমরা দেখতে পাচ্ছি। সমগ্র পৃথিবীর গ্রামে গ্রামে, নগরে নগরে আজ উচ্চারিত হচ্ছে হরেকৃষ্ণ নাম, আলোচিত হচ্ছে মহাপ্রভু শ্রীচৈতন্যের বাণী "জীবের স্বরূপ হয় নিত্যকৃষ্ণ দাস। "তাঁকে ভুলে যাওয়াতেই বিশ্বময় অশান্তি, জীবের দুর্গতি।

'হরে কৃষ্ণ' মহামন্ত্র সমগ্র বিশ্বে প্রচার কার্যে রত আছে গৌড়ীয় মঠ, শ্রীচৈতন্য মঠ প্রভৃতি। তবে মায়াপুরের কৃষ্ণভাবনামৃত সংঘ The International Society for Krishna Consciousness" সংক্ষেপে ইসকন আজ বিশ্বের গ্রাম হতে গ্রামান্তরে গিয়ে কৃষ্ণনাম প্রচার করছেন। বাস্তবিক পক্ষে কৃষ্ণনামামৃত প্রচার হয় আজ থেকে পাঁচ হাজার বৎসর পূর্বে, যখন শ্রীকৃষ্ণ তাঁর সখা অর্জুনকে গীতার তাৎপর্য ব্যাখ্যা করেন। শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু ছিলেন ভগবানের অবতার। বৈদিক শাস্ত্রসমূহে ভগবানের অবতারের যে সমস্ত লক্ষণ বর্ণিত হয়েছে তার সব কটিই শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর মধ্যে বিদ্যমান ছিল। ভগবান শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য অবতীর্ণ হয়েছিলেন এই কলিযুগের কলুষিত মানুষকে ভগবৎ প্রেমে উদ্বুদ্ধ করবার জন্য। সঙ্কীর্তন আন্দোলন বা সঙ্কীর্তনযজ্ঞের মাধ্যমে হৃদয়ে অমৃত বারি সিঞ্চন করেছিলেন মানুষের উদ্ধারকল্পে।

সারাবিশ্বে কৃষ্ণভাবনামৃত সংঘের যে সমস্ত কেন্দ্র স্থাপিত হয়েছে "Centre around the world" উৎসাহী পাঠক পাঠিকার জ্ঞাতার্থে নিম্নে দেওয়া হল .-

উত্তর আমেরিকা-কানাডায় : ক্যালগেরী (আলবার্টা), মন্ট্রিল (কুইবেক), আটোয়া (অন্টেরিও); রেগিলা (সসকাচেয়ন); টরেন্টো (অনটেরিও) ; ভ্যানকুইভার প্রভৃতি। আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্র (U.S.A.) য়্যাটান্টা (জার্জিয়া); বাল্টিমোর (মেরীল্যাণ্ড), বইস (ইদাহো); বোস্টন (মাসাচুসেটস) ; চাম্‌পাইন, চ্যাপেল হিল, চিকাগো, ক্লেভেল্যাণ্ড, ড্যাল্লাস, ডেনভার, ডেট্রোইট, এনসিনিটাস, গেনেসভিল, গুরাবো, হার্টফোর্ড, হনলুলু, হাউসটন্, ল্যাগুনা, লং আইল্যাণ্ড, লসঅ্যাঞ্জেলস্, মিআমি. নিউঅরলিনস্ নিউইয়র্ক, ফিলাডেলফিয়া, সেন্ট লুই, স্যানডিগো, সিট্‌ল, সানফ্রানসিস্‌কো, স্প্যানিশ কর্ক, টাল্লাহাসি, টোপানগা, তাওকো, টাক্‌সন্, ওয়ালাওয়ালা, ওয়াশিংটন, প্রভৃতি।

ইউরোপ যুক্তরাজ্য ও আয়ারল্যাণ্ড : বেলফাস্ট, বার্মিংহাম, ব্রিস্টল, কভেন্ট্রী, ডাবলিন, লিসেষ্টার, লিভারপুল, লণ্ডন, ম্যানচেস্টর, নিউক্যাসল্, রথগোরা, স্কটল্যাণ্ড

জার্মানী : বার্লিন, ফ্রেন্সবার্গ, হামবার্গ, হিডেলবার্গ, কইন, নুরেমবার্গ, উইমার, উইসহাডেন, ইত্যাদি।

ইটালী : অস্টি, বারগামো, বোলোগনা, ক্যাটানিয়া, নেপলস্, রোম, ডিসেন্‌জা ইত্যাদি

পোল্যাণ্ড : ড্যানস্ক, ক্র্যাকাউ, পুজন্যাল, ওয়ারশ ইত্যাদি।

সুইডেন : গোথেনবার্গ, গ্রোডিঞ্জ, কার্লস্টাঙ্, লাণ্ড, মেইমো, স্টকহল্‌ম, আপশালা ইত্যাদি

সুইজারল্যাণ্ড : বেলিনজোনা; বার্ণ, বেল, জুরিক্ ইত্যাদি।

অন্যান্য স্থানে : আমারস্টারডম্, স্যান্টওরাপ, এথেনস্, বারিসিলোনা, বেলগ্রেভ, বুডাপেস্ট, কোপেনহেগেন, ডেবরিসেন, হেলসিঙ্কি, লাসি, কাউনাস, ক্লাপেডা, লিসবন, যুবলজাপা, মাদ্রিদ,

মালাগা, ওস্‌লো, প্যারিস, লোকদীব, পোর্টো, প্রেগ, প্রেগরাডা, পুলা, রিগা, বিজেকা, রটারডম্‌, সান্তাক্রুজ, সারাজেভো, সেপটন্‌, শিয়ললিআই, স্কোপজী, সোফিয়া, স্পিল্ট, তেল আবিব, টিমিসোরা, টার্কু, ভিয়েনা, ভিলনিয়া, ভিরোভিটিকা, জাগ্রে, ইত্যাদি।

রাশিয়া : মস্কো, নিজনী, নোভোসিবিস্ক্‌, প্রেম, সেন্ট পিটার্সবার্গ, আলজানভোস্ক, ব্লাডিভোস্টক

ইউক্রেন : চার্কভ, চারনিগভ্‌, নিপ্রোপেট্রোভস্ক, জোনেস্ক, খার্কভ, কিভ্‌, ভভ্‌, নিকোলেভ, ওডেসা।

অন্যান্য দেশে : আলমাআটা, বাকু, বিশেক্‌, ডুশানবি, কিসিনেভ্‌, মিন্‌স্ক, সুখুমি, বিলিসি, ইরেভ্যান।

অস্ট্রেলিয়া : য়্যাডিলেড্‌, ব্রিসবেন, ক্যানবেরা, মেলবোর্ণ, পার্থ, সিডনী, ইত্যাদি।

নিউজিল্যাণ্ড ও ফিজি : ক্রিস্ট্‌চার্চ, ল্যাবাসা, লার্ডটোকা, বাকিরকী, সুভা, ওয়েলিংটন ইত্যাদি।

আফ্রিকা (দঃ আফ্রিকা) : কেপটাউন, ডারবান্‌, জোহেনসর্বার্গ, পোর্ট এলিজাবেথ,

অন্যান্য : আবেবকুটা, আবিদ্‌জান, আক্রা, বোয়া, ফ্রিটার্ডন, কামপালা, কিসুম, ল্যাগোস্‌, ম্যারনডেরা, মোম্বসমা, নাইরোবি, কাস্কো, ফিনিবা। পোর্ট হারকোট, টোকোরাডি, ওয়ারি ইত্যাদি।

এশিয়া (ত্রিপুরা) : আগরতলা, আমেদাবাদ, এলাহাবাদ, বামনবোর, ব্যাঙ্গালোর, বরোদা, ভাণ্ডার, ভুবনেশ্বর, মুম্বাই, বেলগাঁও, কলকাতা, চণ্ডীগড়, কোয়েমবাটুর, গৌহাটি, হনুমকোণ্ডা, হায়দ্রাবাদ, ইম্ফল, পুরী, কুরুক্ষেত্র, মাদ্রাজ, ম্যাঙ্গালোর, মায়াপুর, মৈরাং, নাগপুর, নূতনদিল্লী, পাণ্ডারপুর, পাটনা, পুণে, সেকেন্দ্রাবাদ, শিলচর, শিলিগুড়ি, সুরাট, তিরুপতি, ত্রিবান্দ্রম্‌, উধমপুর, বল্লভবিদ্যানগর, বৃন্দাবন ইত্যাদি।

অন্যদেশ : বালি, গ্যাংটক, কাপাইনডোরো, চট্টগ্রাম, কলম্বো, ঢাকা, হংকং, লোইলো সিটি, জাকার্তা, যশোহর, কাঠমুণ্ডু, কুয়ালালামপুর, ম্যানিলা, সিঙ্গাপুর, তাইপে, টোকিও, যোগিয়াকর্তা ইত্যাদি।

ল্যাটিন আমেরিকা (ব্রাজিল) : বেলেমপা, বেলো হরিজন্টি, ব্রাসিলিয়া, ক্যাকসাস্‌, কিউরিটিবা, ফ্লোরিয়ানোপেলিস্‌, ফরটেলেজা, গৌরুলহস, মানার্ডস্‌, ন্যাটাল, পিরাজির্ড, পোরটো, য়্যালগ্রি, র‍্যাসিফ্‌,. রিবেবাও, রিও ডি জেনারো, গ্যালভেডর স্যানটস্‌, সান পোলো, টেরেসোপোলিস্‌ ইত্যাদি।

মেক্সিকো : গডালজারা, মেক্সিকো, সালটিল্লো ইত্যাদি।

পেরু : আরে কুইপা, কুজকো, লিমা ইত্যাদি

অন্যদেশে : আসুনচিয়ন, বোগোটা, বোনাসআরেস, কলি, ক্যারাকাস্‌, চিনান্‌দেগা, কোচাবাম্বা, কোয়েঞ্চা, এসেকুইবো, জর্জটাউন, গোয়াতেমালা, গোবাকুইল, ম্যানাকোয়া, মারডেল প্লাটা, মেনডোজা, মন্টেভিডিও, পানামা, পেরুরা, কুইটো ইকোয়েডার, রোজারিও, স্যান্‌জোস্‌, সানেসেলভেডর, স্যানটিয়াগো, স্যান্টোডোমিন্‌গো, ত্রিনিদাদ্‌, টোবাগো ইত্যাদি।